বাংলা মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈন দেবভাবনা: পৌরাণিক ও লোকায়ত উপাদান সন্ধান ও বিশ্লেষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধীনে
পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

লিপিকা বিশ্বাস

রেজিস্ট্রেশন নাম্বার AOOCL1200818 (2018-2019)

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২২

বাংলা মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈন দেবভাবনা: পৌরাণিক ও লোকায়ত উপাদান সন্ধান ও বিশ্লেষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধীনে
পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

লিপিকা বিশ্বাস

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুজিত কুমার মণ্ডল

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২২

<u>Certificate that the Thesis entitled</u>

বাংলা মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈন দেবভাবনা: পৌরাণিক ও লোকায়ত উপাদান সন্ধান ও বিশ্লেষণ Submitted by me for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Dr. Sujit Kumar Mandal, Associate Professor, Department of Comparative Literature, Jadavpur University, Kolkata – 700032. And that neither this Thesis nor any part of it has been submitted before for any Degree or Diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor : Candidate :

Dated : Dated :

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুসংগতভাবে সম্পূর্ণ করতে পারার জন্য সর্বপ্রথমে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, ধন্যবাদ জানাবো আমার এই পি এইচ. ডি কাজের উপদেষ্টা ড. সুজিত কুমার মণ্ডল মহাশয়ের কাছে। তিনি গবেষণা কাজটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর বহু ব্যস্ততার মধ্যেও দক্ষতার সঙ্গে আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এরপর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি RAC কমিটির সদস্য বাংলা সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক মহোদয়, ড. রাজ্যেশ্বর সিনহা ও ড. সুমিত কুমার বড়ুয়া মহাশয়দ্বয়কে। এই শ্রদ্ধেয় মণ্ডলী আমার গবেষণা কাজটি সম্পূর্ণ করতে প্রথম থেকেই ধারাবাহিকভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়ে এসেছেন। তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী যারা আমাকে সকল বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই –ড. কুণাল চট্টোপাধ্যায়, ড. সুচরিতা চট্টোপাধ্যায়, ইপ্সিতা হালদার, ড. স্যমন্তক দাস, ড. সায়ন্তন দাশগুপ্ত, ড. দেবশ্রী দত্তরায়, ড. সুচেতা ভট্টাচার্য, ড. পার্থসারথি ভৌমিক মহাশয়কে।

তুলনামূলক সাহিত্যের বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক নিতাই-দা ও সুদীপ-দা এবং বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক হরিশ-দা ও আইভি-দি’কে ধন্যবাদ জানাই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিকদের ধন্যবাদ জানাই। জাতীয় গ্রন্থাগার ও গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগারিকদের ধন্যবাদ জানাই, সুষ্ঠভাবে গ্রন্থাগারগুলি ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য। এরপর ধন্যবাদ জানাই আমার বিভাগীয় দাদা-দিদিদের ও আমার সহপাঠীবৃন্দকে। যারা অনুপ্রেরণা ও সঠিক মতামত দিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। UGC-RGNF ফেলশিপ কতৃপক্ষকে গবেষণার প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সবশেষে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবো আমার ভালোবাসার পরিবারের কাছে। ঠাকুরমা, মা ও বাবা যারা সর্বদা আমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছেন। ক্ষেত্রসমীক্ষায় সাহায্য করেছে দাদা গোপাল বিশ্বাস, ভাই দেবরাজ বিশ্বাস ও প্রকাশ বিশ্বাস যাদেরকে স্নেহপূর্ণ ধন্যবাদ জানাই। সর্বশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই ড. সুজন বিশ্বাসকে যিনি সর্বদা শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিটি অঙ্গনে আমায় সাহায্যপ্রদান করে আমাকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জুগিয়েছে।

লিপিকা বিশ্বাস

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা **১-৩১**

প্রথম অধ্যায়: মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ-জৈন সমাজ, সাহিত্য ও দেবভাবনার পরিচয় **৩২-৮৮**

১. ০ ভূমিকা ৩২-৩৩

১. ১ মঙ্গলকাব্যের পরিচিতি ৩৩-৫২

১. ২ বৌদ্ধ ধর্মের পরিচিতি ৫২-৫৮

১. ৩ জৈন ধর্মের পরিচিতি ৫৮-৬৪

১. ৪ বাংলায় বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ও সাহিত্যে তার প্রতিফলন ৬৫-৬৯

১. ৫ বাংলায় জৈনধর্মের বিকাশ ও সাহিত্যে তার প্রতিফলন ৬৯-৭৩

১. ৬ মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ-জৈন দেবভাবনার পরিচয় ৭৩-৭৬

১. ৭ উপসংহার ৭৬-৭৭

টীকা ৭৮-৮৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলা সাহিত্যেতিহাস চর্চার নিরিখে মঙ্গলকাব্যের গুরুত্ব: 'বৌদ্ধ ও জৈনযুগ' সহ 'হিন্দু- বৌদ্ধযুগ' এর পুনর্বিবেচনা **৮৯-১৬০**

২. ০ ভূমিকা ৮৯-৯৩

২. ১ মঙ্গলকাব্যের গুরুত্ব ৯৩-১০৩

২. ২ বৌদ্ধ ও জৈনযুগ ১০৩-১১৭

২. ৩ হিন্দু-বৌদ্ধযুগ ১১৭-১৪৩

২. ৪ সাহিত্যের ইতিহাস চর্চায় বৌদ্ধ-জৈন ভাবনার গুরুত্ব ১৪৩-১৫৩

২. ৫ উপসংহার ১৫৩-১৫৪

টীকা ১৫৫-১৬০

তৃতীয় অধ্যায়: মঙ্গলকাব্যের দেবভাবনা ও দর্শনে, বৌদ্ধ ও জৈন দেবভাবনা ও দর্শনের পৌরাণিক ও লোকায়ত উপাদানের প্রতিগ্রহণ **১৬১-২৩১**

৩. ০ ভূমিকা ১৬১-১৬২

৩. ১ মঙ্গলকাব্যের দেবভাবনা ও দর্শনে বৌদ্ধ-জৈন দেবভাবনা ও দর্শনের পৌরাণিক উপাদান ১৬২-১৯০

৩. ২ মঙ্গলকাব্যের দেবভাবনা ও দর্শনে, বৌদ্ধ-জৈন দেবভাবনা ও দর্শনের লোকায়ত উপাদান ১৯১-২২৪

৩. ৩ উপসংহার ২২৪

টীকা ২২৫-২৩১

চতুর্থ অধ্যায়: মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈন ভাবনার ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য **২৩২-৩০৫**

৪. ০ ভূমিকা ২৩২-২৩৩

৪. ১ মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈন ভাবনার ধর্মীয় তাৎপর্য ২৩৩-২৪৫

৪. ২ মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈন ভাবনার সামাজিক তাৎপর্য ২৪৫-২৬১

৪. ৩ মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈন ভাবনার সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ২৬১-২৭৭

৪. ৪ ভারতীয় হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবী এবং বৈদেশিক বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর মূর্তি, চিত্র প্রকরণের তুলনামূলক আলোচনা ২৭৭-২৯৮

৪. ৫ উপসংহার ২৯৮-২৯৯

টীকা ৩০০-৩০৫

উপসংহার **৩০৬-৩১০**

পরিশিষ্ট **৩১১-৩১৭**

গ্রন্থপঞ্জি **৩১৮-৩৩২**

বাংলা মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈন দেবভাবনা: পৌরাণিক ও লোকায়ত উপাদান সন্ধান ও বিশ্লেষণ

ভূমিকা

ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজের ধর্মীয় ইতিহাসের কথা জানতে হলে আমাদের সেই সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত ধর্মীয় নীতি ও আচরণবিধি ঘিরে লিখিত গ্রন্থ *বেদ*[১] পাঠ প্রয়োজন। বৈদিক এই গ্রন্থগুলি লিখিত হয়েছিল দেবতাদের আরাধনার জন্য তাই এগুলি গঠিত হয়েছিল মন্ত্র, গান বা স্তবের আকারে। এইসকল স্তবগুলি পাঠ করতেন সমাজের পূজনীয় মুনি বা ঋষিগণ। প্রধান এই চারটি বৈদিক গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায় বর্তমান সময়েও পূজিত কিছু পৌরাণিক দেবতাদের নাম যেমন - ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, লোম, ঈশান, প্রজাপতি ব্রহ্মা, যম ও অন্যান্য দেবতা। এইসকল দেবতাদের সামনে ঋষিগণ মানবজাতির স্বার্থে ও নানাবিধ জাগতিক প্রাপ্তিলাভের আশায় প্রার্থনা করেছেন। এমনকি শত্রুর হাত থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতেও তারা আরাধ্য দেবতাদের স্মরণ নিয়েছেন। দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রাপ্তির আশায় সেসময়ে মানুষ দেবতাদের সামনে মূল্যবান খাদ্য, পশু, পশুর মাংস, মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী উৎসর্গ করেছেন। এই গ্রন্থগুলিতে বৈদিক ধর্ম ও দর্শনতত্ত্বের কথা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মূল বেদের মধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে বিশ্ব কীভাবে সংগঠিত হয়েছিল সেই বিষয়ে। পৃথিবী সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য কি ছিল স্রষ্টার সেই বিষয়েও এখানে নানাবিধ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থ মধ্য থেকে ঋষিদের দ্বারা একাধিক দেবতার রূপকল্পনা করতে দেখা গেছে। যেমন – ঋকবেদের অষ্টমভাগে পাঁচশো তেষট্টি নম্বর সূক্তে সূর্যদেবের চেহারার বর্নণা পাওয়া যায়। যেখানে সূর্য দেবতার মূর্তির সঙ্গে সাতটি ঘোড়ার বর্ণনা জুড়ে দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন –

> "সপ্তয়ঃ" পদে আমরা "ভগবৎসম্বন্ধ রিকাঃ সদ্বৃত্তয়ঃ" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'সপ্তন' শব্দের মূল যে 'সপ' তু, তাহার অর্থ 'একত্রীকরণ'। যাহা একত্রিত বা মিলিত করিয়াই ভাব প্রকাশ পক্ষে ঐ পদ ব্যবহার করা যায়। অর্থব্ববেদের প্রথম মন্ত্র 'ত্রিষপ্তা' পদ আছে। সেখানে 'সপ্ত' পদে যে যে ভাব ব্যক্ত হয়, তাহা প্রকাশ করিয়াছি। ফলতঃ ভগবানের সম্বন্ধ যাহাতে আনে, খানে 'সপ্তয়ঃ' পদে সেই ভাবই প্রাপ্ত হই। নচেৎ, উপমা পক্ষে 'সপ্তয়ঃ' পদে 'সপ্তরশ্মি' 'সপ্তকিরণ' ভাব গ্রহণ করা যায়। সূর্য্যদেব সপ্তাশ্বে আগমন করেন, তাঁহার সপ্ত অশ্ব- এবং বিধ বাক্যের তাৎপর্য্য কি? সূর্যরশ্মিতে আমরা সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু বাস্তব- পক্ষে শ্বেতবর্ণ বলিয়া কোন বর্ণই নাই। সাতটি বর্ণের মিলনে শ্বেতবর্ণের উৎপত্তি হয়। সপ্তবর্ণ (সপ্তকিরণ) এক হইয়া সূর্য্যদেবকে প্রকাশ করে। তাঁহার যে মূর্ত্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহা সপ্তরশ্মির (সপ্তবর্ণের) সমন্বয়। তাই সূর্য্যের সপ্তাশ্ব পরিকল্পিত হয়। এখানেও সেই মিলনের

মিশ্রণের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। সে পক্ষে এখানকার প্রার্থনার তাৎপর্য্য এই যে, - 'সপ্তকিরণ দ্বারা সূর্য্যদেব যেমন প্রকাশমান হন, সেইরূপ সৎকর্ম্মজ্ঞাত সত্ত্বভাবের দ্বারা আপনারা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন।[২]

সূক্তগুলি থেকে দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে প্রার্থনা করার নানাবিধ ভঙ্গিমা ও পদ্ধতির কথাও জানা গেছে। ঋষিরা সর্বদা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মানবের কর্মবিধির ওপর দেবভাব প্রতিষ্ঠা করা এবং দেবতাকে অনুসরণ করে চলা ব্যক্তির সৎভাবনা ও সুষ্ঠুমস্তিষ্কের অধিকারী হওয়ার আশীর্বাদ চেয়েছেন। মানুষ সেই সময়ে দানকর্মকে বেশ উৎসাহ প্রদান করত। দেবতার অনুসারী ব্যক্তিকে দানশীল হয়ে ওঠার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে বারেবারে গ্রন্থমধ্যে। সবশেষে প্রার্থিত ফল প্রদান করে দেবতারা মানব হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেছে। বেদ-এ বিভিন্ন দেবতার আরাধনা করা হয়েছে এবং পৃথিবীর ও মানবের মঙ্গলের জন্য কিছু আচরণ দেবতার প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে। যেমন - ঋকবেদ গ্রন্থে পৃথিবী দেবতাকে উদ্দেশ করে ভরদ্বাজ ঋষি বলেছেন –

১) হে দ্যাব্যাপৃথিবী! তোমরা উদকবতী, ভূতসমূহের আশ্রয়নীরা, বিস্তীর্ণা, প্রথিতা, মধুদুঘা, সুরূপ বিশিষ্টা, বকণের ধারণ কার্য্যদ্বারা পৃথক রূপে ধারিতা, অজরা এবং বহু রেতস্কা।

২) অসঙ্গতা, বহুধারাবিশিষ্টা, উদকবতী ও শুচিব্রতা (দাব্যাপৃথিবী) সুকৃতি ব্যক্তিকে উদক দান করেন, হে দাব্যাপৃথিবী! তোমরা এই ভুবনের রাজ্ঞী, তোমরা আমাদিগকে যাহা মনুষ্যগণের হিতকর এরূপ রেতঃ সেচন কর।

৩) হে ধিষণা দাব্যাপৃথিবী! যে মর্ত্ত্য (তোমাদের) সুখ গমনের জন্য (হব্য) দান করেন, তিনি সিদ্ধ মনোরথ হন এবং অপত্যগণের সহিত প্ররদ্ধ হন। কর্ম্মের উপরি তোমাদিগের সিক্ত (রেতঃ) নানা বর্ণ বিশিষ্ট এবং সমানকর্ম্মা (পদার্থরূপে) উৎপন্ন হয়।

৪) দাব্যাপৃথিবী! জলের দ্বারা আবৃতা এবং জলকে আশ্রয় করেন তাঁহার জল সৎপৃক্তা, জলবর্শয়িত্রী, বিস্তীর্ণা, প্রথিতা এবং যজ্ঞে পুরস্কৃতা। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিকট যজ্ঞার্থে সুখ যাঞ্চা করেন।[৩]

বৈদিক সকল গ্রন্থগুলিতে এইভাবে ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মের একাধিক দেবতাদের নাম, তাদের নানাবিধ গুণাগুণ এবং চরিত্রবৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। ঋষিদের বর্ণিত গ্রন্থগুলি থেকে বৈদিক দেবতাদের মূর্তি রূপায়ণ এবং পূজাপদ্ধতি গ্রহণ করে চলেছে যুগ যুগ ধরে।

বৈদিক ধর্মীয়গ্রন্থ ও পূজাপদ্ধতিগুলির মধ্যে পরবর্তীতে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বিশেষ আধিপত্য লক্ষ করা গেছে। এমনকি প্রাচীনভারতে ব্রাহ্মণদের সৃষ্ট ধর্মীয় গ্রন্থগুলি সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। মূলত বেদের একটি অংশকে কেন্দ্র করে এই ব্রাহ্মণ্য মতবাদ গড়ে উঠেছিল। প্রাচীনভারতীয় হিন্দু[৪] সমাজে বর্ণের দিক থেকে যে চারটি শ্রেণিতে বিভাজিত করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে প্রথম স্তরে ছিল এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষেরা। এই শ্রেণিভুক্ত মানুষেরা নিজেদের হিন্দুদের ধর্মীয়স্থান এবং ধর্মীয় কার্যবিধির রক্ষাকর্তা বলে নিজেদের চিহ্নিত করত। হিন্দু ও ব্রাহ্মণ উভয়

ধর্মীয়মতবাদের মূল গ্রন্থগুলি গঠিত হয়েছিল শ্রুতিকে কেন্দ্র করে। চারটি প্রধান মতবাদের উপর ব্রাহ্মণ্যবাদ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রথম অংশে বলা হয়েছে - তাঁদের মতে বেদ হল একমাত্র ধ্রুব সত্য। বেদের বিপরীতে কোন প্রসঙ্গ আলোচনা অনুচিত। বেদের বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রথম এবং প্রধান পালনীয় কর্ম হল যে কোন অবস্থাতে বেদকে সম্মান করা ও বেদে বর্ণিত পালনীয় কর্মগুলিকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা। ব্রাহ্মণ্যবাদীরাও বিশ্বাস করে পুনর্জন্মবাদকে। তাঁদের মতে এই পুনর্জন্মকে পিছনে ফেলে এসে মুক্তিলাভ সম্ভব শুধুমাত্র নিষ্ঠাভরে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ পালনের মধ্যে দিয়ে। ব্রাহ্মণ্যরা একথাও বিশ্বাস করে বেদ-এ লিখিত স্তবগুলি শুধুমাত্র আদর্শ ধর্মগাথার ভূমিকাই পালন করে না, এখানে আদর্শ সমাজ গঠনের নমুনাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই আদর্শ ব্যবস্থার প্রধান হাতিয়ার হল *চতুরবর্ণ* প্রথা। যেখানে বলা হয়েছে মানুষ জন্মগতভাবে এই চারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই সামাজিক প্রক্রিয়ার কথা বেদ-এ উল্লিখিত রয়েছে। এই প্রথাকে অকাট্য মেনে নিয়ে ব্রাহ্মণরা সমাজে প্রচার করতে থাকে মানুষ জন্মগত ভাবে সমাজের অধিকার লাভ করে থাকে। এই চার শ্রেণির সামাজিক মানুষের মধ্যে রাখা হয়েছিল কিছু বৈষাম্য। বেদ ভাষ্যের উদ্দেশ্যে কোনরকম প্রশ্ন উত্থাপন না করেই ব্রাহ্মণরা নিজেদের সমাজের সবচেয়ে উঁচু স্থানের মানুষ হিসেবে নির্বাচন করেছিল। তাঁরা নিজেদের অধিকার বজায় রাখতে সমাজের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। ক্ষত্রিয় যারা যুদ্ধকর্মকে নিজেদের ধর্ম বলে মনে করেছিল। তাঁরা ব্রাহ্মণদের মতো সকল সুবিধা পেতে পারত না। বৈশ্যরা থাকে ক্ষত্রিয়দের নীচে, যাদের জীবিকা নির্বাহিত হত ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে। সমাজের একেবারে নিচুতলায় রাখা হয়েছিল শূদ্রদের। তাঁদের সমাজে কোন রকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হত না। তাঁদের বোঝানো হত পূর্ব কর্মফলের জন্য তাঁদের এই নীচু জাতিতে জন্মলাভ হয়েছে। সমাজের উঁচুজাতিদের সবরকম পরিষেবা দেওয়াই তাঁদের পূর্বজন্মের কর্মফল লাঘবের বা মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। ব্রাহ্মণ্যসমাজের এই চতুরবর্ণ রীতির মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির মধ্যেও ছিল জন্মগত অধিকারের প্রভাব। বেদ-এ বর্ণিত চতুরাশ্রম প্রথা (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) যা ব্যক্তি জীবনকে চারটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করতে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানকালেও ব্রাহ্মণদের মধ্যে এইসকল রীতি পালিত হতে দেখা যায় কিছু নবসংস্করণের মধ্য দিয়ে। ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়নের

পরে সমাবর্তনের দিন পর্যন্ত অর্থাৎ দশ থেকে বারো দিন ধরে উপনীত বালক ব্রহ্মচর্য পালন করে থাকে। এই দিনগুলিতে সে ব্রত গ্রহণ করে সমাজের নারী, শূদ্র ও সূর্য দেবতার মুখদর্শন না করার। এই সময়ে সে খাদ্য হিসেবে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে। হোম এবং একাধিক বৈদিক বিধি পালন করে দিনযাপন করে থাকে। এগুলির মধ্যে দিয়ে আসলে পূর্বকালের গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড অনুশীলনের নিয়মরক্ষা করা হয়।[৫] ব্রাহ্মণ্যরা কর্মসূত্র মতবাদ-এর মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছে মৃত্যুর পর আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে। কর্মফল হল তার নতুন জীবনলাভের একমাত্র অবলম্বন।

প্রাচীন ভারতের এইসকল বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থগুলিকে কেন্দ্র করে একসময় হিন্দুধর্ম অনুসারীদের মধ্যে দেবতাকেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগে ধর্মবিষয়ক আখ্যানজাতীয় এক শ্রেণির কাব্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। যেগুলিকে এককথায় *মঙ্গলকাব্য* বলে সাহিত্যের পাতায় চিহ্নিত করা হয়েছে। এই জাতীয় কাব্যগুলিতে প্রাচীন ভারতের ন্যায় মধ্যযুগের সমাজে নব আবির্ভূত দেবতাদের আরাধনা ও মাহাত্ম্য-কীর্তন করা হয়েছে। এই কাব্যের মধ্যে আরও বলা হয়েছে যে এই কাব্য শ্রবণেও মঙ্গল হয়। এই কাব্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশে ব্যক্তি ও পরিবারের অমঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই কাব্যগুলির গুণাগুণ বৃদ্ধি করতে বলা হয়েছে এই কাব্য ঘরে রাখলেও মঙ্গল হয়। এই কাব্যগুলির শুরুতে কবিরা তাদের কাব্য বন্দনা অংশে দেবতামহিমার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলকাব্য মহিমার কথাও ঘোষণা করে থাকে। মনসামঙ্গলের কবি বিজয়গুপ্ত-এর কাব্যে কবি বলেছেন –

আমার গীত শুনিতে জার হৃদয়ে কতুক।
মোর বরে হবে তার নানা ধনে সুখ।।
অপুত্রার পুত্র হয় দরিদ্রের ধন।
রোগীর রোগ দূরে যায়ে বন্দিত মোচন।।
নারী জার ঘরে নাই নারী হয়ে ঘরে।
মনের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়ে মোর বরে।।[৬]

বাইরে থেকে দেখতে গেলে আসলে মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিশেষ কোনও হিন্দু দেবতা বা দেবীকে ঘিরে আলোচনা করা হয়। এইসকল দেবতাভাবনার মধ্যে ছিল মূলত বঙ্গদেশের লৌকিক স্তর থেকে উঠে আসা স্থানীয় কোনো দেবতা ভাবনা। এই কাব্যগুলির মধ্যে কবিরা বেদ, পুরাণ, প্রভৃতি ধ্রুপদী শাস্ত্রগুলিকে সরাসরি কাব্যমধ্যে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেনি। লোকায়ত দেব-দেবীদের ঘিরে আয়োজিত গ্রাম্য আনন্দ উৎসবে এই কাব্যগুলি পাঠ করা হত। জনপ্রিয় কাব্যগুলিকে ভজন হিসেবে

গ্রামের মানুষের বিনোদনের জন্য উপস্থাপন করা হত। বেশিরভাগ মঙ্গলকাব্যসমূহ সাধারণত দ্বৈত ছন্দে রচিত। রূপক হিসেবে পুরাণ ছেড়ে সাধারণ পার্থিব বস্তু যেমন - গ্রামবাংলা, মাঠ, লোকজফুল, গাছপালা ও নদী ইত্যাদির কথা ব্যবহার করা হয়েছে। কাব্য পাঠে পাঠকের মনে ধারণা জন্মে এই সকল নিম্নকোটি স্থানীয় দেবতাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে। তাদের পূজাপদ্ধতি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা মঙ্গলকাব্যগুলির মূল লক্ষ ছিল। এইসকল দেবতাগণ অধিকাংশ পরবর্তীকালে বাংলার আঞ্চলিক প্রতীকী দেবতা হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। এই দেবদেবীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখা গেছে তারা অসাধারণ দৃঢ় মানবিক গুণাবলির অধিকারী। এই দেবতাদের সরাসরি মানুষের সঙ্গে দৈনন্দিন আচার-আচরণে জড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। সাধারণ মানুষের মতো এই দেবতাদের চরিত্রের মধ্যে নানাবিধ মানবিক দোষ ও গুণাবলির উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। যেমন - ঘৃণা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ, স্নেহ, ভয়, প্রয়োজনে অন্যের ক্ষতি করা, অন্যায় ও চতুরতার মধ্যে দিয়ে নিজের কার্যসিদ্ধি করা প্রভৃতি এই ধরণের মানবিক লক্ষণের প্রকাশ পেতে দেখা গেছে। মঙ্গলকাব্য পাঠে দেখা যায় স্থানীয় লৌকিক ও বহিরাগত পৌরাণিক দেবতাদের স্বার্থের মধ্যে প্রায়শই সংঘাত হয়েছে এবং পরিসমাপ্তিতে দেখা যায় স্থানীয় লৌকিক দেবতারা জয়লাভ করেছে। কবিরা এই জয়ের বিষয়টিকে মাথায় রেখে কাব্যের নামকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ ধ্যান দিয়েছেন কেননা মঙ্গল শব্দের অর্থ হিসেবে বিজয় শব্দটিও ব্যবহার করা হত। এই কাব্যগুলি লেখা হয়েছিল বিশেষ করে বৈদেশিক ভাবনা থেকে আগত ঈশ্বরপূজারীদের বিরুদ্ধে। সমাজে অচ্ছুৎ করে রাখা লৌকিক ও মাটির সঙ্গে মিশে থাকা স্থানীয় মানুষের পূজিত দেবতাদের জয়গান সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। মধ্যযুগের এই বিশেষ কাব্যধারার সঙ্গে বিজয় শব্দটির বিশেষ যোগ রয়েছে। কাব্যগুলির মধ্যে বহুস্থানে এই বিজয় শব্দটিকে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। যেমন - বিপ্রদাস পিপিলাই তার কাব্যকে *মনসাবিজয়* নামেও কাব্যে উল্লেখ করেছেন। মঙ্গলকাব্যগুলি নিজস্বগুণের দ্বারা হয়ে উঠেছিল মধ্যযুগের চিহ্নস্বরূপ এবং সকল মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ধারক। মঙ্গলকাব্যগুলি ধীরে ধীরে বাংলা ভাষার স্বরূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতি সচেতন ও সজাগ দৃষ্টি রেখে অনুধাবন করলে দেখা যায় মঙ্গলকাব্যগুলি মূলত বাঙালির জাতীয় জীবনকে অনুসরণ করে গড়ে উঠেছিল। মঙ্গলকাব্যের বিস্তারের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় ১৭০০ সালের শেষের পর্যায়ে মঙ্গলকাব্য সারা বাংলায় ছড়িয়ে

পড়েছিল। মাজিলপুর শহরে মঙ্গলকাব্যকে কেন্দ্র করে ধর্ম ও মন্দির নির্মাণের যে তথ্য পাওয়া যায় - সেখানে উল্লিখিত রয়েছে এই অঞ্চলে মঙ্গলকাব্য রচিত ও প্রচারিত হওয়ার পর থেকে শিব মন্দিরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে প্রথমে বৈদিক ধর্মের বিকাশ দেখা গেলেও ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যে বেদবিরোধী কিছু প্রতিবাদী ধর্মের উত্থান লক্ষ করা গেছে। যেমন - জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, অক্রিয়বাদ, নিয়তিবাদ, সাংখ্য মতবাদ, উচ্ছেদবাদ ও প্রভৃতি ধর্মীয় সংগঠন। এইসকল ধর্মমতগুলি সেই সমাজে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করলেও ধীরে ধীরে মতবাদগুলির প্রভাব ম্লান হয়েছে। এই সকল দর্শনগুলির নাম পাওয়া যায় জৈন ও বৌদ্ধদের লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্য থেকে। গৌতম বুদ্ধ ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন তাঁর সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ ছাড়াও দেশে প্রায় বাষট্টি রকমের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয়দর্শন বা মতবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল ধর্মীয় মতবাদগুলির মধ্যে একটি বিশেষ সাদৃশ্য ছিল এই যে প্রায় প্রত্যেকটি মতবাদই ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিরোধী ধর্মীয়মত ও দার্শনিক পথ। এই মতবাদগুলির মধ্যে প্রাচীনতম ধর্মমত হিসেবে মনে করা হয় জৈনধর্মকে। এই ধর্মমত সেসময়ের সমাজে বেশ প্রভাববিস্তার করেছিল। সমাজে এই ধর্মানুসারী শিষ্যের সংখ্যাধিক্যতা লক্ষ করা গেছে। এই ধর্মমত গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মমতের পূর্বেই সমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। এই ধর্মমতের সঙ্গে সর্বকালীন প্রাচীন মানব ঋষভনাথের সঙ্গে যুক্ত করে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থগুলি থেকে এমনটা প্রমাণ পাওয়া যায় যেখানে উল্লিখিত রয়েছে, যে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের পূজা করা হত। প্রাচীনকালের ঐতিহাসিক ব্যক্তি জৈনতীর্থঙ্কর বর্ধমান বা পার্শ্বনাথের কথা জানা যায়। এই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের পূর্বেও যে জৈনধর্মের অস্তিত্ব ছিল সেই ধারণা আরও বেশি সুস্পষ্ট হয়। সনাতন ধর্মের চারবেদের মধ্যে যজুর্বেদ একটি প্রধানভাগ। যেখানে যজ্ঞের আগুনে পুরোহিতের আহুতি দেওয়ার ও ব্যক্তিবিশেষের পালনীয় আচার-অনুষ্ঠানের পদ্ধতিগুলি এই বেদে সংকলিত হয়েছে। ঠিক কোন শতাব্দীতে যজুর্বেদ সংকলিত হয়েছিল, সেকথা সঠিক করে জানা যায় না। ইতিহাসবিদরা বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করে একথা জানিয়েছেন - আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১২০০-১০০০ এই সময়কালের মধ্যে যজুর্বেদ রচিত হয়েছিল। আনুমানিক এই একই সময়কাল ধরে বেদের অন্য দুটি গ্রন্থ সামবেদ ও অথর্ববেদ সংকলিত হয়েছিল।

এই খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীতে রচিত যজুর্বেদ গ্রন্থে তিনজন জৈন তীর্থঙ্করের নাম পাওয়া যায়, যথা- ঋষভনাথ, অজিতনাথ ও অরিষ্টনেমি। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ ভাগবত পুরাণেও ঋষভনাথকে জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই হিন্দুপুরাণটি প্রথমে লোকমুখে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে ভাগবত পুরাণটি লিখিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বর্তমানকালে ভাগবত গ্রন্থের যেই রূপ সমাজে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে সেই গ্রন্থটি আনুমানিক খ্রিস্টপরবর্তী চতুর্থ-দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে লিখিত হয়েছিল। জৈন সমাজে প্রচলিত লোককথা থেকে জানা যায় ঋষভনাথ বর্তমান চক্রার্ধে (জৈন চক্রানুসারে) এই ধর্মীয়মতটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জৈন ধর্মাবলম্বীরা আরও দৃঢ়তার সঙ্গে ঋষভনাথকে জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলে অনুমান করেন। জৈন গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত রয়েছে ঋষভনাথ জৈনধর্মকে বহুদিকে ও বহুভাবে প্রচার করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় অভিলেখগুলি থেকে যে দেশকালের বর্ণনা, সমাজের ছবি ও সময়কালের নমুনা পাওয়া যায় সেগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক বেশি রাখে। অভিলেখগুলিতে জৈনদের পরিচিতি বিষয়ক নানা পারিভাষিক শব্দ এবং জৈন তীর্থঙ্করদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। কুষাণ সাম্রাজ্যের সময়ের (খ্রিস্টপরবর্তী প্রথমশতক) কিছু জৈনমূর্তিলেখ পাওয়া যায়। যেখানে প্রতিমা সর্বতোভদ্রিকা (জিন চৌমুখীমূর্তি), আয়াগ পট ও দেবনির্মিত স্তূপ প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে আশোকের অভিলেখ (২৬৮-২৩২ খ্রিস্টপূর্ব) থেকে পাওয়া যায় নির্গ্রন্থদের পরিচয়। খারবেল-এর হাতীগুম্ফা অভিলেখ (প্রথম-দ্বিতীয় খ্রিস্টপূর্ব) থেকে কলিঙ্গজিন-এর পরিচয়। মথুরা লেখনী থেকে পাওয়া যায় তীর্থঙ্করদের চিহ্নিত করতে অর্হত শব্দের ব্যবহার। গুজরাট থেকে প্রাপ্ত ধাতুমূর্তি যেখানে খোদিত রয়েছে জীবন্তস্বামী শব্দটি। এই মূর্তিটি মহাবীরের ধর্মদীক্ষা দানকালীন একটি মূর্তি বলে মনে করা হয়। দেওগর অভিলেখ থেকে জৈন তীর্থঙ্করদের সারিবদ্ধভাবে নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এই সারিতে ঐতিহাসিক ঋষভনাথের নাম প্রথমে, তারপর রাখা হয়েছে অন্যান্য তীর্থঙ্করদের নাম। যথা - অজিতনাথ, সম্ভবনাথ, সুমতিনাথ, চন্দ্রপ্রভ, শান্তিনাথ, মল্লিনাথ ও সবশেষে মহাবীর। এই অভিলেখগুলিতে ঋষভনাথ, শান্তিনাথ এবং মহাবীর এই তিনজনের নাম উল্লেখের আধিক্য ধরা পড়েছে। এই স্থানে প্রাপ্ত অভিলেখতে জিনদের উপাসনার বিষয়েও উল্লেখ করেছে। এই দেওগর অভিলেখগুলিতে অন্যান্য বিষয়েরও উপস্থিতি ধরা পরে। এই অভিলেখগুলিকে তিনটি বর্গে

ভাগ করা হয়েছে। যেখানে প্রথমবর্গে থাকে দানকারী এবং তার আশাপাশের সম্পর্কিত ব্যক্তিদের নাম। আরও থাকে দানের পরিমাণের উল্লেখ ও সংক্ষিপ্তে তৎসংক্রান্ত কিছু কথা। দ্বিতীয়বর্গে থাকে স্মারক সূচক ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। তৃতীয় বর্গে থাকে মন্দিরের সূচনাকাল, মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং গড়ে তোলার সময়কালের বিশস্ত কিছু সাল তারিখের উল্লেখ। এই স্তম্ভ লেখনী বা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণগুলি ইতিহাসকে বুঝতে সাহায্য করে।[৭] জৈনধর্মাবলম্বীরা মনে করে আদিনাথ একটি আদিবাসী সমাজকে সুশৃঙ্খল সমাজে রূপান্তরিত করেছিলেন। ঋষভনাথের রাজ্যে মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করত বলেই অনুমান করা যায়। অন্যান্য সকল তীর্থঙ্কর এবং ভারতের ইতিহাসে খ্যাতনামা মহান ঐতিহাসিক যোদ্ধাদের মতো ঋষভনাথও ছিলেন প্রবল শক্তিশালী একজন পরাক্রমশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি সকল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং মানুষকে সুপথে চলতে উৎসাহী করতেন। তাঁর নাম সরাসরি কোনো ঐতিহাসিক যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। যোদ্ধারূপের কথা কোনো জৈন বা অন্যান্য গ্রন্থেও তেমনভাবে পাওয়া যায় না। এই কেবলজ্ঞানপ্রাপ্ত মানবের নাম অহিংসার প্রচারক হিসেবেই বেশি পাওয়া যায়। তাকে সমগ্র মানবজাতির উন্নতির শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক মনে করা হয়।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় - আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সময় থেকে খ্রিস্টপরবর্তী অষ্টম শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষে জৈনধর্মের বেশ আধিপত্য বজায় থাকতে দেখা যায়। প্রাচীনকাল থেকে এই দীর্ঘ সময়কাল ধরে তৎকালীন বাংলাদেশেও এই প্রতিবাদী আখ্যাধারী ধর্মীয়দলগুলি অবস্থান করে আসছিল নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল মহিমার মধ্যে দিয়ে। সূত্রকৃতাঙ্গে চারটি প্রধান জৈনমতবাদের কথা জানা যায়। জৈনদের বিভাজন অনুসারে এই তালিকায় থাকে চারটি প্রধান চিন্তাধারা, যথা - ক্রিয়াবাদ, অক্রিয়াবাদ, অজ্ঞানীকবাদ এবং বৈনায়িকবাদ। তাঁদের কিছু উপগোষ্ঠী মতাদর্শ ছিল। সেসময়ে এই দার্শনিক মতবাদগুলির আনুমানিক প্রায় তিনশো তেষট্টিটি চর্চিত মতবাদের কথা জানা যায়। 'ক্রিয়াবাদদর্শন'-এ মূলত জীবের কর্মকে স্বীকার করেছে। এই গোষ্ঠী মনে করত আত্মা নিজেকে প্রকাশ করে চলেছে নিয়ত। এদের দর্শনকে 'নিয়তিবাদ' নামেও চিহ্নিত করা হয়। তাঁদের মতে আত্মা নিত্য। এই দর্শনের মধ্যে থাকে কালবাদীরা, যাদের কাছে সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের আত্মা প্রকাশিত হয় প্রকৃতির নিয়মে সময়চক্রকে গুরুত্ব দিয়ে। এই মতের ব্যাখ্যা করেছেন গুণরত্ন, যিনি বলেছেন জীবন বৃক্ষের ন্যায়। বৃক্ষ যেমন প্রতিটি ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপধারণ

করে, মানবজীবন ও তেমনি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ রূপধারণ করে। সময় ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব নয়। এই ক্রিয়াবাদীদের অন্য একটি মতবাদ হল 'ঈশ্বরবাদ'। যেখানে ঈশ্বরকে সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা বলা হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ সর্বস্থানে। এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাকালী ঘোষাল। যিনি তাঁর মতবাদের নাম দিয়েছিলেন অদৃষ্টবাদ। তিনি মনে করতেন মানুষের হাতে কিছু থাকে না, সে নিজের প্রচেষ্টায় কিছু বদলাতে পারে না। যা ঘটে চলেছে তা হল প্রকৃতির ইচ্ছা এবং অদৃষ্টের অনিবার্যতার মধ্য দিয়ে ঘটতে থাকে। জৈনগ্রন্থ থেকে এই দর্শনের মোট একশো আটটি মতবাদের কথা জানা যায়।[৮]

জৈনদের দ্বিতীয় মতবাদ হল পবন কাশ্যপের 'অক্রিয়বাদ'। এই দর্শনে বলা হয়েছে আত্মা কোন কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তিনি জানিয়েছেন - মানুষ যদি চুরি করে, অপরকে আঘাত করে, একজন অপরজনকে কারণে বা বিনা কারণে হত্যা করে। কেউ যদি অসৎ উপায়ে অর্থউপার্জন করে। সর্বদা মিথ্যা কথা বলে। লম্পট ও কামুকতা দেখিয়ে সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে এই সকল অনৈতিক কর্মের জন্য আত্মার উপর কোনো প্রভাব পরে না। তিনি আরও বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি সৎকর্ম করে, সর্বদা সত্য কথা বলে। অপরের উপকারে নিজেকে নিয়োগ রাখে এইসকল কর্মের জন্যও মানব আত্মার ওপর কোন প্রভাব পরে না। এই দর্শনে বলা হয়েছে ভালো-মন্দ কোন কর্মের দ্বারাই আত্মার অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না। আত্মা স্থির অবস্থায় থাকে। যেসকল পদার্থের দ্বারা দেহ গঠিত হয়, সেগুলি মৃত্যুর পরে মাটিতে মিশে যায়। মৃত্যুর পরে মানবশরীর যেমন অবশিষ্ট থাকে না। তেমনি আত্মার ও কোন অস্তিত্ব থাকে না। জৈনতালিকা থেকে তাঁদের মোট চুরাশিটি মতাদর্শের কথা জানা যায়।[৯] এই সময়ের তৃতীয় জৈনমতবাদ হল 'অজ্ঞানীকবাদ'। এই মতবাদ সম্পর্কে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের পালি ত্রিপিটকে ব্রহ্মজাল সুত্ত, সমনাফল সুত্ত এবং জৈনধর্মের সূত্রকৃতাঙ্গ গ্রন্থে আলোচনা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলির সঙ্গে সংশয়বাদীদের বাণী ও মতামতগুলিকে (আজ্ঞানিকাহ, আজ্ঞানিনাহ) সংরক্ষণ করেছেন জৈনলেখক সিলাঙ্ক। যিনি মূলত নবমশতক থেকে শুরু করে সূত্রকৃতাঙ্গের সময়কাল পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেছেন। ব্রাহ্মণ ও প্রারম্ভিক উপনিষদে মৃত্যুর পরে ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে, যখন যাজ্ঞবল্ক্য চূড়ান্ত বাস্তবতা বা আত্মাকে জানার অসম্ভবতার পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন। সেসময়ে একাধিক তত্ত্বের মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে সত্যের গৃহীত

মানদণ্ডের অনুপস্থিতিতে কোনো তত্ত্ব আদৌ কতোটা সত্য হতে পারে। সংশয়বাদীরা বিশেষভাবে আত্মার পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব এবং সর্বজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তার বিষয়কে ব্যাখ্যা করেছেন। সত্য জ্ঞান অর্জনের জন্য সর্বজ্ঞতার সমালোচনা করেছেন। জৈন সূত্রকৃতাঙ্গে তিনশত তেষট্টিটি ভিন্ন চিন্তাধারার মধ্যে সন্দেহবাদীদের বাষট্টিটি ধারণাকে গ্রহণ করা হয়েছে। জৈনদের চতুর্থ একটি মতবাদ হল বৈনায়িকবাদ। যেখানে তারা মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করতে গিয়ে বলেছেন যে – যজ্ঞ বা হোমের মাধ্যমে কোন প্রাপ্তি লাভ হয় না। স্বর্গ বা নরক বলে কিছু হয় না। পৃথিবীতে বিশেষ কিছু কারণের জন্য মানুষ সুখী বা অসুখী হয়। মানব শরীরে অবস্থানকারী আত্মা এই আনন্দ ও নিরানন্দ থেকে মুক্তি পায় না। সময়ের সঙ্গে সকল অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আত্মার পুনর্জন্মের জন্য চুরাশি লক্ষ যোজন মহাকল্প পথ অতিক্রম করতে হয়। এই পথ পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে আত্মার সুখ ও দুঃখের অবস্থা থেকে মুক্তি ঘটে। তারা আরও জানিয়েছেন পৃথিবীর জন্ম হয়েছে সাতটি গুণের দ্বারা। সেগুলি হল যথাক্রমে – প্রাথী, অপ, তেজ, বায়ু, সুখ, দুঃখ এবং আত্মা। এই গুণগুলি প্রত্যেকটি হল নিজে নিজে গতিশীল। এরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন গুণের অধিকারী। একটি গুণ অপর গুণগুলিকে তবুও বাধাপ্রাপ্ত করে না। তারা প্রত্যেকে কর্ম দ্বারা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। এই মতাদর্শের মোট বত্রিশসটি মতের কথা জানা যায়। তারা আত্মার শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে মোট আটটি মাধ্যমের কথা বলেছেন। যথা - ঈশ্বর, গুরু, সকল মানব, বয়স্ক শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি, নিকৃষ্টতর প্রাণী, পিতা ও মাতা। তাদের মতে এই প্রাণীকুলকে মানব শ্রদ্ধা জানাবে শরীর, মন, বক্তব্য এবং দানের মধ্যে দিয়ে।[১০] সেসময়ে জৈনদের বিশেষভাবে প্রচলিত একটি মতবাদের নাম ছিল 'চতুর্জামসমভারবাদ'। গৌতম বুদ্ধের সময়ে এই ধর্মের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন মহাবীর যিনি নিগন্থ নামপুত্র নামে পরিচিত। এই ধর্মগুরু আত্মার পুনর্জন্মবাদের কথা মেনে নিয়েছেন এবং বলেছেন পূর্বের ভালো ও মন্দ উভয় কর্মফল মানবকে ভোগ করতে হয়। এই ধর্মমতের মধ্যে তাঁর চতুর্যামনীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেখানে বলা হয়েছে - প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকতে হবে। চুরি করা থেকে দূরে থাকতে হবে। মিথ্যা কথা বলা যাবে না বা কোন জাগতিক সম্পদের মালিক হওয়া যাবে না।[১১] প্রাচীন ভারতের ইতিহাস থেকে পাওয়া বেদ ও ব্রাহ্মণ্যবিরোধী ধর্মগুলির মধ্যে এই সকল ধর্মমতগুলি সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্রাচীন কালের জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলিকে কয়েকটি ছোটো ছোটো জনপদে বিভক্ত থাকতে দেখা গেছে। ইতিহাসে প্রথম ষোড়শ মহাজনপদের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে আরও কিছু ছোটো ছোটো জনপদ তৈরি হতে দেখা গিয়েছিল। জৈনগ্রন্থ *আচারাঙ্গসূত্র*-এ রাঢ় নামে একটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেই অঞ্চলটি এখনকার বঙ্গদেশের রাঢ়ভূমি নামে চিহ্নিত করা হয়। এই জনপদে জৈনগুরু মহাবীর এসেছিলেন জৈনধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এমনটা জৈনগ্রন্থ থেকে জানা যায়। এই রাঢ়দেশের মানুষের অসহযোগিতার জন্য জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে রাঢ়দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। জৈনগুরুদের এই অঞ্চলের প্রতি অনীহার কারণে রাঢ়দেশসহ তাঁর পার্শ্ববর্তী জনপদগুলিতে জৈনধর্ম ততোটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। বাংলাদেশে এই ধর্ম তেমন প্রভাববিস্তার করতে না পারলেও ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে বহুকাল পর্যন্ত এই ধর্মমতটি গৌরবের সঙ্গে পালিত হয়েছে -

> গুপ্ত-পূর্ব যুগে জৈনধর্মের প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল উত্তর ভারতে এই যুগকেই জৈনধর্মের সবচেয়ে গৌরবের যুগ বলা যায়। গুপ্ত যুগে এই ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু স্থানান্তরিত করা হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। উভয় যুগেই এই ধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল।[১২]

এই রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা সর্বদা অক্ষুণ্ণ থাকতে দেখা যায়নি। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজাদের উত্থানের ফলে, প্রত্যেক রাজার নিজের পছন্দসই ধর্মবরণের রীতি দেখা গেছে। গুপ্তযুগে (আনুমানিক ৩২০-৫৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে) জৈনধর্মের বিশেষ উন্নতি ঘটতে দেখা গেলেও। এই সময়কালের মধ্যেই জৈনধর্মের পতনের দিকও সূচিত হয়েছিল। এই সময়ে জৈনধর্ম রাজপৃষ্ঠপোষকতার বাইরেও সমাজের অন্যান্য মানুষ যেমন - ধনী ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিপত্তি বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। গুপ্তযুগের সময়ে সমাজে জৈনধর্মের প্রভাব কমে এলেও, ভারতবর্ষ থেকে একেবারে এই ধর্মের বিলুপ্তি ঘটে না। যার প্রমাণস্বরূপ এখনও ভারতবর্ষ জৈনধর্মাবলম্বীদের দেখা মেলে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে জৈনমন্দির ও প্রতিষ্ঠানগুলি এখনও বেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

জৈনদের প্রথমতীর্থঙ্কর ঋষভনাথ এবং সর্বশেষতীর্থঙ্কর ছিলেন মহাবীর। এই দুইজন তীর্থঙ্কর ছাড়াও জৈনসমাজে স্বীকৃত আরও বাইশজন তীর্থঙ্কর ছিলেন। যারা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে পরিচিত বা বহুল চর্চিত ব্যক্তিমানস হিসেবে ধরা দেয়। জৈন তীর্থঙ্করদের সময়কাল নির্ণয় করতে তাঁরা চন্দ্রমা ও সূর্যের গতিপথেরস্বরূপ নির্ণয় করেছে জৈন আগমগ্রন্থগুলিতে। জৈন ভৌগোলিক

গ্রন্থগুলিতে চন্দ্র এবং সূর্যের একাধিকস্বরূপ এবং সেগুলির সংখ্যা একাধিক একথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁদের মতে পৃথিবীতে আমরা সাধারণত একটি করে সূর্য এবং চন্দ্র দেখে থাকি। জৈন জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী মনে করা হয় জ্যোতির্মণ্ডলে যেমন একাধিক গ্রহ রয়েছে তেমনি চন্দ্র এবং সূর্যও রয়েছে একাধিক। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে হাজারো গ্যালাক্সির নিজস্ব চন্দ্র এবং সূর্য রয়েছে। জৈন পরম্পরা থেকে মনে করা হয় – যে পৃথিবীতে আমরা এখন বসবাস করছি এইরূপ মোট সাতটি ভূভাগ বা ক্ষেত্র রয়েছে জম্বুদ্বীপের অন্তর্ভূক্ত। যেগুলি হল - ভরতক্ষেত্র, মহাবিদেহক্ষেত্র, ঐরাবতক্ষেত্র, রামায়কক্ষেত্র, হিরণ্য বাস্তক্ষেত্র, হেমবাস্তক্ষেত্র ও হরিবর্ষক্ষেত্র। এই সাতটি ভূখণ্ডের মধ্যে যেই পৃথিবীতে মনুষ্য সমাজ বর্তমান রয়েছে তার নাম ভরতক্ষেত্র। এই ভূখণ্ডগুলি প্রত্যেকটি সমুদ্র দিয়ে ঘেরা রয়েছে। যেমন - জম্বুদ্বীপের ভরতভূখণ্ডটি আবৃত রয়েছে লবণহ্রদের দ্বারা। জৈন মতে এই দ্বীপগুলির প্রত্যেকের আলাদা আলাদা চন্দ্র ও সূর্য রয়েছে। এই জম্বুদ্বীপের চন্দ্র এবং সূর্যের সংখ্যা দুটি। অন্যান্য দ্বীপের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা আবার ভিন্ন হয়ে যায়। এই জম্বুদ্বীপের চন্দ্র ও সূর্যের পরিক্রমাকে কেন্দ্র করে জৈনজ্যোতিষগণ তাঁদের সময় বা কালনির্ণয় করে থাকে।[১৩] তাঁরা মনে করে তীর্থঙ্করেরা হলেন শিক্ষক বা ঈশ্বর, পথ-স্রষ্টা, যাত্রাপথ-স্রষ্টা ও ভবনদী পারাপারের কাণ্ডারি।

জৈনবিশ্বতত্ত্ব অনুসারে দেখানো হয়েছে প্রত্যেক বিশ্বজনীন কালচক্রের অর্ধেক সময়ে। চব্বিশজন তীর্থঙ্কর ব্রহ্মাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে তাঁদের আগমনের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলময় করেছেন মানবজাতির কল্যাণে। প্রথম ও শেষ তীর্থঙ্করের মধ্যবর্তী সময়ে এসেছেন আরও বাইশজন তীর্থঙ্কর। যারা হলেন যথাক্রমে - অজিতনাথ, সম্ভবনাথ, অভিনন্দননাথ, সুমিতনাথ, পদ্মপ্রভ, সুপার্শ্বনাথ, চন্দ্রপ্রভ, সুবিধিনাথ বা পুষ্পদন্ত, শীতলনাথ, শ্রেয়াংসনাথ, বাসুপূজ্য, বিমলনাথ, অনন্তনাথ, ধর্মনাথ, শান্তিনাথ, কুণ্থুনাথ, অরানাথ, মল্লিনাথ, মুনিসুব্রত, নমিনাথ, নেমিনাথ ও পার্শ্বনাথ। এই তীর্থঙ্করদের প্রত্যেকের প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল ভিন্ন ভিন্ন বাহন। প্রত্যেকের ছিল নির্দিষ্ট রং-এর অধিকার। এই তীর্থঙ্করেরা জৈন সংঘ স্থাপন করেছিলেন। এই জৈন সংঘ গড়ে উঠেছিল মূলত জৈন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের নিয়ে। যাদের আবার শ্রাবক (পুরুষ অনুগামী) ও শ্রাবিকা (নারী অনুগামী) নামেও চিহ্নিত করা হয়। তীর্থঙ্করদের অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে জৈনরা যথার্থ জ্ঞান মনে করে থাকে। তীর্থঙ্করদের সমকালের

সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পবিত্রতার উপর নির্ভর করে মতবাদগুলির ব্যাখ্যার পার্থক্য দেখা যেত। সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মানসিক পবিত্রতার প্রয়োজন রয়েছে বলে জৈনরা বিশ্বাস করে। এই দুইয়ের মধ্য দিয়ে মানবজাতির উন্নতি করা সম্ভব। তীর্থঙ্কররা ধর্মীয় বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল জীবিত সত্ত্বাকে কৃপা করে থাকেন। এই তীর্থঙ্করেরা সত্য ও ধর্ম প্রচার করে থাকেন মানবের স্বার্থে। প্রাচীনভারতে জৈনদর্শন বা অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রে মানবের সর্বজ্ঞসিদ্ধ লাভের কথা স্বীকার করা হয়েছে। যেমন - জৈন দার্শনিক কুমারিল ভট্ট স্বীকার করেছেন ভবিষ্যৎ পদার্থের জন্য প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রয়োজনীয়তা। তাঁদের মতে যোগশক্তির অসামান্য প্রভাবের দ্বারা বিশেষ কোনো ব্যক্তি মহাশক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। এইরূপ বহু প্রমাণ রয়েছে অতীতে যেখানে ব্যক্তি নিজসাধনার দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির মধ্য দিয়ে জাতিস্মর হয়েছেন। শুধুমাত্র তর্ক জয়ের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি সর্বজ্ঞ হয়েছেন এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। জৈনরা এইরূপ মহান ব্যক্তি বা ব্যক্তিবিশেষের সর্বজ্ঞতা স্বীকার করে নিয়েছেন। জৈমিনিসূত্রে এমনটা স্বীকার করা হয়েছে - একজন মানবের সর্বজ্ঞজ্ঞান লাভ করা সম্ভব।[১৪] জৈনরা এই সর্বজ্ঞ ব্যক্তিদেরই তীর্থঙ্কর জ্ঞানে পূজা করে থাকে। অন্তরের আসক্তি ও ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা থেকে এই সর্বজ্ঞ তীর্থঙ্করেরা মুক্ত থাকেন। তাঁরা সর্বোচ্চ সিদ্ধিলাভ করতে পারে অতিসহজে। এই সকল সিদ্ধি তারা শুধুমাত্র জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রয়োজনে ব্যবহার করেন।

জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত রয়েছে তীর্থঙ্কর নাম-কর্ম নামে একপ্রকার কর্মের কথা। যেখানে বলা হয়েছে মহান আত্মা দ্বারা তীর্থঙ্কর সর্বোচ্চ অবস্থায় উন্নীত হয়। জৈন ধর্মগ্রন্থ *তত্ত্বার্থসূত্র*-এ প্রধান ষোলোটি পালনীয় কর্মের তালিকার উল্লেখ করা হয়েছে। জ্ঞান অর্জনের পর তীর্থঙ্কর সমবসরণে মুক্তির পথ প্রচার করেন। জৈনরা মনে করে দেবতারা একটি স্বর্গীয় মঞ্চ তৈরি করে যেখানে মানুষ ও পশুপাখি একত্রে তীর্থঙ্করদের উপদেশ শুনতে উপস্থিত হয়। তীর্থঙ্করের বাক্য সকল মানুষ ও পশুপাখির নিজস্ব ভাষায় গ্রহণ করে থাকে। এই ধর্মকথা প্রচারকার্যকে বলা হয় সমবসরণ। জৈন গ্রন্থকারিকরা এই সমবসরণকালে বহুদূর পর্যন্ত কোনও নিরানন্দ থাকে না। তীর্থঙ্করদের জন্ম থেকে শুরুকরে পাঁচটি মাঙ্গলিক কর্ম পালন করা হয়ে থাকে। যেগুলির দ্বারা তীর্থঙ্করদের তাঁদের মাতৃগর্ভে প্রবেশ থেকে শুরুকরে তাঁদের মোক্ষলাভ পর্যন্ত ঘটনাকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। যেগুলি হল - গর্ভকল্যাণক বা গর্ভধারণ অর্থাৎ যখন তীর্থঙ্করের আত্মা মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। জন্ম কল্যাণক অর্থাৎ

তীর্থঙ্করের জন্ম। জৈন গ্রন্থে উল্লিখিত ইন্দ্র মেরুপর্বতে তীর্থঙ্করকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করিয়েছিলেন। দীক্ষা কল্যাণক বা সন্ন্যাস গ্রহণ এখানে তীর্থঙ্কর সকল জাগতিক সম্পত্তি পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে থাকেন। জ্ঞান কল্যাণক যেখানে তীর্থঙ্করের কেবলজ্ঞান বা অনন্তশুদ্ধ জ্ঞানলাভের বিষয় রয়েছে। তীর্থঙ্কর যেখানে ধর্মশিক্ষা দেন ও সংঘ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন সেখানে একটি সমবসরণ বা দিব্য ধর্মপ্রচার ভবন গঠন করা হয়। শেষে থাকে নির্বাণ কল্যাণক বা মোক্ষলাভ যেখানে তীর্থঙ্কর তার নশ্বরশরীর ত্যাগ করে। যাকে চিহ্নিত করা হয় নির্বাণ নামে। তীর্থঙ্কর মোক্ষ বা সর্বোচ্চ মুক্তিলাভ করে থাকে। এরপর তীর্থঙ্করের আত্মা সিদ্ধশিলা রূপলাভ করে। জৈনধর্ম শিক্ষা দেয় জীবনচক্রে সময়ের শুরু বা শেষ বলে কিছু থাকে না। কালচক্রে সময় তার নির্দিষ্ট সময় মতো চলতে থাকে। জৈনরা বিশ্বাস করে তীর্থঙ্করেরা তাঁদের শেষজন্মে রাজপুরুষ রূপে জন্মগ্রহণ করে থাকে। জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে তীর্থঙ্করদের পূর্বজীবনের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা থাকে। প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ সম্পর্কে জানা যায় - তিনি প্রাচীনকালে ইক্ষ্বাকু রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অন্য একুশজন তীর্থঙ্কর বিভিন্ন সময়ে এই রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিশতম তীর্থঙ্কর মুনিসুব্রত ও বাইশতম তীর্থঙ্কর নেমিনাথ হরিবংশ নামক ভিন্ন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জৈন ধর্মাবলম্বীরা তাঁদের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ কৈলাস পর্বতে (বর্তমানে যা তিব্বতে ভারত-চীন সীমান্তের কাছে অবস্থিত) মোক্ষ লাভের জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। অন্যতীর্থঙ্কর বসুপূজ্য চম্পাপুরী (যা বর্তমানে উত্তরবঙ্গে অবস্থিত) অঞ্চলে মোক্ষলাভ করেছিলেন। তীর্থঙ্কর নেমিনাথ গিরনার পর্বতে (বর্তমানে ভারতের গুজরাতরাজ্য) এবং সর্বশেষতীর্থঙ্কর মহাবীর পাবাপুরীতে (বর্তমানে ভারতের পাটনা) মোক্ষলাভ করেছিলেন। অন্যান্য বিশজন জৈনতীর্থঙ্কর শিখরজি (বর্তমানে ভারতবর্ষের ঝাড়খণ্ডরাজ্যে অবস্থিত) অঞ্চলে মোক্ষলাভ করেছিলেন। জৈনরা ঋষভনাথ, নেমিনাথ ও মহাবীর পদ্মাসন ভঙ্গিমায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মোক্ষলাভ করেছিলেন। অন্য একুশজন তীর্থঙ্কর কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় মোক্ষলাভ করেছিলেন। জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে এই রীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

জৈন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পূজনীয় হিসেবে চব্বিশজন তীর্থঙ্কর-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে পূজনীয় আরও কিছু দেবতার নাম পাওয়া যায়। যাদের ইকসা ও ইকাসিনি নামে প্রাথমিক স্তরে চিহ্নিত করা হয়। এই দেবতাদের ঘিরে জৈন গৃহীদের মধ্যে কিছু আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত

রয়েছে। শ্বেতাম্বর জৈনদের মধ্যে এই রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের ব্যবহার বেশি লক্ষ করা যায়। শ্বেতাম্বরপন্থীরা ধর্মীয় প্রয়োজনে পালনীয় আচারকে তপস্যার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে। এই আচরণের মধ্যে দিয়ে একজন তপস্বীর জীবন ও মন ধীরে ধীরে ঈশ্বরসাধনার পথে এগিয়ে যায়। তাঁরা খাদ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক বেশি কঠোর নিয়ম-কানুন তৈরি করে। জৈনধর্মের এই আচারব্যবস্থার সঙ্গে লোকায়ত স্তরের ধর্মীয় আচার ব্যবস্থার যথেষ্ট সাদৃশ্য বজায় থাকে। জৈনধর্মের সমকালে সমাজে বজায় থাকা অন্যান্য ধর্মীয় প্রভাবের ফলে জৈনধর্মীয়ভাবনার মধ্যে কিছু দেবতার পূজাপদ্ধতি শুরু হয়। জৈনদের পূজিত দেবতারা হলেন - আম্বিকা, পদ্মাবতী, ষোলোজন বিদ্যারদেবী, যেখানে সরস্বতী ও লক্ষ্মীদেবীর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দেবীদের সঙ্গে আবার পুরুষ দেবতার আবির্ভাবের কথা জানা যায়। এই দেবতাদের মধ্যে অন্য ধর্মীয়গোষ্ঠীর দেবতাদের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট সাদৃশ্য ধরা দেয়। প্রাচীনকালের জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ-এর সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের লোকায়ত শিব-এর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। জৈনদেবী পদ্মাবতী ও মঙ্গলকাব্যেরদেবী মনসার মধ্যেও সাদৃশ্য দেখা যায়। এভাবে জৈনদের অন্যান্য দেবতাদের মধ্যেও এই সাদৃশ্য উঠে আসে। জৈন তীর্থঙ্করদেরও দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয়ে থাকে। এই তীর্থঙ্করদের পূজনীয় দেবতারা সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে পূজ্যজ্ঞানে। প্রাচীনকাল থেকে জৈনধর্মের মধ্যে এইরূপ দেবতা পূজাপদ্ধতি প্রচলিত হয়ে আসছে। এমনটা জৈন মন্দিরগুলিতে মূর্তিপ্রকরণ পদ্ধতি দেখে নিশ্চিত করা যায়। এই দেবতাদের রূপ গঠনের ক্ষেত্রে তৎকালীন সমাজে পূজিত দেবতাদের রূপকল্পনা পদ্ধতি থেকে ভাবনা গ্রহণের পরিকল্পনা স্পষ্ট হয়েছে। বেদবিরোধী এই ধর্মের মধ্যেও ধীরে ধীরে বৈদিক আচারপদ্ধতি ও রীতি-নীতি জায়গা দখল করে নিয়েছিল রূপান্তরের মাধ্যমে।

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে প্রভাববিস্তার করে আসা বেদবিরোধী অন্য একটি প্রতিবাদী ধর্মীয়ভাবনা হল বৌদ্ধধর্ম। যা বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশের বিভিন্ন ধর্মীয়ভাবনার মধ্যে আড়ালে-আবডালে যথেষ্ট মহিমার সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব বহন করে চলেছে। বাঙালির সংস্কৃতি, দর্শন, সাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে বৌদ্ধভাবনার উপস্থিতি বিদ্যমান। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রাচীন ভারতে শাক্যবংশজাত সিদ্ধার্থ গৌতম যার হাত ধরে বৌদ্ধধর্ম উৎপত্তিলাভ করেছিল। ধীরে ধীরে এশিয়াসহ বিদেশেও এই ধর্ম বেশিরভাগ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রধান তিনটি

শাখা হল - থেরবাদ, মহাযান ও বজ্রযান। বৌদ্ধদর্শনে বেদগ্রন্থকে সর্বজ্ঞ বলে মনে করা হয়নি। বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণদের মতকে খণ্ডন করে বলেছেন - বাক্যসমষ্টিরূপ বেদকে অপৌরুষেয় বলা যায় না। মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থগুলি প্রমাণ করেছে - কোন বাক্য পুরুষের প্রযত্নসাধ্য। অন্যান্য গ্রন্থের মতো বেদ কোনও পুরুষের উদ্ভাবনী-প্রতিভার ফল, এই গ্রন্থ প্রযত্নসাধ্য।[১৫] বৌদ্ধধর্মের মূলে বলা হয়েছে চারটি আর্যসত্যের কথা। যেখানে বুদ্ধের চারআর্যসত্য অনুযায়ী বৌদ্ধধর্মের লক্ষ হল তৃষ্ণা বা আসক্তি এবং অবিদ্যা থেকে দূরে থাকা। এইসকল বাহ্যিক কর্মগুলি থেকে উদ্ভূত দুঃখকে নিরসন করা এই ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য। বৌদ্ধদর্শন ও ঐতিহ্যগুলিতে নির্বাণ লাভের প্রক্রিয়াকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই নির্বাণের মাধ্যমে মোক্ষলাভের কথা বলা হয়েছে। পুরাকাল থেকে বিশ্বাস করে আসা পুনর্জন্মচক্রের হাত থেকে মুক্তিলাভের উপায় বলা হয়েছে। এই জাগতিক প্রক্রিয়ার অবসান ঘটিয়ে ব্যক্তির আত্মাকে স্বতন্ত্র সত্তা মনে করা হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের কপিলাবস্তু নগরীর ক্ষত্রিয়রাজা শুদ্ধোধন-এর পুত্র ছিলেন সিদ্ধার্থ। তিনি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে বৈশাখমাসের পূর্ণিমা তিথিতে লুম্বিনী নগরে (বর্তমান নেপালে) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জন্মগ্রহণের সাতদিন পরে সিদ্ধার্থের মাতা মহামায়া দেবীর মৃত্যু হয়। তাঁর জন্মের অব্যাবহিতকাল পরে একসন্ন্যাসী রাজকুমার সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন এই শিশুকুমার যৌবনে চারিদিক বিজয়ী চক্রবর্তী রাজা হবেন। অথবা বিশ্বজয়ী একজন মহানমানব হিসেবে মানবকল্যাণের কথা ধর্মের মধ্যদিয়ে প্রচার করবে। গৌতমের মাতার মৃত্যুর পরে তাঁর লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন তাঁর মাসি মহাপ্রজাপতি গৌতমী। ছোটোবেলা থেকে সিদ্ধার্থ মানুষের দুঃখকষ্ট দেখে ব্যথিত হয়েছেন। যুদ্ধ নয় আলোচনা ও সুপরামর্শের মধ্যে দিয়ে সকল সমস্যার সমাধান করতে বেশি পছন্দ করতেন। বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে সিদ্ধার্থ গৌতম সম্পর্কে উল্লিখিত রয়েছে – শাক্যবংশের রাজা ও প্রজাদের সঙ্গে কৌল্যবংশের রাজা ও প্রজাদের মধ্যে রোহিনি নদীরজল নিয়ে প্রায়শ বিবাদ বাঁধত। এই রোহিনি নদীটি শাক্য ও কৌল্য উভয় রাজাদের দেশের মধ্যবর্তী সীমানা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীর জল দুটি দেশের প্রজারা চাষের কাজে ব্যবহার করত। কোন রাজ্যের প্রজারা নদীর জল কতো পরিমাণ ব্যবহার করবে সেই নিয়ে প্রতি বছর বিশেষত চাষের মরসুমে উভয় রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়ে অত্যাধিক আকার ধারণ করত। এই দ্বন্দ-

কলহের ফলে উভয়পক্ষের প্রজাদের মধ্যে কিছুলোক আহত ও নিহত হত। উভয় রাজ্যের কৃষিশ্রম দাসেদের সমস্যার কথা মাথায় রেখে যখন দুই রাজার মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা তৈরি হয়। সেই সময়ে সিদ্ধার্থ যুবক ছিলেন। তিনি দূরদৃষ্টির মাধ্যমে উপলব্ধি করেন এই দ্বন্দকে মূল থেকে উপড়ে ফেলা প্রয়োজন। তিনি উভয় দেশের প্রজাদের মধ্যে আলোচনা করে দ্বন্দকে গোঁড়া থেকে নির্মূল করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। রাজপুত্র সিদ্ধার্থের এই যুদ্ধহীন ভাবমূর্তিকে শাক্যবংশের সকল সভ্যরা মেনে নিতে পারে না। প্রথমে রাজসভার সমস্ত সভ্যরা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অনুভব করে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের পরিকল্পনা সঠিক। তাঁরা রাজকুমারের সিদ্ধান্তে সহমত জানায়। এরপর দুইরাজ্যের মধ্যে নদীরজল নিয়ে চলে আসা দীর্ঘকালের সমস্যা আলোচনার মধ্যে দিয়ে সারাজীবনের মতো সমাধান হয়।

জীবনের প্রাথমিক পর্ব থেকে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ অহিংসার পথকে অবলম্বন করেছিলেন। সকলকে তিনি এই অহিংসার পথ স্মরণ করতে শিখিয়েছিলেন। তিনি মানব উন্নয়নের সকল বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করেছেন। সিদ্ধার্থ সংসারের জৈবিক কাজের প্রতি উদাসীন ছিলেন। তাঁর পিতা তাকে শাক্যবংশের উত্তরাধিকারীরূপে দেখতে চেয়েছিলেন। খুব অল্প বয়স থেকে তাকে সংসারের যাবতীয় সুখের মধ্যে নিমজ্জিত করতে চেয়েছিলেন। মাত্র ষোড়শ বছর বয়সে রাজা শুদ্ধোধন যশোদার সঙ্গে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। যশোদা ও সিদ্ধার্থের ঘরে রাহুল নামে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। সিদ্ধার্থের ইন্দ্রিয়সুখ নিবারণের জন্য রাজা শুদ্ধোধন চারটি ঋতুর জন্য চারটি আলাদা আলাদা প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তাকে দেখভালের জন্য বেশ কিছু সুন্দরী নর্তকীনারী নিয়োগ করা হয়। তারাও রাজপুত্রকে বশীভূত করে গৃহে বন্দী করে রাখতে অক্ষম হয়। সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করে সংসারের মায়া, রাজ্য, ধন-সম্পদ কিছুই স্থায়ী নয়। মানবজাতি এইসকল জৈবিক বিষয়ের প্রতি ছুটতে ছুটতে অপ্রাপ্তি থেকে দুঃখের সাগরে এসে পতিত হয়। তিনি বুঝতে পারেন পৃথিবী দুঃখময়। এই দুঃখের কারণ খুঁজতে গিয়ে ঊনত্রিশ বছর বয়সে শাক্য রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন।

সিদ্ধার্থ গৌতমের এই গৃহত্যাগের পর তিনি ভৃগুমুনির আশ্রমে কৃচ্ছসাধনারত সাধকদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেন এই কৃচ্ছসাধনার মধ্য দিয়ে সাধকদের স্বর্গলাভের প্রচেষ্টায় তাঁর মনে জেগে ওঠা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি পৃথিবীতে তৈরি হওয়া

মানবের দুঃখ ও সেই দুঃখের কারণ খুঁজতে বিশদে জানতে ভৃগুমুনির আশ্রম থেকে যাত্রা শুরু করেন। এই সময়ে সিদ্বার্থ গৌতম সাংখ্যমুনি অরদাকালামের কাছে গিয়ে সাংখ্যমতবাদ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে। সাংখ্যপদ্ধতিতে জ্ঞানলাভের পর তিনি উপলব্ধি করেন ধ্যানমার্গ বিষয়ে গভীর মনোসংযোগ করা প্রয়োজন। ধ্যানমার্গের প্রধান তিনটি মতবাদ যেখানে শ্বাস-প্রশ্বাসকে আয়ত্বে আনার কথা বলে থাকে। যেগুলি তিনি পূর্বের গুরু অরদা কালামের থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন। সেসময়ের বিখ্যাত একজন যোগী ছিলেন উদ্দক রামাপুত্ত। যার থেকে তিনি ধ্যানমার্গের অন্যান্য পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ করতে মনস্থির করেন। বুদ্ধ উদ্দকমুনির থেকে ধ্যানের অষ্টমপন্থা পদ্ধতি শিক্ষা লাভ করেন। এইভাবে গৌতমের সমাধিমার্গে শিক্ষালাভ সম্পূর্ন হয়। তিনি সাংখ্য ও সমাধিমার্গের পথ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। এই জানার ও শেখার মধ্যে দিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়, সেখানে তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তর বুঝতে চেয়েছেন। তিনি গয়া শহরের উরুবেলা নগরে একটি কুটীরে তাঁর পূর্বপরিচিত পরিব্রাজক সাধুদের সঙ্গে পুনরায় কৃচ্ছসাধনায় নিমজ্জিত হয়েছেন। এইসময়ে সিদ্বার্থগৌতম তাঁর কৃচ্ছসাধনায় দৈনিক খাদ্যাভ্যাসের দিকে বেশি নজর দেন। শুরু করেন দিনে একবার খাদ্যগ্রহণ এরপর দুদিন অন্তর একবার। ধীরে ধীরে এই খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া পনেরোদিন অন্তর একবার করে হয়ে যায়। খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেন সবুজবর্ণের পত্রাদি, বনে ফলন হওয়া জোয়ারের খাদ্য, ঝরে যাওয়া গাছের ফল ও গুল্ম লতাকে। পোষাক হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করেন গাছের ছালের তৈরি পাতলা আলখাল্লা বা লোমের তৈরি পোষাক। এইভাবে তিনি আরও বেশি করে প্রাকৃতিক উপায়ে বেঁচে থাকতে নিজের শরীরকে অভ্যস্ত করেন। দীর্ঘ ছয়বছর ধরে কঠোর সাধনার মধ্যদিয়ে যাওয়ায় গৌতম শারীরিকভাবে প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়েন। তিনি চলাফেরা করতেও ব্যর্থ হয়ে পড়েন। এইরকম শারীরিক ও মানসিকঅবস্থা থেকে তিনি উপলব্ধি করেন পেটে খিদে ও শরীরকে কষ্ট দিয়ে কোনো সাধনা সম্পূর্ন করা সম্ভব নয়। এত কষ্ট সহ্য করেও তিনি সাধনার ফল তেমন কিছু উপলব্ধি করতে পারেন না। এই পরিস্থিতি থেকে তাঁর মূল উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে না পেরে তিনি কৃচ্ছ সাধনারত মুনিদের প্রশ্ন করেন – সংযম বা রিপুদমনের প্রকৃয়াকে কীভাবে ধর্ম বলা যায় ? তাঁর মতে শরীরকে রক্ষা না করে চিন্তাকে আসল ভাবা হলে সেটা হয়ে দাঁড়ায় কুকুরের প্রবৃত্তির মতো। শরীর যদি জ্ঞানলোকপ্রাপ্তের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হয় তাহলে, এই শরীরকে প্রয়োজনীয় সুখাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছানো

সম্ভব। যে নিজের শরীরকে সুস্থভাবে পরিচর্যা করতে ব্যর্থ হয় এবং ইচ্ছাকৃত ক্ষুধার্থ, পিপাসার্ত থেকে শরীরকে ক্লান্ত বা অবসন্ন রেখে মুক্তির পথ খোঁজে। তাঁদের কখনো আত্মশক্তির পথে সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। সঠিক সচেতনতা ও আত্মসংযমের জন্য শরীরের প্রতি যেই ক্রিয়াগুলি অত্যন্ত প্রয়োজন সেইগুলি সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের সাধকদের মধ্যেও এই সমাধি নিয়ে সংশয় এসেছে এবং তারা প্রশ্ন করেছে সমাধির দ্বারা কি হবে? কেননা পৃথিবীতে মৃত্যু সুনিশ্চিত। এই মানব শরীর পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারা গঠিত। মানবজীবনে মহাসুখ পেতে সমাধির তুলনায় সঠিক গুরু খুঁজে তার থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে হবে। চর্যার ধর্মগুরুরা ধ্যানের মাধ্যমে এই মুক্তির সন্ধান জানতে পেরেছে এবং জানিয়েছে। চর্যাপদ গ্রন্থে লুই পাদের একটি পদে পাওয়া যায় –

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।।
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।।
সঅল স (মা) হিঅ কাহি করিঅই।
সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিআই।।[১৬]

গুরুর হাত ধরে মুক্তির দুয়ারে পৌঁছানো যেতে পারে এমনটা একসময় গৌতম বুদ্ধও মনে করেছিলেন। কৃচ্ছ সাধনার বিরুদ্ধে গৌতমের যখন সংশয় মনের মধ্যে উপস্থিত হয়, সেইসময় উরুবেলাতে বসবাসকারী এক ধনবান ব্যক্তির কন্যা সুজাতা। যে বটবৃক্ষের নীচে প্রার্থনা করে পুত্রলাভের আশায়। সে প্রার্থনা করে দেবতার উদ্দেশ জানায় যদি তার পুত্রলাভ হয় তাহলে প্রতি বছর এই অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে সে পূজা দেবে। বৃক্ষপূজার রীতি আসলে প্রাচীন সমাজ থেকে চলে আসা একটা ধারাবাহিক প্রথা। শুধু ভারতবর্ষ নয় বিদেশেও এইপ্রথার প্রচলন এখন পর্যন্ত দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে জাপানের *হানামি* উৎসবের কথা। জাপানে বৃক্ষ ও ফুল পূজা করতে দেখা যায় এই হানামি উৎসবের মধ্যে দিয়ে। 'হানা'- শব্দের অর্থ হল ফুল ও 'মি'- শব্দের অর্থ দর্শন করা। সব মিলিয়ে বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী এই সাগরপাড়ের দেশেও বৃক্ষকে ঘিরে উৎসব পালন করতে দেখা যায়। এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে তারা বিশ্বাস করে থাকে উদ্ভিদের মধ্যে ঈশ্বর বাসকরেন। তাই তারা উদ্ভিদকে পবিত্র মনে করে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে।[১৭] বৃক্ষপূজার উদ্দেশ সুজাতা তাঁর পরিচারিকা পুন্নাকে পূজার ব্যবস্থা করতে বলে। এইসময়ে পুন্না বটবৃক্ষ নীচে ঋষিরূপী গৌতমকে

আবিষ্কার করে। তাকে বৃক্ষদেবতা বলে মনে করে। সুজাতা বৃক্ষপূজার জন্য নিয়ে আসা পায়েস গৌতমের সামনে নিবেদন করে। এরপর গৌতম সুজাতার নিবেদিত পায়েসান্নের পাত্র আগলে রেখে নদীতে স্নান সেরে এসে এই পায়েস ভোজন করে। এভাবে গৌতমবুদ্ধের পূর্বজীবনের তপস্যার পথ ছেড়ে নতুন জীবনের পথে যাত্রা শুরু হয়। এই স্থানে রাজকুমার থেকে গৌতম বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন হন। গৌতমবুদ্ধ নাম ধারণ করেন। বুদ্ধ তার প্রাপ্ত মহাজ্ঞান বৌদ্ধধর্মমতের মধ্যে দিয়ে মানব সমাজের কাছে প্রকাশ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

গৌতমবুদ্ধ মহাজ্ঞান লাভের পর তাঁর ধর্মকথা প্রচার করতে সিদ্ধান্ত নেয়। তাঁর আবিষ্কৃত ধর্মমত প্রথমদিকে জনসাধারণের কাছে কঠিন বলে মনে হয়েছিল। সেসময়ে সমাজে প্রচলিত ভগবানবাদ ও আত্মাকে ঘিরে যে সকল ধারণা গড়ে উঠেছিল সেগুলি বর্জন করা অতীব কঠিন ছিল। সমাজে মানুষের মনে জায়গা করে নেওয়া কর্মবাদ বা কর্মপ্রথাকে মানুষ সহজে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না। সমাজে প্রচলিত এইসকল বিষয়গুলি গৌতমবুদ্ধকে ভাবিত করতে থাকে। তিনি উপলব্ধি করেছেন – আত্মা অমর নয়। আত্মা বলে আলাদা একটি স্বাধীন সত্ত্বা আছে একথাও তিনি স্বীকার করেননি। তাঁর এই মতবাদগুলি সমাজের মানুষও মানতে রাজি হয়নি শুরুতে। তিনি শঙ্কিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে মানব সমাজ নিজ স্বার্থপূরণের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। মানুষকে সেই সংকল্প ভাঙিয়ে বৌদ্ধমতে বিশ্বস্ত করানো তখন অতোটাও সহজ হবে না। তাঁর ধর্মপথে ছিল ত্যাগের কথা। তিনি সংসারের সুখময় জীবনত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবনধারণের কথা বলেছেন। সমাজে কিছু অসুবিধা থাকলেও তাঁর বুদ্ধত্ব অবস্থা মধ্যে দিয়ে জ্ঞানচক্ষু দিয়ে উপলব্ধি করেছেন - সমাজ থেকে অপসংস্কৃতি, অপবিত্রতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে। তাঁর নির্বাণ অবস্থায় প্রাপ্ত ধর্মমতের কথা সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন।

ধর্মদীক্ষা প্রচারে গৌতমবুদ্ধ দুটি নীতি গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমটি যেখানে তিনি বলেছেন – ধর্মদীক্ষার পরে যারা সংঘে থাকবে তারা হবে ভিক্ষু। দ্বিতীয় যেখানে তিনি বলেন গৃহস্তদের ধর্মদীক্ষার পর তাঁদের বলা হবে উপাসক। তিনি এই ভিক্ষু ও গৃহী উপাসকদের মধ্যে মোট চারটি বিশেষ পন্থার পার্থক্য নির্ধারন করেছেন। যেখানে বলা হয় উপাসকরা গৃহে থেকে প্রজ্ঞাবান বুদ্ধের ধর্মপথ অনুসরণ করতে পারবে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা হবে গৃহহীন। তাঁদের কোনো নির্দিষ্ট বসবাসের স্থান হবে না। তাঁরা

একস্থান থেকে অন্যস্থানে ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করবে। উপাসকরা প্রয়োজনীয় সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে কিন্তু ভিক্ষুরা কোনো সম্পত্তির অধিকারী হবে না। উপাসক হতে হলে কোনোরকম আচার-অনুষ্ঠান বা উৎসবের প্রয়োজন নেই। ভিক্ষুদের জন্য রয়েছে উপসম্পাদ নামক উৎসব আচরণের নির্দেশ। এসকল নীতিগুলি থেকে যদি উপাসকেরা বিচ্যুত হয় তাহলে তাঁদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থাগুলি তাঁদের কাছে নৈতিক শিক্ষার মতো ব্যবহৃত হতে থাকে। ভিক্ষুরা এইসকল পন্থাগুলি থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে তাঁদেরও শাস্তিস্বরূপ ভিক্ষুজীবন থেকে বঞ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের সংঘের সদস্যপদ থেকেও সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ। বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি পাঠে দেখা যায় গৌতমবুদ্ধ সংঘের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কিছু কঠোর নিয়মাবলী শুরু করেছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি সংঘের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে এই রীতি-রেওয়াজগুলি নিয়ে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেন। বুদ্ধের ধর্ম ও সংঘ বিষয়ে বলতে গিয়ে শরৎকুমার রায় জানিয়েছেন -

> সংঘের স্বাভাবিক বুদ্ধির পথে অন্তরায় হইয়া তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে কখনো আপনার অধীনে করিতে চাহেন নাই। তাঁহার প্রেম ও সাধনায় সংঘ সৃষ্ট হইলেও তিনি অন্ধ স্নেহের বশবর্তী হইয়া শিশুটিকে একান্তভাবে আপনি কোলে আঁকড়াইয়া ধরিলেন না; পরন্তু তাঁহাকে মুক্তির প্রান্তরে ছাড়িয়া দিলেন। সেখানে শ্রদ্ধাশীল শ্রাবক ও ভিক্ষুদের স্নেহরস পান করিয়া শিশু আনন্দে বাড়িতেছিল। এইরূপ স্বাধীনভাবে বাড়িতে পাইয়াছিল বলিয়াই এক সময়ে সংঘ ভারতব্যাপী সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিয়াছিল। এই সৃষ্টিব্যাপারে বুদ্ধের কৃতিত্ব ও মহিমা তো আছেই; ভিকশুদের ভিক্ষুদের ও লোক সহানুভূতি ও সংস্রব সুস্পষ্ট দেখা যাইয়া থাকে।[১৮]

বৌদ্ধবিহারে যে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল সেগুলি ছিল একান্ত বৌদ্ধ সাধুদের ও তদানীন্তন জনসাধারণের আকাঙ্খিত বস্তু। বৌদ্ধ রচনা *মহাবগগে সাদ্ধিবিহারিক* নামক অংশ থেকে জানা যায় - নবীনভিক্ষুরা নিজেদের পছন্দ মতো অপর কোনো প্রবীণ ভিক্ষুদের উপাধ্যায় বরণ করে তাঁর উপদেশানুসারে জীবন-যাপন করতে পারতো। এই নবীনভিক্ষুরা স্থবিরদের সঙ্গে এক বিহারে বাস করত। তাঁরা ভিক্ষার জন্য একই সঙ্গে গ্রামে বের হত।

গৌতমবুদ্ধ তাঁর নিজের উৎসারিত ধর্মের সঙ্গে বাহ্যিক এইরকম কয়েকটি নিয়মাবলী এবং বিষয়কে যুক্ত করে নিজের ধর্মকথা প্রচারের জন্য মনস্থির করেন। তিনি তাঁর ধর্মকথা শিক্ষা দেওয়ার জন্য সারনাথে অবস্থিত অরদা কালামের নাম নির্বাচিত করেন। তিনি জানতে পারেন অরদা কালাম ততদিনে পরলোক গমন করেছেন। তিনি রাজপুত উদ্ধককে নিজের ধর্মকথা শোনাতে চায়। এই

রাজকুমারের ততোদিনে দেহাবসান ঘটেছে। এইবার তাঁর পূর্ব পরিচিত পাঁচজন সঙ্গীর কথা মনে করেন। সেই পাঁচযোগী তখন সারনাথে অবস্থান করছিলেন। তিনি তখন তার পূর্ব পরিচিত এই পাঁচ পরিব্রাজকের কাছে প্রথম নিজের ধর্মকথা প্রকাশ করেন। বুদ্ধের প্রচারিত এই ধর্মকথা শুনতে শুনতে পাঁচযোগী যথা - কৌন্ডিন্য, বপ্প, ভদ্দিয় (ভদ্রিয়), মহানাম এবং অশ্বজিত। তাঁদের মনে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে কোনো প্রশ্নের উদ্রেক হলে বুদ্ধ সেই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পঞ্চ পরিব্রাজকদের মনকে সন্তুষ্টি প্রদান করেছেন। বুদ্ধ তাঁর ধর্মকথা বলতে গিয়ে প্রথমে শুরু করেছেন বিশুদ্ধপথ সম্পর্কে জানাতে চেয়ে। তাঁর মতে বিশুদ্ধপথ হল অন্য যেকোনো প্রাণী বা উদ্ভিদকে আঘাৎ করা বা মারা থেকে বিরত থাকা। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কারও সম্পদ চুরি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। মিথ্যা কথা না বলা, সম্পদের লালসা থেকে বিরত থাকা, সেইসঙ্গে মাদক দ্রব্য স্পর্শ না করা। যেসকল কর্মগুলি মানুষের ভাবনাকে বিপথে চালিত করতে পারে সেসকল কর্ম থেকে মানুষকে দূরে থাকতে গৌতম বুদ্ধ নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষ তাঁর নিজের ভিতরে থাকা মান বোধ দিয়ে কোন কাজ তাঁদের জন্য জরুরি নয় সেকথা বুঝে নেবে। বৈদিক গ্রন্থগুলিতে যেভাবে সমাজের মধ্যে বিভাজনের সৃষ্টি করেছিল। গৌতম বুদ্ধ পরিব্রাজকদের বললেন তিনি বেদের সমাজ বিভাজন নীতি থেকে সরে এসে সমাজে দুই রকম পতিত জনগোষ্ঠী দেখেছেন। যাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় যারা জানে না তাঁদের অকারণে সমাজে অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছে। তাঁদের চিহ্নিত করা হয়েছে মানহীন বা মাপকাঠিহীন সম্প্রদায় হিসেবে। সমাজে দ্বিতীয় অচ্ছুৎ সম্প্রদায় যেখানে তাঁরা সমাজে পতিত এই বিষয়ে অবগত। যাদের বলা হয়েছে মানযুক্ত বা মাপকাঠিযুক্ত সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় তাঁদের এই অবস্থার মুক্তির জন্য প্রস্তুত। মানুষের জীবন-যাপন প্রণালীর বিশেষত্ব হল উভয়গোষ্ঠী যাদের মান আছে। অন্য যাদের মান নেই তাঁদের সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে জীবন পথে যাত্রা করতে হয়। তাঁরা সমাজের তৈরি করা নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে দিয়ে যাত্রা করতে বাধ্য হয়। বুদ্ধ পরিব্রাজকদের অষ্টাঙ্গমার্গের কথা বলেন। এইমার্গের সাম্যদিতির প্রধানবস্তু হল সর্বত্তোম চেতনাপন্থা। বুদ্ধের মতে পৃথিবী হল বদ্ধ অন্ধকারময় একটি ঘর। যেখানে মানুষ কয়েদিদের মতো অবস্থান করে। মন হল একমাত্র যন্ত্র যার দ্বারা অন্ধকারময় অবস্থা থেকে আলোর দিকে যাত্রা করতে পারে। পৃথিবীর এই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা করার সময় মনের জোশ বৃদ্ধি করে ইচ্ছাশক্তি নামক একটি অদ্ভুদ শক্তি যা মানুষের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে।

মানুষ তাঁর উদ্দেশ্য কর্মের জন্য এই ইচ্ছাশক্তিকে জাগরণ করতে থাকে। মন মানুষকে এই অন্ধকার অবস্থার মধ্যে রাখে আবার মুক্তির পথ মানুষকে মন দেখায়। বুদ্ধ প্রণোদিত এই সাম্যনীতির মধ্যে রয়েছে অজ্ঞান দূরকরে মনকে জ্ঞানের আলো দানকরা। অজ্ঞানতার অর্থ হল মহৎ সত্যপথ বুঝতে অক্ষমতা। দুঃখকে কিভাবে দূরকরা যায় বা জয়করা যায় সেইকথাও বুঝতে পারে না। সাম্যদিতির দ্বারা কুসংস্কার, অপসংস্কৃতি ও অতিপ্রাকৃত বিষয়গুলিকে ত্যাগ করতে সাহায্য করে। এই সাম্যদিতি অর্জন করতে হলে দরকার ব্যক্তিমনের মুক্তবোধ ও মুক্তচিন্তা। অন্য ধর্মের ন্যায় এখানে মানবমনের আশা-আকাঙ্খাকে দমিয়ে রাখার কথা বলা হয়েছে। বুদ্ধ বলেছেন মানবমনের কিছু ভাবনা যেমন - আশা, আকাঙ্খা ও উদ্দেশ্য যেগুলি আসলে মানুষের মহৎ গুণের লক্ষণ। এই গুণগুলিকে সঠিক কাজে ব্যবহার করতে পারলে মানুষ প্রশংসনীয় হতে পারে। এরপর তিনি শিক্ষা দিয়েছেন সাম্যবাক্য[১৯] সম্পর্কে। সম্যকবাক্যের পন্থাগুলি অবলম্বনের ফলে ব্যক্তি বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। সর্বদা সত্যকথা বলতে হয়। বুদ্ধ বলেছেন সর্বদা সত্যিকথা বলতে মনে কোনো ভয় বা অনুকম্পা রাখা যাবে না। তিনি মনে করেছেন ব্যক্তির সত্যিকথা বলায় কখনো কোন ব্যক্তির ক্ষতি হতে পারে না। এরপর তিনি শিক্ষা দিয়েছেন সাম্যআজীব বিষয়ে। যেখানে তিনি জানিয়েছেন সৎ জীবিকা অর্জনের পথের কথা। ব্যক্তি মাত্রই বেঁচে থাকার জন্য অর্থউপার্জনের কথা চিন্তা করতে হয়। এই অর্থউপার্জনের পথ কখনো ভালোপথ অবলম্বন করে আবার কখনো মন্দপথ অবলম্বন করে। এই শিক্ষার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধ মানুষকে বোঝাতে চেয়েছেন অন্যের ক্ষতি করে। যখন কেউ নিজের মুনাফা তৈরি করে অন্যকে ঠকিয়ে তখন সেটা হয়ে যায় অন্যায় বা অসৎ উপার্জনের পথ। অন্যের ক্ষতি না করে নিজে উপার্জন করে, নিজের কায়িকপরিশ্রমের মধ্যদিয়ে সেটা হয়ে যায় সৎ উপার্জনের পথ। তাঁর মতে সাম্যব্যায়াম হল সঠিকপ্রচেষ্টা যার দ্বারা অবিদ্যা দূর করা যায়। এই পদ্ধতির দ্বারা লক্ষ স্থলে পৌঁছানোর জন্য এবং দুঃখময় কারারুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের জন্য ও সাহায্য করা হয় মানবজাতিকে।

ধর্মকথা প্রচারের মধ্যে দিয়ে গৌতম বুদ্ধ মানুষকে ‘সঠিক প্রচেষ্টা’ বিষয়ে জানাতে চেয়েছেন। যেখানে তিনি বলেছেন – ‘সঠিক প্রচেষ্টা’-র মধ্যে চারটি উদ্দেশ্য থাকে। যাদের মধ্যে প্রথমটি হল অষ্টাঙ্গপথে মনকে বিরত করে বা বাধা দেয়। দ্বিতীয়টি যেখানে মানসিক চেতনার সৃষ্টি হয় তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। তৃতীয় যেখানে মন এবং মনের সকল চেতনার মধ্যে অষ্টাঙ্গমার্গের

আটটিপন্থাকে প্রবেশ করিয়ে মনকে পরিচালনা করতে থাকা। চতুর্থ অবস্থা যেখানে মানসিক চেতনা সৃষ্টি হয়েছিল সেই অবস্থাকে উন্নততর অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। এরপর আসে সাম্যশক্তি-র কথা যেখানে মনসংযম ও চেতনাশক্তিকে জাগ্রত করার কথা বলা হয়েছে। মানসিক চেতনার উপর লক্ষ রাখার কথা বলা হয়েছে যাতে মানসিক চেতনাগুলি জাগ্রত হওয়ার পরে মানসিকবোধ বিপথগামী না হয়। এই ভিন্নমুখী মানসিক অবস্থার নাম অসাম্যশক্তি। গৌতমবুদ্ধ এই সাম্যশক্তি লাভের সমস্ত রকম পন্থা উল্লেখ করেছেন। এই সাম্যশক্তি বজায় রাখতে সাম্যদীতি লাভের প্রয়োজন হয়। সাম্যদীতির মধ্যে থাকে- সাম্যসংকল্প, সাম্যবাক্য, সাম্যকামনা, সাম্যপ্রচেষ্টা এবং সাম্যকসত্ব। তিনি একথাও বলেছেন এই সাম্যদীতি লাভের পক্ষে কতকগুলি প্রতিবন্ধকতা থাকে। যেমন - লোভী, মন্থরতা, ভীতি, সন্দেহ ও সংকল্পের অভাব। এই পাঁচটিবাঁধা মানুষের সাম্যদীতি লাভের পথে বাঁধার কারণ হয়ে যায় বিভিন্ন সময়ে। এই পাঁচটি বাঁধাকে অতিক্রম করতে গেলে সমাধির একাগ্রতার প্রয়োজন হয়। এখানে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে সাম্যসমাধি ও সমাধি এক বিষয় নয়। সমাধি বলতে বুদ্ধ সহজভাবে বোঝাতে চেয়েছেন - কোন বিষয়ের উপর মনের একাগ্রতা বা চেতনাকে নতুন করে জাগরণ ঘটানো। সমাধিলাভের একমাত্র মাধ্যম হল ধ্যান। ধ্যানের মধ্যে দিয়ে মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি করে ওই পাঁচটিবাঁধাকে অতিক্রম করা যেতে পারে। মনের সঙ্গে পঞ্চইন্দ্রিয়ের সংযোগ স্থাপন সম্পূর্নভাবে না হতে পারলে তখন সেই অবস্থাকে বলা হয় সমাধি। ধ্যানযোগকে মনের মধ্যে স্থায়ী করতে পারলে সেটা হয়ে যায় সাম্যসমাধি। সাম্যসমাধি সর্বদা ফলদায়ী হয়। এই অবস্থা মনকে শুদ্ধ পথে চলার শিক্ষা দেয়। মনের একাগ্রতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। মনের মধ্যে খুশি বোধ দীর্ঘস্থায়ী করতে সক্ষম হয়। বৌদ্ধ মতে মনের এই সুখী থাকার বোধকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একাগ্রতার ফলে মানবশরীর কুশলকর্ম চিন্তা করতে সক্ষম হয়ে থাকে এমনটাও জানিয়েছেন। অকুশল চিন্তার ক্ষমতা এই মানসিক একাগ্রতা দূর করতে সাহায্য করে। অশুভ ফল উৎপাদনে সক্ষম চিন্তাকে সাম্যসমাধি দূরে রাখে। গৌতম বুদ্ধ পরিব্রাজকদের নৈতিক শিক্ষা দিয়েছেন। যেখানে তিনি মোট দশটি নৈতিক দর্শনের কথা উল্লেখ করেছন - শীল, দান, উপেক্ষা, নেক্ষম, বীর্য্য, ক্ষান্তি, সুখ, অধিস্থান, করুণা ও মৈত্রী। যেগুলিকে আবার একত্রে বুদ্ধের নৈতিক উপদেশ [২০] নামে চিহ্নিত করা হয়। এইভাবে বুদ্ধ দীর্ঘ পয়তাল্লিশ বছর ভারতের বিভিন্ন স্থানে তার বৌদ্ধ ধর্মেরবাণী প্রচার করেন। অবশেষে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ

শতকে কুশীনগর নামক স্থানে আশিবছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। গৌতমবুদ্ধের প্রচারিত বাণীর মূল অর্থ ছিল অহিংসার মধ্যে দিয়ে মোক্ষলাভ। তাঁর প্রচারিত ধর্মীয় কথায় জাগতিক জগৎ অতিক্রম করে মুক্তিলাভের বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে তিব্বতের বৌদ্ধসাধক দলাই লামা পৃথিবীর দুঃখের কথা স্বীকার করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জন্ম থেকে শুরু করে বার্ধক্যাবস্থায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত মানুষ জীবনাতিবাহিত করার সময় বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে থাকে। এই অবস্থাগুলির মধ্যে একটি অবস্থা হল দুঃখবোধ। এই দুঃখবোধ উপলব্ধির জন্য মানুষ যদি নিজের মনকে প্রস্তুত রাখে তাহলে তাঁর জীবনে এই দুঃখ নামক অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ সহজ হয়ে উঠতে পারে। তিনি এই দুঃখ নামক অবস্থাকে অনিবার্য বলে চিহ্নিত করেছেন তাঁর একটি সাক্ষাতকারে, যা পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে তিনি বলেছেন - পৃথিবীতে দুঃখকে আস্বীকার করে চলা যায় না। মানবজীবনের কষ্ট এবং অপছন্দগুলি মানুষ জীবনের অস্তিত্বের মধ্যে দিয়ে মনে করতে চায় না। তিনি কৌতুক করে সেখানে আরও উল্লেখ করেছেন মানবের জন্মদিবসকে গুরুত্বপূর্ণ বোঝাতে সাধারণত এখন বলা হয় ‘শুভ জন্মদিন’। মানুষের জন্মের পর থেকেই তাঁর দুঃখেরকাল শুরু হয়। মানব জন্মলাভ কখনোই ‘শুভ’ হতে পারে না। জন্মদিনকে শুভেচ্ছা বার্তা দেওয়া উচিৎ শুভ-দুঃখ-জন্মদিবস বলে। দুঃখকষ্ট মানবের দৈনন্দিন অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে রয়েছে। মানবের এই মানসিক অবস্থা থেকেই মানবমনের অসুখ ও অসন্তুষ্টি তৈরি হয়।[২১] মানব জীবনযাত্রার নিত্যপ্রয়োজনীয় পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুভূতিগুলিকে যথাযথভাবে পালনের বিষয়ে গৌতমবুদ্ধ মনোযোগ দিয়ে ভেবেছেন। সেগুলির শুদ্ধতার ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ রেখে মানবজাতির কল্যাণের কথা চিন্তা করেছেন। এই ধারণাগুলিকে বৌদ্ধধর্মরক্ষকরা পরবর্তীকালে বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে দীর্ঘায়িত করে ব্যাখ্যা করেছেন। বুদ্ধ পরবর্তীকালে মূল বৌদ্ধভাবনা থেকে সরে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বৌদ্ধ মতবাদের জন্ম দিয়েছিল। সেসকল বৌদ্ধভাবনা ও ধর্মগ্রন্থের মধ্যে দিয়ে যেভাবে মূল ধর্মীয়কথা প্রচার করা হত সেখানে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ নীতিকথা থেকে সরে এসে মানুষকে ব্যাপকভাবে বৌদ্ধের প্রচারিত ধর্মীয় আচরণগুলির বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হত। এই বৌদ্ধ ধর্মীয়আচরণে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধ গৃহী ও ভিক্ষুর নৈতিকতা, ভিক্ষুত্ব, ধ্যান এবং পারমিতা-র চর্চাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বৌদ্ধধর্ম প্রথমদিকে গৌতমবুদ্ধ প্রচারিত রীতি-নীতিগুলির মধ্যদিয়ে বিস্তারলাভ করতে থাকলেও। ধীরে ধীরে এই ধর্মীয় ভাবনার মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে সেসময়ে সমাজে প্রচলিত ধর্মগুলির প্রভাব। বৌদ্ধধর্মের আচারপদ্ধতির মধ্যে কিছু বদল আসতে শুরু করে। বৌদ্ধ মতাদর্শীরা নিজেদের দেবতার রূপদান করে পূজাপদ্ধতি শুরু করে। এভাবে বৌদ্ধ ধর্মীয়ভাবনার মধ্যে দেবতায়নের সংখ্যা পাল্লা দিয়ে বাড়তে শুরু করে। এই দেবতাদের রূপ, চিত্র পরিকল্পনা, পূজাপদ্ধতি ও ধর্মীয় আচারপদ্ধতির মধ্যে বৈদিক ধর্মের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের লোকায়তধর্মের প্রভাব দেখা দেয়। যেমন - বৌদ্ধদেবতা নীলকণ্ঠ যাকে মঙ্গলকাব্যের দেবতা শিবের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রাখতে দেখা যায়। বৌদ্ধদেবী জাঙ্গুলী যার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের দেবী মনসার সাদৃশ্য বজায় থাকতে দেখা যায়। এভাবে বৌদ্ধদের দেবতাদের সঙ্গে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত লোকায়ত দেবদেবীদের এবং অন্যান্য ধর্মীয়গোষ্ঠীর দেবতাভাবনার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধযুগকে বাংলাদেশের সামগ্রিকভাবে সর্বাধিক উত্থানের কাল হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসময়ে বাংলাদেশের সুখ্যাতি বা পরিচিতি দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল নানাবিধ দেশজ সম্পদ এবং ঐতিহ্যের কারণে। বৌদ্ধগ্রন্থে বঙ্গদেশের নাম সুখ্যাতির মধ্যে দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রাচুর্য্য এবং জৈনধর্মের সামান্য উপস্থিতি থাকলেও একসময়ে সমাজে এই দুইধর্মের প্রভাব কমতে শুরু করে। ভারতভূমিতে অষ্টম শতকে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের ফলে ভারতবর্ষের চারিদিকে নতুন করে সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরাভ্যুত্থান লক্ষ করা যায়। আদি শঙ্করাচার্যের সাহচার্যে তৎকালীন ভারতবর্ষের জনবসতির যে ছবি পাওয়া যায় সেখানে তিনি সনাতনধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চারটি হিন্দু দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেমন - পূর্বদিকে পুরীতে গদাধরপীঠ, পশ্চিমদিকে গুজরাটে সারদাপীঠ (কালিকা), উত্তরদিকের উত্তরাখণ্ডে জ্যোতিরমঠপীঠ (বদরিকাআশ্রম) ও দক্ষিণে তিনি গড়ে তোলেন শ্রীস্রিনগেরি সারদাপীঠ। চারটি বিখ্যাত মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র ভারতবর্ষকে নতুন করে শঙ্করাচার্য সনাতনধর্মের জোয়ারে প্লাবিত করেছিলেন।[২২] সমাজে চলতে থাকা অন্যান্য সনাতনপন্থী বিরোধী ধর্মমতগুলির প্রভাব সমাজে ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মতো বিরোধী ধর্মমতগুলি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে ছদ্মবেশে ছোটো ছোটো বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্ম ও লোকায়ত ধর্মমতগুলির মধ্যে প্রবেশ করে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে শুরু করে। সেসময়

এই ধর্মমতগুলিকে আশ্রয় করে সমাজে যেসকল নতুন দেবদেবীদের উদ্ভব হয়েছিল তাদের গুণগান করে সাহিত্যজগতে মঙ্গলকাব্যের আবির্ভাব হয়েছিল। বাংলাদেশের সমাজে দীর্ঘকাল ধরে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম গরিষ্ঠাকারে অবস্থান করলেও তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীকালে এই ধর্মগুলির তেমনভাবে অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাচীনকাল থেকে লক্ষ করলে দেখা যায় ভারতীয় সমাজে প্রথমে আসে বেদের কথা, এরপরে বেদ বিরোধী ধর্মমত। পুনরায় বৈদিক আচার অনুষ্ঠান ও দেবতাদের পূজাপদ্ধতি ফিরে আসতে শুরু করে লোকায়ত স্তরের সমাজভাবনা ও পূজাপদ্ধতির মধ্য দিয়ে। এমনই এক সামাজচিত্রের মধ্যে দিয়ে বঙ্গদেশের সমাজের যাত্রাকালে আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকে সম্পূর্ন ভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী ও শক্তিশালী বর্হিদেশীয় রাজার আক্রমণ নেমে আসে বাংলাদেশের ওপরে। এই বিদেশী শক্তি নিজেদের হস্তক্ষেপণের মাধ্যমে দেশীয় শক্তি ও ধর্মমতগুলিকে সতর্কভাবে ধ্বংস করতে শুরু করে। সমাজের এই চিত্রপটের মধ্য থেকেই তৎকালীন মানুষ মিশ্রলোকায়তধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। লোকায়ত ধর্মকথাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল মধ্যযুগের সাহিত্য মঙ্গলকাব্যগুলি।[২৩] বৈদিকধর্মের কথা ও আচারপদ্ধতি সেই সঙ্গে বেদবিরোধী জৈন ও বৌদ্ধধর্মের কথা এবং আচরণগুলি প্রকাশমান হতে শুরু করে। মঙ্গলকাব্যের মিশ্রদেবতাভাবনা, সংস্কৃতি, ধর্মকথা ও আচরণগুলির মধ্যে দিয়ে।

পৌরাণিক দেবতা শিব-এর সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের শিবের বর্ণনার মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। হড়প্পা সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত *পশুপতি শীলমোহর* থেকে যে চিত্র উদ্ধার হয়েছে সেখানে দেখা যায় একজন শৃঙ্গধারী দেবতাকে ঘিরে রয়েছে কিছু বন্যপশু। এই দেবতা মূর্তির সঙ্গে সনাতনপন্থীরা তাদের আদিদেবতা শিবের প্রতিমূর্তি হিসেবে দাবি করে। এই সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত যোগীমূর্তি যাকে হিন্দু দেবতা মূর্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে দেবতা শিবকে দিয়ে মর্ত্যের মাটিতে চাষ-আবাদ করার ছবি বর্ণনা করা হয়েছে। সিন্ধু সভ্যতার দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় সেখানে মূলত কৃষিকাজ ছিল তাঁদের জীবিকার প্রধান উপাদান। তখনকার মানুষ উপলব্ধি করে নাগরিক বিপ্লবের জন্য কৃষি উৎপাদনের পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রসারণ প্রয়োজন। সিন্ধু উপত্যকার মনোরম পরিবেশ কৃষিকাজের উপযোগী হয়ে ধরা দেয়। কৃষিক্ষেত্রে মুনাফা বৃদ্ধিতে অভূতপূর্ব সহযোগিতা করেছিল এই আবহাওয়া। অনুমান করা হয় (৫৫১০-২২৩০ খ্রিস্টপূর্ব) এই সময়কালের মধ্যে এখনকার তুলনায় অত্যন্ত বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে, সেসকল অঞ্চলগুলিতে দীর্ঘকাল আর্দ্রতা স্থায়ী

হয়েছিল। পরিবেশের এই সহায়তার কারণে সিন্ধু উপত্যকার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়সীমার তুলনায় তৎকালীন সময়ে অনেক বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছিল। কৃষিক্ষেত্রে সিন্ধু সভ্যতার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়, ওই সময়কার কৃষি হয়ে উঠেছিল জীবিকা নির্বাহের প্রধান হাতিয়ার। প্রাচীন সিন্ধু সংস্কৃতির সময়কালে বিভিন্ন প্রকারের লাঙলের নিদর্শন এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ দেয়। সেইসময়ের বানাওয়ালি এবং জাওয়াইওয়ালায় (বাহাওয়ালপুর) কাদামাটি দিয়ে তৈরি লাঙলের ফলা আবিষ্কার হয়েছে। উত্তরপূর্ব আফগানিস্তানের শোরতুঘাই-এর সিন্ধু জনবসতিতে লাঙল-কর্ষিত ভূক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। লাঙল আসার পরে ফসলের উৎপাদন ক্ষমতার ব্যাপক উন্নতিসাধিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। শিবমঙ্গলকাব্যে শিবের সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা যায়। শিবকে নিজের পেটের খিদে মেটাতে হাতে লাঙল তুলে নিয়েছে ভূমিকর্ষণের জন্য। প্রাচীনকালে প্রাপ্তমূর্তির সঙ্গে সমাজের কৃষিকাজের যোগাযোগ ছিল। মধ্যযুগের মানুষের মনে কৃষিবোধের জাগরণ ছিল সহজাত। বেদবিরোধী প্রধান ধর্মীয়ভাবনা জৈনদের মধ্যে সিন্ধুসভ্যতা থেকে প্রাপ্ত এই পশুপতিমূর্তির মধ্যে তাদের প্রথমতীর্থঙ্কর ঋষভনাথের সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন -

> Rishabha was a real historical person and he was called “Keshi” Shramana. Lord Reseph is believed by most assyrilogists to be mythical. Jaina always maintains that Rishabha and Hind God Shiva are one and the same. Shiva is mentioned as the “Lord of the Lords” in Vedic texts and recognized as one of the “Trinity” of Hindu gods. Hindu texts further states that Shiva is an omniscient yogi, and lives an ascetic life on Mount Kailas.[২৮]

শিবের সঙ্গে বৌদ্ধদেবতা নীলকণ্ঠের গঠনগত ও চরিত্রগত সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বৌদ্ধদেবতা নীলকণ্ঠের গলায় নীলরঙের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। হিন্দুদেবতা ভগবান শিবের কণ্ঠে গরল জমে থাকার কারণে সেখানে নীল রঙের আভা দেখা যায়। হিন্দুদেবী মনসা যাকে হিন্দুধর্মে সর্পের দেবীরূপে পূজা করা হয়। এই দেবীর সঙ্গে জৈনদেবী পদ্মাবতীর সাদৃশ্য পাওয়া যায় চরিত্রগত ও বর্ণনাগতদিক থেকে। বৌদ্ধদের জাঙ্গুলীদেবীর সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের সর্পেরদেবীর যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। বৌদ্ধস্থাপত্য ও ভাস্কর্যে নাগেদের উপস্থিতি যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ করা যায়। মঙ্গলকাব্যে চণ্ডীদেবীর উপাসনার কথা জানা যায়। এই দেবী বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন নাম গ্রহণ করে পূজা লাভ করেছেন। এই নামের সঙ্গে জৈনদের বিদ্যাদেবীদের নামের সাদৃশ্য অনুমান করা হয়। বৌদ্ধদেবী নীলতারাসহ আরও কয়েকজন তারাদেবীদের মূর্তির সঙ্গে এই চণ্ডীদেবীর যোগাযোগ লক্ষ করা যায়। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের যে

কাহিনি পাওয়া যায় সেখানে বৌদ্ধজাতকের কাহিনির খানিকটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ধর্মমঙ্গলকাব্যে ধর্মঠাকুরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধপ্রভাব রয়েছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একথা জানিয়েছেন বহুপূর্বে। অঞ্চলভেদে ধর্মঠাকুরের মূর্তিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে ধর্মমঙ্গলকাব্যের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া যায়। একইভাবে মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য দেবতাদের মধ্যেও দেখা যায় বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবের ছায়া। যেগুলি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই গবেষণা পত্রটির মধ্যে দিয়ে।

টীকা

১) বেদ: বেদ হল প্রাচীন ভারতে লিপিবদ্ধ তত্ত্ব জ্ঞান-সংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থের একটি বৃহৎ সংকলন। বৈদিক সংস্কৃতভাষায় রচিত বেদই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন এবং সনাতন ধর্মের সর্বপ্রাচীন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সনাতনধর্মীরা বেদকে অপৌরুষেয় এবং নৈর্বক্তিক ও নির্দিষ্ট রচয়িতা-শূন্য মনে করেন। তাই বেদকে শ্রুতি (যা শ্রুত হয়েছে) সাহিত্যও বলা হয়।

সূত্র: বসু, যোগীরাজ (২০১৫)। *বেদের পরিচয়*। পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা: ফার্মা. কে. এল. এম.। পৃ. ১-৫০।

২) লাহিড়ী-শর্ম্মণা, শ্রীযুক্ত দূর্গাদাস (সম্পাদিত) (১৩২৭)। *ওঁ বেদ ঋগ্বেদ-সংহিতা*। চতুর্থ অধ্যায়। হাওড়া: পৃথিবীর মুদ্রাযন্ত্র। পৃ. ২৩৫৫।

৩) দত্ত, শ্রীরমেশ চন্দ্র (অনূদিত) (১৮৮৬)। *ঋগ্বেদ সংহিতা*। চতুর্থ অষ্টক। কলকাতা: কলকাতা: গবর্নমেন্ট যন্ত্রে মুদ্রিত। পৃ. ৯১৯।

৪) হিন্দু: হিন্দু কাকে বলা হবে তা নিয়ে নানাবিধ মতবাদ প্রচলিত রয়েছে - ক) ব্যক্তিকে বেদ গ্রন্থকে অপৌরুষেয় বলে মান্য করবে। খ) যে বেদমূলক কোন প্রচলিত ধর্মমতকে গ্রাহ্য করে চলে এবং প্রাদেশিক বা সামাজিক কোন সমাজভুক্ত হবে। এই সকল নিয়ম পালন করলেই সেই ব্যক্তিকে হিন্দু বলা হবে।

সূত্র: বন্দোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি (২০২০)। *হিন্দু কে*। কলকাতা: সূত্রধর। পৃ: ৯-১৫।

৫) ভট্টাচার্য, শিবজীবন (২০২১)। *হিন্দুধর্মের দার্শনিক পটভূমি*। কলকাতা: সূত্রধর। পৃ: ৯-১১।

৬) দাসগুপ্ত, জয়ন্তকুমার (সম্পাদিত) (২০০৯)। *কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৭-৮।

৭) পাণ্ডে, শ্রীপ্রকাশ (সম্পাদিত) (২০২০)। *শ্রমণ*। জানুয়ারি থেকে জুন সংখ্যা। বারানসী: পার্শ্বনাথ বিদ্যাপীঠ। পৃ. ১৭-১৯।

৮) Sen, Amulyachandra (1931). *School and Sects: In Jaina Literature.* Kolkata: Mahabodhi Book Agency. পৃ. ১৭৭-১৮৩।

৯) তদেব। পৃ. ১৮৩-১৮৭।

১০) তদেব। পৃ. ১৮৭-১৯২।

১১) জ্ঞানবজ্র, কর্মা (অনূদিত) (২০১৭)। *ধম্মপদ*। কলকাতা: তথাগত। পৃ. ২৮৪-২৮৮।

১২) চট্টোপাধ্যায়, সুনীল (২০০৮)। *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ১৮০।

১৩) পাণ্ডে, শ্রীপ্রকাশ (সম্পাদিত) (২০২০)। তদেব। পৃ. ২৩-২৮।

১৪) তর্কবাগীশ, ফণীভূষণ (সম্পাদিত ও অনূদিত) (১৯৬১)। *ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র) বাৎস্যায়ন ভাষ্য*। প্রথম খণ্ড। পৃ. ১৪২-১৪৫।

১৫) সেন, দেবব্রত (১৯৫৫)। *ভারতীয় দর্শন*। কলকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স। পৃ. ৬৬।

১৬) রায়চৌধুরী, সুব্রত (সম্পাদিত) (২০১৫)। *নবনির্মাণে চর্যাপদ*। কলকাতা: গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পত্রিকা তথ্যসূত্র দ্বিতীয় সংখ্যা। পৃ. ১৫৫।

১৭) Sosnoski, Daniel (edited) (1996). *Introduction to Japanese Culture.* Vermont and Tokyo, Japan: Charles E. Tuttle Company. পৃ. ১২।

১৮) রায়, শরৎকুমার (১৪০৭)। *বৌদ্ধ ভারত*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ৩১।

১৯) সাম্যবাক্য : গৌতম বুদ্ধের ধম্মশিক্ষার যে 'অষ্টাঙ্গমার্গ' বা 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' কথা জানা যায় তার একটি অংশ হল সাম্যবাক্য। যেখানে বলা হয়েছে - মানুষকে যা সত্য শুধু তাই বলতে হবে। একজন অন্যের বিরুদ্ধে খারাপ অসত্য কথা বলবে না। সকলের প্রতি নম্রভাবে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে। মূল্যহীন কথা বা যে

কথার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পায় না, সেই কথাগুলি স্বীকার করা ঠিক উচিৎ নয়। সর্বদা কথা বলতে হবে এমন যেখানে চিন্তা ও চেতনার প্রকাশ ঘটবে।

সূত্র: মিত্র, কৃষ্ণকুমার (১৯৯৮)। *বুদ্ধচরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষেপ বিবরণ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ৮৩।

২০) বুদ্ধের নৈতিক উপদেশ: গৌতম বুদ্ধ মানবের উদ্দেশ্যে প্রদানকারী দশটি উপদেশকে চিহ্নিত করা হয় বুদ্ধের নৈতিক উপদেশ নাম দ্বারা। যেখানে থাকে - ক) শীল খ) দান গ) উপেক্ষা ঘ) নেক্ষম ঙ) বীর্য্য চ) ক্ষান্তি ছ) সুখ জ) অধিস্থান ঝ) করুণা ও ঞ) মৈত্রী।

সূত্র: মিত্র, কৃষ্ণকুমার (১৯৯৮)। তদেব। পৃ. ৮৩।

২১) Lama, Dalai and C. Cutler, Howard (1999). *The Art of Happiness A Handbook for Living*. London: Coronet Books Hodder and Stoughton. পৃ. ১১৪-১১৫।

২২) মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দুশেখর (অনুবাদিত) মহাদেবন, টি. এম. পি. (২০১৮)। *শঙ্করাচার্য*। নিউ দিল্লী: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইণ্ডিয়া। পৃ. ২৭-৩৩।

২৩) ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০০)। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*। কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১২-১৩।

২৪) Saha, Bipin R. and Barnes, Jenifar (2013). *Non-Vedic Tradition of India–Mahavira, Buddha and Gosala. Comparisons and contrasts of Buddhism and Jainism.* Dellhi: Cossmo Publication. পৃ. ২।

প্রথম অধ্যায়

মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ-জৈন সমাজ, সাহিত্য ও দেবভাবনার পরিচয়

১. ০ ভূমিকা

সমাজ-জীবন স্থির নয়, পরিবর্তনশীল। এই ক্রমপরিবর্তনের ধারা সমাজে সাধিত হয় প্রধানত তিনটি অবস্থার মধ্যে দিয়ে আদিম সমাজ, লোক সমাজ এবং নাগরিক সমাজ। এই আদিম সমাজের বীজসংগ্রহ করে ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান হয় লোকসমাজ। এই শ্রেণির লোকসমাজ থেকে রসদ নিয়ে বেড়ে ওঠা সাহিত্যের নাম হল লোকসাহিত্য। আদিম সমাজ ছিল গোষ্ঠীনির্ভর। পরিবার গুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তারা একটি আলাদা গোষ্ঠীর রূপলাভ করত। এইভাবে বহু গোষ্ঠীর উদ্ভব হলে সমস্যার সম্ভাবনা দেখা যায়। তারা অস্তিত্বের লড়াইয়ে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হতে থাকে। এরফলে উভয়ের বিনাশের পথ প্রশস্ত হয়। বহু আদিমগোষ্ঠী আজ পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিছু জাতি নিজেদের মধ্যে একই ঐক্যসূত্রের মিলন ঘটিয়ে, উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে। বাংলাদেশে এইরূপ একটি ছবি দৃশ্যত হয়েছে। এখানে বিভিন্ন প্রকৃতির আদিম জাতির বাসভূমি ছিল। ধীরে ধীরে তারা নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের বাঁধন তৈরি করে অস্তিত্বের লড়াইয়ে একে-অপরের সঙ্গে আদান-প্রদানের সম্পর্ক তৈরি করে বেঁচে রয়েছে। এই টিকে থাকা পল্লিসমাজের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল একসময়ে মঙ্গলকাব্য নামক সাহিত্যের ধারা -

> আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।[১]

বর্হিশক্তির আক্রমণের ফলে আর্য-অনার্যের সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ ও সমন্বয় ঘটে তৈরি হয় সংক্রান্তিকাল। এই সময়ে উচ্চবর্ণের লোকেরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিম্নবর্ণের লোকেদের সঙ্গে মেলবন্ধনে উদ্যোগী হয়। একইভাবে লোকায়ত অন্ত্যজ দেবতারা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য আর্যব্রাহ্মণ্য দেবতাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের পর সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে। গৌতমবুদ্ধ দ্বারা প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম থেকে উৎসারিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের দেবতারা অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রচলিত লৌকিক জনজীবনের সংস্কার, বিশ্বাস, পূজার্চনার মধ্যে নিজেদের প্রতিস্থাপন করে। একইভাবে জৈনধর্মের দেবতাগণ তাদের ভাবনা, বিশ্বাস, আচার, রীতি নিয়ে প্রচলিত সমাজের মধ্যে মিশে যেতে থাকে। পরবর্তীকালে এই দেবতারা ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে স্থান করে নেয়। তৈরি হয় একটি

মিশ্রসত্ত্বসমাজ। এই সমাজ থেকে উদ্ভূত দেবতারা নাম পায় মিশ্রসত্ত্বদেবতা। মঙ্গলকাব্যের এইসকল মিশ্রসত্ত্ব দেবতারা হলেন - মনসা, চণ্ডী, শিব ও ধর্মঠাকুর প্রধান মঙ্গলকাব্যের দেবতা। শীতলা, কালিকা, ষষ্ঠী, রায়, সূর্য, অন্নদা, সারদা, তীর্থ, জগন্নাথ ও প্রভৃতি অপ্রধান মিশ্রসত্ত্ব মঙ্গলকাব্যের দেবতা।

১. ১) বাংলা মঙ্গলকাব্যের পরিচিতি

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে দেবতাকেন্দ্রিকতা। ব্যতিক্রমী সাহিত্যের সংখ্যা সামান্যমাত্র। মধ্যযুগ-এর সাহিত্য দেবতাবর্ণিত সাহিত্য আখ্যা পেলেও, এই সাহিত্যের মধ্যে মানুষের সুখ, দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা এইসকল অনুভূতির বর্ণনা থেকে বাদ পড়েনি। দেবমাহাত্ম্য বর্ণনা কাব্যে ধরা পড়েছে একটা উপরিআবরণ হিসেবে। আবরণটি খসিয়ে দিলে সেখানে সাধারণ মানুষের জীবনরসের উষ্ণপ্রস্রবনের স্রোত পরিলক্ষিত হয়। আধুনিকপূর্ব সমগ্র সাহিত্যের ধারাতে মানবজীবন রসের কথা উল্লেখ থাকলেও, মঙ্গলকাব্যের ধারাতে এই বর্ণনা সর্বাগ্রগণ্যতা লাভ করেছে। এক বিশেষ রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল। বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণের ফলে সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য রাজনীতিতে যে বিরাট গুণগত পরিবর্তন ঘটেছিল যার হাত ধরে তৈরি হয়েছে মঙ্গলকাব্যের ধারা। সাহিত্য সৃষ্টি হয় জাতির মানসলোকের ইতিহাসকে ঘিরে। জাতির মানসলোক লুকিয়ে থাকে তৎকালীন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী বিজয়ের (১২০১ খ্রিস্টাব্দ) হাত ধরে তৎকালীন বাংলাদেশে মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মুসলিমদের শাসনের পূর্বে বঙ্গদেশ শাসিত হয়েছিল জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী রাজাদের হাতে। বৌদ্ধ ও জৈন ভাবাপন্ন রাজাদের পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী রাজারা হিন্দুধর্মের শাস্ত্রাচারমূলক বিধি-বিধান, বর্ণাশ্রম, কৌলীন্যপ্রথা। হিন্দুদের সকল রকমের সংস্কারকে প্রকট করে তুলতে গিয়ে সামরিক শক্তির দিকে নজর দিতে অবহেলা করেন। রাজা লক্ষণ সেন (১১৬৯-১২০৬ খ্রিস্টাব্দ) হাত ধরে বাংলাদেশ অন্যধর্মীয় রাজাদের হাতে হস্তান্তরিত হয়। শুরু হয় বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়। এই ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বিধর্মী রাজা বখতিয়ার খিলজি।

ত্রয়োদশ শতকের গোঁড়ায় ঘটে যাওয়া এই যুগান্তকারী ঘটনা যেমন একদিকে হিন্দু কতৃত্বের অবসান ঘটিয়েছিল তেমনি মসনদ দখলের হীনচক্রান্ত ও গুপ্তহত্যার ধারাবাহিক ঘটনাক্রম রক্তপাতের

বীভৎসতায় নতুন ইতিহাস রচনা করেছিল। মাত্র একশো আটত্রিশ বছরের মধ্যে সিংহাসনের দাবিদারের বদল ঘটেছিল বত্রিশবার। বখতিয়ার খিলজি লক্ষণাবতীর সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন (১১৯৮-১২০৫ খ্রিস্টাব্দ), তিনি সুস্থিরতার সঙ্গে রাজ্যশাসন করতে পারেনি। রাজ পরিবারের দৃশ্য দিনে দিনে আরও নৃশংসতর হয়ে উঠেছিল। ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ ওমরাহের হাতে প্রাণ হারান রাজা বখতিয়ার খিলজি। ১২০৫-১২১১ খ্রিস্টাব্দ এই স্বল্পসময়ের মধ্যে তিনজন রাজার (আজ্জউদ্দিন মুহাম্মদ শিরাণ, আলাউদ্দিন আলিমরদান খলজি, হুস্বামউদ্দিন খলজি) আগমন ঘটেছিল। গিয়াস-উদ্-দিন ইউয়জ (১২১১-১২২৭ খ্রিস্টাব্দ) রাজপদে আসীন হলে, তিনি রাষ্ট্রশক্তির স্থায়িত্ব বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। সেই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন সুলতান শামস-উদ-দিন আলতমশ। দিল্লির সুলতানের সঙ্গে গিয়াস-উদ্-দিন ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে সন্ধি করেন। গিয়াস-উদ্-দিন সুলতানের বিরোধিতা করলে, আলতমাশ পুত্র নাসিরুদ্দিনের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। গিয়াস-উদ্-দিন-এর এই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে লক্ষণাবতীর অধিকার চলে যায় দিল্লির মসনদের অধীনে। একশো তেরো বছর ধরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলেছিল। প্রথমে রাজপদে সম্মানের ভাগ দখল, কিছুদিন পরে রাজার মৃত্যু, পুনরায় নতুন রাজার আগমন। এই পরিস্থিতির রংবদল ধরা পড়ছে ১৩৩৯ খ্রিস্টাব্দে শামস-উদ-দিন ইলিয়াস শাহের রাজপদে আসীন হওয়ার মধ্যে দিয়ে। এই রাজার পরবর্তী একশো বছরে ধীরে ধীরে বাংলায় স্থিরতা ফিরে আসতে থাকে। মানুষ আবার যেন একে অন্যের প্রতি ভরসা, বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে শুরু করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুকুমার সেনের বক্তব্য - চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে শামস-উদ-দিন ইলিয়াস শাহ বাঙ্গালায় স্বাধীন সুলতা রাজ্য সংস্থাপিত করেছিলেন যার ফলস্বরূপ দেশে অনেকটা সুসংস্থাপিত হয়েছিল। এই ইলিয়াস-শাহী বংশের রাজ্যকাল থেকে এদেশে পুনরায় জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য-অনুশীলন আরম্ভ হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর সময়কাল থেকে। রাজাদের এই সাহিত্য রচনায় তেমন ভূমিকা লক্ষ করা যায় না। রাজনুগৃহীত ধনীব্যক্তিদের হাত ধরে নতুন সাহিত্য পথ জেগে উঠেছিল।[৫] এই ছিল সেসময়ের রাজসিংহাসন নিয়ে লড়াই-এর ছবি।

তুর্কী আগমনের পরে রাজসিংহাসন ঘিরে লড়াই দেখে অনুমান করা যায় যে তখন রাজ্যে জনসাধারণের জীবনে নিশ্চয়তা ছিল না। চারিদিকে হিংসার জাল, অবিশ্বাস যা সমাজকে দুঃস্বপ্নর মতো ঘিরে ধরেছিল। এই পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে তারা আরও বেশি করে দৈবনির্ভর ও

অদৃষ্টের ওপর নির্ভরশীল হতে থাকে। মুসলমানেরা শুধু রাজ্য দখল করে থেমে থাকেনি, মানুষকে তাঁর শিক্ষা ও অন্যান্য সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। তাঁরা প্রথমে দেশীয় সম্পদ নষ্টের খেলায় মেতে উঠেছিল - দেশের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির যেসব প্রধান কেন্দ্র ছিল সেগুলিকে সর্বপ্রথম বিধস্ত করা হয়েছিল। বুদ্ধি-বিদ্যা কৌশলে যারা শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তাঁরা সর্বাগ্রে বিপন্ন হয়েছিলেন।[৬] মানুষের ধর্ম নাশ করতে কখনও তাঁরা পিছপা হয়নি। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী যেকোন রাজনৈতিক বিজয় তখনই সম্পূর্ণ হতে পারে, যখন বিজিত জাতির ওপর ধর্ম-সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিজয় লাভ করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ইটালির কমিউনিস্ট পার্টীর জেনারেল সেক্রেটারি আন্তনিও গ্রামসির হেজেমোনি গুরুত্ব রাখে। তিনি মনে করতেন সংস্কৃতি হল মৌলিক ক্ষমতা অর্জনের পন্থা। ব্যক্তির ক্ষমতা অপসারণের জন্য প্রথমে তার সাংস্কৃতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে। গ্রামসির মতে একটি শ্রেণি কেবল তার নিজস্ব সংকীর্ণ অর্থনৈতিক স্বার্থকে নিয়ে আধুনিক পরিস্থিতিতে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। আবার বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বিশুদ্ধভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। এখানে প্রয়োজন বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক নেতৃত্ব। যেখানে জোটের সাথে জোট এবং দরকারে আপস করতে পারবে।[৭] ইসলামি রাজশক্তি ও নিজেদের ধর্ম জোড় করে জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দিতে থাকে। হিন্দু শাসনকালে তৈরি হওয়া কৌলীণ্যপ্রথার কুফল ও ইসলামি শাসনের আগ্রাসননীতি যার দ্বারা প্রত্যন্ত গ্রামবাংলার বুকে নেমে আসে ধর্মান্তরীতকরণ। এই ধর্মান্তরণ পদ্ধতিতে উঠে আসে নিষ্ঠুরতার ছবি। যারা প্রাণের ভয়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা প্রাণে বাঁচলেও মুসলিমদের কাছে ছিল অবহেলিত। কোন কিছুর বিনিময়ে নিজের ধর্মনাশ করে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হতে চায়নি, তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল নানাবিধ অত্যাচার।

ইসলামধর্মের পূর্বে বাংলায় বিভিন্ন সময় ধরে নেতৃত্ব দিয়েছে বৌদ্ধ ও জৈন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম। জৈনধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর, যিনি বিশ্বে অহিংসার বাণী ছাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। মহাবীর মানবমুক্তির বার্তা ঘোষণা করেছিলেন - ধর্ম একটি বাস্তবতা, তা শুধু সামাজিক প্রথা মাত্র নয়। জীবের মুক্তি আসে সত্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলে, সমাজের বাহ্যিক অনুষ্ঠানগুলির উদযাপনের মাধ্যমে নয়। এই ধর্মমত মানুষকে শিখিয়েছে ধর্মমাত্র মানুষে মানুষে চিরন্তন বিচ্ছিন্নতার বাধা নয়। এই বার্তা একসময় প্রাচীন ভারতে সকল বাধা অতিক্রম করে সমগ্র দেশকে জয় করেছিল।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের কঠোর আচার-পদ্ধতি এবং তার সঙ্গে সমাজের নিয়ম-কানুনের বেড়াজাল, সমাজে উঁচুনিচু ভেদাভেদ এগুলি থেকে রেহাই পেতে মানুষ যখন দিশেহারা। অহিংসার পথ দেখাতে এগিয়ে এসেছিলেন জৈনধর্মের তীর্থঙ্করগণ। ভারতবর্ষের কিছু অঞ্চল ও ইউরোপীয় দেশগুলিতে জৈনধর্মের প্রাধান্য ছড়িয়ে পড়েছিল। গৌতম বুদ্ধের আগমন এবং মহাবীরের পরবর্তীতে জৈনধর্মে প্রতিভাপন্ন ব্যক্তির অভাবে ভারতবর্ষ থেকে ধীরে ধীরে জৈনধর্মের আলো স্তিমিত হয়েছে।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতমবুদ্ধের জন্ম (যদিও মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধের সময়কাল নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে)। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে ভারতীয় উপমহাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয়। বর্তমানে বৌদ্ধধর্ম দুটি প্রধান মতবাদে বিভক্ত - হীনযান ও মহাযান। বজ্রযান বা তান্ত্রিক মতবাদটি মহাযানের একটি অংশ। বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বসবাস করে চীনে। বাংলাদেশের উপজাতীদের বৃহত্তর অংশ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত। গৌতমবুদ্ধ মূলত জৈনধর্মের ভাবধারায় নিমজ্জিত হয়ে নিজ ধর্মমত প্রচার করেছিলেন বলে কিছু গবেষক অনুমান করেছেন -

> অহিংসাবাদ জৈনধর্মের আদি আধার। বৌদ্ধধর্ম এই অহিংসাতত্ত্ব জৈনধর্ম থেকে লাভ করেছে। বৈদিকদর্শনে অহিংসাবাদ থাকে শুধুমাত্র অন্তর্মুখে, কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধদর্শনে এই অহিংসাতত্ত্ব অন্তর ও বাহির উভয়মুখেই থাকে সুস্পষ্ট। আর এখানেই বৈদিকদর্শনের সঙ্গে উক্ত দুই দর্শনের স্বতন্ত্রতা। এরপরেও এই দুই মত নিজস্বভঙ্গিতে মূলে পৌঁচেছে, যেমন – বৌদ্ধমত গ্রহণ করেছে শূন্যবাদকে অপরদিকে জৈনমত আত্মতত্ত্বের পথকে বেছে নিয়েছে। প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধনে এবং বিস্তীর্ণ বঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃতিলাভ করেছিল। বাং লার যোগী ও সহজিয়া ভাবতন্ত্রে জৈন সাধনার চিহ্ন এখনও বর্তমান বহন করে চলেছে। জৈনদর্শনে 'নয়বাদে' পুরাকালের বিভিন্ন দর্শনের মতবাদের সমন্বয় সামঞ্জস্যের উপায় পাওয়া যায়।[৮]

গৌতমবুদ্ধ প্রচারিত ধর্মমতের মধ্যে নিজস্ব কিছু জীবন অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও দর্শনকে জুড়ে দিয়েছিলেন। বুদ্ধের দর্শনের প্রধান অংশ ছিল দুঃখের কারণ ও সেগুলি নিরসনের উপায়। বাসনা হল সর্বদুঃখের মূল। বৌদ্ধ মতে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি হওয়া প্রধান লক্ষ যাকে 'নির্বাণ' বলা হয়। নির্বাণ শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিভে যাওয়া বা বিলুপ্তি। বৌদ্ধ মতে নির্বাণ হল সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ। এই সম্বন্ধে গৌতমবুদ্ধের চারটি উপদেশ যা চারিআর্যসত্য (চত্বারিআর্য্যসত্যানি) নামে পরিচিত। তিনি অষ্টবিধ উপায়ের মাধ্যমে মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। গৌতমবুদ্ধের মৃত্যুর কয়েকশো বছরের মধ্যে গৌতমবুদ্ধ প্রচারিত মূলধর্ম থেকে সরে এসেছিল বৌদ্ধভাবনা। বৌদ্ধধর্মের শেষপরিণতি হয়েছিল মন্ত্র বা তন্ত্ররূপে। এই তন্ত্রভাবনা সমাজের একশ্রেণীর

মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিল ধর্ম পালনের অতিসহজ উপায়। সমাজের অন্যশ্রেণীর মানুষ ধর্মের নামে তন্ত্রের কদাচারকে মেনে নিতে পারেনি। ধীরে ধীরে সমাজে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ধূসর হতে থাকে।

বৌদ্ধধর্মের এই ক্ষয়ীষ্ণু পরিবেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের উত্থানের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। ইসলামের আগমনে বৌদ্ধধর্ম সব থেকে বেশি ধাক্কা খেয়েছিল। ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছিল বৌদ্ধ মঠগুলি। বহু বৌদ্ধসন্ন্যাসী নিহত হয়েছিল, কেউ কেউ প্রাণের দায়ে পালিয়ে গিয়েছিল তিব্বতীয় দেশগুলিতে। এইসময় সমাজের কিছু সুবিধাভোগী লোক ক্ষমতার লোভে, রাজশক্তির লোভে সহজেই ধর্মান্তরিত হয়ে যায়। কোথাও মানুষকে জোড় করে ভয় দেখিয়ে ইসলামে পরিণত করা হয়েছিল। একথা স্বীকার করতে হয় যে বেশ কিছু মানুষ সেইসময়ে সুফি সাধনার হৃদয়স্পর্শী প্রেমভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন ইসলাম ধর্মে। এইসময় থেকে বঙ্গসংস্কৃতিতে বহুমুখী ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। এই ভঙ্গুর পরিবেশে জন্ম নেয় মানুষের ভয় থেকে কিছু নতুন দেবতাভাবনার। রূপ পেতে থাকে নবআগত কিছু দেবদেবী।

নবআগত দেবতারা পূজা পাওয়ার জন্য কখনও মরিয়া হয়ে ওঠে এবং ভক্তের অনিষ্ট করতে দ্বিধা করে না। কখনও ভক্তের ডাকে সারা দিয়ে তাকে দুহাত ভরে সম্পত্তি দিতেও কার্পণ্য করে না। আসলে রাজাদের খাম-খেয়ালিপনাতে প্রজাদের দুর্ভোগ কাহিনি মঙ্গলকাব্যের পাতায় উঠে এসেছে। এখানে দেবতারূপ হয়ে যায় রচয়িতাদের বিশ্বাসের কল্পরূপ। রাজাদের অন্যায় অত্যাচারের নমুনা এইসকল দেবতাদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ধরা পড়ে। তখন থেকে শুরু হয় ধর্মীয়-সংস্কৃতির প্রতিরোধ। উচ্চকোটির দেবতাদের পাশে এসে দাঁড়াতে থাকে নিম্নকোটির দেবতারা। এই আর্য-অনার্যের মিলনের জন্য তুর্কী আক্রমণের প্রয়োজনীয়তা অন্যরমকভাবে গুরুত্ব পায় সর্বসমক্ষে। দুইগোষ্ঠীর মিলনের ফলে বাঙালিরা নতুন রূপলাভ করেছিল। উচ্চকোটি-নিম্নকোটি, ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে সকলের মধ্যে সম্মিলন ঘটেছিল। এক নতুনশ্রেণির দেবতার জন্ম হয়েছিল। দেবতাদের অন্তরে ছিল পৌরাণিকতার ছবি। বাইরে ফুটে উঠেছিল অপৌরানিক অনার্য দেবতাভাবনার প্রতিচ্ছবি। এই দেবতাদের ঘিরে যে সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছিল, সেই সাহিত্যগুলি 'মঙ্গলকাব্য' নামে অভিহিত হয়েছিল। এই কাব্যগুলির অধিকাংশ জুড়ে ছিল দেবদেবীর কথা। এই কাব্যের গুণাগুণের কথা ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে – এই কাব্য শুনলে মঙ্গল হয়, এবং অশ্রদ্ধা করলে হয় অমঙ্গল। এই কাব্য

মঙ্গলাধার, এই কাব্য ঘরে রাখলে মানবের মঙ্গল হয়।[৯] মঙ্গলকাব্যের গানের সুরকে মঙ্গলের সুর বলা হত। এই গান যাত্রাপালাতে বা মেলাতে গাওয়া হত। মঙ্গলকাব্যগুলি ছিল মূলত শুভঙ্করী চেতনার প্রতীক। যার মাধ্যমে মধ্যযুগের মানুষ খুঁজে পেয়েছিল জীবনের প্রতি আত্মবিশ্বাস ও আস্থা। সময়ের দাবি মেনে মঙ্গলকাব্য হয়ে উঠেছিল সমাজের দর্পণ।

ত্রয়োদশ–চতুর্দশ শতাব্দী থেকে মঙ্গলকাব্যের রচনা শুরু হলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই কাব্য সম্পূর্ণ রূপলাভ করেছিল। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্য গুরুত্ব পেয়েছে – পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে মঙ্গলকাব্যগুলি একটা বিশেষ গতানুগতিক রচনাপ্রথার অনুকরণ আরম্ভ করে। বিষয়বস্তুর পরিকল্পনার দিক থেকে এই শ্রেণির কাব্য সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য - বর্জিত হয়ে পড়েছিল।[১০] এই কাব্যের লক্ষণীয় দিক হল তার গঠনপ্রকৃতি। গঠনের মধ্যে লোকায়ত ও পুরাণের ছায়া স্পষ্ট রয়েছে। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কাব্যেকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি পৌরাণিক দিক, অন্যটি লৌকিক দিক। পৌরাণিক অংশের নাম হল দেবখণ্ড ও লোকায়ত অংশের নাম নরখণ্ড। এই ধরণের লোকায়ত ভাবনার উৎস ব্রতকথা হলেও, মঙ্গলকাব্যে মৌখিক গদ্যকাহিনির প্রচলন ছিল। কাব্যের মধ্যে কোন উচ্চতর দেবদেবীর কথা বা উচ্চতর আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ পাওয়া যাবে না। দরিদ্র, অনগ্রসর মানুষের শক্তি প্রার্থনার কেন্দ্রে যে দেবদেবীর অবস্থান তাঁদের কৃপায় অতি সহজে আরাধিত ব্যক্তি বহু ধন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে। প্রমাণ পাওয়া যায় কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি অংশে। যেখানে কবি মুকুন্দরাম-এর চণ্ডী বলেছেন -

দালিম্ব তরুর মূলেদিলা দরশন ।
স্থান দেখাইয়া মাতা দিলা ততক্ষণ।।
চণ্ডী সঙরিয়া বীর নিলেক চিয়াড়।
চেলা কাটি ফেলে যেন পুখড়ীর পাড়।।
খুড়িতে খুড়িতে বীর ধনের লাগ পাইল।
লোহার শিকল ধরি টানিয়া তুলিল।।
তুলিয়া বান্ধিল বীর সপ্ত ঘড়া ধন।
চণ্ডীর সমুখে রাখে ব্যাধের নন্দন।[১১]

এই দেবতারা রুষ্ট হলে নেমে আসে ধ্বংসের ছবি। কলিঙ্গদেশে ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ অংশে দেখা যায় -

চণ্ডীর আদেশ পান বীর হনুমান।
মঠ অট্টালিকা ভাঙ্গি করে খান খান।।
উঠে পড়ে ঘড়গুলা করে দলমল।
চারিদিকে বহে ঢেউ পর্বত – বিশাল। ।

চণ্ডীর আদেশে ধায় নদনদীগণ।[১২]

শুধু বিশ্বাসীদের জন্য নয়, এইসকল ব্রতকথা ও পাঁচালি অবিশ্বাসীদের সতর্ক করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হত। তুর্কী আক্রমণের পরবর্তী সময়ে যেভাবে ধর্মান্তরীকরণ চলেছিল তার ফলস্বরূপ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ভুল পথে ধাবিত হতে শুরু করেছিল। এই পরিস্থিতি থেকে মানুষের রেহাই পাওয়ার পথ দেখিয়েছিল মঙ্গলকাব্যগুলি। মানুষের ভয় থেকে জাগে দেবভাবনা, এই দৈবীভাবনা হয়ে যায় আগত বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায় খোঁজার সিঁড়ি। উৎপত্তির দিক থেকে দেবতারা হয়ে যায় বিপদভঞ্জনকারী, ভক্তকে রক্ষা করা তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্যে। বাংলার জলাভূমিতে সাপের উৎপাত থেকে রেহাই পেতে উৎপত্তি হয়েছিল সর্পদেবী মনসার। বসন্তরোগের মারাত্মক প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে জন্ম নিয়েছিল শীতলা নামের নতুন দেবীর। মানুষের জাদুবিশ্বাস ও দেবতা নির্ভরতার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় -

> কতকগুলি বিশেষ সংস্কার আদিকাল থেকেই মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বরহস্যের নানান কিছুর সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করতে পারার মতো সুবিকশিত বুদ্ধিবৃত্তি গড়ে না ওঠায়। উত্তরকালে বুদ্ধিবৃত্তিগুলি সমুন্নত হয়ে উঠলেও, প্রপিতামহদের উত্তরাধিকার হিসেবে ঐ আদিম সংস্কারগুলির শিকড় থেকেই যায় মানুষের মনের জটিল, আরণ্যক গহনে। এখানে একটা কথা বলতে হবে : আদিম প্রপিতামহদের কাছে যে – সব নৈসর্গিক বিষয়ের কোন ব্যাখ্যা ছিল না, সেই সবকিছুর আড়ালে তাঁরা অলৌকিক ক্ষমতাশালী কোন শক্তির কল্পনা করতেন। এই প্রতীতি থেকেই সমান্তরাল ভাবে জাদুবিশ্বাস এবং দেবতা-নির্ভর ধর্মপ্রত্যয় গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। এই জন্য জাদু ও ধর্মবিশ্বাস বহু সময়েই একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে দেখা দেয়।[১৩]

পাঁচালি বা ব্রতকথার আখড়া থেকে মঙ্গলকাব্যের সূচনা। মঙ্গলকাব্য হল ব্রতকথার বৃহত্তর রূপ।

মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য:

মঙ্গলকাব্যের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায় কাব্য পাঠে। যেমন - নরখণ্ড যেখানে থাকে মর্ত্যের মানুষকে নায়ক-নায়িকারূপে চরিত্রে প্রতিস্থাপন। তাঁদের দুঃখ কষ্টের কথা এখানে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়। দেবখণ্ডের কাহিনিতে থাকে স্বর্গকেন্দ্রিকতা। স্বর্গজাত কোন দেবপুরুষ বা দেবরমণী কোন বিশেষ দেবদেবীর উদ্দেশ্যে স্বর্গভ্রষ্টা কোন দেবপুরুষ বা দেবনারী হবে এই খণ্ডের নায়ক-নায়িকা। তারা কোন দেবদেবীর মর্ত্যে পূজা পাওয়ার আশায় মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করে। মঙ্গলকাব্যের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় –

ক. মঙ্গলকাব্যের গঠনপ্রকৃতি: মঙ্গলকাব্যগুলি মূলত পালাগানে বিভক্ত হত। শুরুতে মঙ্গলকাব্যগুলি দিবাপালা ও রাত্রিপালার জন্য আলাদা আলাদা গীত রচিত হত। চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলকাব্যের

আটদিনে ষোলপালার বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। গায়নের সুবিধামত এই বিভক্ত পালাগুলি গীত হত। দিবাপালা দ্বিপ্রহর থেকে আরম্ভ হয়ে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত আসর বসত। সূর্যাস্তের পর থেকে রাত্রিপালা শুরু হয়ে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত গীতানুষ্ঠান চলত। ধর্মমঙ্গলকাব্যের গঠনে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্যের নমুনা পাওয়া গেছে। এই কাব্যে মোট বারোদিনে চব্বিশটি পালার উল্লেখ পাওয়া গেছে। ধর্মঠাকুরকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করে, সূর্যের দ্বাদশ সংখ্যার বিষয় মাথায় রেখে এই দীর্ঘ চব্বিশপালার রচনা করা হয়েছিল। মনসাপালা আবার প্রতিদিন একপালা করে একমাস ধরে গীত হত। সকল মঙ্গলকাব্যের গান শেষ হবার পূর্বরাতের পালাকে জাগরণ পালা'[১৪] বলা হত। পুরাণের কাহিনি সম্পাতিতে পুরাণপাঠ ও শ্রবণের ফলশ্রুতি বর্ণনা করা থাকত। মঙ্গলকাব্যগুলির কাহিনি শেষে মঙ্গলগানের পাঠ ও শ্রবণের ফলাফলের বিবরণ দেওয়া থাকত। কাব্যের শুরুতে এই আশ্বাস বাক্যের প্রতিফলন লক্ষ করা গেছে -

এক মনে যে করে শ্রবণ এই কথা।
প্রিয় হঅ প্রভুর প্রসন্ন থাকে ধাতা।।
করণ কারণ ধর্ম কেবা জানে মায়া।
কোনখানে রৌদ্রজল কোনখানে ছায়া।।
না বুঝিয়া নিন্দা করে নিন্দুক যে কেহ।
খস্যা পড়ে অস্থি মাংস গল্যা জায় দেহ।।'[১৫]

এই অংশের বিবরণে ঐহিক কামনা-বাসনার সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সংসারের পারত্রিক কল্যাণের আশ্বাস দেওয়া হত।

খ. বন্দনা: মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ড শুরু হয় বন্দনা অংশ দিয়ে। গণেশাদি সহিত পঞ্চদেবতার এখানে বন্দনা করা হয়। গ্রন্থোউৎপত্তির কারণ, সৃষ্টিরহস্য, মনুর প্রজাসৃষ্টি, স্বর্গভ্রষ্টা দেবশিশুর উদ্দেশ্য সাধন করে আবার স্বর্গে পুনরাগমন প্রভৃতি বিষয়গুলি এখানে থাকে। দেবতামাহাত্ম্য প্রচারাশ্রয়ী ভাবনার মধ্যে দিয়ে পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য উভয়ের সাদৃশ্য বহন করে চলেছে। শুধু বাইরে নয় কাহিনিগত দিক থেকেও উভয়ের সদৃশ বিদ্যমান। উভয়ের দৈবীভাবনার মধ্যে কিছু বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন – পুরাণে আনুপূর্বিক দৈবউপায়ে দেবমাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবতারা ছলে বলে কৌশলে কার্যসিদ্ধি করতে দ্বিধা করে না। বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসা নিজের হিতসাধনের জন্য ছল করতে পিছপা হয়নি -

মনসা কমলা দুঁহে পাতাইল সই। একাসনে বসিয়া ত দুঁহে কথা কই।।
কপট চাতুরী করে জয় বিষহরি। যেনমতে মরিবেক ওঝা ধন্বন্তরি।।
বাড়িল নৌতন প্রেম করলাম সনে। মনসা বলেন সই শুন সাবধানে।।

তোমায় আমায় হৈল প্রম পীরিত। আর খানি মনে ভাবি হইনু বিস্মিতি।।

... ...

ছকুড়ি ছজন শিষ্য গেল ঘরাঘরি। শ্বেতমাছি – রূপ হৈলা জয় বিষহরি।।

সেইখানে শ্বেতমাছি রহে লুকাইয়া। নিজ ঘরে ধন্বন্তরি উত্তরিল গিয়া।[১৬]

গ. নায়িকার বারোমাসি বর্ণনা: নায়িকার বারোমাসি বর্ণনা বাংলার প্রাচীন কাব্যগুলির ক্ষেত্রে একটি প্রধানবৈশিষ্ট। বারোমাসি বর্ণনায় প্রাচীন কবিগণ পরিবর্তমান প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর পটভূমিকায় নায়ক-নায়িকার সুখ দুঃখের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেত। মঙ্গলকাব্যের এই বৈশিষ্ট্য লোকগীতির ধারা থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। মঙ্গলকাব্য উদ্ভবের পূর্বে লোকগীতিতে এই রীতির ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। এই রীতিকে অনুসরণ করে *রামায়ণ* অনুবাদে এসেছে সীতার বারোমাসি। বৈষ্ণবকবিতায় রাধিকার বারোমাসি, এমনকি চৈতন্য-জীবনচরিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বারোমাসি। তৎকালে নারীদের অবস্থা, তাঁদের কষ্টযাপনের ছবি এই অংশের মধ্যদিয়ে জীবন্তরূপে ধরা পড়েছে। বারো মাস জুড়ে সেকালের নারীরা কীভাবে কষ্টের মধ্যে দিয়ে দিনযাপন করে থাকত সেই কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নায়িকার মুখে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অভাবের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে গৃহবধূ ফুল্লরা গৃহের বাইরে পা রেখেছে অন্নসন্ধানের আশায়। তাতেও সুব্যবস্থা করতে না পেরে অসহায় ফুল্লরা দেবী চণ্ডীকে নিজের দূর্দশার কথা জানিয়ে বলেছে -

অনল সমান পোড়ে বৈশাখের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা।।
পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন্ন।।[১৭]

বাঙালি ব্যক্তি-জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি এই বারমাসি বর্ণনাতে যেমন পরিপুষ্টি পেয়েছে তেমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। এই কবিদের প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে যেমন প্রকৃতির খুঁটিনাটি বাস্তব চিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। একইভাবে এই পটভূমিতে নায়ক-নায়িকার অনুভূতিগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ঘ. বিবাহবর্ণনা: এই অংশে স্ত্রীচারের ব্যাখ্যায় সকল মধ্যযুগের কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলার একাধিক অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে বিবাহ অংশের বিভিন্ন বর্ণনার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই অংশের মধ্যে দিয়ে অঞ্চলভেদে এক বিবাহাচারের দ্বিবিধ রীতি-নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যে এই সামাজিক রীতি-রেওয়াজ উল্লিখিত হওয়ায় পুরাকালের আচারবিধি সম্পর্কে পাঠক অতিসহজে অবগত হতে পারে -

বাহির হইল সুন্দরি বেউলা পাটেত চড়িয়া।

হরষিত হইল লখাই বেউলারে দেখিয়া।।
দশ জন আইল কাছিয়া কাপড়।
কান্দে করি লইল বর চান্দোর কোঙর।।
আগে লখাই পাছে বেউলা সাত পাক ফিরি।
লখিন্দরে রাখিলেক পুর্ব্বমুখ করি।।
অন্তম্পট দূর করি মুখচন্দ্রিকা।
সুভ দিনে বেউলা লখাই হইয়া গেল দেখা।।[১৮]

এই বিবাহ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে বাঙালি বিবাহ রীতিকে তুলে ধরা হয়েছে। বিবাহ পূর্বে নায়ক-নায়িকার অধিবাসের রীতির কথা কিছু কাব্য থেকে জানা গেছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সে কালের বিবাহ বাসরে আচারের সঙ্গে আজকের আধুনিক বিবাহ বাসরের সাদৃশ্য সম্পূর্ণ লোপ পায়নি।

ঙ. বাঙালির ভোজন বর্ণনা: বাঙালিরা চিরকাল ভোজনবিলাসী তাই ঘরে খাদ্যাভাব জেনেও ভারতচন্দ্রের শিব-গৌরীকে রান্নার ফর্দ দিয়েছেন এই প্রকার –

আজি গণেশের মাতা রান্ধ মোর মতো।
নিমে সিমে বেগুনে রান্ধিয়া দিব তিত।।
সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুমড়া বার্ত্তাকু দিয়া রান্ধিবে প্রচুর।।[১৯]

বাঙালি রান্নার সঙ্গে বাঙালির ভোজনের দৃষ্টান্ত মঙ্গলকাব্যগুলিতে রয়েছে। কালকেতুর গ্রাসের পরিমাণ ও আমানি খাবার গর্ত পাঠককে অভিভূত করে। বাঙালির ভোজন লালসা মধ্যরাতে জেগে ওঠে –

লখীন্দর বলে প্রিয়া শুন মোর বাণী। ক্ষুধায় আকুল মুঞি, লাগে ভোকছানি।।
রাত্রের ভিতরে যদি করাহ ভোজন। তবে সে রহিবে প্রিয়া আমার জীবন। [২০]

এই সেই রসিক বাঙালি যারা বাসর ঘরে শান্তিতে নিদ্রাযাপনে দ্বিধা করে ভোজনকে প্রাধান্য দেয়।

চ. পাকপ্রণালী বর্ণনা: এই অংশের মধ্যে দিয়ে বাস্তবতার প্রতি মঙ্গলকাব্যের কবিরা যথেষ্ট নিষ্ঠা দেখিয়েছে। মধ্যযুগের আখ্যানকাব্য, ডাকের বচন ও বিক্ষিপ্ত লৌকিক রচনাতে এই বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার দেখা গেছে। সমাজের জনসাধারণের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের প্রাধান্য বাড়াতে, এই ধারার কবিরা পারিপার্শ্বিক রচনাসমূহকে নিজেদের কাব্যের মধ্যে স্থান দিতে শুরু করেছিলেন। এইসকল বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাথমিক ভাবে মূলকাহিনির প্রয়োজনে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও, এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে দিয়ে কাব্যগুলি সেযুগের দর্শকদের হৃদয়ের কাছে পৌঁছেছিল। সেকালের শ্রোতারা কাব্যের মধ্যে নিজেদের বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। কাব্যে এই দৃশ্যগুলি রচনায় কবিদের মৌলিকতা ধরা পড়েছে –

গড়ণপাড়া ডাহিনে রাখিয়া সদাগর। গরিটি বাহিয়া সাধু চলিল সত্বর।।

দিগঙ্গে আইল সাধু পুণ্যবান ঘাটে। নিমের গাছেতে যথা ওড়ফুল ফুটে।।
পশ্চাত করিয়া সাধু চলিল দিগঙ্গ। বামে থুয়্যা খড়দহ পাইল কোঙরঙ্গ।।
কাটি গঙ্গা দিয়া সাধু কালীঘাটে যায়। হনুঘাট সদাগর পশ্চাত এড়ায়।।[২১]

মঙ্গলকাব্যগুলি সংকলিত হওয়ার পূর্বে সমুদ্রযাত্রা মধ্যযুগের মানুষের কাছে সম্মানীয় বলে গণ্য হত। মঙ্গলকাব্যের কবিরা তাঁদের নায়ককে সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় বোঝাতে নায়ককে পাঠাতেন সমুদ্রে।

ছ. বিশ্বকর্মার শিল্পনিপুণতা: পুরী নির্মাণে স্বর্গের দেবতার ডাক পড়েছে কাব্যের প্রয়োজনে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন দেবতা বিশ্বকর্মা। যিনি বেহুলা-লখাই-এর জন্য পর্বতের ওপর ঘর তৈরি করেছিলেন। পোশাক পরিচ্ছেদ তৈরিতেও নিপুণতার প্রমাণ দিয়েছেন। যার মধ্যে দিয়ে বাঙালির চারুশিল্পে দক্ষতার পরিচয় বহন করেছে। শিবের আদেশে পদ্মার জন্য বসতবাড়ি গড়ে তোলে বিশ্বকর্মা -

আজ্ঞা পাইয়া বিস্বকর্ম জানিয়া সকল মর্ম
করণ্ডি গঠে পাতিয়া আফর।
সোবন্তের তাল সোবন্তের চৌচাল
চিত্র করে দেখিতে সুন্ধর।।
করণ্ডির চারিদ্বার বিষধর অবতার
মৈধ্যে বেদি নাগের মণ্ডল।।
জেখানে রৈব বিসহরি নির্মাইল কোঠা করি
কোঠার মৈর্দ্ধে রচিল মঙ্গল।।[২২]

কবিরা নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন পুরী নির্মাণ, নগর-পত্তন, শিল্পকীর্তির বর্ণনা প্রভৃতি অংশ গুলিতে। দেবতাদের শিল্পসত্ত্বার প্রয়োগে নির্মিত পুরী ছিল মর্ত্যের বাঙালি জাতির বাস্তুভিটে নির্মাণের কৌশল।

জ. নগর পত্তন: পল্লিগ্রামের সমাজব্যবস্থা থেকে মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি। নগর পত্তন অংশে তৎকালীন নগরজীবনের বর্ণনা ধড়া পড়েছে। সেসময় শ্রেণিবৈষম্যের চূড়ান্ত ফলস্বরূপ সমাজের স্তর ভেদে লোকেদের বসবাসের জায়গা ঠিক করা হত। যেমন -

পাইয়া বীরের পান বৈসে যত মুসলমান
দিলেন পশ্চিমদিকে তারে।।
আইলা চড়িয়া তাজি সৈয়দ মৌলনা কাজি
খয়রাতে বীর দেয় বাড়ি। [২৩]

মুকুন্দরামের কাব্যের ন্যায় ভিন্ন কোন কাব্যে এইরূপ নগরবর্ণনার ছবি গড়ে উঠতে পারেনি। এই বর্ণনাগুলি আসলে উঠে এসেছে কবিদের অভিজ্ঞতালব্ধ জীবন থেকে। শুধু মুসলমানেরা নয় ডোমেদের

স্থান হয়েছিল নগরের বাইরে কুঁড়ে ঘড়গুলিতে। নর্তকীদের স্থান হয়েছে নগরের বাইরে।[২৪] এই বর্ণনাগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে নব-প্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবন তৎকালীন বাংলার পল্লী-জীবনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গড়ে উঠেছিল।

ঝ. লোকসাহিত্যের অঙ্গ ধাঁধা: ধাঁধা বা প্রহেলিকা লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। মঙ্গলকাব্যে ব্যবহৃত ধাঁধাতে লৌকিক রসের প্রাচুর্য্য ধরা পড়েছে। কাহিনির বাঁধন আলগা হলে প্রহেলিকার অবতারণায় মঙ্গলকাব্যগুলি সার্থকতার শীর্ষে পৌঁছে দেয়। আদিম সমাজে কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করত, বরপক্ষের লোকেরা সেই ধাঁধার উত্তর দিতে পারলে তবেই কনের গৃহে প্রবেশের অনুমতি পেত। এখানে বাংলার সমাজ ইতিহাস রচনার দৃষ্টান্ত ধরা পড়েছে কাব্যে। এই বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার ছাড়া মঙ্গলকাব্যগুলি সম্পূর্ণতা লাভ করেনি।

ঞ. চৌতিশা: বিপন্ননায়ক কতৃক দেবীর চৌতিশা স্তব অংশটি কাব্যে প্রশংসার দাবি রেখেছে। ‘ক’ থেকে ‘হ’ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনবর্ণকে বাক্যের আদিঅক্ষরে বসিয়ে সাধারণত এই স্তব রচনা করা হয়। এখানে ক্রমান্বয়ে চৌত্রিশটি অক্ষর ব্যবহার করা যায় বলে এইরকম নামকরণ হয়েছে। সবসময় যে চৌতিশার অক্ষর সংখ্যা চৌত্রিশ হবে এমনটা নয়। এই অক্ষর সংখ্যা চৌত্রিশ–এর কম বা বেশি হত। মানিকরাম গাঙ্গুলির *ধর্মমঙ্গলকাব্য*-এর দ্বাদশপালার কথা। যেখানে ক-ক্ষ পর্যন্ত মোট সাতাশটি অক্ষরে দেবতা স্তব বর্ণনা করতে দেখা গেছে –

কএঃ কালরাত্রি কঙ্কালমালিনী।
করালবদনা কালী কর্পরধারিনী।।
খএঃ খ্যাতিরূপা ক্ষিতিধরসুতা ক্ষেমঙ্কারী।
খড়গহস্তা খরতরা ক্ষয়কর ঐরি।।
... ...
হয়েঃ হরিহরপরাণী হের মা নয়নে।
হাতের হত্যার হয়্যা হান লাউসেনে।।
ক্ষয়েঃ ক্ষুধারূপে ক্ষেমঙ্করী ক্ষেম দোষ গুণা।
ক্ষমাময়ী ক্ষান্তিরূপে ক্ষয় কর সেনা।।[২৫]

মূলপুরাণে এই চৌতিশার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ত্রয়োদশ শতকে রচিত *বৃহদ্ধর্ম–পুরাণ* নামক একটি উপপুরাণ পাওয়া যায় যেখানে সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই জাতীয় চৌতিশার লক্ষণ দেখা গেছে।

ট. যুদ্ধবর্ণনা: যুদ্ধবর্ণনা মঙ্গলকাব্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। মনসামঙ্গলকাব্যে এই অংশটি বাদ পড়েছে। বাকি সকল কাব্যে এই অংশের গতানুগতিক অনুকরণের কৃত্রিমতার ছাপ বহন করেছে। এই অংশের মধ্যে দিয়ে বীররসের সঙ্গে বীভৎস রসের সংমিশ্রণ করে পরিবেষণ করা হয়েছে –

বীরবালা দুই ভুজে   বীর কালকেতু যুঝে
পশ্চিম দুয়ারে দেয় হানা ।
রাহুত মাহুত পড়ে   কদলী যেমন ঝড়ে
খর বহে রুধিরের খানা।
...   .
বাণ-বৃষ্টি করে বীর   মেঘে যেন ফেলে নীর
ঘন উঠে রুধিরের ফেনা।।
বীর রাজসেনা হানে   কৌতুকে যোগিনীগণে
গাঁথিয়া পরয়ে মুণ্ডমালা।[২৬]

এই যুদ্ধবর্ণনা অংশে মূলত রামায়ণ ও মহাভারত–এর যুদ্ধ বর্ণনা কৌশলকে অনুকরণ করা হয়েছে।

ঠ. ছলনার প্রসঙ্গ: বাঙালিরা ছোটবেলার স্মৃতি থেকে ভেসে উঠবে চাঁদের মা বুড়ীর কথা। সেইরূপ মঙ্গলকাব্যের দেবীর জরতী বা বৃদ্ধার রূপধারণ করে ছলনা করার দৃষ্টান্ত এখানে পাওয়া যায়। এখনও গ্রামের ঠাকুমা-ঠাকুরদারা তাঁদের নাতি-পুতিদের গল্প শোনানোর সময় তাদের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে শুরু করে 'এক যে ছিল বুড়ী' বাক্যটি দিয়ে। লোককথার অঙ্গনে বুড়ী প্রতীকটি খুবই প্রচলিত একটি চরিত্র। মঙ্গলকাব্যে এই চরিত্রটি বাদ পড়েনি, দেবতারা এই চরিত্রটির আড়ালে নিজেদের দেবত্বকে অতিসহজে লুকিয়ে রেখে, মানবের মাঝে মিশে যেতে পারত। সকল মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে এই চরিত্রটি বেশ গুরুত্বের দাবি রাখে। ডোমনি বেশে শিবকে ছলনার দৃষ্টান্তও ধরা পড়েছে -

ডোমনির সঙ্গে সহলিয়া করে সাধিবারে কাজ।
সেই চণ্ডী রক্ষা কর সুজন সমাজ।।
ঘাটে দাঁড়াইয়া দেবী মনে মনে হাসে।
হাসিতে হাসিতে গেল ডুমনির পাশে।।
...   .
মাঞার পুতলি দেবী নানা মাঞা জানে।
ডোমনিরে সহি বলি ডাক দিয়ে আনে।।
অর্পে (?) দুই জনের প্রিয় বাক্য বলি।
সরযূর কুলে দোহে করে কোলাকুলি।।[২৭]

পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবতাদের শ্বেতমাছি ও শ্বেতকাকের রূপধারণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

ড. শ্মশানবর্ণনা: শ্মশানবর্ণনা করে কবি কাব্যে বীভৎসরসের অবতারণা করেছে। পুরাণের ভঙ্গিমায় এই কাব্যগুলিতে বিভিন্ন উপায়ে কাব্যরসের পরিবেষণ করা হত। যার নমুনা এই শ্মশান বা মশান বর্ণনা।

ঢ. নায়ক-নায়িকার সাজসজ্জা ও রূপবর্ণনা: এখানে নায়িকার রূপবর্ণনায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্নদামঙ্গলকাব্যের হরগৌরির রূপবর্ণনা অংশটি এখানে গুরুত্বের দাবি রাখে -

কি এ নিরুপম   শোভা মনোরম
হর গৌরি এক শরীরে।
শ্বেত পীত কায়   রাঙ্গা দুটি পায়
নিছানি লইয়া মরি রে।।
আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে
আধ পট্টাম্বর সুন্দর সাজে।[২৮]

মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুসরণ করে পরবর্তীতে রাজসভার কবিরা তাঁদের কাব্য রচনায় এই বৈশিষ্টটিকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, যেমন - আলাউলের *পদ্মাবতকাব্য*[২৯]।

ণ. মঙ্গলকাব্যের ছন্দ: মৌখিক প্রচলিত গীতকাহিনি থেকে মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি হলেও, মঙ্গলকাব্যে সর্বত্র ছড়ারছন্দ অনুসরণ করা হয় না। এই কাব্যগুলিতে ব্যাপকভাবে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হত। অক্ষরবৃত্ত পয়ারছন্দকে মধ্যযুগে পাঁচালীরছন্দ বলা হয়। মঙ্গলকাব্যে লিখিত রূপলাভের পূর্বে এই নতুন ছন্দরীতির ব্যবহার হয়নি। মূলত মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রচলন ছিল। পয়ার ছন্দের পরে এই কাব্যের মধ্যে ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছিল। ত্রিপদী ছন্দের আবার দুটি ভাগ রয়েছে, লঘুত্রিপদী আর দীর্ঘত্রিপদী। লঘুত্রিপদী ছন্দের মাত্রা ছিল ৬+৬+৮, অন্যদিকে দীর্ঘত্রিপদীর মাত্রা ছিল ৮+৮+১০। এই ত্রিপদী ছন্দের নাম আবার কোন কবি 'লাচারী' বলে চিহ্নিত করেছেন। ভারতচন্দ্র এই ছন্দের মাধুর্য্য আরও বাড়িয়ে তুলেছিলেন। যেমন - ভারতচন্দ্রের লঘু ত্রিপদী

উর মহামায়া   দেহ পদছায়া
ভারতের স্তুতি লয়ে।
কৃষ্ণচন্দ্র বাসে   থাক সদা হাসে
রাজলক্ষ্মী স্থিরা হয়ে।।[৩০]

দীর্ঘ দিপদী,

শ্বেত বর্ণ শ্বেত বাস   শ্বেত বীণা শ্বেত হাস
শ্বেতসরসিজনিবাসিনী।।
বেদ বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র   বেণু বীণা আদি যন্ত্র
নৃত্য গীত বাদ্যের ঈশ্বরী।[৩১]

মঙ্গলকাব্যে ব্যবহৃত পয়ার ছন্দকে দ্বিপদী নামে চিহ্নিত করা যায়।

ত. ধুয়া বা ধ্রুবপদের ব্যবহার: মঙ্গলগানে একঘেয়েমি দূর করতে গানের মধ্যে দোহারদের সুরে ধুয়া গাওয়ার রীতি প্রচলন রয়েছে। মূল কাহিনির বিষয়বস্তুর সঙ্গে এই ধুয়া পদগুলির মিল থাকে না। পদগুলি গায়েন ও দোহার[৩২]-রা নিজেদের প্রয়োজন মতো আসরে বসে সুর দান করে। *অন্নদামঙ্গল*-এর কবি ভারতচন্দ্র এই ধুয়াপদ সৃষ্টিতে চরম উৎকর্ষতা দান করেছিলেন।

থ. নারীদের পতিনিন্দা: মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিবাহ অংশে যেসকল সামাজিক আচারপদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির মধ্যে বিবাহের আচারগুলির মধ্যে নারীদের পতিনিন্দা অংশটি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। যেখানে তাঁরা নিজস্বামীর নিন্দা করে সাময়িক তৃপ্তি লাভ করে। বিবাহসভায় নারীরা নায়ককে বরের বেশে দেখে নিজের পতির সঙ্গে তুলনা করে নিজপতির মন্দকথা সভাস্থলে তুলে ধরে। যা কাব্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করে। গৌরীর বিবাহস্থলে শিবের রূপে মুগ্ধনারীরা শিবের সঙ্গে নিজস্বামীর তুলনা করে বলে –

সবে বলে গৌরীর বর মিলাছে ভাল।
মদনমোহন রূপে ঘর কর্য়াছে আল্যি।।
একযুবতী বলে সই মোর গোদা পতি।
কোঁয়া-জ্বরের ঔষধ সদা পাব কতি।।
ভাদ্র মাসের পাঁকুই বড়ই দুর্ব্বার।
গোদে তৈল দিতে কত তুলিব ন্যাকার।।
আর যুবতী বলে পতির বর্জ্জিত দশন।
শাক-সূপ-ঘণ্ট বিনে না করে ভোজন।[৩৩]

বাঙালি পরিবারের চিত্র এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই অংশের সঙ্গে কালিদাসের *কুমারসম্ভব* কাব্যের সপ্তমসর্গের মিল রয়েছে। যেখানে মহাদেবকে বরবেশে দেখে পুরনারীগণ নিজেদের স্বামী দুর্ভাগ্যের কথা মনে করেছে।

দ. নারীর সতীত্বের পরীক্ষা: প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যে নারীরসতীত্বের একটি অংশ উল্লেখ করা হয়েছে। অংশটি পুরাণ অনুকরণজাত (রামায়ণ) হলে এখানে *রামায়ণ*-এর মতো নায়িকার অগ্নিপরীক্ষা নেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় না। এখানে নায়িকার নানাবিধ পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার কথা জানা যায়। যেমন – মনসামঙ্গলকাব্যে বেহুলাকে বিভিন্ন সময়ে নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে -

হেনকালে চাদবন্যা কহে আর কথা। যদি সে তোমার কন্যা হয় পতিব্রতা।।
লোহার কলাই দিবে করিয়া রন্ধন। সেই কন্যা বিভা করে আমার নন্দন।।

...   .

মাএরে প্রবোধ দেই বেহুলা সুন্দরী। বার মাসে বার ব্রত অমাবস্যা ক্রি।।
আঁও হাড়ি আঁও সরা আড়াই হালা বেণা। আনিঞা আমার তরে দেহ একজনা।।
যদি আমার মন থাকে মনসার পায়। লোহার কলাই সিজে কত বড় দায়।।[৩৪]

একদিকে মৃতস্বামীকে কোলে করে যৌবনবতী রমণী কলারভেলায় চেপে গৃহত্যাগ করেছে। নিজসতীত্বের ওপর ভরসা করে স্বামীকে জীবিত করে আনবে বলে। অন্যদিকে আর একদল রমণী নিজস্বামীদের ছোটোখাটো দোষ ত্রুটির কথা উল্লেখ করে তাদের প্রতি ধিক্কার জানিয়েছে। যেখানে পাতিব্রত্যকে পদদলিত করার দৃশ্য স্পষ্ট হয়েছে। বাঙালি নারীর পতিব্রতার বৈশিষ্টকে এখানে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে।

ধ. দাম্পত্যকলহ: দাম্পত্যকলহ যা সমস্ত সংসারে অতিপ্রাচীন রূপ। বাঙালি কবিরা তাঁদের বর্ণনায় এই নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়কে অতিযত্নসহকারে কাব্যে স্থান দিয়েছেন। সেসময়ে কুলীনপ্রথার ফলে বৃদ্ধস্বামীর হাতে কুলীন যুবতী মেয়েদের যেসকল অত্যাচার সহ্য করতে হত। সেই ছবি এখানে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। এই ছবি আরও পরিষ্কার হয় হর-গৌরীর দাম্পত্যজীবনের দিকে তাকালে -

কেবা এমন ঘরে থাকিবে। জয়া।
এ দুঃখ সহিতে কেবা পারে।।
আপনি মাখেন ছাই   আমারে কহেন তাই
কেবা সে বালাই ছাই মাখিবে।
দামাল ছাবাল দুটি   অন্ন চাহে ভূমে লুটি
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখে।।
বিষপানে নাহি লয়   কথা কৈতে ভয় হয়
উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে।[৩৫]

ন. শিব উপ্যাখ্যানের উপস্থিতি: মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবতা শিবকে ব্যবহার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। কবিরা দেবতা শিবকে মানব চরিত্রের ন্যায় দোষগুণ দিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছে। শিব নিজ কন্যা মনসাকে প্রেম নিবেদন করে বলেছে –

দেখিয়া তোমার ঠান   কামে মহেশ্বর বান
মদনবাণেতে তনু জর জর
ধরিতে নবম প্রাণ।
তুমি কুমারী সতী   অবশ্য চাহি তোমার পতি
তুমি রূপবতী আমি গুণবান
যে লয়ে তোমার মতি।।[৩৬]

কবিরা শিবকে দিয়ে বিবাহ বাসরের হাস্যরসকে আরও সহজ সরল করে শ্রোতার সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

প. সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা: এই অংশটি মঙ্গলকাব্যের মধ্যে বেশ গুরুত্বের দাবী রাখে। এই অংশটি পৌরাণিক প্রভাবজাত হলে এখানে বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন রয়েছে স্পষ্ট –

মহতের পুত্র হৈল নাম অহংকার।
যাহা হইতে হৈল সৃষ্টি সকল সংসার।।
অহংকার হইতে হৈল এই পঞ্চজন।
পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন।।
এই পঞ্চ জনে লোকে বলে পঞ্চভূত।
ইহা হইতে প্রাণীবৃন্দ হইল বহুত।।[৩৭]

এই অংশে প্রথমে দেবতা সৃষ্টিরবর্ণনা করা হয়। শেষে মানব সৃষ্টিরবর্ণনা করে মূল গীতের দিকে কবিদের যাত্রা শুরু হয়।

ফ. মঙ্গলকাব্যের নামকরণ বৈশিষ্ট্য: মঙ্গলকাব্যের নামকরণ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় যেকয়টি রাগ-রাগিণীর উল্লেখ পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একটি রাগ হল মঙ্গলরাগ। ব্যাপক অর্থে দেব-মহিমা প্রচারমূলক গীতগুলি 'মঙ্গল' রাগে গীত হত বলে সম্ভবত এই কাব্যগুলি মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিতি পেয়েছিল। দ্রাবিড়ভাষায় মঙ্গল শব্দের অর্থ হল 'বিবাহ'। বিবাহ আসরগুলিতে পূর্বে কিছু গীতের প্রাধান্য দেখা গেছে যা মূলত মঙ্গল রাগে গাওয়া হত। সেই ভাবনা থেকে মানুষ পরে দেবতা বন্দনার গীতকে এইরূপ শব্দবন্ধ দ্বারা বাঁধতে চেয়েছেন। এই গান মূলত এক মঙ্গলবারে শুরু হয়ে, পরের সপ্তাহের মঙ্গলবারে শেষ হত তাই এইরকম নামকরণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই গান শ্রবণেও মঙ্গল হয়। এই ভাবনা থেকে এইরূপ নামকরণ হতে পারে বলে অনুমান করা যায়। সেইযুগে 'মঙ্গল' শব্দটি সম্ভবত লৌকিক কল্যাণসাধনের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হত। সবসময়ে কবিরা এইরূপ নামকরণে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মঙ্গল শব্দটি ব্যবহার করেছেন এমনটা নয়। কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে যেমন - শিবমঙ্গলকাব্যের ধারার প্রথম দিকের কবি রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র তাঁর কাব্যের নাম 'শিবের মঙ্গল' রেখেছিলেন। পরবর্তী কবি রামেশ্বরের কাব্যের নাম দিয়েছেন 'শিব সঙ্কীর্তন'। সমাজের অন্যশ্রেণির দেবতাকে ঘিরে রচিতগ্রন্থের নামের সঙ্গে মঙ্গল শব্দটি ধীরে ধীরে যুক্ত হয়েছে, যেমন - কৃষ্ণমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি।

ব. গর্ভবর্ণনা: গর্ভবর্ণনাতে কবিরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তারা গর্ভধারণের প্রথমমাস থেকে শুরু করে নায়ক-নায়িকার জন্ম পর্যন্ত সকল মাসের গর্ভধারিণীর সকল লক্ষণের কথা অতিনিপুণতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন -

প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।
দুই মাস যত লোকে করে কানাকানি।।
তিন মাসে করে রামা ভূতলে শয়ন।
চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকা ভক্ষণ।।
পাঁচ মাসে নিদয়ার না রুচে ওদন।
ছয়মাসে নাহি চলে অবশ চরণ।।[৩৮]

এইভাবে দশমাস পর্যন্ত গর্ভের বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে।

ভ. জাতকর্ম ও সংস্কার: মঙ্গলকাব্যগুলিতে লৌকিক ভাবনার অহরহ প্রকাশের ফলে এখানে লৌকিক সংস্কার ও কুসংস্কারগুলি উঠে এসেছে বিশদে। সেসময়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের পারদর্শিতার কথা উঠে এসেছে। সেসময়ে শিশুজন্মের সঙ্গে কিছু জাতকর্ম করার রীতি ছিল -

স্নান করাইয়া জলে   মাঠুর মাথায়ে তৈল ডালে
জয় ধ্বনি দিল সর্ব্বজন।
দেখিয়া পুত্রের মুখ   সোনকার বড় সুখ
বাজে সব বিবিধ বাজন।।[৩৯]

শিশুর জন্মের ছয়দিনে করা হত ষষ্ঠীপূজা। সাতদিনে শাস্ত্রের মতে বিভিন্ন সংস্কার পালনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ম. সাধভক্ষণ: মঙ্গলকাব্যের কবিরা সাধ খাওয়ানোর অংশে বেশদক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। গর্ভধারণ থেকে শুরু করে নারীর যে শারীরিক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু হয়। খাওয়া দাওয়ার প্রতি অযত্ন ও অরুচি থাকে নারীদের। সাধ খাওয়ানোর দৃশ্যে, কবিরা গর্ভবতী রমণীর কষ্টকে লাঘব করতে চেয়েছে –

দেখিয়া গর্ভের ভর   মনে বড় লাগে ডর
ক্ষুধাতৃষ্ণা নাহি দিন দশ।।
আপনার মত পাই   তবে গ্রাস কত খাই
পোড়া মাছে জমিরের রস।।
নিধানী করিয়া খাই   তাহাতে মহিষা দই
কুল করঞ্জা প্রাণ হেন বাসি।।[৪০]

এই অংশে খাওয়ার যে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে বাঙালি নারীর রন্ধন পটুয়সীতার দিককে সমাজের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।

য. সমুদ্রপথের বর্ণনা: এটি মঙ্গলকাব্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ভারতীয় সমুদ্র উপকূলবর্তী বাণিজ্যপথের বর্ণনা করা হয়েছে। এই অংশে থাকে কালিদহ নামক সামুদ্রিক মরীচিকার কথা। যেখানে বাণিজ্য পথযাত্রীর জীবনে নেমে আসে ট্রাজেডি। প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে এই পথে চলতে হয় সমুদ্র পথযাত্রীকে। এই অংশে আসে মাঝি-মাল্লাদের খেদোক্তি -

মাথে হাথ দিয়া কান্দে যতেক বাঙ্গাল। সকলি বুড়িল জলে হইনু কাঙ্গাল।।
পোস্ত-হোলা ভাস্যা গেল, ছাকনার কানি। আর বাঙ্গাল বলে গেল ছিঁড়া কাথাখানি।।
ধুলায় লোট্যায় কান্দি আর বাঙ্গাল বলে। সাত গাঠ্যা টেনাখানি ভাস্যা গেলা জলে।।
আর বাঙ্গাল বলে ভাই অই তাপে মরি। এমন বসন নাই উভ কর‍্যা পরি।।[৪১]

এই অংশে মানুষের দুর্দশার কথা বর্ণনা করা হয়েছে হাস্যকৌতুকের মধ্যে দিয়ে। জায়গা বিশেষে মাঝিদের নৌকা পরিচালনার পারদর্শিতার দিকটি এখানে স্পষ্ট করা হয়েছে।

র. আত্মপরিচয় বর্ণন: প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের এই অংশটি বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। এই অংশে কবি তাঁর বাসস্থান, নিজের পিতৃ ও পিতৃকুলের পরিচয়, মাতা ও মাতামহের পরিচয় দান করেছেন। এই অংশে কবিকে দেব-দেবীর স্বপ্নাদেশের কথা বিস্তৃতাকারে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে –

শিরোদেশে বসে এক এক ব্রাহ্মণ সন্তান।
প্রবোধ করেন মোরে কহিএ পুরাণ।।
নিয়ত খণ্ডিতে নারে হরিহর ধাতা।
মা বাপ লইএ ঘর কে কর‍্যাচে কোথা।।
শরণ পঞ্জর ধর্ম সভাকার গতি।
মঙ্গল হবেক রাখ তার প্রতি মতি।।
ভট্টাচার্যে কহিএ ভবনে চল ঝাট।।
স্বপ্ন দেখে সবিস্ময় সুখ নাঞি মনে।[৪২]

ল. গ্রন্থোৎপত্তির কারণ: মুখবন্ধরূপে বা কাব্যশেষে সমকালীন রাজা ও রাজার শাসনব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া থাকে। এই অংশটি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ফিরে দেখার সুযোগ করে দেয়। ‘মনসার জন্মপালা’ অংশে কবি বিজয়গুপ্ত কৌশলে তাঁর কাব্যকাল উল্লেখ করেছেন এইভাবে –

ঋতু [শ] শী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতা [ন] হুসন রাজা পৃথিবীপালক।।[৪৩]

গবেষকেরা কাব্যগুলি উদ্ধার করতে পারলেও সময়কালের অংশটি অনেকাংশেই হয়ে গেছে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

ব. নির্ঘণ্ট রচনা: মঙ্গলকাব্যের এই অঙ্গটি সেই সময়কালকে চিহ্নিতকরণে গুরুত্ব রাখে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারার মাধ্যমে কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে বাংলার সমাজ, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, প্রাকৃতিক সম্পদগুলির বর্ণনা জুড়ে দেওয়াতে কাব্যসৌন্দর্য নষ্ট হয়নি বরং কাব্যসৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। গল্পসজ্জায়

লেখকদের মৌলিকতা ও শিল্পসৌন্দর্য ধড়া পড়েছে। বাংলার মাঠ-ঘাট, নদী-নালার, মানুষের দৈনন্দিন ক্রিয়াক্রমের ছবিকে নিপুণতার সহিত সাহিত্যের আকারে তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে এই ধারার কবিদের স্বদেশপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, প্রকৃতি প্রেমের পরিচয় পাওয়া গেছে। মঙ্গলকাব্যের কবিদের দক্ষতার কাছে পৌরাণিক ও অপৌরাণিকের ভেদাভেদ গেছে মুছে। এইখানে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ চূড়ান্ত সার্থক হয়ে উঠেছেন।

১. ২) বৌদ্ধধর্মের পরিচিতি

ঈশ্বর ও পরকালের বিশ্বাস এই নিয়ে মানবধর্মের ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্য-খৃষ্টান-ইসলাম এই তিন ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই যুক্তি প্রযোজ্য। বুদ্ধ সমকালে বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরতত্ত্বের যে ধারণা পাওয়া যায়, সেগুলি আজকের বৌদ্ধধর্মের থেকে কিছুটা সরে এসেছে। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর প্রকাশ্যসভায় মানবকে উপদেশ দিয়েছিলেন – দুঃখতত্ত্ব বা চতুরার্য সত্যের মধ্যে দিয়ে।[৪৪] যেখানে তিনি মানবের দুঃখের কারণগুলি ব্যাখ্যা করেছেন - অর্থাৎ দুঃখ কি? দুঃখ কেন আসে প্রভৃতি। বুদ্ধ নিজে প্রথমে কঠোর তপস্যা করে সফল হয়। নিজে প্রথমে দুঃখমুক্তির বাণী উপলব্ধি করেন। পরে সেগুলি পৃথিবীবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে। এই মহামানব অবিদ্যাজনিত জড়া-মরণ থেকে মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। মানুষের জীবনে দুঃখ অনিবার্য কিন্তু এই দুঃখের বিনাশও সম্ভব। চার আর্য্যসত্য ছাড়া প্রতীত্যসমুৎবাদ[৪৫] এবং পঞ্চস্কন্ধ[৪৬] মূলত এই তিনটি মৌলিক তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে মানবদুঃখের কারণ খুঁজতে চেয়েছিলেন। সকল মুক্তির কথা লিখিত হয়েছে তাঁর ‘অষ্টাঙ্গিক আর্য্যমার্গ’[৪৭] নামক সূত্রাবলীতে। এই অংশে তিনি ঈশ্বর নিয়ে বিস্তৃতভাবে কোন বর্ণনা করেননি। তিনি পার্থিব জগৎ থেকে মুক্তিলাভের দিককে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভাবার চেষ্টা করেছেন। ধর্মচক্র, পরিনির্ব্বাণ বিষয়ক সহস্র উপদেশ এখানে রয়েছে। ব্রহ্ম বিষয়ক তেমন কোন আলোচনা এখানে করা হয়নি। সংঘের নিয়মাবলী এখানে নির্ধারন করা হয়েছে।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে ভারতীয় উপমহাদেশসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল। তার জীবিত কালে বৌদ্ধধর্ম ততটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। সমসাময়িক ভারতবর্ষে ষোড়শ মহাজনপদ[৪৮]–এ বিভক্ত ছিল। সেখানে ‘বঙ্গ’ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভগবান বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যেও কোন বাঙালি শিষ্যের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণ অনুমান

করেছেন – খ্রিস্টপরবর্তী ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী সময়কাল পর্যন্ত বাংলাদেশ গৌড়, বঙ্গ, বজ্জ, তাম্রলিপ্ত, সমতট প্রভৃতি নামে ভিন্ন ভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। পাল ও সেন আমলে এই বিভাজন কিছুটা মুছে গিয়েছিল। গৌতমবুদ্ধের মহাপরিনির্বানের পর থেকে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি কিছুটা বৃদ্ধি লাভ করেছিল বলে অনুমান করা যায়। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যেগুলিতে আজও এই স্মৃতি বহন করে চলেছে। তেলপত্ত জাতক[৪৯] যেখানে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের শতপুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। এই জাতকে তক্ষশিলার নাম পাওয়া যায়। গৌতমবুদ্ধ সুম্ভের অন্তর্গত দেসক শহরে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। অঙ্গুত্তরনিকায়[৫০]-এ যেখানে গৌতমবুদ্ধ শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব ছাড়া আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। যেমন – প্রাচীন ভারতের দণ্ডবিধি, সমাজব্যবস্থা ও প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে প্রথম বঙ্গন্তপুত্ত নামে একজন বৌদ্ধ আচার্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই আচার্যকে ঘিরে কিছু সংশয় দেখা গেছে কেননা তিনি আসলে বঙ্গসন্তান কিনা সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বুদ্ধ তাঁর আশি বছর জীবনের মধ্যে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি কোথায় কতদিন অবস্থান করেছিলেন সেকথা লিখিত রয়েছে তাঁর শিষ্য আনন্দ সারিপুত্ত ও অন্যান্য শিষ্যদের বর্ণনায়। গৌতমবুদ্ধ জীবিত অবস্থায় তাঁর ভিক্ষুসঙ্ঘে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। তাঁর পরিনির্ব্বানের পর এই বিশৃঙখলা আরও চরম আকার ধারণ করেছিল। যেগুলি দূর করতে রাজগৃহে প্রথম মহাসভা[৫১] (খ্রিস্টপূর্ব ৪০০) সংঘটিত হয়। এরপর কয়েকশো বছরের মধ্যে আরও দুটি মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। যথা - দ্বিতীয় মহাসভা[৫২] (খ্রিস্টপূর্ব ৩০৪-৩০২) বৈশালীতে ও তৃতীয় মহাসভা[৫৩] (খ্রিস্টপূর্ব ২৪৭)। চুল্লবগ্গ মহাবংস ও দীপবংস প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলিতে এই অনুষ্ঠানগুলির বিবরণ পাওয়া গেছে। মৌর্যসম্রাট অশোকের সহযোগিতায় তৃতীয়মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই মহাসভার বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় পাটলিপুত্র নগরের বিবরণ। এই মহাসভাগুলিতে বিভিন্ন রাজ্যের ভিক্ষুগণ যোগদান করলেও বঙ্গদেশে থেকে আগত কোন ভিক্ষুর উপস্থিতির কথা আলাদা করে জানা যায় না। এই ধর্মীয় মহাসভার পর থেকে থেরবাদী মতাদর্শ ভারতবর্ষে গুরুত্ব হারাতে থাকে। রাজা অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্মের মৈত্রীর বাণী ভারতবর্ষসহ বহির্ভারতকে সঞ্জীবিত করেছিল।

> খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধ সাহিত্যে ও স্থাপত্যে এমন বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে যাহা দ্বারা অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণ তে বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করিয়াছে এবং ভারতব্যাপী বৌদ্ধ চিন্তানায়কগণও বঙ্গদেশ সম্বন্ধে আর অনবহিত নহেন।[৫৪]

নাগার্জুনীকোণ্ডা শিলালেখ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতক নাগাদ খোদিত ভাবে বঙ্গের নাম পাওয়া গিয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর বেশ কিছু নিদর্শন বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের কথা প্রমাণ করে। তবে এই ক্ষেত্রে নলিনীনাথ দাশগুপ্তের বক্তব্য গুরুত্ব রাখে –

> খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দ্বাদশজন মহাস্থবির অক্ষয়কীর্তি ও চারিত্রিক ঔদার্যের জন্য সমস্ত বৌদ্ধ জগতে পূজা পাইয়াছিলেন। সেইদিন 'কালিক' নামে একজন বাঙালীও এই স্থবিরমণ্ডলীর অন্তর্গত ছিলেন।[৫৫]

এরপর চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠান হলেও বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার লোপ পায় না। গুপ্তরাজারা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হলেও ছিলেন উদার মনোভাবাপন্ন। তারা অন্যের ধর্ম পালনে হস্তক্ষেপ করেননি। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং (৬৩৫-৬৯৫ খ্রিস্টপূর্ব) জানিয়েছেন মহারাজা শ্রীগুপ্ত চীনদেশীয় শ্রমণদের জন্য একটি মৃগস্থাপন স্তূপের কাছে একটি চীনামন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার প্রমান এখনও বর্তমান রয়েছে। গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (৩৩৭-৪২২ খ্রিস্টপূর্ব) ভারতে আসে। যিনি দুই বৎসর কাল ধরে তাম্রলিপ্ত বন্দরে বৌদ্ধচিত্র, মূর্তি সংকলনে ব্যাপৃত ছিলেন সমগ্র আর্যাবর্ত পরিদর্শনের মধ্যে দিয়ে। এই যুগের আবহাওয়া এতটাই অনুকূল পরিস্থিতির বার্তা এনেছিল যে – ধর্ম, দর্শন, কাব্য, নাটক, জ্যোতিষ, গণিত, স্থাপত্য ও চিত্রকলা সমগ্র দিক থেকে ভারতের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হতে থাকে। সেই সঙ্গে ভারতের নাম ইতিহাসের পাতায় এক নবঅধ্যায়ের সূচনা করে।

বৌদ্ধধর্মের মূলকথা কী ? এই নিয়ে যেমন বহুবার বিবিধ প্রশ্ন উঠে এসেছে। তেমনি বিবিধ উত্তর ও পাওয়া গেছে। এই প্রশ্নের আসল উত্তর খুঁজতে গেলে *সুত্তপিটক* নামক গ্রন্থের সাহায্য নিতে হবে। বুদ্ধ তার ধর্মপ্রচারে বেশি মনোযোগী ছিলেন তাই নিজে কিছু লিখে রাখার কথা হয়ত ভাবেননি। তাঁর মৃত্যুর পর তার মুখ নিঃসৃত বাণী বলে এই সূক্তগ্রন্থটি বেশ খ্যাতি পায়। যেখানে রয়েছে ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত কিছু উপদেশ। তাঁর উপদেশাবলীতে তিনি বাস্তব জীবনসমস্যার দিকে বেশি নজর দিয়েছিলেন। মানুষের দুঃখ পরিত্রাণ যদি কোন ধর্মের মূলকথা হয়, সেখানে মানুষ আকৃষ্ট হবে এটা স্বাভাবিক। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও এই ধর্মেরপ্রভাব পড়েছিল সেই খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী থেকে। সম্রাট অশোক (২৬৮-২৩২ খ্রিস্টপূর্ব) বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর থেকে দ্রুততার সহিত

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হতে থাকে। সম্রাট অশোক এই ধর্মকে দেশের অভ্যন্তরে ও পৃথিবীর অন্য প্রান্তে থাকা দেশগুলিতে প্রচারের ব্যবস্থা করে। নিজ পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে সিংহলে ধর্মপ্রচারে প্রেরণ করে। অন্য দেশগুলিতে লোক প্রেরণ করে ধর্ম প্রচার করেন। জানা যায় সম্রাট অশোক সমগ্র আর্যাবর্তের একাধিপতি ছিলেন। গুর্জর থেকে উৎকল পর্য্যন্ত আসমুদ্র ভারতবর্ষের গিরিকন্দরে, প্রস্তরস্তম্ভে ও পর্বতশৈলে বৌদ্ধধর্মের উপদেশ বাণী প্রচার করেছিলেন। তিনি জীবহিংসা নিবারণ করেছিলেন। সুবিস্তৃত রাজ্যের মধ্যে মনুষ্য-পালিত পশুর জন্য ঔষধ ও পথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। অশোকের প্রস্তর-খোদিত অনুশাসন থেকে জানা যায় - তিনি সিরিয়া, মিশর, মাসিডন, সাইরিনী ও ইপাইরস দেশের গ্রীক রাজাদের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। সেই দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে প্রচারক প্রেরণ করেছিলেন। অশোকের ধর্ম প্রচারকগণ সিরিয়া ও পালেস্টিন দেশে এই ধর্মনীতি প্রচার করেছিলেন। পরবর্তীকালে মৌর্য্যবংশ ও চন্দ্রগুপ্তের (৩২৪-২৯৭ খ্রিস্টপূর্ব) সময় থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পথপ্রশস্ত হয়েছিল। গুপ্ত রাজারা (৩২০-৫০০ খ্রিস্টাব্দ) বৌদ্ধদের ভূমিদান করেছিল একথা জানা যায়। বিক্রমাদিত্যের (১০৫-১০১০ খ্রিস্টপূর্ব) সময়কাল শুরু হয়, যেখানে হিন্দু ধর্মের উত্থানের পথ প্রশস্ত হয়। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান এই সময়কে হিন্দু ইতিহাসের পঞ্চমযুগ বা পৌরাণিক যুগ বলা যায়। ৫০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ মুসলমানর কর্তৃক আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার পর্যন্ত এই যুগের ব্যাপ্তিকাল স্থায়ী হয়েছিল। মূলত বৌদ্ধধর্ম খ্রিস্টপূর্ব ২৪২ থেকে খ্রিস্টপরবর্তী ৫০০ এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলার ইতিহাসে দার্শনিক যুগ[৫৬] ১০০০–২০০ খ্রিস্টপূর্ব সময়কালকে ধরা হয়েছে। এই সময়কালের মধ্যে ঘটে গেছে বৌদ্ধদেরপ্রধান তিনটি মহাসভা। সপ্তম শতকের রাজা হয়েছিলেন শিলাদিত্য যেখানে বৌদ্ধদের নির্যাতনের দৃষ্টান্তের কথা তেমন কিছু জানা যায় না। তাদের রাজ সভাসদরাও বৌদ্ধধর্মাবলী ছিলেন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ তাঁর সময়ে ভারতে এসছিলেন। সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে ভারতীয় সমাজ থেকে অবলুপ্তির দিকে ঢলে পড়েছিল। ৭৫০-৯৫০ খ্রিস্টাব্দ এই সময়ে অবলুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্মের প্রতি নেমে আসে কঠোর অত্যাচারের প্রতিচ্ছবি। প্রাচীন রাজবংশগুলির অধঃপতন, রাজপুতদের প্রাদুর্ভাব এবং সপ্তমশতকের শেষের দিকে শংকরাচার্যের সময়কাল থেকে বৌদ্ধনির্যাতন শুরু হয়েছিল। এই ধর্মে প্রথমদিকে মূর্তিপূজার উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা গৃহ ছেড়ে গৌতমবুদ্ধের সঙ্গে

সংঘে বসবাস করতে শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই সংঘে ভাঙন লাগে। আঠারোটি উপশাখায় বৌদ্ধমত বিভক্ত হয়ে যায়।[৫৭]এরপর বুদ্ধের মৃত্যুর একশো বছরের মধ্যে এই ধর্মের রূপ আরও পাল্টে যায় -

> কথাবথূ নামক প্রাচীন ইতিহাসে আছে যে, খ্রী: পূ: ৩য় শতকের মধ্যেই বৌদ্ধসঙ্ঘে রীতিমত মতভেদ হইয়াছিল।বুদ্ধের মৃত্যুর শতবর্ষ পরে বৈশালীতে যে অধিবেশন আহূত হয়, তাহাতে স্থবিরগণ ১০,০০০বর্জন ভিক্ষুকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত করেন।[৫৮]

সংঘবর্জিত ভিক্ষুরা পরে মহাসাঙ্ঘিক নামে নতুন দল তৈরি করে। মহাসাঙ্ঘিকদের উদারনীতি, পূজা, দান, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি ধারণাগুলি মানুষকে বেশি আকৃষ্ট করতে থাকে। ফলে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলি ধীরে ধীরে মহাসাঙ্ঘিকদের দলে এসে ভিড়তে থাকে। মহাসাঙ্ঘিকদের দল ভারী হতে থাকে। তারা অন্যদের আদর্শ বা নীতিকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করতে থাকে। তারা স্থবিরবাদীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবধারায় দীক্ষিত হতে থাকে। স্থবিরবাদীরা বৌদ্ধধর্মের পুরোনো ভাবধারাকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করে। বৌদ্ধরা এই মতের দ্বিবিধতাকে এড়াতে প্রধান দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। এই নতুন দল দুটির নাম হয়ে যায় –হীনযান বা থেরবাদ[৫৯] ও মহাযান বা স্থবিরবাদ[৬০]। এই দুই দলের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। হীনযানীরা বুদ্ধের আদর্শ ও নীতিকে সামনে রেখে এগোতে চায়। মহাযানীরা সেকথা না মেনে বুদ্ধকে লোকোত্তর বলে প্রচার করতে থাকে। গৌতমবুদ্ধের সঙ্গে অলৌকিকতার যোগ স্থাপন করে। এই বিভাজনের কিছুকাল পরে হীনযান বৈভাষিক[৬১] ও সৌত্রান্ত্রিক[৬২] নামে দুটি প্রধান উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। এইভাবে ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম মূল মতাদর্শ থেকে সরে গিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছাতে থাকে।

পরবর্তী সময়ে মহাযানশাখার মধ্যে দেখা যায় মতানৈক্য। মহাযানশাখা দুটি দলে ভাগ হয়ে যায় – মাধ্যমিক[৬৩] ও যোগাচার[৬৪]। মাধ্যমিক মত পরে শূন্যবাদ[৬৫] নাম ধারণ করে। তাঁদের মতে বস্তু, চৈতন্য সবই শূন্য। যোগাচারবাদীরা প্রচার করতে থাকে 'সর্বং বুদ্ধিময়ং জগৎ' নতুবা বিশ্বশূন্য। যোগাচারবাদীরা প্রচার করতে থাকে জগতের সর্বস্থানে বুদ্ধের উপস্থিতি রয়েছে। সপ্তমশতক পর্যন্ত এই দুইশাখা জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ও অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার ফলে অষ্টমশতক নাগাদ এই মতগুলি নিজের জায়গা হারাতে থাকে। বৌদ্ধধর্মের ভাবধারাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা যায়। হিন্দু পুরাণেরন্যায় এখানে জন্ম নিয়েছে বৌদ্ধ দেবদেবী। হিন্দু তান্ত্রিক মতে কৌলধর্ম, শৈবধর্ম ও নাথধর্ম এই সকল ধর্মগুলি বৌদ্ধধর্মের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

বৌদ্ধ বিদ্যায়তনে শুরু হয়ে যায় বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার আচরণ। যা পরিচিতি পায় মন্ত্রযান নামে। এই মন্ত্রযানের মধ্যে অবস্থান করে – কালচক্রযান[৬৬], বজ্রযান[৬৭] ও সহজযান[৬৮]। বজ্রযান ও কালচক্রযান - এর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। বজ্র শব্দের অর্থ বৌদ্ধতান্ত্রিক মতে হয়ে যাচ্ছে শূন্যতা। বজ্রকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধদেবদেবীর নামকরণ হয়েছে - বজ্রধাতেশ্বরী, বজ্রেশ্বরী, বজ্রসারদা প্রভৃতি। বজ্রযানের শেষ পরিণতি সহজযান। সহজযানের পর বৌদ্ধধর্মের ভিন্ন কোন পরিবর্তিত রূপের কথা জানা যায় না। এইখানে বৌদ্ধধর্মের শেষ বলে ধরে নিতে হয়।

সপ্তমশতক পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের দুটি শাখা জনপ্রিয়তা পেলেও অষ্টমশতক নাগাদ পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ও অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার ফলে এই মতগুলি নিজের জায়গা হারাতে থাকে। বৌদ্ধধর্মের ভাবধারাতে যুগান্তরকারী পরিবর্তন ফুটে ওঠে। হিন্দু পুরাণের ন্যায় এখানে আবির্ভূত হয় বৌদ্ধ দেবদেবী। হিন্দু তান্ত্রিকমত, কৌলধর্ম, শৈবধর্ম ও নাথধর্ম। এই সকল ধর্মগুলি বৌদ্ধধর্মের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। বৌদ্ধবিদ্যায়তনে শুরু হয় বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার-আচরণ। বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম হল প্রজ্ঞাপারমিতা[৬৯]। ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী রয়েছে বলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস। তুর্কী আক্রমণের ফলে বৌদ্ধযুগে সাহিত্যের নিদর্শন বেশিরভাগ অংশ চলে গেছে ধ্বংসের কবলে। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সহজযানীদের হাতে রচিত গ্রন্থ হল চর্যাপদ। এই গ্রন্থের সময়কাল ও লেখকদের কথা সম্পর্কে জানা যায় –

> ঠিক কোন সময়ে বৌদ্ধধর্ম এই বিভিন্ন যানে বিভক্ত হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন তবে পাল যুগের বাঙালাদেশের মননশীলতা ওধর্মীয় জীবন বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান প্রভৃতি দ্বারাই নিঃসন্দেহে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। এই যুগেই কাহ্ন, সরহ, লুই, তিলোপাদ প্রভৃতি প্রখ্যাত সিদ্ধাচার্যগণ চর্যা ও দোহা রচনা করিয়াছেন। এই চর্যা ও দোহায় বাঙালীর প্রাণের প্রকাশের বেদনা ও রসের আবেগ সর্বপ্রথম বাঙালীর কণ্ঠে বাঙালীর নিজের ভাষায় স্ফূরিত হইয়াছে।[৭০]

তর্কবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষদর্শন, ব্যাকরণ-অভিধান প্রভৃতিতে তাঁদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে এইসময়ে উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধরা পাণিনির টীকা রচনা করে যেখানে পতঞ্জলির মহাভাষ্যকে তেমনভাবে গ্রহণ করেনি ফলে তাদের গ্রন্থ জনসমাজে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমী যার ছাত্র ছিলেন দক্ষিণভারতে তর্কযুদ্ধে বিজয়ী মহাবিহারের কৃতি ছাত্র শীলভদ্র। চন্দ্রগোমী রচনা করেন *চান্দ্রব্যাকরণ*। কোষ রচনায় তাঁদের দক্ষতার কথা জানা যায় যেমন *অমরকোষ*। *অমরকোষ* গ্রন্থের তিনটি অঙ্গ

রয়েছে - পর্যায়, অনেকার্থ ও লিঙ্গ। এই তিনটি অঙ্গে বর্ণিত অংশ থেকে বহুল জ্ঞান লাভ করা যায়। এমনকি ছন্দ, বানান এগুলিকে ঘিরে লিখিত কিছু বইয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় - ছন্দের বই হল *ছন্দোমঞ্জরী*। শব্দশাস্ত্রে তাদের আনাগোনার কথা জানা যায় 'ন্যায়সূত্র' নামক গ্রন্থ থেকে।

১. ৩) জৈনধর্মের পরিচিতি

জৈনধর্ম হল মূলত একটি সম্পূর্ণ ভারতীয়ধর্ম। ভারতবর্ষের মাটিতে এই ধর্মের উৎপত্তি হয়ে, ধীরে ধীরে এই ধর্মমতটি ভারতের মাটিতে অস্তিত্ব হারাতে থাকে। কোন মানুষ যখন আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, রাগ-বিরাগ, অহংকার, লোভ ইত্যাদি আন্তরিক আবেগগুলিকে ধ্যান ও তপস্যা দ্বারা জয় করে। সেই জয়ের মাধ্যমে পবিত্র অনন্ত জ্ঞান (কেবল্ জ্ঞান) লাভ করে তখন তাকে জিন বলা হয়। জিনরা মানবজাতির পার্থিব জীবনের সুখ-দুঃখ, জন্ম-মরণের চক্র থেকে মুক্তির পথ-প্রদর্শক হয়ে মানুষের কাছে আত্মিক মুক্তির বার্তা পৌঁছে দেয় তীর্থঙ্করদের মাধ্যমে। এই মুক্তি কোন স্বর্গ বা ইশ্বরতত্ত্বের কথা বলে না। তারা আত্মার পরিশুদ্ধির কথা বলে। জিনদের আচরিত ও প্রচারিত এই পথের অনুগামীদের বলা হয় জৈন। এইসকল জৈনদের দ্বারা প্রচারিত ধর্মমতকে বলা হয় জৈনধর্ম। জৈন ধর্মাবলম্বীরা মনে করে অহিংসা ও আত্ম-সংযম হল মোক্ষ এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি লাভের পন্থা। জৈনধর্ম শ্রমণপ্রথা থেকে উদ্গত ধর্মমত। এই ধর্মমতটি হল বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মমতগুলির মধ্যে অন্যতম একটি ধর্মমত। জৈনরা তাঁদের ইতিহাসে এইরকম মোট চব্বিশজন তীর্থঙ্কর[৭২]-এর কথা উল্লেখ করেছে। যাদের শিক্ষা জৈনধর্মের মূল ভিত্তিস্বরূপ। প্রথম তীর্থঙ্করের নাম ঋষভনাথ এবং সর্বশেষ তীর্থঙ্করের নাম মহাবীর। এই তীর্থঙ্করদের উপদেশ বাণীগুলী জৈন ধর্মাবলম্বীরা সর্বদা মেনে চলে।

জৈনধর্ম কখনও কোনো সৃষ্টিকর্তা বা ধ্বংসকর্তা ঈশ্বরের ধারণাকে গ্রহণ করে না। এই ধর্মমতে জগৎ নিত্য। জৈনধর্ম আরও মনে করে প্রত্যেক আত্মার মধ্যে মোক্ষলাভ ও ঈশ্বর হওয়ার উপযুক্ত উপাদান রয়েছে। এই ধর্মমতে পূর্ণাত্মা দেহধারীদের বলা হয় অরিহন্ত (বিজয়ী) এবং দেহহীন পূর্ণাত্মাদের বলা হয় সিদ্ধ (মুক্তাত্মা)। যেসকল অরিহন্ত অন্যদের মোক্ষলাভে সাহায্য করে তাঁদের বলা হয় তীর্থঙ্কর। জৈনধর্মে উত্তর-অস্তিবাদী ধর্মমত মনে করা হয়। এই ধর্ম মোক্ষলাভের জন্য কোনো সর্বোচ্চ সত্তার উপর নির্ভর করার কথা বলে না। তীর্থঙ্করেরা হল সহায় ও শিক্ষক, যিনি মোক্ষলাভের পথে সাহায্য করে। মোক্ষলাভের জন্য সংগ্রাম মোক্ষলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে করতে হয়। জৈনধর্ম হল

একটি অনন্তকালীন দর্শন। জৈন কালচক্র অনুসারে, প্রত্যেক অর্ধে চব্বিশজন বিশিষ্ট মানুষ তীর্থঙ্করের পর্যায়ে উন্নীত হয়। মানুষকে মোক্ষের পথপ্রদর্শন করে। মহাবীরের পূর্বসূরী পার্শ্বনাথ ছিলেন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। তিনি খ্রিস্টপূর্ব নবম-সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে জীবিত ছিলেন। আনুশাসনিক ধর্মগ্রন্থগুলিতে পার্শ্বনাথের অনুগামীদের উল্লেখ রয়েছে। *উত্তরাধ্যয়ন সূত্র*-এর একটি কিংবদন্তিতে পার্শ্বনাথের শিষ্যদের সঙ্গে মহাবীরের শিষ্যদের সাক্ষাতের কথা রয়েছে। এই সাক্ষাতের ফলে পুরোনো ও নতুন জৈন শিক্ষাদর্শের আদান-প্রদান ঘটেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠশতাব্দীতে বর্ধমান মহাবীর জৈনধর্মের সবচেয়ে প্রভাবশালী শিক্ষকে পরিণত হয়েছিলেন। জৈনরা তাকে চব্বিশতম তীর্থঙ্কর এবং এই কালচক্রের সর্বশেষ তীর্থঙ্কর রূপে শ্রদ্ধা করে।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন-এর বিবরণ থেকে জানা যায় সপ্তমশতকে পূর্বভারতে জৈনধর্মের প্রাধান্য ছিল। বৈশালী[৭৩], পুণ্ড্রবর্ধন[৭৪], সমতট[৭৫], কলিঙ্গ[৭৬] জনপদগুলিতে জৈনসম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। মগধে অল্পসংখ্যক জৈনরা বসবাস করত।[৭৭] ভারতে জৈন ধর্মবলম্বীদের সংখ্যা প্রায় ১০,২০০,০০০ (আনুমানিক)। উত্তরআমেরিকা, পশ্চিমইউরোপ, দূরপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া, মালেশিয়া, জাপান ও বিশ্বের অন্যত্র বসবাসকারী জৈনদের দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের অপরাপর ধর্মমত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জৈনদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বৃত্তিদানের একটি প্রাচীন প্রথা জৈনদের মধ্যে আজও বিদ্যমান রয়েছে। ভারতে এই সম্প্রদায়ের সাক্ষরতার হার অত্যন্ত উচ্চ। জৈন কিংবদন্তি অনুসারে, সকলপুরুষ নামে তেষট্টিজন বিশিষ্ট সত্ত্বা এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। জৈন কিংবদন্তিমূলক ইতিহাস এই মহামানবদের কর্মকাণ্ডের সংকলন। সকল পুরুষদের মধ্যে চব্বিশজন তীর্থঙ্কর, বারোজন চক্রবর্তী, নয়জন বলদেব, নয়জন বাসুদেব ও নয়জন প্রতিবাসুদেবের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। চক্রবর্তীরা হলেন বিশ্বের সম্রাট ও জাগতিক রাজ্যের প্রভু। এখানে বলা হয়েছে তাঁদের গায়ের রং সোনালি। জৈনধর্মশাস্ত্রে উল্লিখিত একজন শ্রেষ্ঠ চক্রবর্তী হলেন ভরত। কিংবদন্তি অনুসারে ভরত চক্রবর্তীর নামে দেশের নাম হয়েছে ভারতবর্ষ। ভদ্রবাহুর *জিনচরিত* (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ অব্দ) গ্রন্থে এই ভ্রাতৃমণ্ডলীর উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। বলদেবরা হলেন অহিংস যোদ্ধা। বাসুদেবরা সহিংস যোদ্ধা এবং প্রতিবাসুদেবরা হলেন মূলত খলনায়ক। বাসুদেবরা প্রতিবাসুদেবদের শেষ পর্যন্ত হত্যা করেছে। নয়জন বলদেবের মধ্যে আটজন মোক্ষলাভ করেছে এবং সর্বশেষ বলদেব স্বর্গে গিয়েছেন। বাসুদেবরা তাঁদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য নরকে গিয়েছে।

সত্যের জন্য কাজ করতে চেয়েও শুধুমাত্র সহিংসতা অবলম্বনের জন্য তাঁদের এই শাস্তি হয়েছে। জৈনরা বিশ্বাস করেছে দেবতা পূজায়। এই দেবতাভাবনায় কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। জৈনরা মনে করে তাদের কল্পিত দেবতারা অলৌকিক শক্তির অধিকারী নয়। তাঁদের থেকে কিছু নেবার নেই। তারা জন্ম-মৃত্যুর অধীন, পুণ্যের ক্ষয় হলে তাঁদের পতন হবে। মানুষ জন্মান্তরে দেবতা হয়ে উঠতে পারে। মানুষের মতো তাঁরা দেহের আবরণযুক্ত আত্মা, তফাৎ শুধু মাত্রার, বস্তুতে নয়।[৭৮]

অহিংসা জৈনধর্মের প্রধান ও সর্বাধিক পরিচিত এবং সর্বজনগ্রাহ্য একটি বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে জৈনাচারের প্রাণ বলা যেতে পারে। জৈন দার্শনিকেরা নিষ্ঠাসহ কায়, মন বাক্যে এই নির্দেশাবলী পালন করতে নির্দেশ দেয়। কোনোরকম আবেগের তাড়নায় কোনো জীবিত প্রাণীকে হত্যা বা আঘাত করাকে জৈনধর্মে হিংসা বলা হয়েছে। এই ধরনের কাজ থেকে দূরে থাকা জৈনধর্মে অহিংসা নামে পরিচিত। প্রতিদিনের কাজকর্মে অহিংসার আদর্শকে মেনে চলা, এই বিষয়কে জৈনধর্মের মতো অন্য কোন ধর্মে গুরুত্ব দিতে লক্ষ করা যায় না।[৭৯] অহিংসার আদর্শের মধ্যে থাকে – দয়া, ক্ষমা, করুণা, সমদৃষ্টি, সহনশীলতা, সত্য, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি বিষয়গুলি। প্রত্যেক মানুষ নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ ও কোনোরকম আদান-প্রদানের সময় অহিংসার চর্চা করা। কাজ, বাক্য বা চিন্তার মাধ্যমে অন্যকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকা। জীবের প্রতি করুণা ও ভাবের প্রদর্শন করে ক্রোধ, মোহ, দ্বেষ ভাবগুলিকে ত্যাগ করা। মানুষসহ সমস্ত জীবিত প্রাণীর প্রতি জৈনরা অহিংসা ব্রতপালন করে। এই আদর্শ বাস্তব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে প্রয়োগ করা অসম্ভব, তাই জৈনরা একটি শ্রেণীশৃঙ্খলা মেনে চলে। যেখানে মানুষ-পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গ-গাছপালার স্থান রয়েছে। তারা মনে করে বৃক্ষ, গুল্ম, লতা এইসবের মধ্যে প্রাণ ও চেতনা রয়েছে। তাঁরা আমিষ রন্ধন প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের তুলনায় নিরামিষ আহারকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এইগুলির মধ্যে আবার যেসকল খাদ্যবস্তু বিনারন্ধনে খাওয়া যায়, সেগুলি সর্বাগ্রে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। অধিকাংশ জৈনরা দুগ্ধজাত নিরামিষ খাবার খেয়ে থাকে। দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের সময় যদি পশুদের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ করা হয়। সাধারণ নিরামিষ আহার তারা গ্রহণ করে। এই ধর্মাবলম্বীরা মনে করে মানুষ ও পশুপাখির পরে কীটপতঙ্গরা জৈন ধর্মানুশীলনের রক্ষাকবচ পাওয়ার উপযোগী। ইচ্ছাকৃতভাবে কীটপতঙ্গদের ক্ষতি করা জৈন ধর্মানুশীলনে নিষিদ্ধ। এই জন্য জৈন ভিক্ষুরা রাতে প্রদীপ জ্বেলে ঘুমানোর বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁদের ধারণা এই প্রদীপে কোন কীটপতঙ্গের মৃত্যু হলে দায়ী হবে ভিক্ষু। কোন ক্ষুদ্র কীট বা পতঙ্গ যাতে

উড়ে এসে নাসিকা গহ্বরের দ্বারা মনুষ্য শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে সেইজন্য তাঁরা নাকে সর্বদা ছোট টুকরো কাপড়ের পটি বেঁধে রাখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। পানীয় জলের সঙ্গে যাতে কোন ব্যাকটেরিয়ার মত জলজপ্রাণী মানব শরীরের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। তারা পানীয় জলকে কাপড়ে সেঁকে পান করতে নির্দেশ দিয়ে থাকে।[৮০] তারা কীটপতঙ্গকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার বদলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। জৈনধর্মে ঐচ্ছিকভাবে ক্ষতিকরা ও নির্দয় হওয়াকে হিংসার চেয়ে গুরুতর অপরাধ বলে মনে করা হয়। মানুষ, পশুপাখি ও কীটপতঙ্গের পর জৈনরা গাছপালার প্রতি অহিংসা ব্রতপালন করেন। খাদ্যের প্রয়োজনে গাছপালার ক্ষতি করতে হয়। মানুষের টিকে থাকার ক্ষেত্রে এটা অপরিহার্য বলে তাঁরা এতটুকু হিংসা অনুমোদন করে। কিছু ব্যতিক্রমী নমুনা পরিলক্ষিত হয় - কিছু কট্টরপন্থী জৈনরা এবং জৈন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা মূল-জাতীয় সবজি আলু, পিঁয়াজ, রসুন খায় না। তাদের ধারণা অনুযায়ী কোনো গাছকে উপড়ে আনতে গেলে গাছের ছোটো ছোটো অঙ্গগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই অহিংসার কথা মাথায় রেখে গান্ধীজী সুখাদ্যের তালিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন –

> Whilst it is true that man cannot live without air and water, the thing that nourishesthe body is food. Hence the saying, food is life. Food can be divided into three categories: vegetarian, flesh, and mixed. Flesh foodsinclude fowl and fish. Milk is an animal product and cannot by any means be is ananimal product and cannot by any means be included in a strictly vegetarian diet.[৮১]

জৈন ধর্মমতে হিংসার পিছনে উদ্দেশ্য ও আবেগগুলি কাজের থেকে বেশি গুরুত্ব পায়। যেমন - যদি কেউ অযত্নের বশে কোনো জীবিত প্রাণীকে হত্যা করে। পরে তার জন্য অনুতাপ করে তাহলে কর্মবন্ধন[৮২] কমে আসে। অন্যদিকে ক্রোধ, প্রতিশোধ ইত্যাদি আবেগের বশে হত্যা করা গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। ভাব বা আবেগগুলি কর্মবন্ধনের কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। কোনো সৈন্য আত্মরক্ষার জন্য কাউকে হত্যা করছে এবং কেউ ঘৃণা বা প্রতিশোধের বশে কাউকে হত্যা করা উক্ত দুই হিংসার ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন অহিংসা আদর্শের অন্যতম বিশিষ্ট প্রচারক ও পালনকর্তা। তিনি জানিয়েছেন -

> But if the Gita believed in ahimsa or it was included in desirelessness, why did the author take a warlike illustration? When the Gita was written, although people believed in ahimsa, wars were not only not taboo, but nobody observed the contradiction between them and ahimsa.[৮৩]

জৈনধর্মে আত্মরক্ষার জন্য হিংসা বা যুদ্ধ মেনে নেওয়া হয়েছে, বিশেষ কিছু শর্তকে মেনে নিয়ে। সেক্ষেত্রে প্রথমে শান্তিপূর্ণ সমাধানসূত্র লক্ষ এবং তা সম্ভব না হলে যুদ্ধপদ্ধতি প্রয়োগের নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। বিশ্বের কোন ধর্ম অহিংসার আদর্শকে এত গভীরভাগে ও পদ্ধতিগত ভাবে আলোচনা করেনি।

জৈনধর্মের দ্বিতীয় প্রধান আদর্শ হল 'অনেকান্তবাদ'। জৈনরা এই অনেকান্তবাদ ধারণার মধ্যে দিয়ে মুক্তমনস্ক হওয়াকে বুঝিয়েছে। সকল ধর্মের মানুষ ও তাঁদের মতাদর্শ গ্রহণ ও বিভিন্ন বিশ্বাসের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করাকে বোঝায়। জৈনধর্ম এই ধর্মের অনুরাগীদের বিপরীত ও বিরুদ্ধ মতবাদগুলিকে বিবেচনা করার শিক্ষা দেয়। এখানে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে –

> মানুষকে বাদ দিয়ে ঈশ্বর নয়। ব্রহ্মবান্ধবের ঈশ্বরপ্রেমও মানুষের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা থেকেই উৎসারিত। শাস্ত্রীয় আচার-অনুশাসন পালনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন যুক্তিহীন দেশাচারের শিকার। কিন্তু সমস্ত মানুষের প্রতি সমদর্শিতার ক্ষেত্রে তাঁর ধর্মবিশ্বাস কখনোই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি। ব্রহ্মবান্ধব খুব কাছ থেকে দেখেছেন বিপিনচন্দ্র পাল। বিপিনচন্দ্রও ব্রহ্মবান্ধবের ধর্মকে চিহ্নিত করেছেন মানবধর্ম হিসেবেই।[৮৪]

এই ধারণা বহুত্ববাদকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। সত্য ও বাস্তবতাকে বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা উচিত। একটি মাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তা সম্পূর্ণ বিচার করা যায় না। জৈনদের অনেকান্তবাদ এই ধারণাটি মহাত্মা গান্ধীর ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও অহিংসার আদর্শকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই তত্ত্বটিকে জৈনরা 'অন্ধের হস্তীদর্শন' নামক উপাখ্যানের মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা করে থাকে। এই গল্পে প্রত্যেক অন্ধ ব্যক্তি একটি হাতির আলাদা আলাদা অঙ্গ স্পর্শ করেছিল। কেউ শুঁড়, কেউ পা, কেউ কান বা কেউ অন্য কিছু স্পর্শ করেছিল। প্রত্যকে হাতির যে অঙ্গটি ধরেছিল, হাতি সেই রকম পশু বলে তারা দাবি করে। হাতিটিকে সম্পূর্ণভাবে স্পর্শ না করতে পেরে তাদের জ্ঞানও সম্পূর্ণ হয় না। অনেকান্তবাদের ধারণাটি পরে আরও প্রসারিত হয়ে স্যাদবাদীদের কর্তৃক বিস্তৃতাকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'অপরিগ্রহ' হল জৈনধর্মের তৃতীয় প্রধান আদর্শ। অপরিগ্রহ বলতে নির্লোভ হওয়া, অপরের দ্রব্য না নেওয়া ও জাগতিক কামনা বাসনা থেকে দূরে থাকাকে বোঝানো হয়েছে। জৈনরা যতটুকু প্রয়োজনীয়, তার চেয়ে সামান্য পরিমাণ বেশি দ্রব্য পরিগ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তারা দ্রব্যের মালিকানা স্বীকার করলেও দ্রব্যের প্রতি আসক্তি শূন্যতার শিক্ষা দেয়। জৈনধর্মাবলম্বীরা বলে - যে পরিমাণ সম্পত্তি রয়েছে সেইগুলির ক্ষেত্রে আসক্তিশূন্য হতে হবে। জৈনধর্মাবলম্বীরা মনে করে এমন

না হলে দ্রব্যের প্রতি অধিক আসক্তির বশে ব্যক্তি নিজের ও অপরের ক্ষতিসাধন করতে পারে। তেমনি শ্রীমদ্ভাগবদ গীতায় সন্ন্যাস যোগে বলা হয়েছে –

জ্ঞেয় স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাতপ্রমুচ্যতে।। ৫-৩।।[৮৫]

গৌতমবুদ্ধ ও তাঁর দশোপদেশ বাণীর মধ্যে অন্যের দ্রব্য জোর করে গ্রহণে বিরত থাকতে বলেছিলেন তাঁর শিষ্যদের। বুদ্ধ দশবিধ অশুভকে পরিহার করতে বলেছিলেন। এই দশোপদেশের মধ্যে দ্বিতীয় মতটি হল – অপহরণ না করা, অথবা বলপূবর্ক কাউকে কিছু থেকে বিরত না করে, সকলকে নিজের পরিশ্রমের ফল ভোগ করার সুযোগ করে দেওয়া।[৮৬]

ব্রতের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত চৈতন্যের বিকাশের দ্বারা আধ্যাত্মিক জাগরণের উপর জৈন ধর্মাবলম্বীরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল। কট্টরপন্থী অনুগামী ও সাধারণ অনুগামীদের জন্য এই ধর্মে বিভিন্ন স্তরের ব্রতের বিধানের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ধর্মের অনুগামীরা পাঁচটি প্রধান ব্রতপালন করে, যাকে তারা পঞ্চমহাব্রত[৮৭] নামে চিহ্নিত করে। জৈনসন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের জন্য এই পঞ্চমহাব্রত-এর পাঁচটি নিয়ম পালন করা অত্যন্ত জরুরি। গৃহস্থ জৈনদের ক্ষেত্রে এই পঞ্চমহাব্রত উল্লিখিত নিয়মগুলির মধ্যে ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতার যথাসম্ভব পালনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই ধর্মে মানবমনের চারটি আবেগকে (ক্রোধ, অহং, অসদাচরণ ও লোভ) চিহ্নিত করে সেগুলিকে এড়িয়ে চলার কথা বলা হয়েছে। জৈন ধর্মমতে, ক্ষমার মাধ্যমে ক্রোধকে, বিনয়ের মাধ্যমে অহংকারকে, সত্যাচরণের মাধ্যমে অসদাচরণকে এবং সন্তুষ্টির মাধ্যমে লোভকে জয় করার কথা বলা হয়েছে। মহাবীর তাঁর শিষ্যদের বোঝাতে গিয়ে কিছু জৈবিক আচরণকে মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেগুলি হল -

> Mahavira's idea of tapas was that of self-restraint with regard to the body, speech and mind; in his view, austerities had to be inward as well as outward, and fasting, absolute chastity and unmitigated meditation were its several forms. The practice of austerities or penances was to be restored to as a means of wearing out and ultimately destroying the effect of sinful deeds committed in former existence's, and the practice of the threefold self-restraint, of the body, speech and mind, as a means of stopping the production of new karmas. As justified forms of penance's, Mahavira was prepared to recognize only *anshan* (fasting), *unrodaree* (limiting the food that one eats), *bhikshacharya* (eating only begged food), *rasparityag* (abstaining from special items of food which one most

enjoys), *kaeyklaish* (bodily austerity), *Pratisanleenta* (avoidance of temptation by control of senses and mind), *Prayishchit* (confession and penance), *vinay* (reverence), *veyivritay* (service rendered to the aged and the helpless), *swadhyai* (the study of the scriptures), *dhyan* (meditation), *Kayotsarga* (feeling and showing absolute indifference to the body and its needs).[৮৮]

জৈনধর্মে সন্ন্যাস প্রথাকে বেশ উৎসাহ দেওয়া হত। জৈন সন্ন্যাসীদের যথেষ্ট সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হত। জৈনসন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা অত্যন্ত কঠোর ও পবিত্র জীবন-যাপন করে। তাঁদের স্থায়ী বাসস্থান বা বিষয়সম্পত্তি কিছু রাখার নিয়ম ছিল না। তাঁরা পাদুকা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। বছরের অধিকাংশ সময় তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ালেও চতুর্মাস্য[৮৯]–এর চার মাস তারা সংঘে ফিরে আসে। ভিক্ষাকে এই জৈন সন্ন্যাসীরা প্রধান জীবিকা বলে গ্রহণ করে। গৃহী জৈনদের পারিবারিক উৎসবে জৈন সন্ন্যাসীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়নি।

জৈনরা কোনো সুবিধা বা পার্থিব চাহিদা পূরণ অথবা পুরস্কারের আশায় দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করে না। তাঁরা প্রার্থনা করে কর্মবন্ধন নাশ ও মোক্ষলাভ করতে। তারা এই জাগতিক বিষয় ও বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্য নবকার মন্ত্র [৯০]–এর স্মরণাপন্ন হয়। জৈন সাধকগণ বছরের অধিকাংশ সময়ে উপবাস পালন করে। বিশেষ করে ধর্মীয় উৎসবের সময় উপবাস জৈনধর্মে একটি বিশেষ প্রথা। তাঁদের এই উপবাসের কিছু রীতি লক্ষ করা যায়। এই সাধকদের উপবাস ব্যক্তির সামর্থের উপর নির্ভর করে। কেউ চাইলে দিনে একবার বা দুবার খেতে পারে। কিছু সন্ন্যাসী সারাদিন শুধুমাত্র জলপান করে দিনাতিপাত করে। কিছু সন্ন্যাসী সূর্যাস্তের পরে কিছু আহার গ্রহণ করে। কেউ কেউ আগুনে রান্না করা খাদ্য গ্রহণ করে না উপবাসের সময়। তারা শুধুমাত্র ফলমূল আহার হিসেবে গ্রহণ করে। কিছু সন্ন্যাসী আবার আগুনের স্পর্শিত খাদ্য গ্রহণ করলেও তাতে চিনি, তেল বা নুন জাতীয় খাদ্যদ্রব্যকে আড়ালে রাখেন। উপবাসের উদ্দেশ্য হল আত্মসংযম অনুশীলন। মনকে শুদ্ধ করে প্রার্থনায় অধিকতর মানসিক শক্তি প্রয়োগের জন্য তৈরি করা। জৈনরা সাময়িকাধ্যান[৯১] নামে এক ধ্যানপদ্ধতি গড়ে তুলেছিল। জৈনরা ছয়টি কর্তব্য পালন করে যেগুলিকে আবশ্যক কর্তব্য[৯২] নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১. ৪) মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ও সাহিত্যে তার প্রতিফলন

প্রাক-বুদ্ধ ভারতের ইতিহাস লিখিত হয়েছিল বৈদিক ও বেদোত্তর সাহিত্যের ভিত্তিতে। বৌদ্ধ সাহিত্যগুলি আবিষ্কারের ফলে ঐতিহাসিক সময়ের কিছু ঘটনাসমূহ পাঠকের সামনে তুলে ধরা সক্ষম হয়েছে। বৌদ্ধ সাহিত্য শুধুমাত্র বুদ্ধ-কালীন ভারতের ছবি নয়। প্রাক-বুদ্ধের সময়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার প্রতিচ্ছবিও বটে। বুদ্ধের পরিনির্বানের (আনুমানিক ৪৮৩ খ্রিস্টপূর্ব.) পরে, বুদ্ধ শিষ্যরা বুদ্ধ বাণীগুলি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। গৌতম বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় *ত্রিপিটক* [৯৩] লেখা হয়নি। পালি ত্রিপিটকের অধিকাংশ বাণী গৌতম বুদ্ধের মুখনি:সৃত বাণী বলে কথিত রয়েছে। বিনয়-পিটকে উল্লেখ রয়েছে কবে কোথায় গৌতমবুদ্ধ কোন কথার ব্যাখ্যা করেছিলেন। যদি এইস্থানে অনুমানের ওপর নির্ভর করে সমস্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বুদ্ধ স্বলিখিত কোন পুস্তকের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিনয়-পিটকে সংঘের নিয়মাবলী, দেশীয় চিকিৎসাবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিক্ষাব্যবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্বগুলি যেমন- প্রতীত্যসমুৎপাদ, নির্বাণ, চতুরার্যাসত্য, অষ্টাঙ্গিকমার্গ ও ভিক্ষুদের উদ্দেশ্য গৌতম বুদ্ধের স্বকোথিত বচনগুলি বুদ্ধবচন নামে পরিচিত হয়েছে।[৯৪]

ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময় ধরে দ্বিবিধ ধর্মাবলম্বী রাজারা রাজ্যশাষণ করলে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য লুপ্ত হয়ে যায়নি। পাল আমলে বৌদ্ধদের বিস্তারলাভের সুবর্ণযুগ। বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভের সময়কাল নিয়ে মতবিরোধ থাকলে অনুমান করা যায় – বঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব চলে আসছে। পাল পূর্ববর্তী রাজন্যবর্গের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষ করা গেলে, তদানীন্তন বঙ্গে পালদের সময়ে বৌদ্ধধর্মের স্বমহিমায় বিস্তারের কথা জানা যায়। পালরাজারা প্রায় তিনশো বছর গৌড়ে রাজত্ব করেছিল। এই পালরাজারা ছিল বৌদ্ধ মহাযান শাখায় বিশ্বাসী। বৌদ্ধধর্মের প্রধান তত্ত্ব ছিল ক্ষান্তি বা খন্তি[৯৫]। পাল নৃপতিরা নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছিল। পূর্বে বৌদ্ধ রাজা অশোক এই নীতিকে গ্রহণ করেছিলেন। ক্ষান্তি শুধু রাজসভাতে আবদ্ধ না থেকে জনসাধারণের হৃদয় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। হিন্দু-বৌদ্ধ একে অন্যের সঙ্গে সৌভাতৃত্বের বোধ গড়ে তুলতে পেড়েছিল। পাল পরবর্তী সেন রাজসভার কবি জয়দেব তাঁর অমর কীর্তিতে বুদ্ধকে সম্মানের সহিত স্মরণ করেছেন স্বরচিত একটি শ্লোকে –

নিন্দসি যজ্ঞবিধরহহ শ্রুতি জাতম্।

সদয়হৃদয়- দর্শিত পশুঘাতম্ ।।
কেশব ধৃত – বুদ্ধশরীর জয় জগদীশে হরে।[৯৬]

ভারতবর্ষে যখন হিন্দু-বৌদ্ধের লড়াই চলছে তখন জয়দেব তাঁর গ্রন্থে বুদ্ধকে ভগবানজ্ঞানে নমস্কার জানিয়েছে। যজ্ঞের নামে পশুহত্যা রোধের জন্য তাঁর আন্দোলনের প্রশংসা করেছে। পালযুগে প্রথম ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে বৌদ্ধ দেবতারা স্থান করে নিতে পেরেছিল। ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনের দেবতারা বৌদ্ধদের কাছে পূজা পেয়েছে যেমন - সরস্বতী মঞ্জুশ্রীর শক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছেন। বৌদ্ধ বাগেশ্বরী সিংহবাহনা, বৌদ্ধকুলের এই দেবীব্রাহ্মণ্য কালীর নামান্তর। ব্রাহ্মণ্য মহাদেব যিনি সমুদ্রমন্থনের সময় কণ্ঠে গরল ধারণ করেছিলেন বলে তার নাম হয়েছিল নীলকণ্ঠ। বৌদ্ধদের কাছে এই দেবতা হয়ে যান – নীলগুটিকাবিশিষ্টকণ্ঠং। বৌদ্ধ তারা হিন্দুদের দশমহাবিদ্যা[৯৭]- র মধ্যে স্থান করে নিয়েছেন। বর্তমানে কিছু বৌদ্ধ দেবতার মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। যেখানে বাঙালির হাতের স্পর্শের দাগ রয়েছে বলে অনুমিত হয়েছে।

পালবংশের রাজা দেবপাল (৮৩০–৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ) যিনি ধর্মপালের পরে সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন। গঙ্গার উৎপত্তি থেকে শুরু করে পশ্চিমে সাগরের তীর পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই রাজার সময়ে বৌদ্ধ পরিব্রাজক বীরদেব বহুকাল তার রাজ্যে বসবাস করেছিলেন। রাজা দেবপালের সঙ্গে শৈলন্দ্রবংশীয় নরপতি বালপুত্রদেবের সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। জাভাতে প্রাপ্ত মূর্তিশিল্প এই সাংস্কৃতিক সংযোগের প্রমাণ বহন করে চলেছে। যেমন - শিববুদ্ধ, বিষ্ণুবুদ্ধ প্রভৃতি মূর্তির পরিচিন্তন দাবি রাখে একসময় বাংলাদেশের সঙ্গে জাভার সাংস্কৃতিক সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে শিববুদ্ধের একটি মূর্তি সংরক্ষিত রয়েছে। কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন মূর্তিটি বরিশালজেলার কেশবপুর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। ধাতুময় মূর্তিটির দ্বিভুজ অর্ধ নির্মীলিত দৃষ্টি, ঢলঢল মুখমণ্ডল, মৃদুহাস্যোজ্জ্বল প্রসন্নের ভাব প্রকাশক। সুদীর্ঘ কমনীয় দেহকান্তি, আকারে ছোট, ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট। এই মূর্তির মধ্যে শিব ও বিষ্ণু মূর্তির প্রাদুর্ভাব ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যেকে প্রকাশ করেছে।[৯৮] সমগ্র মূর্তিটির পরিকল্পনায় ও অলঙ্করনে পাল শিল্পীদের পরিমার্জিত রুচি ও শিল্প নৈপুণ্যের কথা প্রমাণ করে। এই শিববুদ্ধ ও বিষ্ণুবুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ধ্যানীবুদ্ধে পৌঁছে যাওয়ার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। বুদ্ধমূর্তি গড়তে গিয়ে বাঙালিরা কতোটা আত্মনিষ্ঠ সাধনায় মগ্ন হয়েছিল প্রাপ্ত বৌদ্ধ মূর্তিগুলি থেকে সেকথা প্রমাণ হয়।

বৌদ্ধ সাহিত্যগুলিতে বলা হয়েছে - মৃত্যুর পর মানুষ একত্রিশটি লোকভুমির যে কোনো একটি লোকভুমিতে গমন করে। এই একত্রিশটি লোকভুমিকে ভাগ করা হয়েছে এইভাবে - চারপ্রকার তীর্যক, সাতপ্রকার স্বর্গ, ষোলপ্রকার রূপব্রম্মভূমি ও চারপ্রকার অরূপব্রম্মভূমি। এই একত্রিশ প্রকার লোকভূমির উপরে সর্বশেষ স্তর হল নির্বাণ। মানুষ যদি খারাপ কাজ করে তাহলে তারা প্রেতলোক জায়গা পায়। অসুর, নরক ও তির্যক এইসকল স্থানে জন্মগ্রহণ করে সাজা ভোগ করে। ইহজন্মে মানুষ যদি ভালো কাজ করে তাহলে মৃত্যুর পর সে বাকি সাতাশ লোকভুমিতে গমন করে। বুদ্ধের এই যাবতীয় কর্মাবলী বাঙালি শিল্পীরা নিপুণতার সঙ্গে মূর্তিশিল্পের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলাদেশে যুগে যুগে বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বিচিত্র পরিণতি লাভ করেছে। বাঙালির মানসপ্রকৃতিকে বুঝতে হলে বৌদ্ধধর্মের পর্যালোচনা প্রয়োজন। বাংলা ও মগধের জনমানসকে অষ্টম-দ্বাদশ এই চারশো বছর বৌদ্ধধর্ম পরিচালনা করেছে। বুদ্ধজীবনের অন্যান্য ঘটনার তুলনায় সম্বোধিলাভের ঘটনা বিশেষভাবে বাঙালি শিল্পীকে প্রভাবিত করেছিল। বিভিন্ন বুদ্ধমূর্তি ছাড়া মহাযানী প্রতিমা রূপায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। মহাযানী অবলোকিতেশ্বর লোকনাথের মূর্তি, যেখানে – সূর্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উক্ত সমস্ত দেবতাদের গুণাবলী দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। এই মূর্তি দর্শনে তাই অনুভব হয় একদিকে তিনি কঠোর পৃথিবীর কল্যাণ সাধনে রত। অন্যদিকে তিনি গরীব দুঃখীদের আর্তনাদে করুণাঘন আনতদৃষ্টি প্রদর্শন করেছে। মহাযানী বৌদ্ধমূর্তির মধ্যে তারা দেবীর প্রতিমা বেশি আবিষ্কৃত হয়েছে। যিনি অবলোকিতেশ্বরের শক্তির দেবী। হারিতি, মঞ্জুশ্রী, পর্ণশবরী প্রভৃতি সকল দেবতার মূর্তি বাংলার মাটিতে পাওয়া গেছে। ঢাকা, ত্রিপুরা, দিনাজপুর, বাগুড়া ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে প্রাধ্যান্য দেখা গেছে। এই জনপদের মানুষের মধ্যে মহাযান ও বজ্রযান দুই ভাবধারার মধ্যে যথেষ্ট সুসমন্বয় গড়ে উঠেছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর *বেনের মেয়ে* (১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসের মধ্যে বজ্রযানী বৌদ্ধমূর্তি সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রদান করেছেন। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করে থেমে থাকেনি। বাঙালির সাহিত্যের বিকাশের পথকে করে তুলেছিল আরও প্রশস্ত। বৌদ্ধ মহাবিহারগুলি এক্ষেত্রে প্রশংসার দাবি রেখেছে। পালযুগে ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, জীবনের সঙ্গে জীবনের সংযুক্তি ঘটে। বাঙালি বৌদ্ধশিক্ষা ও সংস্কৃতির মিলনের প্রতিফলন এই মহাবিহারগুলিতে তুলে ধরা হয়েছিল।

বৌদ্ধযুগের বাঙালির ইতিহাস বাঙালির আত্মজাগরণের ইতিহাস। এই কথার যথার্থতা বিচার করতে হলে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসের কাছে ফিরে যেতে হবে। বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ফলে মানুষ যেমন বৌদ্ধ জোয়ারে ভেসেছিল তেমনি তারা বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পুঁথি বা গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করেছিল। আলোচ্য যুগের বাঙালীদের জ্ঞানস্পৃহা, মননশীলতা এই সবকিছুর স্পষ্ট ছবি ধরা পড়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানিয়েছেন ব্রাহ্মণদের দলে টানতে পারলে বৌদ্ধরা খুব আনন্দ উপলব্ধি করতেন। তাদের গ্রন্থরচনায় সুবিধা হত। সেসময় গুপ্ত ও কর উপাধিধারী ব্যক্তিদের লিখিত গ্রন্থের প্রমাণ পাওয়া যায় -

> কর উপাধিধারী অনেকেও বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কয়েকজন তৈলিকপাদ বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। বণিকদেরতো কথাই নাই। ইহারাই বৌদ্ধভিক্ষুদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন ও বিহারের খরচ চালাইতেন। তদ্ভিন্ন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতেন, মঠ প্রতিষ্ঠা করিতেন ও পুস্তক লিখিয়া মঠকে দান করিতেন। ঐরুপে সকল জাতির লোকেই তখন বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।[৯৯]

তর্কবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষদর্শন, ব্যাকরণ-অভিধান প্রভৃতিতে তাদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে এই সময়ে উন্নতকরণের পরিচয় পাওয়া যায়।

বৌদ্ধদের গল্পের বইগুলি চমৎকারিতার প্রমাণ দেয়। তাদের মূলত দুইধরণের গল্পের কথা জানা যায় - জাতকের গল্প ও অবদানের গল্পকথা। জাতকের গল্পগুলিতে রয়েছে বুদ্ধের পূর্বজন্মের কথা। অবদানে থাকে তাঁর সঙ্গী-সাথীদের পূর্বজন্মের কথা। দশম-এগারো শতকে তাঁরা স্মৃতিপুস্তক লিখতে শুরু করে। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করার পদ্ধতি লেখা রয়েছে। শেষের দিকে তাঁরা লিখতে শুরু করে তন্ত্রের বই। যেখানে মূলত রয়েছে মন্ত্রোদ্ধার, মন্ত্রসাধনা, দেবতা মূর্তি তৈরি পদ্ধতি ইত্যাদির কথা। প্রতিমালক্ষণ বিষয়ক প্রধান গ্রন্থ *সাধনমালা।* [১০০] সেসময়ে রচিত বৌদ্ধঅভিধান ও পাঠককে চমকে দেয়, যেমন – নামলিঙ্গানুশাসন, ত্রিকাণ্ড, বিশ্বপ্রকাশ প্রভৃতি। বৌদ্ধবাঙালির সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার উজ্জ্বল নিদর্শন শিলালিপি ও তাম্রানুশাসনের মধ্যে প্রকীর্ণ রয়েছে। কামরূপাধিপতি ভাস্কর বর্মার সভাকবি তার রচনার শুরুতে শিব ও ধর্মের জয়গান করেছেন। এবার প্রশ্ন ওঠে এই গ্রন্থগুলি সব কোথায় গেল? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই প্রশ্নের উত্তর দান করছেন এইভাবে - হয় হিন্দুরা তাড়াইয়া দিয়াছে, নয় গ্রাস করিয়াছে। [১০১] কিভাবে হিন্দুরা গ্রাস করেছে বিভিন্ন সাহিত্যের নিদর্শন তুলে এনে তিনি একথার ব্যাখ্যা করেছেন। দুঃখের সঙ্গে একথা মনে রাখতে হয় যে - বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের সঙ্গে

সঙ্গে বৌদ্ধসাহিত্যের অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। এই ধ্বংসের ফলে শুধু বৌদ্ধস্মৃতি লোপ পায়নি, বাঙালির ইতিহাসও অনেকাংশে মুছে গেছে।

বর্তমানকালে কিছু গবেষকের অবিশ্রাম পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ সামান্য কিছু বৌদ্ধসাহিত্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। যেমন - সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত মানস* যেখানে কাব্যের কবি বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। নৃপতি দেবপালের সভাকবি অভিনন্দের কাব্যের দেবী-মাহাত্ম্য বর্ণনায় বৌদ্ধপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। কবি জয়দেবের উদারতার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় বাংলাসাহিত্য রচিত না হলেও বাঙালির ভাষা ও জীবনচর্চার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে প্রচুর। *কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়* গ্রন্থটির সংকলকের নাম জানা যায়নি তবে গ্রন্থের শুরুতে বুদ্ধপ্রশস্তি দেখে অনুমান করা হয় যে গ্রন্থসংকলক বৌদ্ধপ্রভাবিত ছিলেন। মহাযান শাখাটি লোকায়তধর্মের সঙ্গে মিলনের ফলে তান্ত্রিক উপযানগুলি তৈরি হয়। এই তান্ত্রিক উপযানের পালনকারীরা নিজেদের পরিচয়কে লুকিয়ে রেখে প্রাচীন বাংলাভাষায় নিজ মতের তত্ত্বকথা রচনা করে থাকত। পরবর্তী হীনযানদের ওপরে এই গোষ্ঠীর প্রভাব পড়েছিল। *দোহাকোষ* ও *চর্যাচর্যবিনিশ্চয়* গ্রন্থে যার প্রমাণ পাওয়া যায়। সহজযানীরা পূজা-অর্চনা, শাস্ত্রপাঠ ও মন্ত্রজপে তেমন বিশ্বাস করে না। তাঁদের বিশ্বাস ছিল নিজের শরীরের মধ্যে বুদ্ধের অবস্থান রয়েছে। জপ-তপ সব কিছুর মধ্যে দিয়ে শরীরে থাকা দেবত্বের সন্ধান করেছে –

পণ্ডিঅ সঅল সত্থ বক্ খাণই।
দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই।।
অমণাগমণ ণ তেন বিখণ্ডিঅ ।
তোবি নিলজ্জই ভণই হউ পণ্ডিঅ ।।[১০২]

বৌদ্ধ ভাবধারাকে আশ্রয় করে যে সকল সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তার সামান্য অংশের কথা আজ উল্লেখ করা সম্ভব হয়। দশম-একাদশ শতাব্দীতে যে সান্ধ্যভাষার জন্ম হয়েছিল বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা তাদের রচিত গানের কথায় এই ভাষা ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করেছে। বঙ্গে তুর্কী আক্রমণে এসে বৌদ্ধধর্মের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধসাহিত্যে সৃষ্টির ও গতিরোধ হয়েছিল।

১. ৫) বাংলায় জৈনধর্মের বিকাশ ও সাহিত্যে তার প্রতিফলন

জৈনধর্ম বিস্তারের ইতিহাস মূলত জৈনধর্মাবলম্বীদের স্থানান্তরে গমন ও বসতিস্থাপনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। মহাবীরের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে জানা যায় প্রাচীনকালে জৈনদের প্রধান বাসস্থান

ছিল কোসল, বিদেহ, মগধ ও অঙ্গ। এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন দিকে জৈনদের গমনাগমন ঘটে ও জৈনধর্মের বিস্তৃতি লাভ ঘটে। জৈনরা প্রথম কলিঙ্গ দেশে আসে রাজা খারবেল-এর পৃষ্ঠপোষকতায়। মহামেঘবাহন রাজবংশের সম্রাট খারবেল (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম-দ্বিতীয় শতক) ছিলেন ধর্মসহিষ্ণু রাজা। তিনি জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন। উদয়গিরির (বর্তমান উড়িষ্যা) উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় - তিনি প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথের একটি মূর্তিনির্মাণ করেছিলেন। এই রাজা জৈনধর্মের ভাবধারাকে আপন অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি পাভর নামক একটি জৈনমঠ তৈরি করেছিলেন। কুমারী পর্বতে জৈনসন্ন্যাসীদের জন্য গুহানিবাসগুলি এই রাজার সময়কালের নিদর্শন। ইতিহাসে এই রাজাকে ভিক্ষুরাজা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১০৩] খ্রিস্টপরবর্তী প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে মথুরা থেকে যেসকল জৈন লেখমালা ও মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলি থেকে অনুমান করা যায়, মথুরা ছিল সেসময়ে জৈনধর্মের দ্বিতীয় প্রধান কেন্দ্র। তৃতীয় প্রধান জৈনধর্মের কেন্দ্র ছিল উজ্জয়িনী। অশোকের পৌত্র জৈনধর্মের অনুগামী ছিলেন। তিনি অন্ধ্র ও দ্রাবিড় দেশে জৈনধর্ম প্রচারের জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন। গুপ্তযুগের লেখমালায় জৈনধর্মের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় – উদয়গিরি, ককুভ প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে। পাহাড়পুর তাম্রশাসনসমূহ থেকে উত্তরবঙ্গে জৈন প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতের প্রাচ্যদেশে (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপ্রান্তের জেলাগুলি) জৈনধর্মের প্রতিপত্তির মূল কারণ ছিল, আর্যসভ্যতা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে আলোচিত অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে সর্বপ্রথম জৈনধর্ম প্রবেশ লাভ করেছিল। আর্যাবর্তের সীমারেখার বাইরে পূর্বভারতের এই অঞ্চলগুলি ছিল অরণ্যাবৃত। অস্ট্রীকরা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এই অঞ্চলে বাস করত। দ্রাবিড় বংশীয়দের কিছু অংশ এই অঞ্চলে বাস করত। আর্যদের কাছে এই অঞ্চলগুলি তখনও ছিল পাণ্ডববর্জিত দেশ। তারা কোন কারণে এই অঞ্চলে প্রবেশ করলে প্রায়শ্চিত্ত বিনা নিজ জাতে উঠতে পারত না। এই ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় – আর্য-বৌদ্ধ ও আর্য-হিন্দু ধর্মের প্রবেশ এই অঞ্চলগুলিতে জৈনধর্মের পূর্বে কখনও ঘটেনি।[১০৪] জৈনধর্মের প্রথম তরঙ্গ অতিপ্রাচীনকালে বঙ্গদেশে এসে পৌঁছেছিল। রাঢ়ভূমি ছাড়া এই ধর্মের প্রভাব লুপ্ত হয়ে গেছে। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে রাজশক্তির উত্থান পতনের কথা। পালরাজারা দীর্ঘকাল গৌড়ে রাজ্যশাসন করলেও, এই রাজাদের সময়ে ধর্ম নিয়ে হানাহানির প্রতিচ্ছবি খুব একটা দৃষ্টান্ত রাখেনি। পালবংশের মোট দশজন রাজা

ছ'শো আটানব্বই বৎসর রাজত্ব করেছিল (আইন-ই-আকবরী মতে)। সেসময় সমাজে বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন ও শৈব এই সকল ধর্মাবলম্বীরা একই সঙ্গে পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে বসবাস করত।[১০৫] এই পালরাজাগণ মূলত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও, তারা অন্যধর্মের প্রতি ক্রূরদৃষ্টি দান করতেন না। রাজ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে জৈনরা নিজেদের নিরাপদ স্থান হিসেবে সেইসময়ে রাঢ় অঞ্চলগুলিকে বেছে নিয়েছিল। চতুর্থ-পঞ্চম শতকে দেশব্যাপী হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান বঙ্গদেশে জৈনধর্মের অবনতির প্রধান কারণ। এই কথার সত্যতা প্রকাশিত হয়েছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে প্রতিবেদন (১৮৭২- ৭৩)। কানিংহাম ও বেগলার রাঢ় অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করে বেশ কিছু জৈন নিদর্শন তুলে এনেছিল। যেমন - দেউলি গ্রামে জৈনমন্দির ও তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের মূর্তিসহ বেশ কিছু জৈন নির্দশন পাওয়া গেছে। দুলমি গ্রামে কিছু জৈনমূর্তি, সুইসা গ্রামে তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি ও পাকভিরা গ্রামে পদ্মপ্রভ, ঋষভনাথ ও সর্বতোভদ্রিকার কিছু মূর্তি পাওয়া যায়।[১০৬] জৈনধর্মের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে জৈনধর্মের সাহিত্যালোচনা পথ প্রদষ্টার ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয় জৈনদের সাহিত্যকর্ম প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসকেও পুনরায় আলোচনার সুযোগ করে দেয়।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে পাটুলিপুত্র নগরে জৈনদের একটি সভার আহ্বান করা হয়েছিল। যেখানে জৈন-সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থগুলি বিভক্ত ও বিন্যস্ত হয়ে যায়। এরপর গুপ্তসম্রাটদের আগমনে (৪৫৪ খ্রিস্টাব্দে) জৈনদের দ্বিতীয় সভা আহুত হয় গুজরাতের ধলভী নগরে। এই সভাতে জৈনধর্মশাস্ত্রগুলি পুনরায় লিপিবদ্ধ হয়। শাস্ত্রগুলির মধ্যে প্রধান গ্রন্থটি হল *কল্পসূত্র*। জৈনধর্মাবলম্বীরা মনে করে কল্পসূত্র গ্রন্থের রচয়িতা ভদ্রবাহু। ভদ্রবাহুর চারজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে গোদাস ছিলেন অন্যতম একজন। এই গ্রন্থ থেকে জৈনধর্মের বেশ কিছু শাখার নাম জানতে পারা যায়। যেই শাখাগুলির প্রবক্তা ছিলেন গোদাস। তার প্রবর্তিত মূল শাখার নাম হয় গোদাসগণ। এই গোদাসগণ শাখা আবার কয়েকটি উপশাখায় ভাগ হয়েছে – তাম্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া ও কর্ব্বটিকা। গুপ্তসাম্রাজ্যের সময়ে বঙ্গের এই অঞ্চলগুলিতে জৈনধর্মের প্রভাবের কথা অনুমান করা যায়। সপ্তম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় – পূর্বভারতের কিছু অঞ্চলে জৈনধর্মের প্রাবল্যতা দেখা গেছে। মহাভারতে এই কর্ব্বট জনবসতির কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈনদের নৃতাত্ত্বিক নমুনা হিসেবে তুলে আনা যেতে পারে শরাক জাতির

কথা। অনুমান করা যায় এই জাতির নাম এসেছে মূলত জৈন শ্রাবক[১০৭] সম্প্রদায়ের প্রভাবে। যদিও এই জাতিদের মধ্যে এখন হিন্দু ধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যায়। *আচারাঙ্গসূত্র* জৈনদের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থ থেকে চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীরের কথা জানা যায়। মহাবীর কেবলজ্ঞান লাভ করার পূর্বে কিছুদিন বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এই গ্রন্থটিতে। প্রাচ্যদেশে ভ্রমণকালে মহাবীরের ওপর রাঢ় দেশের লোকেরা তাঁর দিকে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। তার দিকে ঢিল ছুঁড়ে নানাভাবে অত্যাচার করেছিল। *শব্দানুশাষন* নামক মহাশ্রমণ সঙ্ঘাধিপতি শ্রুতকেবলী দেশীয়াচার্য শাকটায়ণ রচিত একটি জৈন প্রচীন ব্যাকরণগ্রন্থের কথা জানা যায়। এই গ্রন্থটি পাণিনি পূর্ব রচিত। এই গ্রন্থের কোথাও পাণিনির নাম উল্লেখ করা হয়নি। পাণিনির গ্রন্থে শকটায়ণের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেখান থেকে এই গ্রন্থের প্রাচীনতা নিয়ে কিছুটা হলেও জটিলতার নিরসন করা যায়। শাকটায়ণ জৈনধর্মের লোক ছিল কিনা এই সন্দেহের নিরসন তিনি নিজেই করেছেন তাঁর গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে মহাবীরের স্মরণ নিয়ে। তার পরবর্তী টীকাকার যশোবর্মা গ্রন্থে শকটায়ণকে জৈন ধর্মাবলম্বী বলে উল্লেখ করেছেন। জৈন দার্শনিকেদের কিছু গ্রন্থ পাওয়া যায়। জৈনরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করত না। প্রাচীন যুগের নাস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে জৈনদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈন দিগম্বর সম্প্রদায়ের মল্লিসেন সূরির লেখা স্যাদবাদমঞ্জুরী, হরিভদ্র সূরির লেখা – ন্যায়-প্রবেশক সূত্র, ন্যায়াবতারবৃত্তি ও ষড়দর্শনসমুচ্চয়। ষড়দর্শনসমুচ্চয় গ্রন্থের টীকা রচিত হয় *তর্করহস্যদীপিকা* নামক গ্রন্থে। এই সকল গ্রন্থগুলিতে জৈনদের দার্শনিক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। যেমন - খ্রিস্টপূর্ব ৫২ অব্দে কুন্দকুন্দাচার্যের লেখা পঞ্চাস্তিকায়সময়সার। চন্দ্রপ্রভ সূরির দর্শনশুদ্ধি, প্রমেয়রত্নকোষ ন্যায়াবতারবিবৃতি। রত্নপ্রভ সূরির স্যাদবাদ রত্নাকর অবতারিকা, তিলকাচার্যের আবশ্যক লঘুবৃত্তি ও বুদ্ধচরিত। গুণরত্নের ষড়দর্শন সমুচ্চয়বৃত্তি, যশোবিজয়ের তর্কভাষা। ন্যায়প্রদীপ, ন্যায়রহস্য, ন্যায়ামৃত-তরঙ্গিনী, ন্যায়খণ্ডখাদ্য প্রভৃতি হল জৈনন্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।[১০৮] জৈনদের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে, শাস্ত্রগ্রন্থ আগম যা সম্পূর্ণ সংরক্ষিত হতে পারেনি। জৈন আচার্যদের হাতে কিছু জৈন সাহিত্যের উৎপত্তি হয়েছিল। যথা – উমাস্বাতি-র লেখা *তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র* (১৩৫-২১৯ খ্রিস্টাব্দ), পূজ্যপাদ *সর্বার্থসিদ্ধি* (টীকা)। ৪৮০-৫৫০ খ্রিস্টাব্দ এই সময়কালের মধ্যে দিবাকর সিদ্ধসেন রচনা করেন *ন্যায়াবতার*।

পরবর্তীতে সামন্তভদ্র রচনা করে *আপ্তমীমাংসা*। অঙ্কলদেব ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ রচনা করে অষ্টশতী, ন্যায়বিনিশ্চয় ও কয়েকটি গ্রন্থ। পুস্তক রচনার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এই সময়ে বিদ্যানন্দী রচনা করে (৮০০ খ্রিস্টাব্দ) তত্ত্বার্থ, শ্লোকবার্ত্তিক, আপ্তপরীক্ষা, অষ্টসাহস্রী। মাণিক্যনন্দী রচনা করে পরীক্ষামুখসূত্র। ৮২৫ খ্রিস্টাব্দ প্রভাচন্দ্র রচনা করে প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড। ৯০৫ খ্রিস্টাব্দ অমৃতচন্দ্র সূরি রচনা করে তত্ত্বার্থসার। দশম শতকে নেমিচন্দ্র রচনা করে দ্রব্যসংগ্রহ, গোন্মতসার, লব্ধিসার, ক্ষপণসার ও ত্রিলোকসার নামক গ্রন্থগুলি। এই শতকের মধ্যে অনন্তবীর্য পরীক্ষামুখলঘুসূত্রবৃত্তি। ১২০০ শতকে হেমচন্দ্রসূরি কিছু দার্শনিকগ্রন্থ রচনা করেন - প্রমাণমীমাংসা, কাব্যানুশাসনবৃত্তি, অনেকার্থসংগ্রহ, দ্ব্যাশ্রয়মহাকাব্য, যোগশাস্ত্র ও ইত্যাদি।[১০৯] এইসকল গ্রন্থগুলি থেকে জৈনধর্মের ভাবধারা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা গঠন করা যেতে পারে।

১. ৬) মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ-জৈন দেবভাবনার পরিচয়

উদারপন্থী বৌদ্ধ পালসাম্রাজ্যের পতন ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনসাম্রাজ্যের উত্থান। এই দুই সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের সময়, তুর্কী আক্রমণের ফলে বৌদ্ধধর্মের চরম বিপর্যয় ঘটে। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির অবলুপ্তি ঘটে। রাজা অশোকের সময়ে মগধ সাম্রাজ্যের উন্নতি ঘটে এবং দেশীয় অধিকাংশ মানুষ যখন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। মানুষ তখন সমাজে ব্রাহ্মণ্যদের এতটা আধিপত্যের কথা কল্পনা করতেও পারত না। হীনবল ব্রাহ্মণ্যরা পুনরায় সমগ্র ভারতবর্ষে একাধিপত্যে ঘিরে ফেলতে পারে।[১১০] ব্রাহ্মণরা তাদের দীর্ঘকালের অর্জিত স্বশ্রেণীহিতৈষিতা শক্তির দ্বারা এই বৃহৎকার বৌদ্ধদের পদানত করে, তারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। ব্রাহ্মণ্যেরা বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে সমাজের মূল থেকে তুলে ফেলতে পারেনি। সমাজের অন্তঃস্থলে রয়ে গিয়েছিল ক্ষয়ে যাওয়া বৌদ্ধদের পথচলার ছাপ। দীর্ঘকাল ধরে জৈনধর্ম বাংলাদেশে প্রচলিত থাকলেও এই ধর্মের প্রভাব আজ ভারতীয় সমাজ থেকে প্রায় মুছে গেছে। ঐতিহাসিকগণ জৈন ও আজীবিক এই দুই ধর্মকে বাংলার আদিধর্ম বলে উল্লেখ করেছে। এই আজীবিক সম্প্রদায় জৈনদের সঙ্গে মিশে গেছে বলে হিউয়েন সাং বাংলাদশে বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রাধান্য দেখলেও আজীবিকদের তেমন কোন বর্ণনা দিতে পারেনি।[১১১] নির্গ্রন্থদের প্রাবল্যতা যথেষ্ট লক্ষ করা গেছে এমনটা জানিয়েছিলেন। সমাজে জৈনপ্রভাব বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যের কাছে মাথানত করে কোনঠাসা হয়ে যায়। পুনরায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের মতো এই জৈনধর্ম উজ্জীবিত হয়ে

উঠতে পারেনি। সমাজে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠায় বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের বিলোপ ঘটে। এই পতন ঘটলেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের দৈবীপরিকল্পনার মধ্যে দুইধর্মের প্রভাব আজও রয়ে গেছে।

বৌদ্ধদের প্রধান দুটি দলের মধ্যে মহাযান শাখার মধ্যে দেবদেবী পরিকল্পনার কথা জানা যায়। হীনযানীরা বুদ্ধের বচনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের কাছে নিজের মুক্তি লাভ হল প্রধান লক্ষ। তাদের কোন দেবতার সাহায্য দরকার হয় না মোক্ষলাভের পথে। মহাযানীরা এখানে দার্শনিকতার পরিচয় দেয়। তাদের কাছে নিজের মুক্তির স্থান নেই। প্রথমে পৃথিবীর সকল মানবকূল এবং পশু-পাখিকূলের মুক্তির কথা, পরে আসে নিজের মুক্তির কথা। প্রথম বৌদ্ধমূর্তি কবে আর কোথায় তৈরি হয়েছিল এই নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। গান্ধারশিল্পের আগমনের বহুপূর্ব থেকে ভারতীয়দের গুহাচিত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে। মথুরাশিল্পে কোন বৌদ্ধমূর্তি গড়ে তোলাটা সহজসাপেক্ষ ছিল না। গৌতমবুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন, এমনকি তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রণাম গ্রহণ করতেও দ্বিধা করতেন। গান্ধারশিল্প যেহেতু বাইরে থেকে আসা তাই তাদের কাছে বৌদ্ধমূর্তি গড়ার ক্ষেত্রে সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। গান্ধার শিল্পের হাত ধরে বৌদ্ধদের দৈবীমূর্তিগুলি প্রথম রূপলাভ করেছিল। গুপ্তরাজাদের পরবর্তী পালরাজাদের সময়ে বজ্রযান ও তন্ত্রভাবনার মধ্যে থেকে বেশ কিছু দেবতার মূর্তি রূপায়ন হতে থাকে। যেমন – লোকেশ্বর, উচ্ছুষ্মজম্ভল, মঞ্জুশ্রী, তারা অবলোকিতেশ্বর, বসুধারা, হেরুক, পর্ণশবরী ইত্যাদি দেবতাদের নাম পাওয়া যায়।[১১২] প্রথম দিকে জৈনধর্মের মধ্যে দেবতা মূর্তির অস্বীকারের দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করেছে দৈবীভাবনা। জৈনদের প্রধান দুটি দল শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। এদের মধ্যে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম মূর্তিতত্ত্বের প্রচলন ঘটেছিল সেকথা আর আজ আলাদা করে বলা যায় না। মথুরার কংকালী টিলায় যেসকল প্রতিমা পাওয়া গেছে তাদের কিছু পদ্মাসনে উপবিষ্ট হলেও তাদের পুরুষাঙ্গ উৎকীর্ণ নেই। যেসকল প্রতিমাগুলি কায়োৎসর্গে দণ্ডায়মান সেগুলির পুরুষাঙ্গ উৎকীর্ণ রয়েছে। এইসকল প্রতিমাগুলিতে আধুনিককালের জৈনদের মূল দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনটির সঙ্গে তেমন সদৃশ পাওয়া যায় না।[১১৩] জৈনদের মধ্যে কল্যাণক দিবসের চিত্র অঙ্কন করে মন্দিরে রেখে পূজা করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এইভাবে ধীরে ধীরে জৈন ভাবধারার মধ্যে মূর্তি পূজাপদ্ধতির প্রচলন হয়েছিল বলে অনুমান করা

যায়। জৈনদের কিছু দেবদেবী হল – পদ্মাবতী, অম্বিকা, বৈমান্তিক কিছু দেবতা এবং কিছু গৃহদেবতার পূজার প্রচলন দেখা যায় জৈন সমাজে।

জৈনধর্মের ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কোন ধর্মের উৎপত্তি পূর্বে এই নিয়ে নানা মুনির নানা মত রয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশ ভারতবর্ষ থেকে দুইধর্মেরই প্রভাব অবলুপ্ত প্রায়। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় জৈনধর্মকে বঙ্গের আদিধর্ম বলে ব্যাখ্যা করেছেন। জৈনধর্মের অবলুপ্তির জন্য বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যকে দায়ী করেছেন।[১১৪] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলার সংস্কৃতিকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসংস্কৃতি' বলে সওয়াল করেছিলেন। পালযুগের সময় থেকে বঙ্গদেশে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে স্থানীয় কতকগুলি লৌকিক ধর্ম-সংস্কারের সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়েছিল। এই গ্রহণ-বর্জন আরও পূর্বকাল থেকে শুরু হয়েছিল বলা চলে। তুর্কী আক্রমণ এখানে শুধুমাত্র অণুঘটকের কাজ করে। এই মিশ্রণের ফলে কতকগুলি লৌকিকধর্ম ও মিশ্রসত্ত্ব দেবতাদের উদ্ভব হয়। বাংলা-বিহার জুড়ে মুসলিম আক্রমনের ফলে বৌদ্ধরা প্রাণ বাঁচিয়ে নেপালের দিকে এগিয়ে যায় ও নিজেদের অসিস্ত্ব রক্ষা করে। বাংলায় অবশিষ্ট তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের দেবতারা অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে লৌকিক জনজীবনের সংস্কার, বিশ্বাস, পূজার্চনার মধ্যে নিজেদের প্রতিস্থাপন করে। সমাজে ক্রমে পুরাতন ধর্ম-বিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে নবাগত আদর্শের উপর আশা ও আশ্বাস স্থাপিত হতে থাকে। রক্ষণশীল এই সমাজ পুরাতনকে একেবারে পরিত্যাগ করতে পারে না। তাঁরা নূতনকে আহ্বান জানাতে গিয়ে পুরাতনের রূপান্তর মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। এই নূতন ও পুরাতনের মিশ্রণের ভাবনায় উৎপন্ন দেবতারা নাম পায় মিশ্রসত্ত্ব দেবতা। যারা মঙ্গলকাব্যের দেবতা হিসেবে সুপরিচিত।

মঙ্গলকাব্যের দেবতা মনসা যার সঙ্গে বৌদ্ধদেবী জাঙ্গুলী ও জৈনদেবী পদ্মাবতীর সাদৃশ্য রয়েছে। এই তিনজন দেবী তিনধর্মের মানুষের সর্পভয় দূর করে –

> বৌদ্ধতন্ত্রে জাঙ্গুলীতারা অন্যতম প্রধান দেবতা। বৌদ্ধসাধনায় তারা ও জাঙ্গুলী অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে। তারা আট প্রকার ভয় দূর করেন বলেই তারা নামে অভিহিতা। এই অষ্টভীতির মধ্যে সর্পভীতি অন্যতম। বৌদ্ধজাঙ্গুলী তারার প্রতিরূপ হিসাবে জৈনধর্মে পদ্মাবতী বিষনাশিনী দেবীরূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পদ্মাবতীও সর্পভয়নাশিনী সর্পবিষারোগ্যকারিণী।[১১৫]

জৈনদেবী পদ্মাবতী, বৌদ্ধদেবী জাঙ্গুলী ও মঙ্গলকাব্যের মনসাদেবী আদতে অভিন্না। এই হিন্দু পৌরাণিক দেবতাদের গঠন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির মিল রয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য – অনুমেয় সরস্বতী মূর্তিকল্পনা বহু প্রাচীন খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী। বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা

ও দেবগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ অবশ্য অনেক পরবর্তী সময়ের ঘটনা। বৈদিকযুগ থেকে পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিকযুগে উপনীত বিদ্যাদেবী সরস্বতীর মধ্যে দিয়ে। পৌরাণিক দেবী সরস্বতীর সঙ্গে জৈনদেবী সরস্বতী ও বৌদ্ধদেবী সরস্বতীর সাদৃশ্য রয়েছে। জৈনদের মধ্যে ষোলোটি বিদ্যারদেবী রয়েছেন তাদের মধ্যে শ্রুতিদেবীকে প্রকৃতজ্ঞানের দেবী মনে করা হয়। বৌদ্ধদের সাধনমালায় বজ্রসরস্বতী, বজ্রবীণাসরস্বতী, বজ্রসারদা ও আর্য্যসরস্বতী এই চারজন দেবীর নাম পাওয়া যায়। এইসকল দেবীদের রূপ পরিকল্পনা ও পূজাপদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।[১১৬] হিন্দুদের সর্বমঙ্গলের দেবতা সিদ্ধিদাতা গণেশ মূর্তি বিশ্লেষণে একই কথা মনে হয়। বিঘ্নান্তক অক্ষোভ্যকুলের এই দেবতা প্রধানত দ্বারপাল রূপে উল্লিখিত হয়েছে সাধনমালা গ্রন্থে। বিঘ্ন অর্থে বাধা, কিন্তু বজ্রযানে বিঘ্ন বলতে হিন্দু দেবতা গণেশকে বুঝায়। যেহেতু গণেশ সিদ্ধিদাতারূপে পূজিত হয় তাই বৌদ্ধরা গণেশকে বিঘ্নরূপী মনে করে এবং বিঘ্নান্তক নাম দিয়েছে। ব্রাহ্মণ্যদেবতা গণেশের পূজার প্রচলন জৈনধর্মেও বহাল হতে দেখা গেছে। মঙ্গলকাব্যের দেবতা শিবের ন্যায় জৈনদের মধ্যে দেবতা শিবের প্রচলন ছিল। হরপ্পাসভ্যতা থেকে ঋষভনাথের সময়কাল অনুমান করা হয়। সেই সময়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে তাঁদের মাতৃদেবীর আরাধনা ও শিবপূজার প্রচলনের কথা জানা যায়।[১১৭] বৌদ্ধধর্মে নীলকণ্ঠ নামে একজন দেবতার পূজার কথা জানা যায়। জৈন তীর্থঙ্কর অভিনন্দের সঙ্গে শক্তিদেবী কালিকার নাম সম্পর্কযুক্ত। এই দেবীর চারটি হাত, পদ্মের ওপর অধিষ্ঠিত, প্রথম দুই হাতে বরদ মুদ্রা। দ্বিতীয় দক্ষিণ হাতে সাপ ও বাম হাতে অঙ্কুশ।[১১৮] তেমনি বৌদ্ধধর্মের দেবী কুরুকুল্লা ও হিন্দুদের শক্তিদেবী কালিকার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন অর্থাৎ এই তিনের দৈবীকল্পনার মধ্যে কোথাও না কোথাও যোগসূত্র রয়ে গেছে।

১. ৭) উপসংহার

জৈনধর্মের চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীর ও বৌদ্ধধর্মের শাস্তা গৌতমবুদ্ধ দুজনে ছিলেন পূর্বভারতের মনীষী। তাঁদের ধর্মের আসল প্রচারভূমি ছিল প্রাচ্যদেশের (মগধ, মিথিলা ও অঙ্গ) মধ্যে সীমিত। এই ধর্মের প্রভাব বাংলার মাটিতে নেমে আসাটা এমন কিছু অলৌকিক বা অবাস্তব ভাবার কারণ নেই। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে এই দুই ধর্মের আগে সমাজে ছিল পুরাতন আর্যধর্মের প্রভাব, যা বেদবাহ্য বলে চিহ্নিত হত।[১১৯] সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই ধর্মগুলির মধ্যে উত্থান-পতন সংঘটিত

হয়েছে। অস্তিত্বের লড়াইয়ে কোনো ধর্মমত হারিয়ে ফেলেছে তার নিজস্ব আকৃতি। আপন ধর্মের আদর্শকে বাঁচিয়ে রেখেছে অন্য মতের মধ্যে দিয়ে। যেমন – গুপ্তযুগে (আনুমানিক ৩২০-৫৫০ খ্রিস্টাব্দে) পূর্বে ওড়িশা থেকে পশ্চিমে মথুরা পর্যন্ত শ্বেতাম্বর জৈনরা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। দিগম্বর জৈনরা দাক্ষিণাত্য, মহীশূর ও দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করেছিল।[১২০] একইভাবে বৌদ্ধধর্ম একদা ভারতবর্ষের বৃহৎ অংশ জুরে রাজ্য বিস্তার করলেও ধীরে ধীরে তা লোপ পেয়েছে ভারতের মাটিতে। এশিয়াসহ বাইরের কিছু দেশকে এই ধর্মের মহিমায় মোহিত করে রেখেছে। ভারতীয় ভূমিতে গৌতম বুদ্ধের ধর্ম প্রতিষ্ঠার ভূমি মোটে মসৃণ ছিল না –

> It is true that the distinction appeared clear enough to Gautama and his successors; but his was largely because the Brahmanism against which they maintained their polemic was after all merely the popular aspect of Brahmnism. From a study of Buddha's dialogues, it would appear that he never encountered a capable exponent of the highest vedantic idealism, such a one as Yajnavalkhya or Jataka; or if Alara is to be considered such, Gautama took expectation to the Atmanistic terminology rather than its ultimate significance. It appeared toGautama and to his followers then and now that the highest truths-especially the truth embodied by Buddhists in the phrase An-atta, no-soul-lay rather without than within the Brahmanical circle.[১২১]

জৈনদের কাছে জীবনে কর্মের সাধনা সব থেকে বড় সাধনা। তাঁদের সাধনার আর একটি অঙ্গ হল ত্যাগ ও পবিত্রতা। কথিত আছে মহাবীরের থেকে উত্তরকালে গৌতমবুদ্ধ এই ধারণাকে গ্রহণ করেছিলেন।[১২২] গৌতম বুদ্ধের প্রচলিত ধর্মমত দীর্ঘকাল ধরে ভারতভূমিতে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। কালের নিয়মে এই মতাদর্শের অবসান ঘটেছে কিন্তু নবআগত ধর্মমতের মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বীজ বপন করে রেখে গেছে। মুসলমান শাসনের গোড়ার দিকে সমাজকে হিন্দুসমাজ বলা যেতে পারে কেননা এই সময়ে সমাজে উঁচুনীচুর ভেদাভেদ সমান হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।[১২৩] এই সময়ে মহাযান-উপাস্য অনেক দেবদেবী ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক উপাসনার মধ্যে রূপবদল করে নিজেদের রক্ষা করেছিল। এই সময়ে যেসকল সাহিত্য তৈরি হয়েছিল সেখানেও দেখা যায় সাহিত্যের গঠনে আমূল পরিবর্তন এসেছিল।

টীকা

১) ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ (২০০০)। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।* কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১১।

২) জাতক: সুত্তপিটকের খুদ্দকনিকায়ের দশম গ্রন্থের নাম জাতক। জাতক শব্দের অর্থ হল জাত বা জন্মলাভ করাকে বোঝায়। ভারতের প্রাচীনতম গল্পসংগ্রহের নাম হল *জাতক* বা পালি ভাষায়জাতকথ বন্ননা। জাতক হল ভগবান শাক্যমুনি বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনির সঙ্কলন। অনেকের মতে জাতক হল বিশ্বের সমগ্র ছোট গল্পের উৎস।

সূত্র: ভট্টাচার্য, বেলা (কার্যকরী সম্পাদিকা) ও সম্পাদক মণ্ডলী (২০০৩-২০০৪)। *বৌদ্ধকোষ*। চতুর্থ খণ্ড।কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৫৯৯-৬০০।

৩) হরপ্পা সভ্যতা: এই আবিষ্কারের পর থেকে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সময়কালকে আরও প্রাচীনতার দিকে প্রসারিত করেছে। ১৮৭৫ সালে ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিকবিদ কানিংহাম প্রথম হরপ্পার লিপি আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে দয়ারাম সাহানি ও রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় নামে দুই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদের অনুসন্ধানের ফলে এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে। হরপ্পা সভ্যতার কোন লিখিত সাহিত্য এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। প্রায় ২০০০ টি মতো সীল উদ্ধার করা হয়েছে যেগুলি কিছু কিছু পাঠোদ্ধার করা হয়েছে।

সূত্র: চট্টোপাধ্যায়, সুনীল (২০০৩)। *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ১৭-১৮।

৪) প্রথম তীর্থঙ্কর: জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর ছিলেন ঋষভনাথ যাকে আদিনাথ ও বলা হয়। তাঁর বাহন ছিল ষাড়, বর্ণ ছিল সোনালী এবং উচ্চতা ছিল ৫০০ ধনুষ। এই জৈন তীর্থঙ্করের অস্তিত্ব হরপ্পাসভ্যতার সময় থেকে ছিল। জৈনরা বিশ্বাস করেন জৈন কালচক্রের প্রত্যেক অর্ধে চব্বিশ জন করে তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন।

সূত্র: সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু (২০০৯)। *ভারতীয় দর্শন।* প্রথম খণ্ড। কলকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স। পৃ. ৫৯।

৫) সেন, সুকুমার (১৯৭৮)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স। পৃ. ৮০-৮১।

৬) তদেব। পৃ. ৮১।

৭) R. Bates Thomas (2010). *Gramsci and the Theory of Hegemony.* University of Pennsylvania Press. পৃ. ৩৫১-৩৬৬।

৮) শ্যামসুখা, পূরণচাঁদ (১৩৫৫)। *জৈন দর্শনের রূপরেখা*। কলকাতা: আর, এন, চ্যাটার্জি এন্ড কোং। পৃ. ১।

৯) চৌধুরী, ভূদেব (১৯৯৮)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আর, এন, চ্যাটার্জি এন্ড কোং। পৃ. ১৭৫।

১০) ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০০)। তদেব। পৃ. ২৭।

১১) বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ২৮৮।

১২) তদেব। পৃ.৩২৬।

১৩) সেনগুপ্ত, পল্লব (২০১১)। *পূজাপার্বণের উৎসকথা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। পৃ. ৩৬।

১৪) জাগরণ পালা: মঙ্গলগানকে কোন কোন সময় সাধারণ অর্থে জাগরণ ও বলা হয়ে থাকে। প্রাক-চৈতন্য যুগে লিখিত সাহিত্য শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় কাব্যে এই জাগরণ শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। সে যুগে মানুষ দুর্গা পূজা উপলক্ষে রাত্রি জেগে গান করত, তাই হয়ত এরূপ নামকরণ। চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পুঁথির ওপর লেখা পাওয়া গেছে জাগরণ পুঁথি শব্দটি।

সূত্র: ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০০)। তদেব। লিমিটেড। পৃ. ৫৯-৬১।

১৫) দত্ত, বিজিতকুমার ও দত্ত, সুনন্দা (সম্পাদিত) (২০০৯)। *মানিকরাম-বিরচিত ধর্মমঙ্গল* । কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ১৯।

১৬) বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পাদিত) (২০০২)। তদেব। কলকাতা: রত্নাবলী। পৃ. ১৫১-১৫২।

১৭) বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। তদেব। পৃ. ২৫৮।

১৮) দাশ গুপ্ত, শ্রীতমোনাশ (সম্পাদিত) (২০১১)। *সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ* । কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।পৃ. ৫২-৫৩।

১৯) বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। তদেব। পৃ. ১১৬।

২০) বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পাদিত) (২০০২)। তদেব। কলকাতা: রত্নাবলী। পৃ. ২১৩।

২১) নস্কর, সনৎকুমার (সম্পাদিত) (২০১৫)। *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল*। কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ। পৃ. ১৮৮।

২২) দাশ গুপ্ত, শ্রীতমোনাশ (সম্পাদিত) (২০১১)। তদেব। পৃ. ২৬।

২৩) বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। তদেব। পৃ. ৩৪৩।

২৪) ডোমেরা সাধারণত নগরের বাইরে কুঁড়ে বাঁধিয়া বাস করিত, বাঁশের তাঁত ও চাঙারি তৈরি করিয়া বিক্রয় করে তাঁদের দিনাতিপাত হত। ব্রাহ্মণরা তাঁদের স্পর্শ করা থেকে দূরে থাকত।

সূত্র: রায়, নীহার রঞ্জন (১০৮২)। *বাঙালির ইতিহাস*। আদি পর্ব। কলকাতা: লেখক সমবায় সমিতি। পৃ. ১০৭।

২৫) দত্ত বিজিতকুমার ও দত্ত সুনন্দা (সম্পাদিত) (২০০৯)। *তদেব* । পৃ. ৪৪৫-৪৪৬।

২৬) বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। তদেব। পৃ. ৩৮৯।

২৭) দাসগুপ্ত, জয়ন্তকুমার (সম্পাদিত) (২০০৯)। *কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ২৭।

২৮) মুখোপাধ্যায়, নিশীথ (সম্পাদিত) (১৪১৪)। *রায়গুনাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল* । কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ। পৃ. ৪৯-৫০।

২৯) পদ্মাবতী: আরাকান রাজসভার কবি আলাওল, যিনি ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে, মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় পদ্মাবতী রচনা করেন। এটি মূলত তাঁর অনুবাদ কাব্য, মালিক মোহাম্মদ জায়সীর হিন্দি কাব্যে পদুমাবৎ থেকে। এই কাব্যের রোসাঙ্গরাজ প্রশিস্ত, নায়িকা পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা, নায়ক রত্নসেনের সৌন্দর্য বর্ণনা ও বিবাহ বর্ণনা উক্ত অংশগুলিতে মঙ্গলকাব্যের বর্ণনা পদ্ধতির রীতি ধরা পড়েছে।

সূত্র: বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পাদিত) (১৯৯২)। *পদ্মাবতী জায়সী ও আলাওল*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। পৃ. ১৩৫।

৩০) মুখোপাধ্যায়, নিশীথ (সম্পাদিত) (১৪১৪)। তদেব। পৃ. ৮।

৩১) তদেব। পৃ. ৮।

৩২) দোহার: ভগবদভক্তির জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক যে গান গাওয়া হয়, তখন তাকে কীর্তন বলে। এই কীর্তন গানের সময় – কীর্তন গানের আসরের পেছনের দিকে কিছু গায়ক থাকেন। যারা মূল গায়কের গানকে অনুসরণ করে পদের নির্দিষ্ট স্থান থেকে গান শুরু করে মূল গায়ককে সাহায্য করেন তাঁদের দোহার বলা হয়। এই গায়কেরা আসরে বসে পদরচনা করতে পারেন নিজেদের মতো করে। এই পদগুলি রচনার ক্ষেত্রে মূল গায়কের তেমন কোন সম্পর্ক থাকে না। কীর্তনের সময় আসরে দোহারদের প্রয়োজনীয়তা বেশ গুরুত্ব রাখে।

সূত্র: মিত্র, খগেন্দ্রনাথ (১৩৫২)। *কীর্তন* । কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। পৃ. ১-৫৪।

৩৩) বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। তদেব। পৃ. ৯৮।

৩৪) নস্কর, সনৎকুমার (সম্পাদিত) (২০১৫)। *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল*। কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ। পৃ. ২০২- ২০৩।

৩৫) মুখোপাধ্যায়, নিশীথ (সম্পাদিত) (১৪১৪)। তদেব। পৃ. ৫২-৫৩।

৩৬) দাসগুপ্ত, জয়ন্তকুমার (সম্পাদিত) (২০০৯)। তদেব। পৃ. ২২।

৩৭) বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। তদেব। পৃ. ৩৯।

৩৮) তদেব। পৃ. ১৬৩।

৩৯) দাসগুপ্ত, জয়ন্তকুমার (সম্পাদিত) (২০০৯)। তদেব। পৃ. ৩০২।

৪০) বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। তদেব। পৃ. ১৬৫।

৪১) নস্কর, সনৎকুমার (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ। পৃ. ১৯২।

৪২) দত্ত বিজিতকুমার ও দত্ত সুনন্দা (সম্পাদিত) (২০০৯)। তদেব। পৃ. ১৯।

৪৩) দাসগুপ্ত, জয়ন্তকুমার (সম্পাদিত) (২০০৯)। তদেব। পৃ. ৮।

৪৪) চতুরার্য সত্য: বৌদ্ধধর্মে দুঃখ সত্য বলে ব্যাখ্যা হলেও, বুদ্ধোপদেশ কিন্তু দুঃখবাদ নয়। বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে – এই পৃথিবীতে দুঃখ আছে সত্যি। সেই দুঃখের নিরোধ কিংবা দুঃখনিরোধের উপায় জানা থাকলে দুঃখের স্বরূপ জানার প্রচেষ্টাকে আর হতাশাব্যঞ্জক মনে হবে না। এই চার আর্য্যসত্য বোধ মানুষকে হতাশা বা নিরাশা থেকে ধীরে ধীরে আশা-র দিকে চালিত করে। এই চার আর্যসত্য হল বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিস্বরূপ।

সূত্র: বড়ুয়া, দীপক কুমার (২০০৮)। *বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা। পৃ. ১৫।

সূত্র: চৌধুরী, সুকোমল (২০১৪)। *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ – ২। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ২৫-৫০।

৪৫) প্রতীত্যসমুৎবাদ: বৌদ্ধধর্ম-মতের মধ্যে প্রতীত্যসমুৎপাদ মতটি অত্যন্ত কঠিন মত। প্রতীত্য-সমুৎপাদের দ্বারা সংসারের নানাবিধ দুঃখ-দুর্দশার মূলীভূত কারণগুলিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছ। দুঃখের এই কারণগুলিকে নিঃশেষে অপসৃত হলে ভবিষ্যতে আর দুঃখের উৎপত্তি হবে না। প্রতীত্যসমুৎপাদ থেকে আমরা জানতে পারি আমাদের জীবনের দুঃখ-দুর্দশার জন্ম হয়েছে পরজন্মের কৃতকর্মের ফলে।

সূত্র: চৌধুরী, সুকোমল (২০১৪)। তদেব। পৃ. ৯৫-১২৫।

৪৬) পঞ্চস্কন্ধ: রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি ধারণাকে ঘিরেই তৈরি হয় পঞ্চস্কন্ধ, যা আমাদের ব্যক্তিসত্ত্বাকে গঠন করে। এখানে গঠন শব্দের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধ একত্রিত হয়ে একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বাকে তৈরি করে। এই তত্ত্বটি মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থে একটি আখ্যানের মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভিক্ষু ও নাগসেনের কথোপকথন রয়েছে।

সূত্র: দাশগুপ্ত, শশিভূষণ (১৩৯০)। *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি* । কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। পৃ. ১-৮।

৪৭) অষ্টাঙ্গিক আর্য্যমার্গ: দুঃখনিরোধ হওয়ার উপায় হিসেবে ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ-এর কথা বলেছিলেন। অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে থাকে - সম্যক দৃষ্টি, (সম্যক ধারণা বা চিন্তা) (Right View), সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক আচরণ, সম্যক জীবিকা (জীবনধারণ), সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি (মনন), সম্যক সমাধি (একাগ্রতা)। এখানে *সম্যক* শব্দের অর্থ হল সঠিক। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের উপর ভিত্তি করে বৌদ্ধধর্মের দশশীল, অষ্টশীল এবং পঞ্চশীলের উৎপত্তি।

সূত্র: মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার (অনূদিত) (২০১৫)। *বৌদ্ধ দর্শন (মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বিরচিত)* । কলিকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ২১।

৪৮) ষোড়শ মহাজনপদ: মহাজন শব্দের অর্থ হল বিশাল সাম্রাজ্য। বৌদ্ধ গ্রন্থে বেশ কয়েকবার এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধগ্রন্থ অঙ্গুত্তরনিকয়া মহাবস্তুতে ষোলোটি মহাজনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যা বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের পূর্বে ভারতের উত্তর-উত্তর পশ্চিমাংশে উত্থিত এবং বিস্তৃত হয়। এই ষোলোটি দেশ হল - অবন্তী, অস্মক, অঙ্গ, কম্বোজ, কাশী, কুরু, কোশল, গান্ধার, চেদি, বজ্জি বা বৃজি, বৎস, পাঞ্চাল, মগধ, মৎস্য বা মচ্ছ, মল্ল, শূরসেন। যাদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল ষোড়শ মহাজনপদ।

সূত্র: চক্রবর্তী, রজনীকান্ত (২০০৯)। *গৌড়ের ইতিহাস*। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে। কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৫০।

৪৯) তেলপত্ত জাতক: তেলপত্ত জাতক হল জাতক সংখ্যা ৯৬। যেখানে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের শতপুত্রের মধ্যে একজন হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর যৌবনাবস্থায় প্রত্যেকবুদ্ধগণ রাজভবনে ভোজনের জন্য

এলে বোধিসত্ত্ব তাঁদের দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। একদিন তাঁদের প্রণাম জানিয়ে নিজের রাজা হওয়ার বাসনার কথা জানান। তখন তাঁরা তাকে উপদেশ দেন যে, ওই রাজ্যের দ্বিসহস্র যোজন দূরে অবস্থানকারী গান্ধার রাজ্যে সাত দিনের মধ্যে পৌঁছাতে পারলে বোধিসত্ত্ব রাজা হতে পারবেন। তাঁর যাত্রাপথে ছিল ভয়ঙ্কর যক্ষিণীদের আনাগোনা ও প্রাণনাশের সম্ভাবনা। বোধিসত্ত্ব প্রত্যেক বুদ্ধগণের আশীর্বাদ নিয়ে রওনা হন। বন পথে বিপদ এলেও ইন্দ্রিয়দমন করে যক্ষিণীদের হাত থেকে নিস্তার পান। তাঁর এই সংযম দেখে গান্ধারবাসীরা তাকে তক্ষশীলার রাজার পদে বরণ করে নিয়েছিলেন।

সূত্র: মুখার্জী, বন্দনা (২০০৪ – ২০০৫) ভট্টাচার্য, বেলা (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধকোষ*। পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৬৪৯।

৫০) অঙ্গুত্তরনিকায়: পালি সুত্তপিটকের অন্তর্গত চতুর্থ নিকায় বা সূত্রসংগ্রহের নাম অঙ্গুরত্তরনিকায়। এই নিকায়ের মধ্যে আনুমানিক মোট ২৩০৮টি সূত্র রয়েছে। গ্রন্থটি এগারটি নিপাত বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি নিপাত আবার কয়েকটি বর্গে বিভক্ত। এই নিকায়গুলির মধ্যে সমাজের বিবিধ বিষয়গুলিকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন –

ক) একনিপাত যেখানে রয়েছে তথাগতের কথা, স্বামী-স্ত্রীর কথা, নির্বাণলাভের কথা ইত্যাদি বিষয় গুলি।

খ) দুক নিপাত যেখানে রয়েছে দুরকম বুদ্ধ, দুই প্রকার বনবাসের ও দুই প্রকার দানের বর্ণনা এছারাও অন্যান্য বিষয়ের কথাও এখানে উল্লেখিত রয়েছে।

গ) তিকনিপাত এই তিন সংখ্যা যুক্ত নিপাতে রয়েছে তিন প্রকার পাপকর্ম, তিন প্রকার দেবতার দূতের বর্ণনা ইত্যাদি।

ঘ) চতুক্কনিপাত এখানে রয়েছে পাপসঞ্চয়ের চার কারণ, ধর্মবিনয় থেকে বিমুক্তির চার বর্ণনা ইত্যাদি।

ঙ) পঞ্চকনিপাত যেখানে রয়েছে শৈক্ষের নির্বাণলাভের পাঁচটি বল, পাঁচটি নীবরণ ও ইত্যাদি।

চ) ছক্কনিপাত এই ছয় সংখ্যায় থাকবে ভিক্ষুর ছয়টি পালনীয় ধর্মের কথা, ছয়টি উচ্চতম বিষয়ের কথা ইত্যাদি।

ছ) সত্তকনিপাত এই সাত সংখ্যার নিপাতে সাতপ্রকার শ্রদ্ধা, শীল ও ধনের বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য কিছু বিষয়ও এখানে স্থান পেয়েছে।

জ) অটঠকনিপাত এই আট সংখ্যার নিপাতে রয়েছে আটপ্রকার বন্ধন, আটপ্রকার দান ইত্যাদি।

ঝ) নবকনিপাত এখানে রয়েছে নয়প্রকার ব্যক্তি, নয়প্রকার সংজ্ঞা ও চিন্তার কথা ও ইত্যাদি বিষয়।

ঞ) দসকনিপাত এই দশ সংখ্যার বিষয়ে রয়েছে দশ প্রকার বুদ্ধি, ধর্মের দশ মুলতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি।

ট) একাদসকনিপাত এই সংখ্যায় রয়েছে নির্বাণে পৌঁছাবার এগারটি পথের বর্ণনা। আসবজ্ঞান লাভের জন্য এগারোটি গুরুধর্ম বর্ণনা ও ইত্যাদি বিষয়গুলি।

সূত্র: ভট্টাচার্য, বেলা (সম্পাদিত) চৌধুরী, বিনয়েন্দ্র (১৯৮৫- ৮৬)। *বৌদ্ধকোষ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৫-৭।

৫১) প্রথম মহাসভা: প্রথম সংগীতি (খ্রিস্টপূর্ব ৪০০) বুদ্ধের মহাপরিনির্বানের মাত্র তিনমাস পরে মগধের রাজধানী রাজগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। বুদ্ধের পরিনির্বানের পর এটি প্রথম আয়োজিত ধর্মসভা বলে এটা প্রথম সংগীতি নামে চিহ্নিত হয়। এই সভার বিবরণ শুধু পালি সাহিত্যেই নয়, সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিনয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই সভায় বুদ্ধের ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত বাণী একত্রিত করার উদ্দেশ্যে, তাঁর প্রবীণ শিষ্য মহাকাশ্যপ স্থবির উক্ত অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন। রাজা অজাতশত্রু এই অধিবেশন সুসম্পন্ন করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন। এই সংগীতিতে সর্বমোট পাঁচশো জন অর্হত্বপ্রাপ্ত স্থবির যোগদান করেছিলেন।

সূত্র: হালদার (দে), মণিকুন্তলা (২০১০)। *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস*। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ – ৪। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ১১২-১২০।

৫২) দ্বিতীয় মহাসভা: দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতি (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৪) সংঘটিত হয় রাজা শিশুনাগ পুত্র অশোক বা কালাসোকের রাজত্বে। এই সভার সূচনাতে বলা হয় বুদ্ধ তাঁর উপদেশ রক্ষা করার উপায় হিসেবে তাঁর বচনের যথেচ্ছ ব্যাখ্যার বন্ধকতার কথা বলা হয়। এখানে উঠে আসে চতুর্সত্যের কথা, বা বুদ্ধ বর্ণিত চার আর্যসত্যের

নাম। বুদ্ধ বচনকে রক্ষা করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দীপবংশ থেকে জানা যায় এই অধিবেশন আটমাস ধরে চলেছিল।

সূত্র: হালদার (দে), মণিকুন্তলা (২০১০)। তদেব। পৃ. ১২১-১২৭।

৫৩) তৃতীয় মহাসভা: তৃতীয় মহাসভা (খ্রিস্টপূর্ব ২৫০) সংঘটিত হয় মৌর্যসম্রাট অশোকের রাজত্বকালে। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে স্থানীয় বহু লৌকিকসম্প্রদায়ের মিশ্রণের ফলে বৌদ্ধধর্মকে বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। সংঘের মধ্যে বিশৃঙখলার সৃষ্টি হয়। এরপরের অধিবেশিত হয় তৃতীয় মহাসভা। যার লক্ষ ছিল বৌদ্ধধর্মকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা। এই সভার কার্যাবলীতে এই লক্ষণ ধরা পড়ে। এখানে থেরবাদীদের বৌদ্ধধর্মের একমাত্র মূল সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সূত্র: হালদার (দে), মণিকুন্তলা (২০১০)। তদেব। পৃ. ১২৭- ১৩৯।

৫৪) দাশ, আশা (১৯৬৯)। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। পৃ. ৬।

৫৫) দাশগুপ্ত, নলিনিনাথ (১৩৫৫)। *বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: এ. মুখার্জী। পৃ. ৪০।

৫৬) দার্শনিক যুগ: জ্ঞানের অন্যতম প্রাচীন একটি শাখা হল দর্শন। ফিলোসফি শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেছিলেন গ্রিক চিন্তাবিদ ও গণিতজ্ঞ পিথাগোরাস। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ অব্দের দিকে শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। নন্দনতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, যুক্তি, অধিবিদ্যা, সামাজিক দর্শন ও রাজনৈতিক দর্শন এই সমগ্র বিষয়ের ওপর দার্শনিকদের সমান দক্ষতা থাকে। পৌরাণিক যুগের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এগুলি মানুষকে বিপথে চালিত করতে থাকে। সমাজে কিছু মানুষের মনে সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক হয় এবং মানুষ সব বিষয়কে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে থাকে। এই সময়কালকে বলা হয় দার্শনিক যুগ।

সূত্র: দত্ত, রমেশ (১৪০৩)। *প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড: প্রথম ভাগ। কলকাতা: দীপায়ণ। পৃ. ৩২।

৫৭) আঠারোটি বৌদ্ধ উপশাখা: বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় যে বজ্জিপুত্তরা দশটি বস্তুর উপাস্থাপন করে সংঘের মধ্যে ফাটল ধরায়। বৌদ্ধধর্মের প্রধান দুটি শাখার উৎপত্তি হয় – হীনযান ও মহাযান। এই মহাযান সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তন করে মহাসাংঘিকরা। যারা পরে আবার সাতটি দলে ভাগ হয়ে যায় - ক) একব্যবহারিক, খ) চৈতিক বা চৈতক গ) কৌকুট্টিক বা গোকুলিক ঘ) বহুশ্রুতীয় ঙ) প্রজ্ঞপ্তিবাদ চ) পূর্বশৈল ছ) অপরশৈল। হীনযান বা স্থবিরবাদীদের এগারোটি শাখার উৎপত্তি হয় - ক) মহীশাসক খ) বাৎসীপুত্রীয় গ) সম্মিতীয় ঘ) ছন্নগারিক ঙ) ভদ্রযানীর চ) ধর্মত্তোরীয় ছ) সর্বাস্তিবাদ জ) ধর্মগুপ্তিক ঝ) কশ্যপীয় ঞ) হৈমবত ট) সংক্রান্তিক।

সূত্র: হালদার (দে), মণিকুন্তলা (২০১০) । তদেব। পৃ. ১৭৫।

৫৮) সেন, সুকুমার (১৯৭৮)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স। পৃ. ২।

৫৯) হীনযান বা থেরবাদ: বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজনের সময়ে মূলত বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার এই চারটি দল একত্রিত হয়ে প্রধান দুটি দলে বিভক্ত হয়ে, নাম পায় মহাযান ও হীনযান। হীনযান এই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক উক্ত দুই দলের মিশ্রণ ঘটে। থেরবাদীরা নিজেদের প্রাচীন সম্প্রদায় বলে মনে করেন। এই থেরবাদীদের সাহিত্যে দশপারমিতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সূত্র: চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত) হালদার (দে), মণিকুন্তলা (২০১০)। *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ২০৯-২১৫।

৬০) মহাযান: মূল বৌদ্ধ সম্প্রদায় হীনযান থেকেই মহাযান সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছে। দ্বিতীয় মহাসংগীতির (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৪) সময় কিছু ভিক্ষু নিজস্ব উদারপন্থী ভাবনাকে সামনে টানতে গিয়ে দল থেকে বিতারিত হয়ে। তারা যে নতুন দল তৈরি করে তার নাম হয় মহাযান। এদের মূল আদর্শ হল বুদ্ধত্বলাভ করা। হীনযানদের এই মতবাদীদের মত কিছুটা ভিন্ন হয়ে ধরা পড়েছিল।

সূত্র: হালদার (দে), মণিকুন্তলা (২০১০) চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত)। তদেব। পৃ. ২০৯-২১৫।

৬১) বৈভাষিক: হীনযান শাখার উপশাখায় *বিভাষা*-কে বিশ্বাস করে এগিয়ে যায় বলে বলা হয় বৈভাষিক। রাজা কনিষ্কের সময় (প্রথম শতাব্দী) জালন্ধরের চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসভা বৌদ্ধশাস্ত্র অভিধর্ম পিটক সংশোধিত হয়। তারা

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে বিশ্বাস করে বলে এদের Realistic বলা হয়। এই ভাধারার ধার্মিকরা জড়বস্তু ও মন উভয়ের স্বতন্ত্র সত্ত্বায় বিশ্বাস করে। এদের আবার সর্বাস্তিবাদীও বলা হয়ে থাকে। তারা বস্তুর অনুভূতি-বেদ্যকে বেশি প্রাধান্য দেয়।

সূত্র: বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার (১৯৯৫)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সি। পৃ. ১৭৯।

৬২) সৌত্রান্ত্রিক: তক্ষশিলার কুমারলব্ধকে এই মতের প্রতিষ্ঠাতা বলে ধরে নেওয়া হয়। এই মতাবলম্বীরা *বিভাষা*র চেয়ে বেশি গৌতম বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণীকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে মেনে চলে। বস্তুসত্বার চেয়ে চিৎসত্ত্বাকে এখানে বেশি প্রাধান্য দেয়। তারা মনে করে বিজ্ঞানের বাইরে পঞ্চস্কন্ধের কোন অস্তিত্ব নেই। এরা কিছুটা অবাস্তব, অভাবস্বভাব এবং আনন্দ-নিরানন্দ-বোধরোহিত। এদের দেশিরভাগ ধর্মগ্রন্থ লিখিত রয়েছে পালি ভাষায়।

সূত্র: বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার (১৯৯৫)। তদেব। পৃ. ১৭৯-১৮০।

৬৩) মাধ্যমিক: মহাযান সম্প্রদায় প্রধান দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়, যথা - মাধ্যমিক ও যোগাচার। এই মাধ্যমিক সম্প্রদায় নাগার্জুনের মধ্যমকশাস্ত্রকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। এদের কাছে 'শূন্যতা' মুখ্যরূপ ভূমিকা পালন করেছিল। নাগার্জুন তাঁর গ্রন্থে কারিকার সাহায্যে শূন্যের উপস্থাপন করে। বুদ্ধের মধ্যমপন্থাকে সামনে রেখে শূন্যের দর্শনকে জনসমক্ষে আনা হয়েছিল। তাঁদের মতে সংসার, নির্বাণ ও শূন্যতা এই তিনকে একই সূত্রে বাঁধা। তাঁরা বলেছেন - অস্তি-নাস্তি, আত্মা-অনাত্মা, নিত্য-অনিত্য এগুলিকে দিয়ে মধ্যমপন্থাকে বিচার করা সম্ভব নয়।

সূত্র: হালদার (দে), মণিকুন্তলা (২০১০) চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত)। তদেব। পৃ. ২০৫-২০৭।

৬৪) যোগাচার: নালন্দা বিহারে নাগার্জুন যখন অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর একদল অনুগামীদের মনে প্রশ্নের উদয় হয়, যা ঘিরে পরবর্তীতে বিবাদ হয় ও নতুন দলের উদ্ভব হয়। এই নতুন দলটি যোগাচার সম্প্রদায় বা বিজ্ঞানবাদ নামে পরিচিত। কথিত আছে এই দলের প্রতিষ্ঠাতা মৈত্রেয়নাথ, যার শিষ্য ছিলেন অসংগ। এই মতাবলম্বীরা বোধিলাভের জন্য যোগমার্গকে বেছে নিয়েছিলেন। এই সম্প্রদায়ীরা মনে করেন তাঁদের কথিত দশটি সাধনমার্গের স্তর অতিক্রম করলে বোধিসত্ত্ব লাভ করা যাবে।

সূত্র: হালদার (দে), মণিকুন্তলা (২০১০) চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত)। তদেব। পৃ. ২০৭-২০৯।

৬৫) শূন্যবাদ: শূন্যবাদের প্রবক্তা হলেন নাগার্জুন। তিনি এই তত্ত্বের অর্থ করেছেন –*প্রতীত্য সমুৎ*পাদ–এর দ্বারা। বিশ্বেরচ সর্বাধিক জড়-চেতন পদার্থ কোন প্রকার স্থির, অচলত্ব থেকে সম্পূর্ণ শূন্য। তিনি জানান বিশ্বে ঘটনাসমূহ রয়েছে বস্তুসমূহ নয়। তিনি তাঁর গ্রন্থে পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের মুখে যুক্তি সাজিয়ে শূন্যবাদের ব্যাখ্যা করেছেন।

সূত্র: মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার (অনূদিত) (২০১৫)। *রাহুল সংকৃত্যায়ন বিরচিত বৌদ্ধ দর্শন*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ৭৪।

৬৬) কালচক্রযান: অদ্বয়বজ্রসংগ্রহে মহাযানকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে – পারমিতা নয় ও মন্ত্রনয় । এই মন্ত্রনয়-এর মধ্যে রয়েছে তিনটি ভাগ যথা – কালচক্র যান, বজ্রযান ও সহজযান। কালচক্রযান হল তিনধারার মধ্য আদিতম ধারা। কাল ও চক্র শব্দ দুটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করলে দাঁড়ায় প্রজ্ঞা ও উপায় এর সংশ্লেষণজনিত শূন্যতাবোধ।

সূত্র: বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার (১৯৯৫)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সি। পৃ. ১৮৩।

৬৭) বজ্রযান: বজ্র শব্দের বৌদ্ধতাত্ত্বিক অর্থ হল শূন্যতা । বজ্রযানে সমস্ত সত্ত্বা বজ্র লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ শূন্য-স্বভাব। এইভাবে বজ্রদেবতা, বজ্রগুরু, বজ্রোপাসক প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দগুলির উদ্ভব হয়েছে। বজ্রোযাঙ্কিত কিছু বৌদ্ধ দেবদেবীর উদ্ভব হয়েছে। এই মতাবলম্বীরা মন্ত্র, মণ্ডলী ও মুদ্রার সাহায্য দেবতাদের উপলব্ধির কথা বলেছেন। সমালোচকেরা মনে করেন – মন্ত্রযান নয় বজ্রযান থেকে বৌদ্ধদেবতাদের উদ্ভব। কালচক্রযান ও বজ্রযানের মধ্যে তেমন কিছু পার্থক্য দেখা যায় না।

সূত্র: বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার (১৯৯৫)। *তদেব।* পৃ. ১৮৩-১৮৪।

৬৮) সহজযান: তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে ‘সহজ’ শব্দের অর্থ হল মহাসুখ। বজ্রযানের একটি শাখা হল সহজযান। কিছু গবেষক আবার মনে করেন বজ্রযানের শেষ পরিণতি সহজযান। পালরাজাদের সময়ে এই ধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এখানে করুণা হল পুরুষ, শূন্যতা হল প্রকৃতি। সমকালীন মানুষেরা এই শাখার ধ্যানধারণা, মন্ত্রতন্ত্র ও মুদ্রাধারণের রীতিগুলিতে বেশি করে আকৃষ্ট হয়ে, এগুলিকে বুদ্ধত্বলাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলে মনে করেন। বৌদ্ধ সহজিয়ারা প্রচার করেন যে ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং স্ত্রী গোপার সঙ্গে সহজ সাধনায় লিপ্ত হয়েছিলেন। চর্যাপদে (১৯০৭) উত্থিত যে – লুইপাদ, সরহপাদ, কাহ্নপাদ প্রমুখ ব্যক্তিরা এই সহজযান সাধনার সাধক ছিলেন।

সূত্র: হালদার (দে), মণিকুন্তলা (২০১০) চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত)। তদেব। পৃ. ২২৮-২৩৪।

৬৯) প্রজ্ঞাপারমিতা: মহাযান সম্প্রদায়ের বর্ণিত পারমিতার ষষ্ঠ স্থান অধিকারী পারমিতা হল এই প্রজ্ঞাপারমিতা। প্রাথমিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পারমিতার দশম স্থান অধিকার করে আছে এই প্রজ্ঞা পারমিতা। প্রথমে প্রজ্ঞা বলতে বোঝাতো বুদ্ধি-তীক্ষ্ণতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। এই পারমিতার দ্বারা বিপশ্যনা প্রাপ্তি হয়।

সূত্র: চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত) (২০১৪)। তদেব। পৃ. ৩৯২-৪০৩।

৭০) দাশ, আশা (১৯৬৯)। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি* । কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। পৃ. ১৩।

৭১) জিন: অরিহন্ত (জিন) একজন মানুষ যিনি সব ধরণের আন্তরিক আবেগকে জয় করেছেন এবং কেবল জ্ঞান লাভ করেছেন। দুই ধরনের অরিহন্ত হয় – সামান্য ও সিদ্ধ। সামান্য বা সাধারণ বিজয়ী যে কেবলীরা শুধুমাত্র নিজের মোক্ষের কথা ভাবেন। সিদ্ধ অরিহন্তরা মোক্ষ অর্জন করে অনন্ত আনন্দ, অনন্ত অন্তর্দৃষ্টি, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি লাভ করে। তারা পৃথিবীর সকল মানুষের মুক্তির কথা ভাবে। এই জিনদের দেখানো পথ অনুসরণ করে সকল জীব সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, মুক্ত ও অসীম আনন্দের অধিকারী হতে পারে।

সূত্র: সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু (২০০৯)। তদেব। পৃ. ৭০।

৭২) ২৪জন তীর্থঙ্কর: জৈনরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। তারা গুরু হিসেবে তীর্থঙ্করদের মেনে চলে। এই চব্বিশজন তীর্থঙ্কর হলেন – ঋষভনাথ, অজিতনাথ, সম্ভবনাথ, অভিনন্দননাথ, সুমতিনাথ, পদ্মপ্রভ, সুপার্শ্বনাথ, চন্দ্রপ্রভ, পুষ্পদত্ত, শীতলনাথ, শ্রেয়াংশনাথ, বসুপূজ্য, বিমলনাথ, অনন্তনাথ, ধর্মনাথ, শান্তিনাথ, কুন্থুনাথ, অরনাথ, মল্লিনাথ, মুনিসুব্রত, নমিনাথ, নেমিনাথ পার্শ্বনাথ ও মহাবীর। প্রত্যেক তীর্থঙ্করের আবার ভিন্ন ভিন্ন বাহন ছিল। তাঁদের যে সকল মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলির মধ্যে কিছু রয়েছে দণ্ডায়মান মূর্তি আর কিছু উপবিষ্ট ভঙ্গির মূর্তি। এই চব্বিশজন তীর্থঙ্কর হলেন এই ধর্মের পথপ্রদষ্টা।

সূত্র: সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু (২০০৯)। তদেব। পৃ. ৫৯।

৭৩) বৈশালী: বর্তমান বিহারের উত্তরাংশে তিরহুত বিভাগে এই রাজ্যটি অবস্থিত ছিল। মুজঃফরপুর জেলার হাজিপুর মহকুমার অন্তর্গত বেসার নামক পল্লীতে বৈশালী নগরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় – সপ্তম শতাব্দীতে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বিভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধরা সকলে একত্রে বসবাস করতেন। এখানে কয়েকশত বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে এই স্থানগুলিতে দেবমন্দিরগুলির অবস্থা বেশ ভালো হয়ে উঠতে থাকে। এই অঞ্চলে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিভিন্ন শাখার লোকেদের বসবাস করতেও দেখা গেছে। এই অঞ্চলে সর্বাধিক জনবসতি ছিল জৈনরা। জৈন দিগম্বর নির্গন্থদের এখানে বেশ আধিক্যের কথা জানা যায়।

সূত্র: ঘোষ, তপনকুমার (২০১৮) (সংকলক)। *বাংলা ভাষায় জৈনধর্ম-চর্চা*। কলকাতা: প্যাপিরাস। পৃ. ২১।

৭৪) পুণ্ড্রবর্ধন: ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রনগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। জানা যায় করতোয়া ও গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থানের নাম পুণ্ড্র। এই রাজ্যের অধিবাসীরা এখন পুণ্ড্র নামে পরিচিত। মনুসংহিতা ও মহাভারতে এই জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্র একটি প্রধানজাতি। খ্রিস্ট জন্মের বহুপূর্বে লিখিত জৈনদের কল্পসূত্র নামক গ্রন্থে পুণ্ডরীক নামক একদল বণিক শাখার উল্লেখ করা আছে। করতোয়া ও মহানন্দা এই নদীদুটি পুণ্ড্ররাজ্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত।

সূত্র: চক্রবর্তী, রজনীকান্ত (২০০৯)। *গৌড়ের ইতিহাস*। কলকাতা: দ্বেজ পাবলিশিং। পৃ. ৩৯-৪২।

৭৫) সমতট: বঙ্গদেশের অন্যনাম হল সমতট। তবকৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে সমতটের নাম সনকট বা সাঁকট হিসেবে উল্লেখ করা রয়েছে। হিউয়েন সাং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় – এই রাজ্যটির আকৃতি ছিল চক্রাকৃতি। যার বেষ্টন ছিল তিন হাজার লি, এবং রাজধানীর বেষ্টন ছিল ২০ লি। এই স্থানের ভূমি ছিল নিম্ন ও উর্বরা, শস্যের ফলন ছিল যথেষ্ট ভালো, জলবায়ু ছিল প্রীতকর। মানুষগুলি ছিল কৃষ্ণকায়, কষ্টসহিষ্ণু ও খর্ব্বকায়।

সূত্র: চক্রবর্তী, রজনীকান্ত (২০০৯)। তদেব। পৃ. ৩৪-৩৫।

৭৬) কলিঙ্গ: দক্ষিণাপথের প্রাচীন নয়টি রাজ্যের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য রাজ্য। বৌধায়ন স্মৃতি ও মনুসংহিতায় এই অঞ্চলটিকে অনার্য্য-নিবাস হিসেবে পরিগণিত হত। এই রাজ্যটি উড়িষ্যার দক্ষিণ থেকে মাদ্রাজ উপকূল অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনুমান করা যায় বর্তমান মেদিনীপুর জেলার কাঁসাই নদীটি এই অঞ্চলের উত্তর সীমা দিয়ে প্রবাহিত হত। এই রাজ্যের বেষ্টন ছিল প্রায় ৮৪৩ মাইল।

সূত্র: চক্রবর্তী, রজনীকান্ত (২০০৯)। তদেব। পৃ. ২৩।

৭৭) ঘোষ, তপনকুমার (২০১৮) (সংকলক)। তদেব। পৃ. ২৪।

৭৮) তদেব। পৃ. ১১৮।

৭৯) তেওয়ারী, হরিপ্রসাদ ও তেওয়ারী, নৃসিংহবাদ (২০১৯)। *ভগবান মহাবীরের সিদ্ধভূমি ও জৈন কালচক্র*। কলকাতা: সোমলতা। পৃ. ৮।

৮০) Stevenson, Sinclair and Taylor, G. P (1915) The Religious Quest of India. *The Heart of Jainism*. London: Oxford University Press. পৃ ১০০-১০১।

৮১) Gandhi, M. K. (1959). *The Moral Basis of Vegetarianism*. Ahmedabad: Jitendra T. Desai. Ahmedabad: Navajivan Mudranalaya। পৃ. ২।

৮২) কর্মবন্ধন: জৈন দর্শনে বলা হয়েছে সম্যকচরিত্র গঠনের কথা। সম্যকচরিত্র গঠনের দ্বারা সম্ভব হয় মোক্ষলাভ। জৈন নীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে বিভিন্ন কর্মের জন্য আমাদের আত্মার বন্ধন অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই বন্ধন থেকে জীবকে মুক্তি পেতে গেলে তাঁদের এই কর্মবন্ধন পালন করতে হবে। এখানে মোট আটটি কর্ম থেকে জীবকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে, যথাক্রমে – জ্ঞানাবরণীয়, দর্শানবরণীয়, বেদনীয়, মোহনীয়, আয়ুষ, নাম, গোত্র ও অন্তরায় কর্ম। এই আট কর্মের জন্য মানুষের বন্ধনাবস্থার সূচনা হয়।

সূত্র: সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু (২০০৯)। তদেব। পৃ. ৬৩।

৮৩) Duncan, Ronald (selected and introduced)। *Selected Writings of Mahatma Gandhi*। London: Faber and Faber Limited-24 Russell Squary। পৃ. ৩৪।

৮৪) ঘোষ, সুবীর (২০১১)। *ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়* । কলকাতা: পশ্চিম বাংলা অকাদেমি। পৃ. ১২৬।

৮৫) Kidambi, Sunder (prepared)। *শ্রীমদ্ভগবদগীতা* । USA: Texas পৃ. ২৮।

৮৬) শীলভদ্র, ভিক্ষু (১৪২২)। *বুদ্ধবাণী* । কলকাতা: মহাবোধি। পৃ. ৭৬।

৮৭) পঞ্চমহাব্রত: জৈনধর্মের কোন ব্যক্তি এই ব্রত পালন করলে তার মোক্ষলাভ হয়। এই পঞ্চমহাব্রত পালন শুধুমাত্র গৃহীরা করতে পারে। এই নিয়মের ফলে জীবনযাত্রায়কে নিয়ামক করে তুলতে পারে। এই পঞ্চমহাব্রতগুলি হল, অহিংসা - প্রথম ব্রতটি হল জৈন ধর্মাবলম্বী কোনো জীবিত প্রাণীর ক্ষতি করা চলবে না। সত্য - এই ব্রতের মূল কথা হল সর্বদা সত্য কথা বলার ব্রত। অস্তেয় - *অস্তেয়* শব্দের অর্থ চুরি না করা। কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত দেয়নি, এই প্রকার বস্তুকে জৈনরা গ্রহণ করে না। ব্রহ্মচর্য - গৃহস্থদের কাছে ব্রহ্মচর্য হল পবিত্রতা এবং সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের কাছে যৌনতা থেকে দূরে থাকা। অপরিগ্রহ - অপরিগ্রহ শব্দের অর্থ হল অনাসক্তি। এর মাধ্যমে জাগতিক বন্ধন থেকে দূরে থাকা এবং দ্রব্য, স্থান বা ব্যক্তির প্রতি অনাসক্তিকে বোঝায়।

সূত্র: ঘোষ, তপনকুমার (২০১৮) (সংকলক)। তদেব। পৃ. ১৪-১৫।

৮৮) Chand, Bool (1987). *Lord Mahavira* [A study in Historical Perspective]. Varanasi: Vivek Printers. পৃ. ১০৩।

৮৯) চতুর্মাস্য: জৈনরা মানব শরীরকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে, যথা- ঔদারিক, বৈকারিক, আহারক, তৈজস ও কার্মণ। এই পাঁচপ্রকার শরীরের একটি থেকে অন্যটির সামান্য পার্থক্য রয়েছে। এগুলির মধ্যে ঔদারিক শরীরকে বাইরে থেকে উপলব্ধি করা যায়। বৈকারিক এই শরীরের বিক্রিয়াগুলি বাইরে থেকে দৃশ্যত নাও হতে পারে। যোগের ফলে এই বিক্রিয়া হতে পারে। আহারক শরীর সূক্ষ জিনিসকে বুঝতে সাহায্য করে। তৈজস এই শরীরে আহারাদি পরিপাক ভালোভাবে সম্পন্ন হতে পারে। কার্মণ এই শরীর সব থেকে বেশি কর্মোপযোগী। জৈনসিদ্ধরা বছরের নির্দিষ্ট চারমাসে শরীরের সমস্ত অশুভকে বর্জন করে, মোক্ষ লাভের আসায় শরীরকে কার্মন করে তুলতে চায়।

সূত্র: ভট্টাচার্য, অমিত (১৪১৫)। *সায়ণ মাধবীয় সর্বদর্শনসংগ্রহ চার্বাক-বৌদ্ধ-জৈনদর্শন*। অখণ্ড সংস্করণ। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। পৃ. ৬৪।

৯০) নবকার মন্ত্র: নবকার মন্ত্র হল জৈনধর্মের একটি মৌলিক প্রার্থনা। এটি যে কোনো সময় পাঠ করা যায়। দেবত্ব অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক গুণগুলিকে এই মন্ত্রের দ্বারা উপাসনা করা হয়। জৈনধর্মে পূজা বা প্রার্থনার উদ্দেশ্য হল জাগতিক কামনা ও বন্ধনকে ধ্বংস করা এবং আত্মার মোক্ষ অর্জন। জৈন তত্ত্বাকারেরা প্রাচীন সাতটি মতের সঙ্গে নিজেদের মতকে মিলিয়ে মোট নয়টি তত্ত্বের কথা স্বীকার করেন, যথা – জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আস্রব, সংবর, নির্জর, বন্ধ ও মোক্ষ।

সূত্র: ভট্টাচার্য, অমিত (১৪১৫)। তদেব। পৃ. ১১৭।

৯১) সাময়িকা ধ্যান: জৈনরা মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষায় ছয় প্রকার বাহ্যিক তপস্যা ও ছয় প্রকার আভ্যন্তরীণ তপস্যার ওপর জোর দিতে বলে। আভ্যন্তরীণ তপস্যার মধ্যে একটি ভাগ হল ধ্যান। মনের গভীরে যে ভ্রান্তধারনাগুলি মূল বিস্তার করেছে সেগুলিকে উৎপাটন করার জন্য এই ধ্যান পদ্ধতিকে তারা অবলম্বন করে। তারা সাময়িকা নামে এক বিশেষ ধ্যানপদ্ধতি গড়ে তুলেছে। সাময়িকা কথাটি এসেছে 'সময়' কথাটি থেকে। সাময়িকার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ শান্তির অনুভূতি পাওয়া ও আত্মার অপরিবর্তনশীলতা অনুধাবন করা। এই ধরনের ধ্যানের মূল ভিত্তি বিশ্ব ও আত্মার পুনঃপুনঃ আগমনের ধারণা।

সূত্র: সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু (২০০৯)। তদেব। পৃ. ২৬।

৯২) আবশ্যক: জৈনরা মনে করে মানুষ ভোগবাসনার দাস হয়ে গিয়ে সততা বা সৎ কর্ম থেকে দূরে থাকে। তারা সংযমের ওপর জোর দেয়। এই সংযম অর্থে কখন ইন্দ্রিয়কে রুদ্ধ করা বোঝায় না। তারা কিছু আবশ্যক কর্ম পালনের সিদ্ধান্ত দেয়, যথাক্রমে - *সম্যিকা* (শান্তি অনুশীলন), *চতুর্বিংশতি* (তীর্থঙ্কর বন্দনা), *বন্দন* (গুরু ও সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন), *প্রতিক্রমণ* (অন্তর্দৃষ্টি), *কায়োৎসর্গ* (স্থির থাকা) ও *প্রত্যাখ্যন* (ত্যাগ)।

সূত্র: সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু (২০০৯)। তদেব। পৃ. ২৭।

৯৩) ত্রিপিটক: বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের অনেক বিভাগ রয়েছে, কিন্তু সমগ্র বৌদ্ধসাহিত্যের নাম *ত্রিপিটক*। বৌদ্ধদের মতে বুদ্ধের বচনগুলি এই গ্রন্থে গ্রথিত রয়েছে। গ্রন্থটি তিনটি ভাগে বিভক্ত – ক) বিনয় পিটক, খ) সুত্ত পিটক ও গ) অভিধর্ম পিটক। এদের মধ্যে বিনয় পিটক শ্রেষ্ঠ। পিটক শব্দের অর্থ পেটিকা বা ঝুড়ি। তৃতীয় মহাসংগীতির (২৫০ খ্রিস্টপূর্ব) সময়ে এই ত্রিপিটকের প্রথম সংকলন হয়।

সূত্র: মুখার্জী, বন্দনা (২০০৪-২০০৫) ভট্টাচার্য, বেলা (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধকোষ*। পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৬৩৮-৬৩৯।

৯৪) চৌধুরী, বিনয়েন্দ্র নাথ (রচিত) চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত) (২০১৪)। *বৌদ্ধ সাহিত্য*। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ। কলকাতা: মহাবোধি। পৃ. ১।

৯৫) ক্ষান্তি বা খন্তি: কোন ব্যক্তিকে প্রহার করলে বা যে কোন শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করলেও যখন কোন মানবের মধ্যে অক্রুদ্ধভাব বজায় থাকে তখন এই অবস্থাকে চিহ্নিত করা হয় খান্তি নামে। অর্থাৎ অপরের দ্বারা পীড়নেও যখন মানুষের বিকার হয়না তখন সেই অবস্থাকে বলা হয় খান্তি।

সূত্র: ভট্টাচার্য, বেলা (সম্পাদিত) (২০০০- ২০০১)। *বৌদ্ধকোষ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৪২৩।

৯৬) চট্টোপাধ্যায়, শ্রী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ (সম্পাদিত) (১৩৬৬)। *জয়দেবের গীত গোবিন্দম্।* কলকাতা: দেব প্রেস। পৃ. ৩৫।

৯৭) দশমহাবিদ্যা: শক্তিদেবতার বহুদিন মূর্তির মধ্যে দশমহাবিদ্যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। অর্বাচীন পুরাণে ও তন্ত্রে দশমহাবিদ্যার রূপবর্ণিত হয়েছে। দশমহাবিদ্যার উদ্ভব সম্পর্কে একটি কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। যথা – দক্ষযজ্ঞে সতী নিমন্ত্রিত না হওয়া সত্ত্বেও পিতার যজ্ঞে উপস্থিত হওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছায় পতির নিকট বাধাপ্রাপ্ত হলে শিবের অনুমিত আদায়ের উদ্দেশ্য সতী শিবকে দশটি ভয়ংকরী মূর্তি দেখিয়েছিল। দেবীর এই দশটি রূপ দশমহাবিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ।

সূত্র: ভট্টাচার্য্য, হংসনারায়ণ (১৯৯৭)। *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* । তৃতীয় পর্ব। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম (প্রাইভেট) লিমিটেড। পৃ. ২৬৫।

৯৮) দাশ, আশা (রচিত) বড়ুয়া, সুমিত (সম্পাদিত) (২০১৮)। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ছোঁয়া। পৃ. ৫২।

৯৯) শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (২০০১)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। পৃ. ৪৮৯।

১০০) সাধনমালা: বৌদ্ধধর্মের দেবদেবীদের ধ্যানরূপের চিত্র ও মন্ত্র রয়েছে এই গ্রন্থে। এখানে মোট তিনশো বারোটি সাধনা রয়েছে। এই তান্ত্রিক গ্রন্থের লেখকদের নাম কিছু জানা গেলেও সমগ্র অংশে জানা সম্ভব হয়নি। সংস্কৃতে লেখা এই গ্রন্থে বিশেষ করে বজ্রযানীদের দেবতা ভাবনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার কথা উল্লেখ রয়েছে।

সূত্র: Bhattacharyya, Benoytosh (edited) (1925). Sadhanamala. Vol. 1. Baroda:Central Laibrery. পৃ. ৫-১০.

Bhattacharyya, Benoytosh (edited) (1928). Sadhanamala. Vol. 2. Baroda: Central Laibrery. পৃ. ৫-১০.

১০১) শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (২০০১)। তদেব। পৃ. ৫৮৩।

১০২) শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (১৩৫৮)। *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ১০৩।

১০৩) সূত্র: ঘোষ, তপনকুমার (২০১৮) (সংকলক)। তদেব। পৃ. ৭২।

১০৪) তদেব। পৃ. ৪৫।

১০৫) চক্রবর্তী, রজনীকান্ত (২০০৯)। তদেব। পৃ. ৬৪।

১০৬) ঘোষ, তপনকুমার (২০১৮) (সংকলক)। তদেব। পৃ. ৪৭।

১০৭) শ্রাবক: জৈন সম্প্রদায়ে যারা সংসারত্যাগী সাধু-সন্তদের মতো জীবন যাপন করতেন না। ধর্মকথা শ্রবণ করে সাধারণ গৃহীদের মত সংসারধর্ম পালন করত তাঁদের জৈনরা শ্রাবক নামে চিহ্নিত করত।

সূত্র: ঘোষ, তপনকুমার (২০১৮) (সংকলক)। তদেব। পৃ. ৪৮।

১০৮) পাল, বিপদভঞ্জন (২০১৪)। *ভারতীয় দর্শন*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। পৃ. ৬৮।

১০৯) তদেব। পৃ. ৬৮।

১১০) শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (২০০১)। তদেব। পৃ. ১৭০।

১১১) ঘোষ, তপনকুমার (২০১৮) (সংকলক)। তদেব। পৃ. ৩৯।

১১২) ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ (রচিত) মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র ও ভিক্ষু, সুমপাল (সম্পাদিত) (২০১৫)। *বৌদ্ধদের দেব-দেবী*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ৮-৯।

১১৩) ঘোষ, তপনকুমার (২০১৮) (সংকলক)। তদেব। পৃ. ১১৩।

১১৪) তদেব। পৃ. ৩৯।

১১৫) ভট্টাচার্য্য, হংসনারায়ণ (২০১৫)। তদেব। পৃ. ৪৫।

১১৬) তদেব। পৃ. ৩২-৩৩।

১১৭) সেন, সুনীল কুমার ও চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (২০১২)। *প্রাচীন যুগের কথা*। কলকাতা: অনুষ্টুপ। পৃ. ৫২-৫৩।
১১৮) Nagar, Shantilal (edited) (1927). *Iconography of Jaina Deities.* Vol. 1. Delhi: B.R Publishing Corporation. পৃ. ২৬৩.
১১৯) সেন, সুকুমার (২০১৬)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ৯।
১২০) চট্টোপাধ্যায়, সুনীল (২০০৩)। তদেব। পৃ. ৯৪।
১২১) Coomaraswamy, Ananda K. (2003). *Buddha and The Gospel of Buddhism.* Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers. পৃ. ১৯৭।
১২২) চট্টোপাধ্যায়, সুনীল (২০০৩)। তদেব। পৃ. ৯৭।
১২৩) সেন, সুকুমার (২০১৬)। তদেব। পৃ. ৮১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যেতিহাস চর্চার নিরিখে মঙ্গলকাব্যের গুরুত্ব: 'বৌদ্ধ ও জৈনযুগ' সহ 'হিন্দু-বৌদ্ধযুগ' এর পুনর্বিবেচনা

২. ০ ভূমিকা

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের বন্ধন চিরকালের। উভয়ের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে প্রবাহিণী নদীর মতো নিত্যচঞ্চল ও বেগবান ধারা। আমাদের যেসকল পূর্বপুরুষরদের হাতে প্রাথমিক স্তরে সমাজ গড়ে উঠেছিল এখন সেসকল পূর্বপুরুষররা আর বেঁচে নেই। কিন্তু সমাজ হারিয়ে যায়নি আজও তা বহাল রয়েছে। ঠিক যেমন ভাবে স্রোতোবাহিত জলকণা পুনরাগত না হলেও নদী বয়ে চলে। নদীর বাঁকে গড়ে ওঠে বসতি আবার তা ধ্বংস হয়ে যায় তেমনি সমাজের মধ্যেও রসবেত্তা রচয়িতার বিন্দু বিন্দু রচনার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে বিপুলায়তন সাহিত্যভাণ্ডার। এই সাহিত্যের মধ্যে গড়ে ওঠা সমাজের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মানুষ দীর্ঘকাল পর্যন্ত অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া সমাজের পরিচয় পেতে পারে। পুরাণ থেকে আমরা আমাদের চিরন্তন সমাজের ইতিহাস জানতে পারি। পুরাণে খণ্ড খণ্ড সমাজের পূর্ণ বা অর্ধসমাপ্ত ইতিহাস হলেও সেগুলি মানব মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। অতীতের লুপ্ত নানা সমাজ কাহিনি আমাদের কাছে চির সুখপাঠ্য হয়ে ওঠে। সেই কাহিনির বিভিন্ন চরিত্র ও কার্যাবলী মানুষের কাছে অনুকরণীয় হয়ে ওঠে। এগুলিকে ঘিরে তৈরি হতে থাকে নানা মিথ। এইভাবে দেখা যায় অতীতের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা সাহিত্য কর্মের মধ্যে নিজেদের স্থির করে তথ্য অনুসন্ধানের কাজে লিপ্ত হয়। যেকোন জাতি বা দেশের ঐতিহ্য জানতে হলে সেই দেশের সাহিত্যগুলিকে যত্ন সহকারে পাঠ করা প্রয়োজন। কোন জাতি বা দেশের গৌরব ইতিহাস গচ্ছিত থাকে লিখিত ও মৌখিক সৃষ্টিকর্মের মধ্যে। বাঙালি জাতির ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে বারবার বাঙালি ঐতিহাসিকগণ ফিরে ফিরে গেছে চর্যাপদের কাছে। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের পাতায় ঘোষণা করেছেন নিজেদের ইতিহাস নিজেদের তৈরি করার মন্ত্র। এই মন্ত্রে উদবুদ্ধ হয়ে একদল যুবকগোষ্ঠী এগিয়ে এসেছিলেন। উঠেছিল বাঙালির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়।[১]

ভারতবর্ষের যুগাতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাস প্রধানত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। যথা – আদিযুগ বা প্রাচীনযুগ (আনুমানিক ৬৫০–১২০০

খ্রিস্টাব্দ), মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ), আধুনিকযুগ (খ্রিস্টাব্দ ১৮০১-বর্তমানকাল)। রাজনৈতিক ইতিহাসের মতো নির্দিষ্ট সাল তারিখ অনুযায়ী সাহিত্যের ইতিহাসের যুগ বিভাজন করা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য যে সাহিত্যের ইতিহাস সর্বত্র সাল তারিখের হিসেব অগ্রাহ্য না করলেও, মূলত সাহিত্যকর্মের বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে ধরে রাখে নির্দিষ্ট যুগের চিহ্ন। সাহিত্যের বিবর্তনের ধারাকে লক্ষ রেখে সাহিত্যের ইতিহাসে যুগবিভাগ করা হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাগণ অনুমান করে - বাংলাভাষায় লিখিত সাহিত্যের উদ্ভবের পূর্বে, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অবহট্‌ঠ ভাষায় সাহিত্য রচনার রীতি প্রচলিত ছিল। এই ভাষায় রচিত সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের আদি অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল।

প্রাচীন যুগের বেদবিরোধী হিসেবে প্রথম দিকে জৈনধর্মের প্রাধান্য থাকলেও পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রাচুর্য্যতা ধরা পড়ে। প্রাচীন যুগের শেষের দিকে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমতে থাকে এবং হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। এই সকল ধর্মগুলির উত্থান-পতনের ফলে দেশের ধর্মীয় পরিকাঠামো সেইসঙ্গে সাহিত্যে ধারারও বদল ঘটেছিল। অনুমান করা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী বিজয়ের বহু পূর্বে বাঙালিরা একটি বিশেষ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। জন্ম দিয়েছিল বাংলা ভাষার। প্রথম দিকে বাংলায় আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও অনার্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেনি। সংস্কৃত ভাষায় লেখা অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*[২], শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতিধরের কাব্যকবিতা, জয়দেবের *গীতগোবিন্দম্*[৩], *কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়*[৪] ও *সদুক্তিকর্ণামৃত*[৫] নামক দুটি সংস্কৃত শ্লোকসংগ্রহ। অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত কবিতা সংকলন *প্রাকৃত-পৈঙ্গল* [৬] বাঙালির সাহিত্য রচনার আদি নিদর্শন। এই সকল গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত না হলেও সমকালীন বাঙালি সমাজ ও মননের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়। পরবর্তীকালে বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে *গীতগোবিন্দম্* কাব্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন হিসেবে চর্যাপদকে ধরা হয়। খ্রিস্টপরবর্তী দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত চর্যাপদগুলি ছিল সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধনসংগীত। আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকগণ বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণের সাহায্যে প্রমাণ করেছে যে চর্যার ভাষা প্রকৃতপক্ষে হাজার বছর আগের বাংলা ভাষা। সমকালীন বাংলার সামাজিক ও প্রাকৃতিক চিত্র

এই পদগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্যমূল্যের বিচারে পদগুলি কালজয়ী বলে সমালোচকেরা জানিয়েছেন।

মধ্যযুগের বিশাল পরিসর জুড়েছিল মঙ্গলকাব্য। দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক এই কাব্যধারার সূত্রপাত হয় খ্রিস্টপরবর্তী ত্রয়োদশ শতকে এবং সেই ধারা বহমান ছিল অষ্টাদশ শতাব্দী ভারতচন্দ্রের সময়কাল পর্যন্ত।[৭] ষোলো শতকে এই ধারার সর্বাধিক প্রসার ঘটে। ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি এই পর্যায়ের নানা শাখা। এই ধারার অন্যতম কবি মাণিক দত্ত, কানা হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর প্রমুখ। মধ্যযুগের অন্য ধারার সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন বড়ু চণ্ডীদাস, তার *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*[৮] নামক কাব্য রচনার মধ্যে দিয়ে। আনুমানিক চতুর্দশ শতকের শেষার্ধে বা পনেরো শতকের প্রথমার্ধে বড়ু চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনি অবলম্বনে এই কাব্য রচনা করেন। এইসময়ে মৈথিলি কবি বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। মধ্যযুগে প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর পঞ্চদশ শতকে প্রণয়োপখ্যান জাতীয় কাব্য ও *ইউসুফ-জোলেখা*[৯] রচনা করেছিল। এই যুগে সাহিত্যধারার মধ্যে অনুবাদ সাহিত্যের নাম সংযোজিত হয়। মধ্যযুগের অনেকখানি অংশ জুড়ে এই ধারাটি অবস্থান করে রয়েছে। এই ধারাটির সূত্রপাত হয়েছিল কবি কৃত্তিবাস কর্তৃক রামায়ণের বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে। পরবর্তীতে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে আরও অসংখ্য গ্রন্থ। শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ) আবির্ভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ সমৃদ্ধির পথে অনেকখানি এগিয়ে যায়। মধ্যযুগে আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয়। শাক্তপদাবলী, নাথসাহিত্য, বাউল ও অপরাপর লোকসঙ্গীত, মৈমনসিংহ গীতিকা ইত্যাদি অমূল্য সাহিত্য মধ্যযুগের সৃষ্টি। প্রাচীনযুগ থেকে মধ্যযুগে রূপান্তরিত হওয়ার মাঝখানে দীর্ঘ ১২০১-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ. পর্যন্ত সময়কে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বা বন্ধ্যা যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিছু সমালোচক বাংলা সাতিহ্যের কথিত অন্ধকার যুগকে সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্বের যুগ বলতে নারাজ। সেসময়ে সাহিত্য নিদর্শন প্রাকৃতভাষায় গীতিকবিতার সংকলিত গ্রন্থ - প্রাকৃতপৈঙ্গল, রামাই পন্ডিত রচিত শূন্যপুরাণ[১০] (গদ্যপদ্য মিশ্রিত), হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেকশুভোদয়া[১১] (গদ্যপদ্য মিশ্রিত), ডাক ও খনার বচন প্রভৃতি সাহিত্যগুলিতে সামনে রেখে পুরোনো মতগুলিকে খণ্ডন করে নতুন মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা

হয়েছে। খনার জীবন কাহিনি নিয়ে নানা গল্পকথা প্রচলিত রয়েছে। এই বিষয়ে কোন যথাযথ প্রামান্য ইতিহাস খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। খনা বা ক্ষণা ছিল প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী এক বিদুষী নারী। তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নানাবিধ বিষয়ে শুভাশুভ এবং প্রয়োজনীয় বচন রচনার জন্যেই বেশি সমাদৃত। কথিত আছে তার আসল নাম লীলাবতী। তার রচিত ভবিষ্যত বাণীগুলি 'খনার বচন' নামে বহুল পরিচিতি পেয়েছিল। খনার বচনগুলি জনপ্রিয়তার উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল তিনি সুন্দর কবিতা ছন্দে জ্যোতিষতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সমাজে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল বাংলা ছাড়া নেপাল, অসম, বিহার, ওড়িশা ও ত্রিপুরাতে এই প্রবাদগুলির যথেষ্ট প্রচলন ছিল। খনার জন্মস্থান নিয়ে নানা মতবিরোধ উঠে এসেছে -

> কেউ বলেন খনা ছিলেন ময়দানবের কন্যা, আবার অনেকে বলেন তিনি ছিলেন একজন মানবরাজকন্যা। আবার অনেকের মতে খনার জন্ম বারাসাত জেলার দেউলি গ্রামে (নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মাঝে), কারো মতে খনার প্রকৃত নাম লীলাবতী এবং তাঁর জন্ম বাংলা-অসম সীমান্তের প্রাগজ্যোতিষপুরে। দক্ষিণবঙ্গের চন্দ্রকেতুগড়ে মাটি খুঁড়ে একটি মাটির ঢিবি পাওয়া যায় যাতে খনা ও মিহিরের নাম লেখা আছে বলা হয়। তবে খনার ব্যাপার মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য মতটি হলো আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে সিংহলের রাজা উপতিষ্যর কন্যারূপে খনার জন্ম হয়।[১২]

সেসময়ে যারা ধর্ম-শিক্ষা শিল্প চর্চার দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত ছিল তারা সীমিত আকারে হলেও শিক্ষাসাহিত্য চর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিল। হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের লোক সাহিত্যের ক্ষেত্রে লোকভাষা বাংলাকে গ্রহণ করেছিল কিনা? এই নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির বাঁধা হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করে। অষ্টাদশ শতকের পরবর্তী সময়ে মূলত বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ শুরু হয়। আধুনিক যুগকে সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা কয়েকটি ধাপে ভাগ করেছে, যেমন - প্রথমপর্ব ১৭৬০-১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ, দ্বিতীয়পর্ব ১৮০০-১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ, তৃতীয়পর্ব ১৮৫৯-১৯০০ খ্রিস্টাব্দ, চতুর্থপর্ব ১৯০১-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ, পঞ্চমপর্ব ১৯৪৮-২০০০ খ্রিস্টাব্দ, ষষ্ঠপর্ব ২০০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমানকাল। বর্তমানকাল এই বিস্তর সময়কালের মধ্যে সাহিত্যের আঙিনায় আরও বহু ধারার আগমন ঘটে গেছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারা সাহিত্য কর্মগুলির প্রবাহমুখীতার দিককে মাথায় রেখে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভাগ করে সমাজকে ধরতে চেয়েছে।

বঙ্গদেশ গঠিত হওয়ার পূর্বে ও পরে, বঙ্গদেশের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে মানুষ জৈন ও বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। দীর্ঘকাল এই ধর্ম বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবকে কাঁটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের আগমন ঘটেছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের (চতুর্থ-ষষ্ঠ শতাব্দী) সংস্পর্শে এসে।

বঙ্গদেশের বিবরণে হিউয়েন সাং জানিয়েছেন এই দেশে বৌদ্ধধর্মের হীনযান ও মহাযান শাখার প্রচলনের কথা। কিছু অঞ্চলে জৈন ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্যতার কথাও জানা যায়। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শাসকদের মধ্যে ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে। রাজাদের তোষণের আশায় ভিন্ন ভিন্ন রুচির সাহিত্য তৈরি হতে থাকে। এই বর্ণনাগুলিতে রয়েছে সমাজ-সংস্কারের ছবি। এখানে পাওয়া যায় - কৃষিবিদ্যার দৃষ্টান্ত, জোতিষতত্ত্ব, সমাজের রীতি-নীতি, আইন-কানুনের নমুনা। দার্শনিক ধারণা আর তান্ত্রিকতাযুক্ত জ্ঞান-গর্ভমূলক কিছু বর্ণনা। প্রাচীনযুগের ছড়া বা গীতিগুলিতে দেবতার প্রাধান্য তেমনটা পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের সাহিত্য আনে বিরাট পরিবর্তন যেখানে গীত বা ছড়া রচিত হয়। এখানে ধরা পড়ে দেবতা আরাধনা প্রাধান্যতা। কোন এক বিশেষ দেবতাকে উদ্দেশ্য করে গীতাকারে সুন্দর কাহিনিগুলির বিস্তার ঘটায় এই মধ্যযুগের কবিরা। এই সময়ের রচনা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখা যায় মধ্যযুগে সাহিত্যের মোট চারটি উপধারা তৈরি হয়েছিল। যথা – লৌকিক সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য ও জনসাহিত্য।[১৩] ব্রিটিশ আগমনে বাংলা সাহিত্যের ধারায় নতুন নতুন দ্বার উন্মোচিত হতে থাকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ ও জৈনযুগের সমাবেশ ঘটেছে। এই ধারণা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে এবং তা কীভাবে সংঘটিত হয়েছে সেটাই আলোচ্য বিষয়।

২. ১) মঙ্গলকাব্যের গুরুত্ব

মধ্যযুগে গড়ে ওঠা ধর্মকেন্দ্রিক অথচ লৌকিক সাহিত্য হল মঙ্গলকাব্য। এই মঙ্গলকাব্যের ধরনধারণের মধ্যে আষ্টেপৃষ্টে রয়েছে বৌদ্ধ ও জৈনযুগের ছায়াপাত। ত্রয়োদশ শতকের বিদেশী শক্তির আক্রমণে পরবর্তী সময় থেকে এই মঙ্গলকাব্য রচনার ধারা স্পষ্ট হতে থাকে। মধ্যযুগে মঙ্গল নামে তিন ধারার দেবতার মহিমা কীর্তন যুক্ত সাহিত্য রচিত হয়েছিল। যেমন – বৈষ্ণবীয় (চৈতন্য মঙ্গল, অদ্বৈত মঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, রাধিকামঙ্গল, জগৎমঙ্গল, কিশোরীমঙ্গল, স্মরণমঙ্গল, গোকুলমঙ্গল ও ইত্যাদি), পৌরাণিক (গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চণ্ডীকামঙ্গল ও ইত্যাদি), লৌকিক (শিবমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল ও সূর্যমঙ্গল)।[14] বৈষ্ণবীয় ধারায় রচিত মঙ্গলকাব্যগুলির কাহিনি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যে-এর সংজ্ঞার সঙ্গে তেমন মিল নেই। এই কাব্যগুলির মধ্যে সমগ্র

স্থান জুড়ে চৈতন্যদেবের গুণগান বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাব্যগুলির নামকরণের দিকে তাকিয়ে সেসময়ের প্রতিচ্ছবিতে তৎকালীন সময়ে মঙ্গলকাব্যের প্রাধান্যতার কথা অনুমান করা যায়। এই সকল বৈষ্ণবীয় ধারায় মঙ্গলকাব্যগুলিকে আলোচনার মধ্যে থেকে দূরে রাখা হয়। বৌদ্ধ ও জৈন দেবভাবনার বিষয়কে সামনে রেখে পৌরাণিক এবং লৌকিক মঙ্গলকাব্যগুলির গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে উঠে আসা সমাজচিত্র আমাদের তৎকালীন সমাজ পরিচয় ঘটাতে সাহায্য করেছে।

পৌরাণিক কাব্যের প্রধান পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রকাশ ঘটলে পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের স্বতন্ত্রতা বজায় রয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে দেবখণ্ড ও নরখণ্ড নামে দুটি ভাগ রয়েছে। দেবখণ্ডে থাকে পুরাণের প্রভাব আর নরখণ্ডের মধ্যে থাকে কাব্য ভাবনার প্রকাশ। এভাবে পুরাণ ও কাব্য পরস্পর পাশাপাশি থেকে নিজেদের আলাদা করে রেখেছে। পুরাণের প্রভাব থেকে মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি হলেও, পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য দুটো ভিন্ন ধারার সাহিত্য হয়ে উঠেছে। পুরাণে মানব কাহিনি স্থান পায় না। মঙ্গলকাব্য মানবজাতির ঘটনা ও বর্ণনা দিয়ে শুরু এবং শেষ হয়। মঙ্গলকাব্য পুরাণের স্তর অতিক্রম করে কাব্যের স্তরে এসে উপস্থিত হয়। এককালে পুরাণের প্রেরণায় মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হলেও পৌরাণিক ঘটনার প্রতি এই ধারার কবিদের তেমন নিষ্ঠা খুব একটা দেখা যায় না। তাঁদের কাছে পৌরাণিক আদর্শের চেয়ে লৌকিক আদর্শগুলি বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। তারা পৌরাণিক দেবতাদের মর্ত্যে নামিয়ে এনে লৌকিক ভাবধারায় মহিমান্বিত করে তুলতে দ্বিধাবোধ করে না। মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক দেবতা শিবের দাম্পত্য জীবনের মধ্যে দিয়ে বাঙালিসুলভ চরিত্র বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। শিবমঙ্গলের শিব নিজের প্রতীক ত্রিশূল ভাঙিয়ে লাঙল তৈরি করে সংসারের প্রয়োজনে। মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনদেবী মনসা মহাভারতের জরৎকারু থেকে নিষ্কৃতি নিয়ে লৌকিক দেবীতে অধিষ্ঠিত হয়েছে। পুরাণের গঠন প্রক্রিয়ার ন্যায় মঙ্গলকাব্য দর্শন, স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখা না করে শুধুমাত্র আখ্যানকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলেছে। পুরাণের মধ্যে দিয়ে রচয়িতা তত্ত্ব প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও মঙ্গলকাব্যের রচয়িতাগণ তত্ত্বের গভীরতা থেকে কাব্যকে মুক্তি দিয়ে, বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনের বর্ণনা দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

হিন্দুধর্মের সঙ্গে একসময়ে বৌদ্ধধর্মের সংঘাত ঘটেছিল ফলস্বরূপ সমাজে সংস্কৃত পুরাণগ্রন্থ বিস্তৃতি পেতে শুরু করে। লক্ষ করলে দেখা যায় ত্রয়োদশ শতকের মুসলমান আক্রমণের ফলে সাহিত্যের মধ্যে পুনরায় পরিবর্তন আসে এবং উদ্ভব হয় মঙ্গলকাব্যের। প্রথম স্তরে মানুষ স্থানীয় দেবদেবীদের স্তুতি করতে গিয়ে অসচেতনভাবে এই লৌকিক দেবতাভাবনার সূত্রপাত করেছিল। মঙ্গল কাব্যসাহিত্য কৃষিসম্পদপূর্ণ পল্লিসমাজের মধ্যে উদ্ভূত হয়ে পরবর্তীকালে সমাজের উঁচুস্তরের দিকে ধাবিত হয়। এই সাহিত্যের প্রভাব পল্লির গৃহপ্রান্তরকে ছাপিয়ে গিয়ে বিত্তশালী ব্যক্তিদের দ্বারাও উৎসাহিত হতে থাকে।[১৫] আগত বিদেশী ধর্মমতের সঙ্গে স্থানীয় ধর্মমতের বৈসাদৃশ্য প্রকট হতে শুরু করে। নবগঠিত সমাজের অবস্থিত দুই ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে ব্যবধান তৈরি হয়ে যায়। রাষ্ট্র শাসনকারী ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শোষিত সমাজের মানুষ নিজেদের অসহায় বলে মনে করতে থাকে। মঙ্গলকাব্যের মৌলিক ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ কাহিনিগুলির মধ্যে দিয়ে দেবতাদের মধ্যে অলৌকিকতার প্রভাব বৃদ্ধি করে। নিজেদের জীবনের দু:খদুর্দশার জন্য নিজেদের ভাগ্যকে দোষ দিতে থাকে –

যে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ।।[১৬]

মানুষ নিজেদের দিকে ধেয়ে আসা অত্যাচার, উপদ্রব, পীড়ন এগুলি থেকে খানিকটা সান্ত্বনা পেতে, এই অসহায় অবস্থাকে দুর্দৈব্যের প্রভাব বলে মেনে নিতে থাকে। এই প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে আরও বেশি করে দৈবভাবনার মধ্যে নিজেদের ভাবনাকে নিমজ্জিত করে রাখে যার ফল পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যগুলিতে।

আর্য্যসভ্যতার পূর্বে বাংলাদেশের ধর্মভাবনার কথা স্পষ্টত সেভাবে কিছু জানা যায় না। পুরাতাত্ত্বিকদের আবিষ্কারের ফলে সিন্ধুসভ্যতার কিছু নমুনা পাওয়া যায়। যেখানে প্রাগার্য সভ্যতা সম্পর্কে অস্পষ্ট কিছু ধারণা পাওয়া যায়। এই আবিষ্কার থেকে মাটির তৈরি কিছু জিনিস পাওয়া গেছে, যেমন - গামলা, ভাঁড়, জালা ইত্যাদির যেগুলির গায়ে রঙিন চিত্র আঁকা রয়েছে। এই নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছাড়াও প্রত্নখননের ফলে একটি যোগীমূর্তি পাওয়া গেছে। যার চারিদিকে ঘিরে রয়েছে বাঘ, ষাঁড় ও গণ্ডার। এই যোগী মূর্তিটিকে কিছু ঐতিহাসিক দেবতা শিবের মূর্তি বলে দাবি করেছেন। আর্যপূর্ব সমাজের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।[১৭] শিবের অস্তিত্ব অনুমান

করে এগিয়ে এলে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সেই প্রাগার্য সভ্যতার দেবতা পরিকল্পনার আভাস লক্ষ করা যায়। কিছু সমাজ তাত্ত্বিকেরা জানিয়েছেন মানবমনের ভয় থেকে দেবতার উৎপত্তি ঘটেছিল আদিম সমাজে। একথার সত্যতা মেনে নিয়ে বলা যায় যে – প্রাচীনতম দেব-পরিকল্পনা ও ছিল এদেশের প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অদৃশ্য শক্তির প্রতি ভীতু মানুষের শ্রদ্ধার্ঘ্য। আর্যসমাজে দেবতাদের বৈশিষ্ট্যে ধরা পড়ে মহত্বের ছবি, ভক্তের থেকে এই দেবতাদের দূরত্ব অনেকটা। মঙ্গলকাব্যের দেবতারা হয়ে যায় - নীচ, স্বার্থপর, ক্রূর, ছলনাময়ী, অত্যাচারী, ক্ষমতালোভী, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও প্রভৃতি। এই দেবতারা নিজের প্রয়োজনে মানবের কাছে কাকুতি-মিনতি করতে পারে। প্রয়োজনে হাতে অশি নিয়ে ভক্তকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। যেমন – মুকুন্দের দেবীচণ্ডী কালকেতুর রাজ্যস্থাপনের জন্য কলিঙ্গরাজ্যের ধ্বংসসাধন করে তৃপ্ত হয়েছিলেন। মঙ্গলকাব্যে কাহিনিগুলির দিকে তাকালে দেখা যায়, কাব্যে উল্লিখিত দেবতাগণ খুব সহজে ভক্তের থেকে পূজা পায়নি। মর্ত্যের মানবের কাছে পূজা পেতে তাঁদের অনেক লড়াই করতে হয়েছে একাধিক সময়ে। শেষে তারা জোর করে ভয় দেখিয়ে নিজের আত্মতৃপ্তি ঘটিয়েছে। এমনকি এই দেবতারা ভক্তের দেওয়া অবহেলা ভরা পূজা গ্রহণ করেছে।

মধ্যযুগে মাটির কাছকাছি বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে শক্তি পূজার উদ্ভব হয়েছিল। যে ভাবনাগুলি মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে ধরা পড়েছে। এই শক্তি সাধনার মধ্যে দুর্বলের শক্তি সাধনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যেখানে ভক্ত ইষ্ট দেবতাকে শক্তির অধিষ্ঠাত্রী করে নিজের মধ্যে সেই শক্তির উদ্বোধন বলে মনে করেছে। শক্তি আরাধনার মধ্যে দিয়ে আরাধনাকারীর আত্মভোলানো চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে। এই শক্তিলাভের মধ্যে নানাবিধ রসের সঞ্চার হয়, যেমন - ভক্ত নিজের দুর্গতিতে শক্তি পূজা করে সাহস অনুভব করে দেবীর প্রতি ভীত হয়। ভক্তের উন্নতিতে শক্তি অনুভব করে কৃতজ্ঞ হয়। দেবতার কোপ যেমন তাঁদের কাছে ভয়াবহ অন্যদিকে দেবতার সুপ্রসন্নতাও তেমনি অতিশয় আনন্দ সঞ্চার করে। বাংলার লৌকিক শাক্তপূজার সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক যুগের দানবপূজার বেশ কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এখানে সর্বদা আত্মশক্তির উদ্বোধনের কথা বলা হয় না। এক বিভীষিকাময় শক্তির কাছে আত্মশক্তির বলিদানের কথা বলা হয়। অনুমান করা হয় দানবীয় শক্তির সম্মুখে অসহায় মানুষ মাতৃশক্তির আরাধনায় একসময় ব্যাপৃত হয়। উল্লেখ্য –

> ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পিতৃতন্ত্রের এবং বৈদিক পিতৃতন্ত্রের মূলে মাতৃতন্ত্র ছিল। বাঙ্গালী সমাজের কথা যাহা বলা গেল – ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই অনুরূপ প্রথা বর্ত্তমান। এই মাতৃতন্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলেন মাতৃদেবত। গ্রাম্য সমাজে মাতৃদেবতাই প্রধানা ছিলেন। নানাদেবী, কামাক্ষ্যাদেবী প্রভৃতি ভারতের ৫১টা পীঠের যে মাতৃদেবতা, তাঁরা সকলেই সিন্ধুযুগীয় মাতৃতান্ত্রিক সমাজের নিদর্শন। বৈদিকযুগেও মন্ত্রদ্রষ্টা নারী-ঋষির অস্তিত্ব ইহার অন্যতম প্রমাণ। সিন্ধুর সংস্কৃতি ছিল মাতৃতান্ত্রিক। হরপ্পার শীলমোহরে মাতৃদেবতার বলির চিত্র দেখা যায়। এ ছাড়া নানীমাই – এই সিন্ধু সমাজেরই সমকালীন সংস্কৃতি।[১৮]

প্রথমদিকে সমাজে এই নারী শক্তিকে অমঙ্গলকারিণী ও বিপজ্জনক দেবী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই ধারণার বদল ঘটেছে। বরাহ মিহিরের *বৃহৎ-সংহিতায়* এই মাতৃকাশক্তি দেবীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙালির আধ্যাত্মিক সাধনার এক বিশেষ জাতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে কোন প্রকারের শুভ-অশুভ শক্তিকে ব্যক্তি তাদের মতো মানবচরিত্রের দোষ-গুণের সঙ্গে গড়ে তোলে। পূর্ববর্তী সমাজে দানব বা অতিপ্রাকৃত খল চরিত্রগুলিকে সহজ-সরল মানবের চরিত্রে নামিয়ে এনে, নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে পূজার আসন পেতেছিল।

মধ্যযুগের প্রায় সমকালীন সময়ের মধ্যে দুটি ভিন্ন প্রকার কাব্যসাহিত্যের ধারা গড়ে উঠেছিল, যথা - বৈষ্ণব কাব্য ও মঙ্গল কাব্য। এই দুই ধারার সাহিত্যের গুরুত্ব সমাজের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভাবে ধরা পড়েছে। বৈষ্ণবকাব্য একান্ত আত্মকেন্দ্রিক ভাবের বাহক কিন্তু মঙ্গলকাব্য সম্পূর্ণ আত্মনিরপেক্ষ ও বস্তুধর্মী ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছে সমাজে। বৈষ্ণব কবিদের সাহিত্যিক বিকাশ আত্মভাবপূর্ণ সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সংঘটিত হয়েছে। এই ধারার সাহিত্যিকদের হাতে তৈরি হয়েছে গীতিকাব্যগুলি। সাহিত্যের অঙ্গনে বৈষ্ণব কবিরা নতুন ধারার দ্বারোন্মোচন করলে জাতীয় কাব্য সৃষ্টিতে তারা তেমন পারদর্শিতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়নি। এই কবিরা মনে করেছিল ঐহিক সংসারের কোন অস্তিত্ব নেই। তাদের মতে পারত্রিক কল্যাণে জীবনের সার্থকতা। তারা আরও জানিয়েছে গার্হস্থ্য জীবনের সুখের কোন মূল্য নেই। আচার সর্বস্বতাকে জীবনের চরমপ্রাপ্তি বলে স্বীকার করেছে। বাস্তবজীবনে আলোচনা থেকে তাঁরা বিরত থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের কবিরা বৈষ্ণব কবিদের এই উপেক্ষার বিষয়কে কাব্যের একমাত্র অবলম্বন করে কাব্য রচনা করতে চেয়েছিলেন। এই কবিরা তাঁদের আরাধ্য দেবতার কাছে স্বর্গসুখ বা মোক্ষলাভের আর্শীবাণী চায়নি। সন্তান-সন্ততির মঙ্গলকামনায় কায়মনে প্রার্থনা করে সন্তুষ্টি পেয়েছে। আধুনিকযুগের সাহিত্যে উপন্যাস জাতীয় রচনাকে মায়া আয়না বলা হয়েছে। এখানে ঔপন্যাসিক জীবন্ত বাস্তবের চিত্রকে সত্যি করে

গড়ে তুলতে পারে। মঙ্গলকাব্যের কবি মুকুন্দরামের রচনার মধ্যে লক্ষ করলে ধরা পড়ে জীবন্ত সমাজ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। আধুনিক সমালোচকেরা মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেকে ভিন্নধারার সাহিত্য হিসেবে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। এই কবি বাস্তব জীবনকে শিল্পী চোখে দেখে অখণ্ড সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।[১৯] মঙ্গলকাব্য ধারার পরবর্তী কবি ভারতচন্দ্র যার কাব্যে সমাজের এই সুরটি প্রতিধ্বনিত হয়েছিল –

বর মাগ মনোনীত যাহা চাব দিব।।
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।।
তথাস্ত বলিয়া দেবী দিলে বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।।
বর পেয়ে পাটুনী ফিরিয়া ঘাটে যায়।[২০]

জীবনের নশ্বর সুখবৃদ্ধি এই কবিদের কাছে পরম কাম্য বস্তু হয়ে ধরা পড়ে। মঙ্গলকাব্যের ধারার শুরু থেকে এই সুরটি বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ভারতচন্দ্র সেই জীবিত সুরকে পাঠকের কাছে শিল্পনৈপুন্য দ্বারা নতুন করে তুলে ধরেছিল। মঙ্গলকাব্য যেখানে সমষ্টি জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। বৈষ্ণব কবিতায় সমষ্টি হৃদয়ের সুখদুঃখের অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। উভয়কাব্যের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।

মধ্যযুগের বাঙালি সাহিত্য সমাজে মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অন্য যেই শ্রেণির কাব্যগুলি অবস্থান করেছিল সেগুলি ছিল চরিতকাব্য। এই চরিতকাব্যের মূলে ছিল পাঁচালির ধারা। এই দুই ধারার প্রভাব সমাজে পড়েছিল খানিকটা ভিন্নাকারে। মঙ্গলকাব্য রচনার উদ্দেশ্য ছিল পালায় বিভক্ত করে গীত অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য। পাঁচালি রচনার উদ্দেশ্য ছিল পাঠকরে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। মঙ্গলকাব্যের মতো এই কাব্যের মধ্যে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। মঙ্গলকাব্যে যেখানে দেবতার মাহাত্ম্য কথা বর্ণনা করে। চরিত কাব্যাভ্যন্তরে কোন ঐতিহাসিক চরিত্রকে সামনে রেখে তার মধ্যে অলৌকিক দৈবীসত্ত্বার প্রকাশ করা হয়। মঙ্গলকাব্য যেখানে সমগ্র একটা জাতির সমাজ জীবনকে প্রেরণা করে গঠিত হয়। সেখানে চরিতকাব্যে শুধুমাত্র কোন একটি সম্প্রদায়ের চিত্রকে প্রেরণা করে গড়ে ওঠে। উভয়কাব্যের গতি হয়ে যায় ভিন্নমুখী। মঙ্গলকাব্য স্বর্গের দেবতাদের মর্ত্যের মাটিতে নামিয়ে আনে আর চরিতকাব্য বাস্তবের মানুষকে বৈকুণ্ঠের দিকে চালনা করে। লক্ষ করলে দেখা যাবে মঙ্গলকাব্যের মতো চরিতকাব্য জাতীয়কাব্যের রূপ না নিয়ে, তা হয়ে উঠেছে গৌণ

কাব্য। মধ্যযুগে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে যে সকল চরিতকাব্য গড়ে উঠেছিল সেগুলির মধ্যে *চৈতন্য-ভাগবত*[২১] ও *চৈতন্য-চরিতামৃত*[২২] গ্রন্থ দুটি বেশ গুরুত্বের দাবী রাখে। মঙ্গলকাব্যের মতো এই ধারা তেমন পুষ্টিলাভ করতে পারে না। চরিতকাব্য ধারাটি মধ্যযুগের একবিশেষ সময়ে উদ্ভব হয়ে আবার সেই যুগের মধ্যে বিলোপ হয়ে যায়। মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে মর্ত্যের সম্পর্ক অটুট হওয়ায় সাহিত্যের এই ধারার পথ হয়েছে আরও প্রশস্ত।

মঙ্গলকাব্যের দেবতা চরিত্র বিশ্লেষণে ধরা পড়ে সেখানে বাংলার স্ত্রীসমাজের ব্রতকথার দেবতাদের প্রভাব রয়েছে। ব্রতকথাগুলি মেয়েলী ব্রতাচারের মধ্যেই অন্তর্নিহিত হয়ে রয়েছে অত্যন্ত রক্ষণশীলতার মধ্যে দিয়ে। সময়ের গতিতে এই ব্রতকথা ও কাহিনিগুলি মঙ্গলকাব্যের মধ্যে দিয়ে ডানা বিস্তারের সুযোগ পেয়েছে। ব্রতকথা ছিল আচারনিষ্ঠ এগুলি মূল রূপের থেকে তেমন পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হতে পারেনি। মঙ্গলকাব্যগুলির বারে বারে রূপবদলের ছবি লক্ষ করা গেছে। পূর্বে যেভাবে তুষতুষালিব্রত, সেঁজুতিব্রত, জয়মঙ্গলব্রত পালিত হত, আজও ব্রত পালনকারিণীরা ব্রতের পূর্বের নিয়মগুলি একইভাবে পালন করে থাকে। বাংলাদেশে মনসামঙ্গলকাব্য প্রচলিত থাকলেও মনসা ব্রতকথার প্রচলনের নমুনা পাওয়া গেছে। যার কাহিনি মনসামঙ্গলকাব্যের চাঁদ সদাগরের অনুরূপ। ব্রতকথার চেয়ে মঙ্গলকাব্যের গুরুত্ব ভিন্ন হয়ে যায়। ব্রতকথা হল মৌখিক ধারা, মঙ্গলকাব্য হল লিখিত সাহিত্যের ধারা। সকল দেশে দেখা যায় মৌখিক প্রচলিত মিথ, কাহিনি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে লিখিত সাহিত্যের জন্ম হয়েছে। ভারতীয় মৌখিক ব্রতকথাগুলিকে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্যের বৃহৎ সাহিত্যের ধারা গড়ে উঠলেও উভয়ের উদ্দেশ্য সাহিত্যমূল্যের ভিন্নতা নির্দেশ করে । ব্রতকথা মেয়েরা পালন করে বিশেষ করে তার এবং তার পরিবার পরিজনদের মঙ্গলার্থে –

> কামনার প্রতিচ্ছবি আলপনায়; যেমন জলপথে নিরাপদে আসার কামনা নদীর আলপনায় ব্যক্ত হচ্ছে। তেমনি কামনার প্রতিধ্বনিটি দিচ্ছে ছড়া; 'যেমন নদী নদী! কোথা যাও?বাপ ভায়ের বার্ত্তা দাও।' এই হল – জলযাত্রীর খবর যখন জলপথে ছাড়া বিনা-তারের সাহায্যে আকাশ দিয়ে আসবার সম্ভাবনা ছিল না।[২৩]

এভাবে ভাদুলিব্রতের মধ্যে দিয়ে মেয়েরা স্বার্থসাধনার পথকে বেছে নেয়। মঙ্গলকাব্যে ব্যক্তিস্বার্থের কথা প্রাধান্য না দিয়ে ব্যষ্টির স্বার্থের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ব্রতকথার উৎপত্তি হয়েছিল অন্তঃপুরে কিন্তু মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি হয়েছিল বারোয়ারীতলায় পরিবেশনের উদ্দেশ্যে। মঙ্গলকাব্য বিষয় বর্ণনার দিক থেকে হয়ে উঠেছে এপিকধর্মী। ব্রতকথার বিষয় বর্ণনায় তেমন বৈচিত্রের লক্ষণ দেখা যায় না।

ব্রতকথার কাহিনি সংক্ষিপ্ততার জন্য কোন চরিত্র তেমন বিশেষ বলশালী হয়ে পাঠকের মনে দাগ কাটতে পারে না। মঙ্গলকাব্যের দীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে চরিত্রগুলি পাঠকের মনে দাগ কেটে যায়। নায়কের দুঃখে পাঠক দুঃখিত হয়। এখানে উভয় কাব্যের গুরুত্বের মাত্রা প্রকাশ পায়।

নাটগীতি বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত একটি আখ্যান কাব্যের ধারা। এই কাব্যে গীতের সঙ্গে নৃত্য যুক্ত ছিল ও কাহিনিতে পাত্রপাত্রীর নাটকীয় সংলাপ যুক্ত ছিল। মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুটি কাব্য হল *গীত-গোবিন্দম্* ও *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন*। এই কাব্যগুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে গীতিসংলাপ সমাপ্ত হত। মঙ্গলকাব্য আখ্যানকাব্য হলেও এই কাব্যের বৈশিষ্ট ছিল ভিন্ন। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে নৃত্যের ঘনঘটা তেমন চোখে পড়ে না। এই কাব্যের গীতের সময় মূল গায়ক একজন থাকে এবং আসরে মূল গায়েনের পিছনে বসে কিছু জন ধুয়া ধরত। নাটগীতির বিষয়বস্তুতে পুরাণের কাহিনিকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলে। মধ্যযুগের কবি জয়দেব তাঁর কাব্যে কৃষ্ণকথাকে নিয়ে সৃষ্টি করেছিল এক উজ্জ্বলকাব্য। যার গুরুত্ব আজও কৃষ্ণকথা সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য সাধারণ।[২৪] মঙ্গলকাব্যে শাক্ত দেবদেবীর আরাধনার কথা বলা হয় কিন্তু নাটগীতির আদর্শ ভিন্ন। *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কিছু আঙ্গিকগত প্রভাব লক্ষ করা যায়। মঙ্গলকাব্যের দেবতারা ছলে বলে কৌশলে ভক্তের কাছ থেকে পূজা পেতে চায়। *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যে কৃষ্ণ কৌশলে রাধার সঙ্গ আদায় করতে চেয়েছে। মঙ্গলকাব্যে বৃহত্তর সমাজ জীবনের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। এই নাটগীতিতে ব্যক্তিমানসের কামনা-বাসনার রূপ স্পষ্ট হতে দেখা গেছে। এখানে মঙ্গলকাব্যে ও নাটগীতি একই সময়ের কাব্য হয়ে, দুটি ধারা ভিন্ন মহিমায় বিস্তার লাভ করেছে। নাথসাহিত্যকে আখ্যায়িকা বলা হলে এই কাব্যে ও মঙ্গলকাব্যের গুরুত্ব আলাদা। নাথগীতিকা সৃষ্টি হয়েছিল নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে। সেখানে শুধুমাত্র দেবতা শিবের উল্লেখ করা হলে তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়নি। নাথসম্প্রদায়ের যোগী সিদ্ধাচার্যদের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্মচর্য দ্বারা যোগ অভ্যাস করে সাধনা সিদ্ধির কথা প্রচার করা ছিল এই কাব্য রচনার মূল উদ্দেশ্য। এই কাব্যের যোগীরা যোগের মধ্যে দিয়ে অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করে। সেই ক্ষমতা দ্বারা নিজের উদ্দেশ্যের উন্নতি সাধন করতে চেয়েছে। মঙ্গলকাব্যের দেবতারা অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা ভক্তের উন্নতি সাধনে ব্যবহার করে। মঙ্গলকাব্যের শেষে যে মিলন ঘটে তা বাস্তবের মাটিতে ঘটতে পারে না, সেজন্য স্বর্গের সাহায্য

নিতে হয়। নাথগীতিকার শেষে যে মিলন ঘটে তাতে বাস্তবের মাটি যথেষ্ট। কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে গোপীচন্দ্র বারো বৎসর যোগসাধনা করে পুনরায় সংসার জীবনে ফিরে এসেছিল। এই কাব্যের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের বেশ কিছু প্রভাব লক্ষ করা গেছে সরাসরি।

মধ্যযুগের নরনারীর প্রেমমূলক রচনা হল মৈমনসিংহ গীতিকা। এই রচনার মধ্যে নায়িকাদের মধ্যে প্রেমের প্রভাবকে গভীর করে দেখানো হয়েছে। এখানে পাতিব্রাত্যের প্রকাশ তেমনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়নি। এই কাব্যের মধ্যে নারীকে প্রেমের আধার করে দেখানো হয়েছে। কাহিনিগুলি এক চরিত্র বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। এই কাহিনিগুলির কোন শাখা কাহিনি দেখা যায় না। এই কাহিনিতে অলৌকিকতাকে বর্জন করা হয়েছে। মঙ্গলকাব্য ও এই কাব্যের মৌলিক ভিন্নতা সমাজে উভয়ের গুরুত্বকে আলাদা করে তুলেছে। মঙ্গলকাব্য সৃষ্টি হয়েছিল দেব-মাহাত্ম্য প্রচারের উদেশ্যে কিন্তু এই গীতিকাগুলির উদ্দেশ্য ছিল পার্থিব প্রেমের প্রচার করা। মঙ্গলকাব্যে পাতিব্রত্যের অজস্র নমুনা পাওয়া যায়। দেখা যায় মঙ্গলকাব্যে হল লিখিত সাহিত্য কিন্তু গীতিকা হল মৌখিক সাহিত্য। এই কাব্যের প্রভাব সমাজে সহজেই লোপ পেয়েছে, স্মৃতি ভারাক্রান্ত হয়ে। এই গীতিকা মূলত গাওয়ার জন্য রচিত হয়েছিল। নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটনো হত এই মর্ত্যের মাটিতে। মঙ্গলকাব্যের ভাবের মধ্যে রয়েছে শেষ হয়েও শেষ না হওয়ার প্রবণতা যা চলে যায় পরকালের দিকে। মঙ্গলকাব্যে আঞ্চলিক বেড়াজালকে অতিক্রম করেছিল তার রচনাগুণের মধ্যে দিয়ে। গীতিকাগুলি তাদের রচনাগুণের সংকীর্ণতার জন্য আঞ্চলিকতার দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছিল। মঙ্গল গানগুলি পালায় বিভক্ত হয়ে কয়েকদিন ধরে গীত হয়। গীতিকাগুলি একপালাতে গীত সমাপ্ত করে। মধ্যযুগের শেষের দিকে বিশেষ করে অন্ত্য মধ্যযুগে (সপ্তদশ শতকে) মুসলিম আখ্যায়িকার বেশ প্রতিপত্তি লক্ষ করা যায়। এই মুসলিম সাহিত্যের দুটি ধারার মধ্যে একটি শাখায় মুসলিম ধর্মপ্রচারকদিগের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যশাখায় লৌকিক প্রণয়-কাহিনি নিয়ে গড়ে উঠেছিল আখ্যানকাব্য। এই দ্বিতীয় সাহিত্যের শাখায় লৌকিক পার্থিব প্রণয়কে নিয়ে লিখিত সাহিত্যের ধারা প্রচলিত হয়েছিল। এই মুসলিম কাব্যগুলির মধ্যে ইসলাম ধর্মের প্রচারের কথা বলা হয়েছে, এবং কাফেরদের বিনাশের কথাও বলা হয়েছে। এই কাব্যের মধ্যে নায়িকার বারোমাসী বর্ণনার ছবিও পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের বিষয়গত ও

আঙ্গিকগত সকল বৈশিষ্ট্য এই মুসলিম আখ্যায়িকারা নিজেদের কাব্যমধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রভাব দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার পরবর্তী মুসলিম কবিদের রচনার মধ্যে সক্রিয় ছিল।

মধ্যযুগের আখ্যায়িকামূলক পদ্যরচনাকে বলা হত পাঁচালী। সেকালে বাংলা সাহিত্যে গদ্যরচনা করার রীতি তখনও শুরু হয়নি। পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে এই সাহিত্য রচিত হত বেশীরভাগ ক্ষেত্রে। ব্রতকথাগুলি যখন লিখিত হওয়ার প্রয়োজনবোধ করে তখন এই সাহিত্যের লিখিতরূপ হল পদ্যাকারে। উল্লেখ্য যে ব্রতকথাগুলি গদ্যাকারে বিবৃত করা হত। পুরুষ রচয়িতাদের হাতে পড়ে এই ব্রতগুলি রূপবদল করে পদ্যাকারে রূপান্তরিত হয়েছিল –

কাঠি-কুটি কুড়াতে গেলাম ইতুর কথা শুনে এলাম।
এ কথা শুনলে কী হয়। নির্ধনের ধন হয়।।
অপুত্রের পুত্র হয় অশরণের শরণ হয়।
অন্ধের চক্ষু হয়, আইবুড়োর বিয়ে হয়, অন্তিমকালে স্বর্গে যায়।।[২৫]

ইতুপূজার ব্রতকথা পাঁচালীরূপটি পাওয়া যায় এইভাবে আবার এরপরে গদ্যরূপটিও পাওয়া গেছে। মানুষের ভয় থেকে যেমন উৎপত্তি হয়েছিল মঙ্গলকাব্যগুলি। একইভাবে পাঁচালিগুলির উদ্ভব হয়েছিল সমাজের বঞ্চনা থেকে মুক্তি কামনায়। মঙ্গলকাব্যেকে অনুকরণ করে এই পাঁচালিধারার প্রভাব হিন্দু সমাজের বাইরে মুসলমান সমাজের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। যার প্রমাণস্বরূপ পাওয়া যায় সত্যপীরের পাঁচালির দৃষ্টান্ত। ব্রতকথাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্যের জন্ম একথা যেমন সত্য, তেমনি লোককথার অন্যান্য সকল ধারাগুলি এসেও এই কাব্যোমধ্যে সম্মিলিত হয়েছে। যেমন মঙ্গলকাব্যের দেবতার উৎপত্তি হবে কোনো একটি অলৌকিক উপায়ে। মনসামঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায় মনসার অলৌকিক উপায়ে উৎপত্তির কথা –

চক্রবাক সঙ্গ যায় চক্রবাকী-সনে। মকরন্দ পিএ অলি কমলের বনে।।
ঘন ঘন পিএ মধু, ঘন যায় সঙ্গ। কামরসে মহেশের পুলকিত অঙ্গ।।
টলিয়া হরের বীর্য্য পড়ে পদ্মপাতে। জয় জয় পুষ্পবৃষ্টি হৈল ত্রিজগতে।।
হর হারাইল বীর্য্য পদ্মপাতে থুয়্যা। পাতাল-ভুবনে গেল পদ্মনাল বায়্যা।।
গড়িয়া পড়িল বীর্য্য বাসুকির কোলে। যত্নে বাসুকি লয়্যা থুইল তাম্র-খোলে।।
বাসুকি আনিঞা দিল বিধাতার স্থান। বিধাতা পাইয়া তাহা ক্রিল নির্ম্মাণ।।[২৬]

লোককথার একটি বিশেষ ধারা হল ছোট সন্তানের দ্বারা আসাধ্য সাধন করা। নায়কের পুনর্জীবন লাভ, ভ্রমরের মধ্যে জীবাত্মার প্রতিস্থাপন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি লোককথার ধারা থেকে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে

মিলিত হয়েছে। লোককথার সংকীর্ণ ধারাগুলি মঙ্গলকাব্যের বৃহৎ ধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে পুষ্টতা লাভ করেছে।

মধ্যযুগে দীর্ঘ চারশো বছরেরও বেশি সময় ধরে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল। সমাজের অন্তঃস্থলে থাকা নারীরা বিবিধ ব্রত ও পার্বণগুলি পূর্ব থেকে পালন করে এসছে। পুরুষেরা কিছু লৌকিক দেবতার উপর নির্ভর করে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চায়। পুরুষদের কল্পনায় এবং সাহিত্যের ধারায় মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি হয়েছে। কাব্য দেখা যায় নায়ক ও নায়িকার ধর্ম আদর্শের বিরোধ। বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাংলার লৌকিক দেবদেবীর উদ্ভব হয়েছিল। তারা বাংলার সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্মের মন্দিরের মধ্যে স্থান দখল করে নিয়েছিল।

২. ২) বৌদ্ধ ও জৈনযুগ

বৈদিক যুগে বেদ রচনাকালে ভারতবর্ষের ধর্মীয় আবহ বেশ সহনশীল ছিল। কালক্রমে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম ক্রমশ সরলতা হারিয়ে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে সমাজের মধ্যে ধর্মের নামে আচার-অনুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞের পরিমাণ বাড়তে থাকে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যজ্ঞের নিয়মকানুন যেমন কঠিন হয়ে উঠতে থাকে। তেমনি যজ্ঞপদ্ধতি সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যাধিক ব্যয় সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। তখন দেশের আপামর জনতা একটি সহজ-সরল ধর্মমতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। দেশের এই অবস্থা থেকে উত্তীর্ন হতে মানুষ যখন চিন্তাশীল। সেই মুহুর্তে ক্ষত্রিয় বংশজাত দুই রাজপুত্র মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের আগমন হয়। গৌতমবুদ্ধের জন্মের কিছু পূর্বে মহাবীরের জন্ম হয়। যাকে জৈনধর্মের চব্বিশতম তীর্থঙ্কর বলা হয়। যৌবনে মহাবীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। ত্রিশবছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘ বারো বছর ধরে তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। শেষে জ্ঞানলাভ করে জিন বা জয়ী উপাধি ধারণ করেন। জৈনধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। অন্যদিকে নেপালের কপিলাবস্তর শাক্যবংশে জন্ম হয় গৌতমবুদ্ধের। যিনি রাজসুখে প্রতিপালিত হলেও মানুষের দুঃখ, কষ্ট, জরা এই সকল জন্ম-মরণ ব্যাধি থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দিতে তিনি গৃহত্যাগ করেন। বোধিপ্রাপ্ত হয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ধর্মপ্রচারে জীবন অতিবাহিত করেন। এই শাক্য সিংহের দ্বারা প্রচারিত ধর্মমতকে বৌদ্ধধর্ম নামে চিহ্নিত করা হয়। বৈদিক ধর্মের পরবর্তীতে ভারতবর্ষে দীর্ঘ সময় জুড়ে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের বেশ প্রতিপত্তি লক্ষ করা গিয়েছিল।

বেদবিরোধী ধর্মের মধ্যে প্রধান তিনটি ধর্ম হল আজীবিক, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম। এই তিন ধর্মের মধ্যে হিউয়েন সাং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় আজীবকধর্ম জৈনধর্মের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে। জৈনধর্মের ইতিহাস থেকে জানা যায় ভারতীয় উপমহাদেশে জন্ম হওয়া ধর্মগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন ধর্মের দাবী রাখে এই জৈনধর্ম। বৌদ্ধধর্মের চেয়ে জৈনধর্মের ঐতিহ্য পুরোনো।[২৭] জৈনধর্মের ইতিহাস থেকে অনুমান করা হয় সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকে। জৈনধর্মের প্রথমতীর্থঙ্কর ঋষভনাথের আবির্ভাব কাল থেকে শেষতম তীর্থঙ্কর মহাবীরের কালে এসে এই ধর্ম আরও নবউদ্যোগ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে মহাদেশকে অতিক্রম করে। এই ধর্মের মূল কথা ছিল চিত্তকে বন্ধন হতে মুক্ত করা। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ফলে বর্ণবিভেদ চূড়ান্ত হয়ে উঠলে জৈনধর্ম প্রথমে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। জৈনধর্মের প্রধান চারটি নীতি হল – অহিংসা, চুরি না করা, মিথ্যা কথা না বলা ও প্রয়োজনাতীত সম্পত্তি অর্জন না করা। এই চারটি নীতির সঙ্গে মহাবীর যোগ করেন ব্রহ্মচর্য পালনের নীতিকে। জৈনরা চব্বিশজন তীর্থঙ্করের জীবনীর মধ্য দিয়ে তাদের ধর্ম ইতিহাসের রূপরেখা অঙ্কন করেছে। জৈনবিশ্বাস অনুসারে বর্তমান কালচক্রার্ধের প্রথমতীর্থঙ্কর ছিলেন ঋষভনাথ। সর্বশেষ দুই তীর্থঙ্কর হলেন পার্শ্বনাথ (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৮৭২-৭৩) ও মহাবীর (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯-৫২৭) যারা ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। বাইশতম তীর্থঙ্কর নেমিনাথ সম্পর্কে সীমিত ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রচলিত কিছু কিংবদন্তি থেকে জানা যায় তিনি ছিলেন যদুবংশীয় কৃষ্ণের জ্ঞাতিভ্রাতা। জৈনধর্মের মধ্য দিয়ে চিরস্থায়ী জীবনদর্শনের কথা বলা হয়েছে। জৈনরা বিশ্বাস করে তাদের ধর্মমত ও চিরস্থায়ী থাকবে আজীবন। বিদেশী প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ সহস্রাব্দে জৈনধর্মের অস্তিত্ব ছিল। সিন্ধু উপত্যকায় পরবর্তী প্রস্তরযুগীয় একাধিক বৃহদাকার শহরের ধ্বংসস্তুপ থেকে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রীগুলি পর্যবেক্ষণ করে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। জৈনধর্মের উৎস নিয়ে অস্পষ্টতা আজও খানিকটা রয়েছে। পাশ্চাত্যে কোনো কোনো গবেষক অনুমান করেছেন যে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রথম শতাব্দী জৈনধর্মের উৎস কালের সর্বাধিক সময়সীমা। উল্লেখ্য –

> এদেশে বৌদ্ধমতের আগমনের ও প্রসারের কিছু পূর্বেই জৈনমতের আগমন ও প্রসার হয়েছিল। দু-মতই দুদিক দিয়ে জল পথে ভাগীরথী ধরে স্থল পথে কলিঙ্গ-ওড্র হয়ে এদেশে পৌঁছেছিল।[২৮]

জৈনধর্ম ভারতের প্রাচীনতম বিদিত ধর্মবিশ্বাস। সিন্ধু উপত্যকায় এই ধর্মের ব্যাপক প্রচলন ছিল। হরপ্পায় খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমার নগ্ন যে পুরুষমূর্তিটি পাওয়া গিয়েছিল সেখানে

দেখা যায় - মূর্তিটি পদ্মাসন ভঙ্গিমায় উপবিষ্ট, সর্পমস্তক এবং সঙ্গে বৃষ রয়েছে। তারা এই মূর্তিকে ঋষভনাথের মূর্তি মনে করে। ঋষভনাথের সঙ্গে থাকা বৃষ মূর্তিকে জৈনধর্মের প্রতীক হিসেবে পরিচয় বহন করে। সাম্প্রতিক কালে সিন্ধু উপত্যকায় পরবর্তী প্রস্তরযুগীয় একাধিক বৃহদাকার শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার থেকে জৈনদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। এই শহরগুলি সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় বা সম্ভবত চতুর্থ সহস্রাব্দের। বেদরচিত হওয়ার বহু পূর্বে জৈনধর্মের অস্তিত্ব রক্ষিত ছিল এমনটা অনুমেয়।

তীর্থঙ্করদের ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে জানতে হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ *ঋগ্বেদ*-এ প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে (দশম-দ্বাদশ মণ্ডল) ঋষভনাথকে রুদ্র তুল্য দেবতা বলা হয়েছে। বৈদিকযুগের মানুষেরা নিজেদের রক্ষার্থে ঋষভনাথের ন্যায় একজন মহৎ দেবতার আবির্ভাবের প্রার্থনা করেছেন। যার সহায়তায় আবার মানব তাদের সকল শত্রুকে নিধন করতে চেয়েছে। *বিষ্ণুপুরাণ* ও *ভাগবতপুরাণ* গ্রন্থদুটিতে এই তীর্থঙ্করকে সুপ্রাচীনকালের ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছে। প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ্যবাদী সাহিত্যে একটি ধর্মীয় সংঘের উল্লেখ পাওয়া গেছে। এই সংঘটি আসলে জৈনদের বলেই অনুমান করা হয়। তার পরবর্তী কুড়িজন তীর্থঙ্করকে নিয়ে বিশেষ কিছু আলোচনা করা হয়নি ইতিহাসের পাতায়। পরবর্তী বাইশতম তীর্থঙ্কর নেমিনাথ ছিলেন পার্শ্বনাথের পূর্বসূরি। জৈনবিশ্বাস অনুসারে, তিনি পার্শ্বনাথের ৮০,০০০ বছর আগে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। উত্তর প্রদেশের মথুরা কঙ্কালী টিলা নামক ঢিপিতে (আনুমানিক ১৮৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দে) খননকার্য চালানো হয়েছিল। এই খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত কিছু প্লেট বা প্রত্নসামগ্রী যেগুলি পরীক্ষা করে আলোইস অ্যান্টন ফুরার জানিয়েছেন - নেমিনাথ ও একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মহাবীরের পূর্বসূরি তথা তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ-এর কথা ভারতীয় ইতিহাস থেকে জানা যায়। তিনি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব নবম-সপ্তম শতাব্দীর ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মহাবীর হলেন চব্বিশতম তথা সর্বশেষ জৈন তীর্থঙ্কর।[২৯] তিনি বর্ধমান নামেও পরিচিত। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দে বীরনির্বাণ সম্বৎ অনুসারে চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কাশ্যপ গোত্রীয় এক ক্ষত্রিয় রাজবংশে মহাবীর জন্ম গ্রহণ করে। তার পিতা ছিলেন ইক্ষ্বাকু রাজবংশের রাজা সিদ্ধার্থ ও মাতা ছিলেন রানি ত্রিশলা (যিনি আবার বৈশালীর রাজা চেতকের ভগ্নী)। মার্চ বা এপ্রিল মাসের এই দিনটিতে মহাবীর জয়ন্তী পালিত হয়।

জৈনদের মতানুসারে প্রাচীন শহর ক্ষত্রিয় কুন্দ লাচ্চুয়ারের কুন্দলপুরকে তার জন্মস্থান মনে করা হয়। বর্তমানে স্থানটি বিহারের জামুই জেলার সিকান্দ্রা মহকুমার অন্তর্গত। জৈনবিশ্বাস অনুসারে, মহাবীরের জন্মের পর ইন্দ্র জম্বুদ্বীপ নামক বিশ্বকেন্দ্রের অক্ষ মেরু পর্বতে তার তৈলার্পণ ও অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এইখানে তার নামকরণ করা হয়েছিল বর্ধমান। যদিও এই সিদ্ধান্ত নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। পরবর্তীকালের আধুনিক ইতিহাসবিদরা মনে করেন - মহাবীরের জন্ম হয়েছিল কুন্দগ্রামে। এই অঞ্চলটি বর্তমান ভারতবর্ষের বিহার রাজ্যের মুজফফরপুর জেলার বাসো কুন্দ নামে পরিচিত। মূলত উত্তরভারতে জৈনধর্মের প্রাধান্য বেশি ছিল মহাবীরের পূর্বে ও সমকালে। মহাবীর পরবর্তীকালে জৈনধর্মের কেন্দ্রবিন্দু স্থানান্তরিত করতে থাকে দক্ষিণ ভারতের দিকে।[৩০] এই মনীষী আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯-৫২৭ সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

রাজপুত্র মহাবীর প্রথম জীবনে বিলাসব্যসনের মধ্যে বড়ো হয়ে উঠলেও, শেষ জীবনে তিনি কঠিন ব্রতযাপনের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করেছিলেন। শ্বেতাম্বর ধর্মগ্রন্থ *আচারাঙ্গ সূত্র*[৩১]-এর দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে জানা যায় পারিবারিক সূত্রে তিনি জৈনদের সাহচার্য লাভ করেছিলেন। তার পিতামাতা ছিলেন জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের অনুগামী। তারা ছিলেন গৃহস্থ জৈন। জৈন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে তার বিবাহ প্রসঙ্গ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। দিগম্বর মতাবলম্বীরা মনে করে - মহাবীরের পিতামাতা তাকে যশোদা নামক একটি কন্যাকে বিবাহ করতে অনুরোধ করলে সে সম্মত হয়নি। অন্যদিকে শ্বেতাম্বর গোষ্ঠীর ধারণা - মহাবীর অল্প বয়সে যশোদাকে বিবাহ করে। প্রিয়দর্শনা নামে তাদের একটি কন্যাসন্তানের জন্ম হয়েছিল। ত্রিশ বছর বয়সে মহাবীর রাজকীয় সুখ ও পরিবার ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুসন্ধানে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অশোকবৃক্ষের নীচে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। জৈনগ্রন্থ *কল্পসূত্র*[৩২] থেকে জানা যায় - মহাবীর অস্তিকা গ্রাম, চম্পাপুরী, প্রতিচম্পা, বৈশালী, বনীজগ্রাম, নালন্দা, মিথিলা, ভদ্রিকা, অলভীকা, পাণিতাভূমি, শ্রাবস্তী ও পাবাপুরীতে চল্লিশটি বর্ষাকাল অতিবাহিত করেছিলেন। সাড়ে বারো বছর কঠোর তপস্যার পর ৪৩ বছর বয়সে তিনি কেবল জ্ঞান বা সর্বজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। জৈন ধর্মগ্রন্থ *উত্তর- পুরাণ* ও *হরিবংশ-পুরাণ*-এ এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। *সূত্রকৃতাঙ্গ* গ্রন্থে সর্বজ্ঞতা ধারণাটির ব্যাখ্যা এবং মহাবীরের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির বিবরণ পাওয়া যায়। সর্বজ্ঞতা লাভের পর ত্রিশবছর মহাবীর সারা ভারত

পরিভ্রমণ করেন। মানুষকে তার নিজের দর্শন শিক্ষা দিতে থাকে। জৈনবিশ্বাস অনুসারে মহাবীরের চোদ্দ হাজার সন্ন্যাসী, ছত্রিশ হাজার সন্ন্যাসিনী, এক লাখ ঊনষাটহাজার শ্রাবক (গৃহস্থ) ও তিন লাখ আঠারো হাজার শ্রাবিকা (গৃহস্থ নারী) অনুগামী ছিল। তার অনুগামী রাজন্যবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মগধের রাজা শ্রেণিকা (যিনি বিম্বিসার নামেও পরিচিত ছিলেন), অঙ্গের রাজা কুণিক ও বিদেহের রাজা চেতক। জৈন ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, মহাবীর পাবাপুরী (অধুনা বিহারে অবস্থিত) নির্বাণ লাভ করেন। এই সময়ে তার প্রধান শিষ্য গৌতম স্বামী কেবল জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। মহাবীরের মোক্ষ স্থানটিতে বর্তমানে জলমন্দির নামে একটি জৈনমন্দিরের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। মূর্তিতত্ত্বে প্রধানত মহাবীরকে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান অবস্থায় অধিক স্থানে চিত্রিত করা হয়েছে। তার মূর্তির নীচে প্রতীক চিহ্ন হিসেবে থাকে সিংহের মূর্তি। প্রত্যেক তীর্থঙ্করের একটি নির্দিষ্ট প্রতীক থাকে, যার দ্বারা পূজক অতিসহজে তীর্থঙ্করদের আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারে।

জৈন ধর্মগ্রন্থ *মহাপুরাণ* ও *ত্রিষষ্ঠি-শকল-পুরুষ-চরিত্র*[৩৩]-এ মহাবীরের পূর্বজন্মগুলির বিবরণ পাওয়া যায়। সংসারের আবর্তনশীল চক্রে একটি আত্মা অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করে। একজন তীর্থঙ্কর যখন কর্মের কারণগুলিকে খুঁজে পায় এবং রত্নত্রয় গড়ে তোলে। তখন থেকে তার জন্মগ্রহণ করা শুরু হয় বলে জৈনরা বিশ্বাস করে। জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে মহাবীরের তীর্থঙ্কর রূপে জন্মের আগে আরও ছাব্বিশটি জন্মের কথা ব্যাখ্যা করেছে। পূর্বের একটি জন্মে মহাবীর ভরতচক্রবর্তীর পুত্র মারীচিরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। *জৈনআগম* মহাবীরের প্রধান শিষ্য গৌতম গণধর তার উপদেশগুলি সংকলিত করেছিল যা মোট বারোটি খণ্ডে পাওয়া যায়। জৈনধর্মের প্রতিটি সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ সম্পর্কে সম্পূর্ন ধারণা এই গ্রন্থগুলি থেকে পাওয়া যায়। সেসময়ে গুরু বা পিতামাতারা তাদের সন্তানদের মৌখিকভাবে যে সকল শিক্ষামূলক গল্প করত সেইগুলি এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। দিগম্বর মতাবলম্বীরা মনে করে আচার্য ভূতবলী হলেন শেষ জৈন সন্ন্যাসী। এই মনীষীর জৈনধর্মের প্রামাণ্য শাস্ত্র সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। মহাবীরের মুখ-নি:সৃত উপদেশগুলি মহাবীরের দেহাবসানের পর তার কয়েকজন অনুগামী মিলে ওই সকল তথ্যগুলি পুনরুদ্ধার করে আগম শাস্ত্রের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছিল। খ্রিস্টপরবর্তী প্রথমশতাব্দীতে আচার্য ধরা সেন কর্তৃক আচার্য পুষ্পদন্ত ও আচার্য ভূতবলীকে উপদেশগুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তারা সেই আদেশ অনুসারে তালপাতায়

ষটখণ্ডাগম নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিল। এই গ্রন্থটি দিগম্বর সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ শ্রদ্ধেয় একটি গ্রন্থ। দিগম্বর সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কয়টি ধর্মগ্রন্থ পাওয়া গিয়েছিল সেইগুলির মধ্যে তুলনামূলক ভাবে এই গ্রন্থটি সবচেয়ে প্রাচীন। জৈন আগমগুলিতে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ জৈনদের পালনীয় পাঁচটি প্রধান ব্রতের কথা এইখানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেগুলি আবার মহাবীর নিজস্ব নৈতিক আদর্শগুলির সঙ্গে যুক্ত করে ব্যাখ্যা করেছিলেন। যেখানে মহাবীরের দর্শনে আটটি মূলভিত্তি (বিশ্বাসের নীতি), তিনটি অধিবিদ্যা (দ্রব্য, জীব, ও অজীব) ও পাঁচটি নৈতিক আদর্শের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যেগুলির উদ্দেশ্য ছিল মানব জীবনের মান উন্নত করা। মহাবীর তার বাণীর মধ্যে দিয়ে সর্বদা সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও একটি বুদ্ধিদীপ্ত সমাজের কথা বলেছেন। এই সমাজ আনতে গেলে যে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের আত্ম-সংযম অভ্যাস জরুরি সেকথা বলেছেন। যতি বৃষভের *তিলোয়পণ্ণত্তি* গ্রন্থে মহাবীরের জীবনের সঙ্গে যুক্ত প্রায় সকল ঘটনা মুখস্থ করে রাখার উপযোগী আকারে আলোচনা করা হয়েছে। আচার্য জিনসেনের *মহাপুরাণ* গ্রন্থটি *আদিপুরাণ* ও *উত্তরপুরাণ* গ্রন্থের সংকলন। খ্রিস্টপরবর্তী অষ্টমশতাব্দীতে তার শিষ্য আচার্য গুণভদ্র এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেছে। উত্তরপুরাণ গ্রন্থে মহাবীরের জীবন কথা তিনটি পর্বে মোট আঠারোশো আঠারোটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। ৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে অসগ মহাবীরের জীবন অবলম্বনে *বর্ধমানচরিত* নামে একটি সংস্কৃতকাব্য রচনা করেছিলেন। সামন্ত ভদ্রের *স্বয়ম্ভুস্তোত্র* হল চব্বিশজন তীর্থঙ্করকে নিয়ে রচিত স্তুতি কবিতা। এখানে আটটি শ্লোকে মহাবীরের গুণাবলি কীর্তন করা হয়েছে। আচার্য সামন্ত ভদ্রের (আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টাব্দে) *যুক্ত্যানুশাসন* হল চৌষট্টিটি শ্লোকে বিন্যস্ত একটি কাব্যিক মহাবীর স্তুতি।[৩৪] জৈনকবি ভগচন্দ (১৬১৩- ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দ) *মহাবীরাষ্টক স্তোত্র* নামে একটি স্তোত্র রচনা করেছিলেন। পার্শ্বনাথের নির্বাণের পর তার শিষ্য শুভদত্ত সন্ন্যাসীদের প্রধান হয়েছিলেন। শুভদত্তের পর যথাক্রমে হরিদত্ত, আর্যসমুদ্র, প্রভা ও কেশী সন্ন্যাসীদের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। উত্তরাধ্যয়ন নামক শ্বেতাম্বর ধর্মগ্রন্থে মহাবীরের শিষ্য ও কেশীর মধ্যে একটি কথোপকথনের বিবৃতি ধরা পড়েছে। যেই বার্তালাপ থেকে জানা যায় কেশী ও তার অনুগামীরা মহাবীরকে তীর্থঙ্কর হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে মহাবীরের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। সুধর্মস্বামীর পর পাঁচজন সূত্রকেবলী জৈন সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। ভদ্রবাহু ছিলেন সর্বশেষ

সূত্রকেবলী। ভদ্রবাহুর পরে আরও সাতজন (মতান্তরে এগারো জন) জৈন সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এরপর ধীরে ধীরে জৈনশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান সমাজ থেকে ম্লান হতে থাকে।

এই ধর্মমত সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি অহিংসার শিক্ষা দেয়। জৈন ধর্মাবলম্বীরা মনে করে অহিংসা ও আত্ম-সংযম হল মোক্ষ এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিলাভের পন্থা। তারা ধর্মচক্রের প্রতীকীর মধ্যে দিয়ে সত্য ও অহিংসার পথে নিরন্তর যাত্রার মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কথাকে ব্যক্ত করে। অহিংসা জৈনধর্মের প্রধান ও সর্বাধিক পরিচিত বৈশিষ্ট্য। কোনোরকম আবেগের তাড়নায় কোনো জীবিত প্রাণীকে হত্যা করাকে জৈনধর্মে হিংসা বলা হয়। এই প্রকারের কাজ থেকে দূরে থাকাকে জৈনধর্মে অহিংসা নাম দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিনের কাজকর্মে অহিংসার আদর্শটিকে প্রাধান্য দেওয়া জৈনধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তারা মনে করে প্রত্যেক মানুষ নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ ও কোনোরকম আদান-প্রদানের সময় অহিংসার চর্চা করবে। কাজ, বাক্য বা চিন্তার মাধ্যমে অন্যকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকবে – তাহলে জৈনধর্মের উন্নতি সম্ভব। মানুষ ছাড়া সমস্ত জীবিত প্রাণীর প্রতি জৈনরা অহিংসা ব্রতপালন করে থাকে। জীবনের ধরন ও অদৃশ্য জীবনসহ জীবনের আকৃতি সম্পর্কে জৈনদের ধারণা অত্যন্ত বিস্তারিত। জৈন ধর্মমতে হিংসার পিছনে উদ্দেশ্য ও আবেগগুলি কাজের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা বিশ্বাস করে এইগুলির মধ্যে দিয়ে কর্মবন্ধনের কারণ লুকিয়ে থাকে। জৈনধর্মে আত্মরক্ষার জন্য হিংসা বা যুদ্ধ মেনে নেওয়া হয়। কোনো সৈন্য যখন আত্মরক্ষার জন্য কাউকে হত্যা করে। কেউ ঘৃণা বা প্রতিশোধের বশে কাউকে হত্যা করে – এই দুটি হিংসার ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। শান্তিপূর্ণ সমাধানসূত্র না পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে এইগুলি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩২২-২৯৮ অব্দ) শেষ জীবনে ভদ্রবাহুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দ) বৌদ্ধ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অশোকের শিলালিপিগুলিতে জৈনদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে অশোকের পৌত্র (খ্রিস্টপূর্ব ২২৪-২১৫ অব্দ) সুহস্তী নামক এক জৈনসন্ন্যাসী কর্তৃক জৈনধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। তিনি উজ্জয়িনীতে বাস করতেন। তিনি বেশ কিছু জৈনমন্দির স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে যেসকল মন্দিরের উৎস বিস্মৃত হয়েছিল। সেগুলিকে তার নির্মিত মন্দির বলে উল্লেখ করা হয়। ভারতীয়

ইতিহাস থেকে জানা যায় মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে এক দ্বাদশ বর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটে।[৩৫] এই সময় আচার্য ভদ্রবাহু দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কর্ণাটক অঞ্চলে চলে যায়। ভদ্রবাহুর শিষ্য স্থূলভদ্র মগধে থেকে যায়। ভদ্রবাহুর অনুগামীরা মগধে প্রত্যাবর্তন করলে অঙ্গ শাস্ত্রের প্রামাণিকতাকে কেন্দ্র করে স্থূলভদ্র ও তাদের মধ্যে বিবাদ বাধে। মগধবাসী জৈনরা এই সময়কাল থেকে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করতে শুরু করে। ভদ্রবাহুর অনুগামীদের কাছে এই রীতিটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। তারা মনে করে পোষাক পরিত্যাগ করে নগ্ন থাকাই ছিল জৈন শাস্ত্রানুমোদিত বিধি। এই বস্ত্র পরিধানকে কেন্দ্র করে জৈন সমাজ দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর নামে দুটি দলে ভাগ হয়ে যায়। দিগম্বর জৈনরা বস্ত্র পরিত্যাগ করে নগ্ন অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করে। শ্বেতাম্বর জৈনরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে। দিগম্বরেরা বস্ত্র পরিধান করাকে জৈন মতগুলির বিশ্বাসের পরিপন্থী মনে করে থাকে। তাদের মতে জৈনমতবাদ অনুসারে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় জীবনযাপন করা উচিত। দিগম্বর মতাবলম্বীরা এই রীতিকে মান্যতা দিয়ে প্রাচীন শ্রমণ প্রথা-টিকে সংরক্ষণ করে চলেছে। জৈনধর্মের ইতিহাস সংক্রান্ত যে তথ্যগুলি পাওয়া যায় সেগুলি অনিশ্চিত ও খণ্ডিত। জৈনদের মতে রাজা বিম্বিসার (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৫৮-৪৯১) অজাতশত্রু (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৯২-৪৬০) ও হর্যঙ্ক রাজবংশের উদয়ন জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নন্দ সাম্রাজ্যে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪২৪-৩২১) জৈনধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। মহামেঘবাহন রাজবংশের সম্রাট খারবেল ছিলেন ধর্মসহিষ্ণু রাজা। তিনি জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। উদয়গিরির উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় তিনি প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথের একটি মূর্তি নির্মাণ করেছিল। সন্ন্যাসীদের জন্য গুহানিবাস তৈরি করেছিলেন। গর্দভিল্লর পুত্র বিক্রমাদিত্যকে জৈনরা তাদের ধর্মের পৃষ্ঠপোষক বলে মনে করে। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট জৈনসন্ন্যাসী সিদ্ধসেন দিবাকরের শিষ্য। অনুমান করা হয় রাজা শালিবাহন বিক্রমাদিত্যের শাসনের অবসান ঘটিয়েছিলেন। এই রাজা ছিলেন জৈনধর্মের এক বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপরবর্তী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত মথুরা জৈনধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। যার প্রমাণ পাওয়া যায় চীনাপর্যটক হিউয়েন সাং (৬২৯-৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ) এর বিবরণ থেকে। তিনি জানিয়েছেন রাজগৃহের কাছে বৈশালী, নালন্দা ও পুণ্ড্রবর্ধনে অসংখ্য জৈনরা বাস করত। তিনি তার সমসাময়িক কালে কলিঙ্গকে জৈনধর্মের প্রধান কেন্দ্র মনে করেছিলেন। সিদ্ধসেন

দিবাকরের শিষ্য বাপ্পাভট্টি কনৌজের রাজা অমকে (খ্রিস্টপরবর্তী অষ্টমশতাব্দী) জৈনধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিল। খ্রিস্টপরবর্তী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে বাপ্পাভট্টি অমের বন্ধু বাকপতিকে ধর্মান্তরিত করেছিল। এই বাকপতি ছিলেন বিখ্যাত প্রাকৃত*গৌড়বাহ* কাব্যের রচয়িতা। দ্বিতীয় শতাব্দীর উৎকীর্ণ লিপিগুলি থেকে জানা যায় - তার ভারতে আগমনের পূর্বে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মধ্যে জৈনধর্মের বিভাজন ঘটে গিয়েছিল।

চারশো চুয়ান্নো খ্রিস্টাব্দে জৈনশাস্ত্র রচনার জন্য বল্লভী সভার আয়োজন করা হয়েছিল। দিগম্বর সম্প্রদায় এই শাস্ত্রগুলিকে অপ্রামাণিক বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। জৈনসন্ন্যাসী সিলুঙ্গ সূরি যাদব রাজবংশের রাজা বনরাজকে (৭২০-৭৮০ খ্রিস্টাব্দ) লালনপালন করেছিল। চালুক্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মূলরাজ নিজে জৈন না হলেও একটি জৈনমন্দির নির্মাণ করেছিলেন জনস্বার্থে। ভীমের (১০২২-১০৬৪ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বকালে বিমল নামে এক জৈনগৃহস্থ আবু পর্বতের চূড়ায় অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। জৈনসন্ন্যাসী হেমচন্দ্র সূরি (জন্ম ১০৮৮ খ্রিস্টাব্দ) আট বছর বয়সে সন্ন্যাসী দেবচন্দ্র কর্তৃক দীক্ষিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন জৈনধর্মের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বময় পুরুষ। গুজরাতে জৈনধর্মের প্রসারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। হেমচন্দ্র সোলাঙ্কি রাজবংশের রাজকুমার পালকে জৈনধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। আচার্য হেমচন্দ্র ছিলেন একজন জৈনপণ্ডিত, কবি ও বহুবিদ্যা বিশারদ। তিনি ব্যাকরণ, দর্শন, ভাষাবিজ্ঞান ও সমসাময়িক ইতিহাসের উপর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি একজন মহাপণ্ডিতের স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। তিনি নিজ মহিমাগুণে *কলিকালসর্বজ্ঞ* (কলিযুগের সব কিছু জানেন যিনি) উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তার অনুপ্রেরণাতে সিদ্ধরাজ কতৃক রচিত হয়েছিল ব্যাকরণ গ্রন্থ ও যেমন - *সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ*[৩৬] নামক গ্রন্থটি। *সিদ্ধ-হেম-শব্দানুশাসন*[৩৭] নামক একটি পাণিনির অনুকরণে ব্যাকরণ হেমচন্দ্র নিজে রচনা করেছিলেন। তিনি *দ্ব্যশরায়* নামে একটি কাব্যরচনা করেন যেখানে ব্যাকরণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে সোলাঙ্কি রাজবংশের ইতিহাসকে পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটি সমসাময়িক যুগের গুজরাত অঞ্চলের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। *কাব্যানুপ্রকাশ* নামে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি কাশ্মীরি অলংকারবিদ মন্মতের *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থের আদলে রচিত। এই গ্রন্থে তিনি আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত প্রমুখ অন্যান্য পণ্ডিতদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

অভিধান-চিন্তামনি হেমচন্দ্র রচিত একখানি অভিধান। বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দগুলিকে একত্রে নিয়ে তিনি *অনেকার্থ কোষ* নামে আরেকটি অভিধান রচনা করেন। পূর্বেব্যবহৃত অ-সংস্কৃত শব্দের একটি অভিধান রচনা করেছিলেন *দেশি-শব্দ-সংগ্রহো* (দেশি-নাম-মালা) নামে। *নিগন্থু সেস* নামে তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি অভিধান গড়ে তুলেছিলেন। এই মহান মনিষীর গণিতবিদ্যাতে পারদর্শীতার কথা ধরা পড়ে। তিনি তার পূর্বসূরি গোপালের অনুসরণে ফিবোনাচ্চি রাশিমালার একটি আদিপাঠ সূচনা করেছিলেন, যার সাহায্যে প্রকৃতির বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করা যায়। এগুলি ছাড়া তার অন্যান্য রচনাগুলি হল *ছন্দানুশাসন* (ছন্দ), *অলংকার চূড়ামণি* (অলংকার শাস্ত্রের টীকা), *যোগ-শাস্ত্র* (যোগ সংক্রান্ত সন্দর্ভ), *প্রমাণ-মীমাংসা* (ন্যায়শাস্ত্র) ও *বীতরাগ-স্তোত্র* (প্রার্থনা)।

জৈনধর্মের পতাকায় পাঁচটি রং থাকে - কমলা/লাল, হলুদ, সাদা, সবুজ আর কালো/গাঢ় নীল। এই পাঁচটি রং পঞ্চপরমেষ্ঠী (অরিহন্ত, সিদ্ধ, আচার্য, উপাধ্যায়, সাধু) অথবা পঞ্চমহাব্রত (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ) এর প্রতীক। পতাকার বর্ণসমূহ ভিন্নার্থ বহন করে, যথা –*সাদা* হল অরিহন্ত এর প্রতীক। আত্মা সকল আসক্তি (ক্রোধ, মায়া, ঘৃণা) জয় করে। আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান ও শ্বাশ্বত সুখ অর্জন করে সেই সময়কে চিহ্নিত করে। সাদা রং শান্তি বা অহিংসাকে বোঝায়। লাল হল সিদ্ধপ্রাপ্তির প্রতীক। আত্মা মোক্ষ ও সত্য আত্মস্থ করলে এই রঙের মধ্য দিয়ে সেইগুলি প্রকাশ করে। লাল রং সত্যবাদিতা প্রকাশ করে। হলুদ আচার্য এর প্রতীক, যিনি উপাধ্যায়গণের প্রধান। হলুদ অচৌর্যবৃত্তিকে (চুরি না করা) গুরুত্ব দেয়.সবুজ উপাধ্যায়-এর প্রতীক, যারা পুরোহিতদের শাস্ত্র সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকে। সবুজ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে। গাঢ় নীল বা কালো সাধু বা মুনি বা পুরোহিত-এর প্রতীক। যার দ্বারা অপরিগ্রহ বোঝায়। পতাকার কেন্দ্রস্থিত স্বস্তিকা আত্মার অস্তিত্বের চারটি স্তর প্রকাশ করে, যথা - স্বর্গবাসী সত্তা, মনুষ্য, পশু পক্ষী পতঙ্গ ও বৃক্ষ এবং নরকবাসী সত্তা। স্বস্তিকার উপরস্থ তিনটি বিন্দু জৈনধর্মের রত্নত্রয়কে নির্দেশ করে। যেগুলি হল - সম্যকদর্শন (সঠিক বিশ্বাস বা দৃষ্টিভঙ্গি), সম্যকজ্ঞান (সঠিক জ্ঞান), সম্যকচরিত (সঠিক আচরণ)। তিনটি বিন্দুর উপরস্থ বক্ররেখাটি মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ স্থান ও বিশুদ্ধ শক্তির আধার সিদ্ধশিলার প্রতীক। যা পাতাল, ভূলোক ও দ্যুলোকের উর্ধ্বে অবস্থিত। যেসকল আত্মা মোক্ষ অর্জন করে যেমন অরিহন্ত বা সিদ্ধ, তারা সিদ্ধশিলায় বাস করে বলে জৈনরা বিশ্বাস করে। 'মূলসংঘ' নামে যেই সংঘটির ঐতিহাসিক

ভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়, সেটা আসলে একটি প্রাচীন জৈনসন্ন্যাসী সংঘ। এখানে মূল শব্দের আক্ষরিক অর্থ শিকড় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলসংঘ হল প্রধান দিগম্বর জৈনসংঘ। বর্তমান দিগম্বর জৈনসম্প্রদায় ও মূলসংঘ এই দুটি আদতে এক বলা চলে। আচার্য কুন্দকুন্দ (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক) এই মূলসংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫২ অব্দ এই সময়কালের মধ্যে দিগম্বর সম্প্রদায়কে নিয়ে *পঞ্চাস্তিকায়সময়সার* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[৩৮] এই সংঘের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় ৪৩০ খ্রিস্টাব্দে। মূলসংঘ আবার কয়েকটি শাখায় বিভক্ত। আচার্য ইন্দ্র নন্দীর শ্রুতাবতার ও ভট্টারকের নীতিসার অনুসারে। আচার্য অর্হদবালী জৈনসন্ন্যাসীদের একটি সম্মেলন আয়োজন করেছিলেন এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর নামকরণ করেছিলেন। চারটি প্রধান গোষ্ঠী হল - নন্দীগণ, এই গণের দুটি প্রধান উপশাখা রয়েছে, বলৎকরগণ, সরস্বতীগচ্ছ (প্রাচীনতম উল্লেখ ১০৭১ খ্রিস্টাব্দ) ও দেশীয়গণ, পুস্তকগচ্ছ (প্রাচীনতম উল্লেখ ৮৬০ খ্রিস্টাব্দ)। সেনগণ যারা জিনসেনের শাখার অন্তর্ভুক্ত। এটিকে আগে পঞ্চস্তুপ বা সুরাষ্ট্র বলা হত (প্রাচীনতম উল্লেখ ৮২১ খ্রিস্টাব্দ)। দেবগণ অকলঙ্ক দেবের শাখা। সিংহগণ শ্রবণ বেলগোলা ও মুদবিদ্রির ভট্টারকেরা দেশীয়গণের অন্তর্গত। হুমবাজের ভট্টারকেরা বলৎকরগণের অন্তর্গত। উত্তর ভারতের বিভিন্ন দিগম্বর সংঘ কাষ্ঠ সংঘের অন্তর্গত। মূলসংঘ ও কাষ্ঠসংঘের আচারগত ভিন্নতা খুব সামান্য। জৈনদের কিছু অহিংসার মূর্তি গড়ে তোলা হয়েছে - ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের নাসিকের কাছে মাঙ্গি-টুঙ্গিতে রাখা হয়েছে জৈনতীর্থঙ্কর ঋষভনাথের মূর্তি। এটি বিশ্বের উচ্চতম জৈনমূর্তি, যার উচ্চতা একশো আটফুট। জৈনদের পবিত্র পাহাড় মাঙ্গি-টুঙ্গির গায়ে খোদাই করে এই মূর্তিটি নির্মাণ করা হয়েছে। জৈনসন্ন্যাসিনী আর্যিকা জ্ঞানমতী মাতাজি ও আর্যিকা চন্দনামতী মাতাজির তত্ত্বাবধানে এই মূর্তিটি নির্মিত হয়েছে। মাঙ্গি-টুঙ্গি পাহাড়টি মহারাষ্ট্রের জৈনসমাজের কাছে পরিচিত চারটি সিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হয়। স্থানীয় মারাঠি জৈন ও কন্নড়গা জৈনদের কাছে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি তীর্থস্থান। এই পাহাড়ের চূড়ায় ও পাদদেশে অনেকগুলি জৈনমন্দির গড়ে উঠেছে। জৈনদের বিশ্বাস নিরানব্বই কোটি জৈনমুনি এই পাহাড়ে মোক্ষলাভ করেছিলেন।

গৌতম বুদ্ধের জন্ম ও মৃত্যুর সময়কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া না গেলেও, অনুমান করা যায় ৫৬৩-৪৮৩ খ্রিস্টপূর্ব এই সময়কাল তার জীবনকাল হিসেবে ধরা হয়। প্রাচীন গ্রন্থগুলি থেকে

আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যেখানে বলা হয়েছে সিদ্ধার্থগৌতম শাক্যজনগোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করে। এই গোষ্ঠী খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মূল ভূখন্ড থেকে সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ভাবে কিছুটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একটি ক্ষুদ্র গণতন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র হিসেবে শাসন করত। সিদ্ধার্থ গৌতমের পিতা শুদ্ধোধন একজন নির্বাচিত গোষ্ঠীপতি ছিলেন, যারও পররাজ্য শাসনের দায়িত্ব ছিল। বৌদ্ধ ঐতিহ্যানুসারে, গৌতম অধুনা নেপালের লুম্বিনী নগরে জন্মগ্রহণ করেন ও কপিলা বস্তুতে বড় হয়ে ওঠেন। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতের অসিত নামক একজন পরিব্রাজক তপস্বীর কথা জানা যায়। যিনি কপিলাবস্তু[৩৯] নগরে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্মের পর তার পিতা শুদ্ধোধনের আমন্ত্রণে আসেন। নবজাত শিশুকে দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন শিশু গৌতম পরবর্তীকালে একজন রাজচক্রবর্তী বা বুদ্ধপ্রাপ্ত হবে। প্রাচীন ভারতের মহাজনপদ থেকে পাওয়া যায় মগধ সাম্রাজ্যের শাসক বিম্বিসারের রাজত্বকালে গৌতমবুদ্ধ জীবিত ছিলেন। গৌতমবুদ্ধ রাজা বিম্বিসারকে শিক্ষাদান করেছিলেন এবং একটি ভিক্ষু সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (আনুমানিক ৫৫৮–৪৯১ খ্রিস্টপূর্ব)। রাজা বিম্বিসারের উত্তরসূরি অজাতসত্রুর শাসনকালের প্রথমদিকে গৌতমবুদ্ধের জীবিতকাল বলে ধরা হয়। এই গণনা থেকে অনুমান করা হয় বুদ্ধ ছিলেন জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের কনিষ্ঠ এবং সমসাময়িক।[৪০] বুদ্ধের জীবনের পূর্ব বা সমকাল জুড়ে ছিল বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদ আজীবক, চার্বাক, জৈনধর্ম ও অঞ্জন প্রভৃতি প্রভাবশালী শ্রমণ চিন্তাধারার প্রসারের কাল। প্রাচীন ভারতের *ব্রহ্মজল সুত্ত* নামক একটি গ্রন্থে এই ধরনের বাষট্টি-টি মতবাদের কথা উল্লেখ করা রয়েছে। এই সকল মতবাদগুলির যারা ধারক এবং বাহক ছিলেন তারা হলেন - মহাবীর, পূরণ কস্সপ, মক্খলি গোসাল, অজিত কেশকম্বলী, পকুধ কচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত প্রমুখ প্রভাবশালী দার্শনিকগণ। তাদের মতগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা রয়েছে *সামান্নফল সুত্ত* নামক গ্রন্থে। অনুমান করা যায় গৌতমবুদ্ধ ও তাঁর পূর্বপ্রচলিত মতবাদগুলির দ্বারা আপন মার্গ দর্শনের পথকেও বর্ধিত করেছিল। বুদ্ধের প্রধান দুই শিষ্য সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লান প্রথম জীবনে ছিলেন সংশয়বাদী সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্তর প্রধান শিষ্য। ত্রিপিটকে উল্লেখ পাওয়া যায় গৌতমবুদ্ধ তার প্রতিদ্বন্দ্বী মত ধারার সমর্থকদের সঙ্গে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে থাকত। বুদ্ধ নিজেও ছিলেন সমসাময়িক কালের অন্যতম শ্রমণ দার্শনিক। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে আলার কালাম ও উদ্দক রামপুত্ত নামে দুই দার্শনিক ও ঐতিহাসিক চরিত্র। যারা বুদ্ধকে ধ্যানের দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষা

দিয়েছিল। বুদ্ধের জীবনকথায় জন্ম, বয়ঃপ্রাপ্তি, সন্ন্যাসগ্রহণ, আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান, বোধিলাভ, শিক্ষাদান ও মৃত্যু পর্যন্ত এই সাতটি ধারাকে পর্যায়ক্রমে স্বীকার করা হয়েছে। প্রথাগত জীবনী গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে মতানৈক্য খুব কম ক্ষেত্রে দেখা যায়। গৌতমের সময়কাল বা তার মৃত্যুর কয়েক শতাব্দীর পর পর্যন্ত তার জীবন সম্বন্ধে লিখিত কোন তথ্যসূত্র পাওয়া যায় না। তার পরবর্তী প্রায় দুই শতাব্দী এই সময়ের মধ্যে সম্রাট অশোক গৌতমবুদ্ধের জন্মস্থানে তীর্থ করতে গিয়ে লুম্বিনীতে স্তম্ভ স্থাপন করেছিল। তার অন্য একটি স্তম্ভে বিভিন্ন ধর্মীয় পুঁথির উল্লেখ রয়েছে। যার দ্বারা মৌর্যযুগে লিখিত বৌদ্ধঐতিহ্যের অস্তিত্বের কথা প্রমাণিত হয়। পূর্ব আফগানিস্তানের জালালাবাদের নিকটে হাড্ডা হতে আবিষ্কৃত খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় থেকে প্রথম শতাব্দীতে গান্ধারী ভাষায় রচিত ও খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত। সাতাশটি বার্চের ছালের গান্ধার বৌদ্ধ পুঁথিগুলি বর্তমানে টিকে থাকা বৌদ্ধ পুঁথিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

কপিলাবস্তু থেকে গৌতমবুদ্ধের যাত্রা শুরু হয়ে এশিয়া মহাদেশের বাইরেও এই ধর্মের প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে। স্থানভেদে বৌদ্ধধর্মের রূপের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন - তিব্বতি বৌদ্ধধর্মে হিমালয়ের কোলে অবস্থিত বিশেষ কিছু অঞ্চলে চর্চিত বৌদ্ধধর্ম যা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এক স্বতন্ত্র রূপলাভ করেছে। মূলত তিব্বত, ভুটান, ভারতের সিকিম, লাদাখ উপত্যকা, তাওয়াং, মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া। উত্তর-পূর্ব চিনের কিছু অংশের অধিবাসীগণ অনুশীলন করে থাকে তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম। তিব্বতি বৌদ্ধধর্মে বিবিধ প্রকারের ধারা এবং মতবাদের অস্তিত্ব থাকলেও এটি মুখ্যত চার ধারায় বিভক্ত। যথা - নিংমা, কাগিয়ু, গেলুগ এবং সাক্য। বৌদ্ধধর্মের এই সকল ধারাগুলি বৌদ্ধদের তিনটি মূল শাখা মহাযান, হীনযান এবং বজ্রযানের শিক্ষার আদর্শ বহন করে চলেছে। এই ধারার মতবাদ কোন কোন মতানুসারে বজ্রযান মহাযানের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নেপালে প্রাপ্ত ইতিহাস থেকে যেসকল তথ্যগুলি পাওয়া যায় তাতে নিওলিথিক যুগের বেশ কিছু উপাদান পাওয়া যায়। নির্দেশ করা রয়েছে যে হিমালয়ান অঞ্চলে প্রায় ৯০০০ বছর থেকে মানুষ বসবাস করে আসছে। অনুমান করা হয় প্রায় ২৫০০ বছর পূর্বে নেপালে তিব্বতী-বার্মীয় জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বে ইন্দো ইরানীয় বা আর্য জাতিগোষ্ঠী এই হিমালয়ান উপত্যকায় প্রবেশ করে। ১০০০ খ্রিস্টপূর্ব কালে এই অঞ্চলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য স্বতন্ত্র রাজ্য এবং কিছু কনফেডারেশন গড়ে উঠেছে। এমন একটি কনফেডারেশন

ছিল সাকিয়া যার একসময়কার রাজা ছিলেন সিদ্ধার্থ গৌতমবুদ্ধের পিতা শুদ্ধধন (৫৬৩-৪৮৩ খ্রিস্টপূর্ব)। ২৫০ খ্রিস্টপূর্ব এই অঞ্চলটি উত্তর ভারতের মৌর্যসাম্রাজ্যের অধীনে আসে। খ্রিস্টপরবর্তী চতুর্থ শতাব্দীতে এটি গুপ্ত সম্রাজ্যের অধীনে একটি পুতুল রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পঞ্চম শতাব্দীর শেষ থেকে শুরু করে পরবর্তী বেশ কিছুটা সময় শাসন করে একদল শাসক যারা সাধারণভাবে লিচ্ছবি নামে পরিচিত। লিচ্ছবি সাম্রাজ্যের পতন হয় অষ্টম শতাব্দীতে এবং সূচনা হয় নেওয়ারি যুগের। ৮৭৯ সালে নেওয়ারিদের রাজত্ব শুরু হলে সমগ্র রাষ্ট্রের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নেপালের দক্ষিণাংশ দক্ষিণ ভারতের চালুক্য সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। চালুক্যদের রাজত্বকালে নেপালের ধর্মীয় বিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন আসে কারণ সব রাজাই হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এবং বৌদ্ধধর্মের প্রসারের বিপরীতে হিন্দুধর্মের প্রচারে অবদান রেখেছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে যেসব রাজা অধিষ্ঠান করে তাদের নামের শেষে সাধারণ একটি শব্দ ছিল মল্ল যার অর্থ হচ্ছে কুস্তীগীর। গোর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণ শাহ কয়েক দশক ধরে যুদ্ধের পর কাঠমান্ডু উপত্যকা দখল করে ছোটবড় রাজ্যে বিভক্ত নেপালকে একটি রাষ্ট্রীয় সংহতি দান করে। নেপালের ইতিহাসে এইসময় থেকে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে হিমালয়ের কোল থেকে নেপালের যাত্রা শুরু করেছিল এমনটা বলা যায়। এই পৃথ্বীনারায়ণ শাহকে আজকের নেপালের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। সিন্ধুসভ্যতা থেকে শুরু করে প্রাচীনযুগের দীর্ঘকাল জুড়ে ভারতবর্ষে জৈনধর্মের প্রভাব সমাজে চলে এসেছে। জৈন চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীরের দেহাবসানের পরে জৈনধর্মের বিনাশ হয়ে যায়নি। পরবর্তীকালের এই ধারার কিছু শ্রমণ জৈনধর্মের পথকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। জৈনধর্মের সমকালের অন্য একটি ধর্ম হল বৌদ্ধধর্ম। দুই ধর্মের মধ্যে কিছু ভিন্ন ধ্যানধারণা থাকলে একথা স্বীকার করতে হয় যে বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্ম থেকে কিছু আদর্শ গ্রহণ করে আপন ধারাকে পুষ্ট করেছে। বৌদ্ধধর্মে স্তূপ পূজার কথা বলা হয়েছে। জৈন ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে উল্লেখ্য –

> শৈব ধর্মীদের প্রাধান্যের পূর্বেবৌদ্ধ ও জৈন ধর্মীরাও এখানে বহুলাড়ায় প্রভুত্ব করে গেছেন মনে হয়। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের মধ্যে আজও যে মূর্তি পূজিত হয়েছে হচ্ছে তা জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথের মূর্তি। এই মন্দিরের কাছে ভূগর্ভ হতে কয়েকটি স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন ঐগুলি বৌদ্ধ সমাধি বা শারীরিক চেইয়। কিন্তু এস্থলে মন্তব্য করা যায় – জৈনদের মধ্যেও ঐরূপ কারণে সমাধি স্তূপ গঠন করা হত। স্তূপ পূজা বা আরাধনা জৈনরা বৌদ্ধদের পূর্বে আরম্ভ করেছিলেন। বহু ঐতিহাসিক মনে করেন ভারতে জৈন বা বৌদ্ধযুগের বহুপূর্বেও স্তূপ পূজা প্রচলিত ছিল দেবতার প্রতীক কিংবা ভক্তিভাজন পরলোকগত ব্যক্তির সমাধি হিসেবে।[৪১]

জৈনদের সঙ্গে বৌদ্ধদের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার কথা এইভাবে ইতিহাসে বারবার উঠে এসেছে। জৈন শাস্ত্রগুলি থেকে একথা জানা গেছে যে মহাবীরের মতাবলম্বীরা আধাত্ম্যচর্চার জন্য চৈত্যে অবস্থান করত। জানা যায় গৌতমবুদ্ধ এই চৈত্যগুলির সম্মান প্রদান করত। তার গৃহী ভক্তদের এই চৈত্যের প্রতি আগ্রহ দেখাতে উৎসাহ প্রদান করতেন।

২.৩) হিন্দু-বৌদ্ধযুগ

ভারতীয় উপমহাদেশে সময়ের স্রোত ধরে ভিন্ন ধর্মীয় আবহের প্রভাব লক্ষ করা গেছে। তাঁদের মধ্যে হিন্দুধর্ম হল প্রচলিত একটি আধ্যাত্মিক মতবাদ। এই হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের ধর্মমতকে সনাতন ধর্ম নাম দিয়ে থাকে। হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে লৌকিক, বৈদিক হিন্দুধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম ও শাক্তধর্মের মতো ভক্তিবাদী ধারাগুলির জটিল মতবাদের সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। যোগ এবং কর্মযোগের ধারণাগুলির সঙ্গে হিন্দুধর্মের কিছু মিল দেখা যায়। হিন্দুধর্ম একাধিক ধর্মীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গঠিত। এই ধর্মের কোনো একক প্রতিষ্ঠাতার প্রমাণ এখন লক্ষ করা যায় না। অনুমান করা যায় বৈদিকযুগ (১৭৫০–৫০০ খ্রিস্টপূর্ব) এই সময়ে প্রচলিত বৈদিকধর্মের মধ্যে সনাতনধর্মের শিকড় গ্রথিত ছিল –

> ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলির মধ্যে আর্যদের ধর্মবিশ্বাসের আদিরূপের সাক্ষাৎ মেলে। এর মূলে ছিল প্রকৃতির পূজা, যা প্রকৃতিরদেবদেবীর পূজায় পরিণতি লাভ করেছিল। আদিম সর্বপ্রাণবাদ ছিল এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঋক-বৈদিক আর্যরাযেমন সর্বত্র প্রাণের, তেমনই বহু দেবদেবীর, অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। প্রকৃতির বাহ্যরূপ ও তার দেবদেবীর উপর তারা মনুষ্য চরিত্রের দোষ গুণ আরোপ করত। কখনও বা দেবদেবীকে পশুর আকার দিয়ে তারা প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মাঝে মাঝে ইন্দ্রকে ষাঁড় এবং অগ্নিকে তেজী ঘোড়া কল্পনা করা হত।[৪২]

হিন্দুধর্মকে বিশ্বের প্রাচীনতম জীবিত ধর্মবিশ্বাস নামে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। হিন্দুধর্মকে পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম বলে মনে করা হয়। এই ধর্মের মূলে কিছু চিরন্তন কর্তব্যের কথা উল্লেখ করা থাকে যেমন - সততা, অহিংসা, ধৈর্যশীলতা, সমবেদনা ও আত্মনিয়ন্ত্রন ইত্যাদি। হিন্দুধর্মের মধ্যে বাহ্যিক আচার-বিচারের থেকে পরম সত্যের জ্ঞানকে সর্বদা মুখ্যস্থান দান করা হয়। হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী এই ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পুরুষার্থ। যেখানে মানবজীবনের সঠিক উদ্দেশ্য বিকাশের কথা বলা হয়। যেগুলি হল - ধর্ম (নীতি), অর্থ, কাম এবং মোক্ষ যার অর্থ, জন্ম মৃত্যুর পুন: পুন: জন্ম (ইহলোকে বা স্বর্গাদি অন্যলোকে) থেকে মুক্তিকর্ম (কাজ, অভিপ্রায় ও ফল) এবং বিভিন্ন ধরনের যোগসাধনা (মোক্ষ লাভের পথ)। হিন্দুদের নিত্যকর্মের তালিকায় আছে পূজা, অর্চনা, দান, ধ্যান, পারিবারিক সংস্কার,

বার্ষিক অনুষ্ঠান এবং তীর্থযাত্রা। ঋগ্বেদের মধ্যে দানস্তুতির উল্লেখ করা রয়েছে। কোন রাজা কোন পুরোহিতকে কী কী সামগ্রী দান করেছিল সেইগুলি যত্ন সহকারে উল্লেখ করা রয়েছে। দাতার পক্ষে দানক্রিয়ার শুভাশুভের কথা এই গ্রন্থে উল্লেখ করা রয়েছে। কেউ কেউ সমাজ ও সভ্যজগতে জাগতিক সুখ ছেড়ে পারমার্থিক শান্তির আশায় ও মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করে থাকে। জনসংখ্যার বিচারে হিন্দুধর্ম, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের পরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মমত। এই ধর্মের অনুগামীদের সংখ্যা আনুমানিক একশো পঁয়ত্রিশ কোটি। এদের মধ্যে একশো দশকোটি হিন্দুমতে বিশ্বাসী মানুষ বাস করেন ভারতে। আনুমানিক নেপাল (৩৩,০০০,০০০), মরিশাস (২৫০,০০০) ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপ বালিতে (৩০০,০০০) উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় হিন্দুরা বাস করেন। হিন্দুধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা রয়েছে অসংখ্য। হিন্দুশাস্ত্রগুলি মূলত শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুই ভাগে বিভক্ত। হিন্দু শাস্ত্রমালায় ধর্ম-সম্পর্কিত শ্রুত বা দৃষ্ট আদি চিন্তারাশিকে শ্রুতিবিন্যাসে বিন্যস্ত করা হয়েছে। শাস্ত্রীয় এই মালিকাটি গঠিত হয়েছে ন্যূনতম ছিয়াত্তরটি গ্রন্থমালার সংমিশ্রণে। এই গ্রন্থটিকে ভাগ করা হয়েছে এইভাবে - চারটি বেদ (ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ দুটি শুক্লযজুর্বেদ-কৃষ্ণযজুর্বেদ ও অথর্ববেদ), ছয়টি বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, শূল্যসূত্র, ব্যাকরণ, পানিনি রচিত অষ্টাধ্যায়ী, নিরুক্ত, যাস্ক সংকলিত নিরুক্ত যেখানে বেদে ব্যবহৃত শব্দাদির অভিধান, ছন্দ, পিঙ্গল বিন্যস্ত ছন্দসূত্র, জ্যোতিষ, লগধ বর্ণিত জ্যোতিষ)। আঠারোটি ব্রাহ্মণ, নয়টি আরণ্যক, তেরোটি উপনিষদ, চারটি উপবেদ, কুড়িটি সংহিতা বা স্মৃতি বা নীতিশাস্ত্র (বেদাঙ্গান্তর্ভুক্ত কল্পশ্রেণীভুক্ত নীতিশাস্ত্র সংকলন)। দুটি সমন্বয়ী - গীতা ও ব্রহ্মসূত্র এইভাবে শ্রুতিশাস্ত্রের বিস্তার ঘটেছে। মস্তিষ্কে তথ্য ধারণ করে রাখার প্রক্রিয়া কিংবা মস্তিষ্কে ধারণকৃত তথ্যকে স্মৃতি বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে তথ্য আহরণ করে মস্তিষ্কে জমা করা হয়। দরকার অনুযায়ী সেই তথ্য আবার ভান্ডার থেকে খুঁজে নিয়ে আসা হয়। জমাকৃত তথ্য হারিয়ে গেলে কিংবা সময়মত খুঁজে পাওয়া না গেলে তা দুর্বল স্মৃতিশক্তির লক্ষণ। অত্যাধিক মানসিক চাপের কারণে স্মৃতি-দৌর্বল্য দেখা দেয়। এই স্মৃতিতে সেকালের মানুষ কিছু সাহিত্যকে ধারণ ও বহন করত। এইভাবে স্মৃতিশাস্ত্রগুলি মানুষ মৌখিকভাবে একপ্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের দিকে ছড়িয়ে দিত। এই স্মৃতি শাস্ত্রগুলির কয়েকটি ভাগ রয়েছে - সংবেদী স্মৃতি, স্বল্প মেয়াদী স্মৃতি ও দীর্ঘ মেয়াদী স্মৃতি। কয়েক সেকেন্ড বা তার কম সময় যে স্মৃতি স্থায়ী হয় তাই হল সংবেদী স্মৃতি। একটি পাত্রের দিকে এক

পলক তাকানোর ফলে পাত্রটির আকার কেমন ছিল, বর্ণ কি ছিল ইত্যাদি যে সব তথ্য আমাদের মস্তিস্কে সংরক্ষিত হয়ে যায় তা হল সংবেদী স্মৃতির উদাহরণ। একসারি শব্দ এক সেকন্ডের পর্যবেক্ষণের পর যতগুলো মনে রাখা যায় তা সংবেদী স্মৃতির উদাহরন। অধিকাংশ সময় পর্যবেক্ষক যা দেখে সব মনে রাখতে পারে না। সংবেদী স্মৃতি তিন ধরনের হয়। কিছু দেখার মাধ্যমে যে সংবেদী স্মৃতি জমা হয় তা আইকনিক সংবেদী স্মৃতি, যেমন - বৃষ্টির সময় বিজলি। কিছু শোনার ফলে যে সংবেদী স্মৃতির জমা হয় তা ইকোইক সংবেদী স্মৃতি। যেমন - কাঠে গর্ত করার সময় পেরেকের উপর হাতুড়ির আঘাতের শব্দ। স্পর্শের জন্য সৃষ্টি সংবেদী স্মৃতি হল হ্যাপ্টিক সংবেদী স্মৃতি। আইকনিক স্মৃতি এক সেকন্ডের ও কম সময়ের জন্য স্থায়ী হয়। ইকোইক স্মৃতি দুই থেকে তিন সেকন্ডের জন্য স্থায়ী হয়। স্মৃতির এই বৈচিত্রের জন্য শ্রুতি শাস্ত্রের তুলনায় স্মৃতিশাস্ত্রের আনুশাসনিক গুরুত্ব কম হয়ে যায়। বলা যায় স্মৃতি সাহিত্য হল বিভিন্ন বৈচিত্রময় গ্রন্থের সংকলন। এই সংকলনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ছয়টি বেদাঙ্গসহ (বেদের ঐচ্ছিক চর্চা), মহাকাব্য (মহাভারত ও রামায়ণ), ধর্মসূত্র এবং ধর্মশাস্ত্র (বা স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ), অর্থশাস্ত্র, বিভিন্ন পুরাণ, কাব্য বা কবি সাহিত্য এবং ব্যাপক ভাষ্য বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। একই স্মৃতি অথচ প্রত্যেক স্মৃতিসাহিত্যেরই ভিন্ন পাঠকের কাছে আলাদা আলাদা সংস্করন ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তবে একথা উল্লেখ্য যে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে স্মৃতিকে সবচেয়ে অবাধ বলে ধারণা করা হত। যেকোন ব্যক্তি এই সাহিত্য লিখতে বা পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম হত। এই গ্রন্থগুলিতে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও পুরাণ আলোচিত হয়েছে এবং ধর্মানুশীলন সংক্রান্ত নানা তথ্য বিবৃত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে *বেদ*[৪৩] সবচেয়ে প্রাচীন, সর্বপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের স্থান অধিকার করে। অন্যান্য প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলি হল *উপনিষদ্*[৪৪], *পুরাণ*[৪৫], ও ভারতীয় মহাকাব্য *রামায়ণ*[৪৬] ও *মহাভারত*[৪৭]। *ভগবদ্গীতা*[৪৮] নামে পরিচিত মহাভারতের কৃষ্ণ-কথিত একটি অংশ বিশেষ গুরুত্ব সম্পন্ন ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে থাকে।

হিন্দুধর্মে উপাসনা তথা আরাধনার একটি বিশেষরীতি বেশ গুরুত্বের দাবি রাখে। এই আরাধনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভক্তি শব্দটির বেশ যোগ রয়েছে। মধ্যযুগে ভক্তিভাব ঢলঢল হয়ে চৈতন্যদেবের[৪৯] আগমনের পর থেকে বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। পূজনীয় দেবতা বা ব্যক্তির প্রতি বিশেষ অনুরাগ বা প্রেমকে ভক্তি বলা হয়। নিজের আরাধ্য ঈশ্বরের

নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রথাকে ভক্তি নামে অভিহিত করা যেতে পারে। ভক্তির পথে যিনি ঈশ্বরোপাসনা করে, তাকে ভক্তনাম দেওয়া যেতে পারে। এই সকল ভক্তিবাদীদের দর্শনকে ভক্তিমার্গ নাম দেওয়া হয়। ভক্তিবাদ কোন একটি শাখা বা ধর্মসম্প্রদায়ের মতকে ঘিরে গড়ে ওঠেনি। এখানে হিন্দুধর্মের একাধিক শাখাসম্প্রদায়ের মূলভিত্তি স্বরূপ গড়ে উঠেছে। এই জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভাবে ভক্তিবাদের একাধিক ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে। পারিভাষিক অর্থে ভক্তি শব্দের উল্লেখ বেদ-এ পাওয়া যায়নি বলে কিছু সমালোচক মনে করেন এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছিল পৌরাণিক যুগে। বৈদিক সাহিত্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেখানে ভক্তিভাবের কিছু অভাব নেই –

> বেদের মন্ত্রে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে প্রার্থনা-বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে, তাহার সমস্তটাই কেবল দানধ্যানের আবেদনপত্র নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেবতার সহিত কবির বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্কের কথাও বলা হইয়াছে। এবং একটি ক্ষেত্রে সেই সম্পর্ক বিশেষিত হইয়াছে ‘স্বাদু’ (অর্থাৎ মধুর) শব্দের দ্বারা- যস্য তে স্বাদু সখ্যং স্বাদ্বী প্রণীতীরদ্রিবঃ।[৫০]

এইভাবে ইন্দ্রদেবকে স্মরণ করা হয়েছে। কোথাও ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন করা হয়েছে প্রগাঢ় আন্তরিক ভাবের সমন্বয়ে। যেখানে রচয়িতা জানিয়েছে তার মন ইন্দ্র প্রশংসায় আকাঙ্ক্ষিত হয়েছে। স্ত্রী যেমন ভাবে তার স্বামীকে আলিঙ্গন করে, একইভাবে তার স্তুতিগুলি ইন্দ্রকে আলিঙ্গন করে যায়। ইন্দ্রের দিক থেকে রচয়িতার মন কখনও যেন বিমুখ না হয়, এমন প্রার্থনা করা হয়েছে। ভক্তিবাদ ঈশ্বর প্রেমকে প্রথা এবং আচার-অনুষ্ঠানের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকা, বন্ধু, পিতামাতা-সন্তান ও প্রভু-ভৃত্য ইত্যাদি মানবিক সম্পর্ক ভক্তিবাদের প্রধান স্তম্ভ। ঈশ্বরের কোনো নির্দিষ্ট রূপ ঈশ্বরের নিরাকার রূপ, বা গুরুর প্রতি ভক্তি ভক্তিবাদের বিশেষ অঙ্গরূপে ধরা পড়েছে। দেবতা বরুণ স্তুতিতে ভক্তের হৃদয় আকুলিত হয়েছে। বরুণদেবকে উদ্দেশ্য করে বলেছে –

> হে বরুণ, আমি কি স্বীয় তনুর দ্বারা তোমার সহবদন করিতে পারিব? কবে আমি তোমার চিত্তে সংলগ্ন হইব? হে বরুণ, আমি এমন কি অধিক অপরাধ করিয়াছি যাহার জন্য তুমি এই স্তুতিকারী বন্ধুকে জিঘাংসা করিতেছ? হে দুর্দম তেজস্বী বরুণ, আমার সেই অপরাধের কথা বল যাহাতে আমি পাপশূন্য হইয়া শীঘ্রই নমস্কারের দ্বারা তোমাকে অর্চনা করিতে পারি।[৫১]

বৈদিক সংহিতায় ভক্তি ভাবনা অঙ্কুরিত হলেও, সেই ভাবনার বিস্তারলাভ ঘটেছিল উপনিষদের যুগে। হিন্দুধর্মে সম্প্রদায় ভেদে ভক্তিবাদের নির্দিষ্ট ভিন্নরূপ প্রচলিত হয়েছে। যেমন - শৈবেরা শিব ও শিবসম্পর্কিত দেবদেবীগণের ভক্ত। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু ও তার অবতারগণের ভক্ত এবং শাক্তেরা মহাশক্তির বিভিন্ন রূপের ভক্ত। কোনো নির্দিষ্ট দেবতার প্রতি ভক্তি থাকলে অন্য কোনো দেবতাকে পূজা করা যাবে না – এমন কোনো বিধান হিন্দুধর্মে উল্লেখ করা নেই। *ভগবদ্গীতা* প্রথম ধর্মগ্রন্থ

যেখানে ভক্তি শব্দটিকে প্রথম ধর্মীয় পথ অর্থে উল্লেখ করা হয়। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয় *ভাগবতপুরাণ* নামক গ্রন্থে। ভগবদগীতার ভক্তিভাবের সঙ্গে মুণ্ডক উপনিষদ-এর ভক্তিভাবনার সাদৃশ্য রয়েছে। এই উপনিষদে বলা হয়েছে ভগবানের অনুগ্রহে ভক্তের পরম আশ্রয়। বর্তমান সমাজে ভক্তির যে ব্যাখ্যা, তা প্রথম পাওয়া গেছে শ্বেতাশ্বেত উপনিষদে।[৫২] ভক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে জানা যায় দক্ষিণ ভারত থেকে ভক্তিবাদের উত্থান হয়েছিল। এই ভক্তিবাদের প্রবক্তারা ছিলেন দুই ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোক, যথা - বৈষ্ণব অলবর (খ্রিস্টপরবর্তী ষষ্ঠ-নবম শতাব্দী) ও শৈব নায়নার (পঞ্চম-দশম খ্রিস্টাব্দ) নামক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ভক্তিবাদ ও ভক্তিবাদী সাহিত্য সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে দেওয়ার পিছনে এই দুই ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোকেরা ছিল প্রধান অনুপ্রেরণা। খ্রিস্টপরবর্তী দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ভক্তিআন্দোলন সমগ্রভারতে বিস্তার লাভ করে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতে ভক্তিবাদের প্রভাব শুধু দুই ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, ভারতীয় অন্যান্য ধর্মগুলির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভক্তিবাদ ভারতীয় সামগ্রিক সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে পড়েছে। ধর্মীয় থেকে ধর্মনিরপেক্ষ অনেক বিষয়ে আজ ভক্তিবাদের ছায়া সুস্পষ্ট।

শৈবপন্থ হল হিন্দুধর্মের প্রধান চার ধর্মমতের মধ্যে অন্যতম একটি ধর্মমত। এই মতের অনুগামীদের শৈব নামে অভিহিত করা হয়। শৈবধর্মে ভগবান শিবকে একমাত্র সর্বোচ্চ ঈশ্বর বলে মনে করা হয়। এই ধর্মের অনুগামীরা ভগবান শিবকে স্রষ্টা, পালন কর্তা, ধ্বংস কর্তা, সকল বস্তুর প্রকাশ ও ব্রহ্মস্বরূপ হিসেবে পূজার্চ্চনা করে। ভারতসহ নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় শৈবধর্ম প্রচলন রয়েছে বর্তমানকাল পর্যন্ত। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়াতে শৈবধর্মের প্রসার লক্ষ করা যায়। শৈবধর্মের প্রাচীন ইতিহাস রচনা করতে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। দেবতা শিবের প্রাথমিক অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় মহেঞ্জোদারো সভ্যতার মধ্যে –

> মহেঞ্জাদোরের সেই বিখ্যাত সেই শিলমোহর যেখানে দেখা যাচ্ছে একজন শিংওলা মানুষ একটি আসনে বসে আছেন। বসার এই ভঙ্গিকে এখন আমরা 'বদ্ধ কোণাসন' বলে থাকি। মূর্তির বাহুদুটি বালায় ঢাকা, দু'পাশে ছোটো ছোটো মূর্তি – একপাশে গণ্ডার আর মহিষ, অন্যপাশে হাতি আর বাঘ। এই মুর্তিটিকে নির্দ্বিধায় আমরা 'পশুপতি শিবের মূল রূপ' হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। বৈদিক পশুপতি হলেন গবাদি পশুজোতের দেবতা, তিনি চরণভূমিতে পশুজোতকে রক্ষা করেন; কিন্তু অরণ্যের হিংস্র পশুদের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এই শিলমোহরে খোদিত মূল মুর্তিটি হয়ত কোনো সাধক পুরুষ, যিনি পশুদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারেন।[৫৩]

ইতিহাস থেকে জানা যায় হড়প্পাসভ্যতার মূল নিহিত রয়েছে ৬০০০ খ্রিস্টপূর্ব মেহেরগড় সভ্যতার মধ্যে। পাঞ্জাব ও সিন্ধুঅঞ্চলের সিন্ধুনদ উপত্যকায় ২৬০০ খ্রিস্টপূর্ব নাগাদ সিন্ধুসভ্যতার শ্রেষ্ঠ দুটি শহর হড়প্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো গড়ে উঠেছিল। এখানে বৃহৎ জনবসতি গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতায় লিখন ব্যবস্থা, নগরকেন্দ্র, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। বিংশ শতকে সিন্ধের সুক্কুরের কাছে মহেঞ্জোদাড়োয় এবং লাহোরের দক্ষিণে, পশ্চিমপাঞ্জাবে হরপ্পায় খননকার্য চালিয়ে সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষের কিছু অংশ উদ্ধার করা হয়েছিল। ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে গুজরাত রাজ্য পর্যন্ত এই হড়প্পা সভ্যতার একাধিক কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে। ভারতের পশ্চিমে অবস্থিত বালুচিস্তানে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রত্নখননের ফলে প্রাপ্ত প্রাচীন ব্রোঞ্জযুগীয় শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্যগুলির সূত্র ধরে ব্রোঞ্জযুগের সঙ্গে বর্তমান শতাব্দীর ধর্মীয় তত্ত্ব, আচার-আচরণের ও যথেষ্ট যোগ খুঁজে পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মের মহান গ্রন্থ মহাভারতের বর্ণণা অনুযায়ী কুরুবংশের কুলদেবতা ছিলেন ভগবান শিব। এই কারণে কুরুবংশের একশত কৌরব ও পঞ্চপান্ডব সঙ্গে তাদের পিতৃপুরুষ সকলে শৈবধর্মের উপাসক ছিলেন। প্রাচীনযুগে বাংলার গৌড়েশ্বর মহারাজ শশাঙ্ক ছিলেন শৈবধর্মের উপাসক। তিনি তাঁর নামের প্রথমে 'পরমশৈব' উপাধি ব্যবহার করতেন। আর্যাবর্তে পাশুপত সম্প্রদায় সবচেয়ে প্রাচীন শৈবধর্মাবলম্বী। প্রাচীন বাংলার সেনবংশীয় রাজারা ছিলেন শৈবধর্মের উপাসক। সেন রাজারা তাঁদের রাজকার্যের শুরুতে ভগবান শিবের স্তবের প্রচলন করেছিলেন। সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষন সেন পিতামহ ও পিতৃদেবের শৈবধর্মের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। সহজিয়া বৈষ্ণবসাধনার নিয়ম নীতিতে ব্যস্ত হয়ে, রাজকার্যে অমনোযোগী হয়ে পড়েছিলেন। আনুমানিক একজন মুসলিম তুর্কি সেনাপতি ও তার মাত্র আঠারো জন অশ্বারোহী সৈন্যদলের দ্বারা আক্রমণকে ঠেকাতে না পেরে পরাজয় শিকার করেছিলেন। রাজা সপরিবারে পালিয়ে গিয়ে প্রথম রাজধানী নবদ্বীপ থেকে নৌকা যোগে দ্বিতীয় রাজধানী পূর্ববঙ্গের মুন্সীগঞ্জের বিক্রমপুরে চলে গিয়েছিল। দাক্ষিণাত্যে শৈবধর্মের প্রভাব পড়েছিল প্রকটভাবে –

> দক্ষিণের পল্লবরাজবংশ এবং পাণ্ড্যরাজবংশ বৌদ্ধ-জৈনদের প্রভাবে আসিলেও চোলরাজবংশ বৌদ্ধ-জৈনদের প্রভাবে আসিলেও চোলরাজবংশ বরাবরই তাহাদের পরম্পরাগত শৈবধর্মে অবিচলিত ছিল। তামিলনাড়ের যে ৬৩ জন শিবভক্ত নায়নমার-রূপে পরিচিত, তাঁহাদের জীবৎ-কালের শেষ সীমারেখা নবম শতাব্দী। সুতরাং দশম শতাব্দীর শেষভাগে (৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ) রাজরাজ চোল যখন কর্ণাটকের একাংশ

> অধিকার করিয়া লইলেন, তখন যে রাজধর্ম শৈবধর্মের সহিত নায়নমার ভক্তবৃন্দের জীবনকাহিনী অধিকৃত অঞ্চলে প্রচারলাভ করিবে ইহাই স্বাভাবিক। রাজরাজ চোলের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ১ম রাজেন্দ্র চোলের রাজ্যকালে (১০১৮-১০৪৩ খ্রি.) শৈবধর্মের প্রচার আরও কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করিয়া থাকিবে। ইহারই ঠিক একশত বৎসর পরে আবির্ভূত হন কর্ণাটকে বীর শৈবধর্ম সম্প্রদায়ের অদ্বিতীয় ধর্মগুরু বসরন্ বা বসবেশ্বর বা বসব।[৫৪]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে শ্রীচৈতন্যের যেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। একইভাবে কর্ণাটকের শৈবধর্ম বিস্তারের ক্ষেত্রে বসবেশ্বর ও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তিনি শুধুমাত্র ভক্ত পুরুষের স্থান দখল না করে ব্যবহারিক জীবনে তিনি ছিলেন কায়মনে সাধক। তার ভক্তি আন্দোলন এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তিনি রাজধানী কল্যাণ নগরে শিবানুভব মণ্ডপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেখান থেকে ধীরে ধীরে শৈবভক্তি আন্দোলন আরও বেশি বলশালী হয়ে উঠতে পেরেছিল। তৎকালীন বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে জানা যায় - বিশ্বসভ্যতা শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ শৈবধর্মের প্রথম সুসংহত দর্শন গ্রন্থ। পরবর্তীকালে স্থান, প্রথা ও দর্শন ভেদে শৈবদের বিভিন্ন শাখা গড়ে উঠেছে। শৈবধর্মের এই সুবিশাল ধর্মীয় সাহিত্যের মধ্যে একাধিক দার্শনিক মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অভেদ (অদ্বৈত), ভেদ (দ্বৈত) ও ভেদাভেদ (অদ্বৈত ও দ্বৈতের মিশ্রণ) শাখা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ্ (খ্রিস্টপূর্ব ৪০০-২০০) শৈবদর্শনের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থের দাবী রাখে। এই গ্রন্থে প্রথম শৈবদর্শন সুসংহত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। আরও কিছু শৈবধারার গ্রন্থের নাম জানা যায় - শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, অগ্নিপুরাণ ও বায়ুপুরাণ যেগুলি হল শৈবদের প্রধান পুরাণগ্রন্থ। এগুলিকে মহাপুরাণের আখ্যা দেওয়া হয়। শৈবদের কিছু প্রধান উপপুরাণ রয়েছে, যথা- শিবপুরাণ, সৌরপুরাণ, শিবধর্মপুরাণ, শিব ধর্মোত্তর পুরাণ, শিবরহস্য পুরাণ, একাম্রপুরাণ, পরাশরপুরাণ, বশিষ্ঠলিঙ্গ পুরাণ, বিখ্যাদপুরাণ ও ইত্যাদি।

বৈষ্ণবধর্ম হল হিন্দুধর্মের মূল চার শাখাসম্প্রদায়ের মধ্যে একটি। যেখানে বিষ্ণুর অবতাররূপের পূজা করা হয়। হিন্দুপুরাণে ভগবান বিষ্ণুর যে দশাবতার [৫৫] উল্লিখিত দেবতাদের মধ্যে বিশেষ করে রাম ও কৃষ্ণকে এই শাখার মধ্যে স্মরণ করা হয়েছে। তাদের কাছে আদি দেবতা বা সর্বোচ্চ ঈশ্বর রূপে বিষ্ণু ও কৃষ্ণকে ধরা হয়। বর্তমান বৈষ্ণব দৈবীভাবনায় বিষ্ণু ও কৃষ্ণকে অভিন্ন ভাবা হয়। উভয়ের মধ্যে আরও কিছু দেবতার নাম রয়েছে, যেমন - বৈদিক দেবতা আদিত্য বিষ্ণু, উপনিষদের দেবতা বাসুদেব-কৃষ্ণ এবং ব্রাহ্মণ ও মহাভারতের নারায়ণ। বিষ্ণুর সর্বশেষ অবতার

কৃষ্ণকে ঘিরে বাংলাদেশের বৈষ্ণবভাবনার মধ্যে বিস্তর প্রভাব পড়েছিল। যার প্রমাণ পাওয়া যায় বর্তমান বৈষ্ণব ভাবাদর্শী সমাজের মধ্যে। এই কৃষ্ণের আগমন নতুন কিছু নয়, বরং পৌরাণিক যুগ থেকে এই কৃষ্ণকথার চর্চা শুরু হয়েছিল -

> ভারতীয় সাহিত্যের পৌরাণিক যুগেই কৃষ্ণকথার বিকাশ পরিণতির একটা উচ্চ সীমা স্পর্শ করেছিল, এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। পুরাণ ও উপপুরাণ সমূহ এই কৃষ্ণকথার আশ্রয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই পুরাণ সমূহের আগেও কৃষ্ণকথার নানা উপাদান ছিল বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। বিশ্বের প্রাচীনতম লিখিত সাহিত্য হিসেবে অভিনন্দিত ঋগ্বেদের মধ্যেও আমরা কৃষ্ণ প্রসঙ্গের প্রাথমিক আভাসটি পেয়ে থাকি। আজ আমরা যে কৃষ্ণকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সর্বব্যাপ্ত দেখি, তার মধ্যে মিলিত হয়েছেন 'বিষ্ণু', নারায়ণ', 'হরি' প্রভৃতি বিচিত্র দেবসত্তা। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থাতে এঁরা ছিলেন পরস্পর পৃথক।[৫৬]

ঋগবেদের একটি শ্লোকে বিষ্ণুকে 'গোপা' বলে সম্বোধন করেছে। বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে পাওয়া যায় গোপশিশু রূপে। খ্রিস্টপূর্ব সময় থেকে কৃষ্ণ চরিত্র গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে বৈষ্ণবীয় সাহিত্যে সেই রূপের বিস্তর বর্ণনা পাওয়া যায়। ভারতে কয়েক শতাব্দীকাল বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব ছিল ভক্ত, দার্শনিক ও পণ্ডিতদের গবেষণা এবং তর্কবিতর্কের বিষয়। কৃষ্ণকে নিয়ে বিভিন্ন ধরণের গবেষণার কাজ ভারতসহ ইউরোপে সাম্প্রতিক কয়েক দশক ধরে চালানো হয়েছে। ইউরোপের অক্সফোর্ড সেন্টার ফর দি হিন্দু স্টাডিজ ও ভক্তিবেদান্ত কলেজের মতো কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। যেসকল সুধী ব্যক্তিরা এই কর্মে উৎসাহ প্রদান করেছে তারা শুধুমাত্র ভারতবাসী নয় কিছুজন পশ্চিমীরাও রয়েছে। যথা - তমালকৃষ্ণ গোস্বামী, হৃদয়ানন্দ দাস গোস্বামী, গ্রাহাম শেউইগ, কেনেথ আর. ভ্যালপেই, গাই বেক, স্টিভেন আর. রোসেন ও প্রমুখ ব্যাক্তিরা। **১৯৯২** সালে স্টিভেন রোসেন *দ্য জার্নাল অফ বৈষ্ণব স্টাডিজ* নামক হিন্দু একটি গবেষণা পত্র চালু করেছিল। যার দ্বারা বহির্বিশ্বেও বৈষ্ণব তত্ত্বকথা প্রকাশ হতে পেরেছিল। এই পত্রিকার মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম, বিশেষত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ছিল। সাম্প্রতিককালে ধর্মসচেতনতা, স্বীকৃতি ও ধর্মপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বাইরেও বৈষ্ণবদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধুমাত্র এই পত্রিকা ছাড়া আন্তর্জাতিক স্তরে বৈষ্ণবধর্মের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাখাটি। যা সকলের কাছে ইসকনদের হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের প্রচার অভিমুখগত কার্যকলাপ প্রক্রিয়া। ভৌগোলিক দূরত্বকে দূরে সরিয়ে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রধান তাত্ত্বিকদিকগুলি নিয়ে ব্যাখ্যা করা রয়েছে বেদ, উপনিষদ ও অন্যান্য পৌরাণিক শাস্ত্রগুলির মধ্যে। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুশীলনের ক্ষেত্রে বিশেষত ভক্তি ও

ভক্তিযোগ প্রসঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রধান তাত্ত্বিকতার বিষয়গুলি নিখুঁত বর্ণনা করা রয়েছে ভগবদ্গীতা, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থগুলির মধ্যে। বৈষ্ণবরা হিন্দুসমাজের অন্যতম বৃহৎ একটি অংশ, তারা অধিকাংশ বসবাস করে ভারতে। এই ধর্মের নাম দেওয়া হয়েছিল বৈষ্ণবধর্ম। এই বৈষ্ণবধর্মের অনুগামীদেরকে বৈষ্ণব নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

বিষ্ণুর দশাবতার থেকে জানা যায় মূলত ভাগবতধর্ম, আদি রামধর্ম ও কৃষ্ণধর্মের এই তিনের সমন্বয়ে বিষ্ণুধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল। বিষ্ণুধর্মের উৎস বিচার করলে একথা বলতে হয় যে, এই বিষ্ণুকেন্দ্রিক পূজার মূলে রয়েছে বৈদিকধর্মের সূত্র। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় বৈদিকধর্মের একটি অঙ্গবিশেষ। তৎকালে বিষ্ণুপূজার প্রাধান্য এই ধর্মকে অন্যান্য ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলি থেকে পৃথক করে রেখেছিল। বিষ্ণুধর্মের আকারে ভারতে প্রথম বৈষ্ণব ধর্মমতের চর্চা শুরু হয়েছিল। বিষ্ণুধর্ম ছিল ভারতের প্রথম একটি দেশজ সম্প্রদায়গত ধর্মমত। যেখানে বিষ্ণুকে সকল অবতারের উৎসস্বরূপ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বিষ্ণু নামটি সর্বপ্রধান দেবতা হিসেবে মান্য দেওয়া হয়েছে। এই দেবতা বিষ্ণুর সঙ্গে অন্যান্য যেসকল দেবতাদের মধ্যে অভিন্নতার দাবি উঠেছে। তাদের মধ্যে নারায়ণ, বাসুদেব ও কৃষ্ণ এই নামগুলি বেশি উল্লেখযোগ্য। এই সকল নামগুলির সঙ্গে প্রত্যকের স্বকীয় দিব্য বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব আরোপিত হয়ে সাহিত্যে বর্ণনা করা হয়েছে। আদি মধ্যকালে বাংলাদেশে কৃষ্ণপূজার তেমন কিছু ব্যাপকতা লক্ষ করা যায় না। পরবর্তীকালে এই দেবতা কৃষ্ণকে নিয়ে বাংলাদেশের সমাজে যথেষ্ট উত্থান দেখা গিয়েছিল। বিশেষ করে চৈতন্যদেবের আগমনের পরে কৃষ্ণ প্রেমের প্রবণতা আরও প্রকট হয়েছিল। বর্তমানে বৈষ্ণবধর্মের সংশ্লিষ্ট উপসম্প্রদায়সমূহ নিজেদেরকে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করে থাকে। তারা নিজেদের শাখাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে নিজেদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। যেমন - কৃষ্ণধর্ম বৈষ্ণবধর্মের একটি শাখা। যেখানে অবস্থান করছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, নিম্বার্ক ও বল্লভাচার্য প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি। যারা কৃষ্ণকে সর্বোচ্চ ঈশ্বর বা স্বয়ং ভগবান মনে করে। বিষ্ণু মতের অনুগামী বৈষ্ণবরা এমনটা স্বীকার করে না। তাদের কাছে বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর। বৈষ্ণবধর্মের বিষ্ণুকেন্দ্রিক সম্প্রদায়গুলি বিষ্ণু বা নারায়ণকে সর্বোচ্চ দেবতা বলে মনে করে। বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাসটির মূল ভিত্তিস্বরূপ তারা গ্রহণ করে পুরাণ বর্ণিত বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের উপাখ্যানগুলিকে। যে উপাখ্যানগুলিতে বিষ্ণুর সঙ্গে গণেশ, সূর্য, দুর্গা প্রমুখ দেবতার পার্থক্য প্রতিপাদন

করে তাদের উপদেবতার পর্যায়ে পর্যবসিত করা হয়েছে। বৈষ্ণব মতে হিন্দু ত্রিমূর্তির অন্যতম দেবতা শিব হলেন বিষ্ণুর অনুগত ভক্ত এবং স্বয়ং এক বৈষ্ণব। এই ভাবনার মধ্যে পঞ্চোপসনা শব্দটি বিশেষ গুরুত্ব রাখে -

> পঞ্চোপসনা শব্দটির অর্থ বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য ও গণেশ এই পঞ্চ দেবতার উপাসনা। বঙ্গে পঞ্চোপসনার শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যে বৈষ্ণবধর্মের বিশিষ্ট স্থান ছিল।[৫৭]

এই মতের বিরুদ্ধে কিছু অভিমত উঠে এসেছে – বৈষ্ণব স্বামীনারায়ণ এই মতের বিরোধিতা করে জানিয়েছে, শিব ও বিষ্ণু এক ঈশ্বরের দুই পৃথকসত্ত্বা। স্বামীনারায়ণের মতবাদ বৈষ্ণবদের একটি সংখ্যালঘু অংশের মতবাদ। বৈষ্ণবদের অপর একটি সংখ্যালঘু অংশ আব্রাহামিক ধর্মের সর্বোচ্চ ঈশ্বরের সঙ্গে বিষ্ণুকে একীভূত করার চেষ্টা করেছে। এই মতটি খুব বেশি জনপ্রিয়তা পায়নি। আব্রাহামিক ধর্মের আল্লাহকে একেশ্বরবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। তিনি একক চিরন্তন সত্ত্বা এবং তার সৃষ্ট জগতের বাইরে পৃথকভাবে অবস্থান করেছেন। বিষ্ণুকে হিন্দুধর্মের বহু দেববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। এখানে সকল সত্ত্বা ঈশ্বরে সমাহিত, এবং ঈশ্বর সকল সত্ত্বার মধ্যে অস্তিত্বমান। বৈষ্ণবরা আরও মনে করে ঈশ্বর সত্য ব্যক্তিত্বময় এবং তার দ্বারা এই বহু বর্ণময় সৃষ্টিও সত্য।

বৈষ্ণব দর্শনের মূলে রয়েছে হিন্দুধর্মের কয়েকটি কেন্দ্রীয় ধর্মমত। যথা - বহু দেববাদ, পুনর্জন্ম, সংসার, কর্ম এবং বিভিন্ন যোগশাস্ত্র। ভক্তিযোগের ক্ষেত্রে বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির প্রতি এই ধর্মে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। এই দেবভক্তি সম্পর্কে পঞ্চরাত্র ও বিভিন্ন সংহিতায়, যেখানে উল্লেখ করা রয়েছে - বিষ্ণুর নাম-গান, ভজন ও কীর্তন, ভগবানের রূপচিন্তন করে ইষ্ট দেবতার পূজা করা। *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে ভজন-কীর্তন সম্পর্কে বলা হয়েছে -

করাইতে চাহে প্রভু আপন কীর্তন।
এতদর্থে করে প্রভু সঘনে রোদন।।
যত যত প্রবোধ করয়ে নারীগণ।
প্রভু পুনঃ পুনঃ করয়ে ক্রন্দন।।
'হরি হরি' বলি যদি ডাকে সর্বজনে।
তাবে প্রভু হাসি চান শ্রীচন্দ্রবদনে।।
জানিঞা প্রভুর চিত্ত সর্বজন মেলি।
সদাই বলেন 'হরি' দিয়া করতালি।।
আনন্দে করয়ে সভে হরি-সংকীর্তন।
হরিনামে পূর্ণ হৈল শচীর ভবন।।[৫৮]

ভেঙ্কটেশ্বররূপী বিষ্ণুর পূজার প্রচলন রয়েছে দক্ষিণ ভারতে। সেই উদ্দেশ্যে তিরুমালা ভেঙ্কটেশ্বর নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিষ্ণু পূজার মধ্য দিয়ে বৈষ্ণবরা ভগবান বিষ্ণুকে তাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত করতে চায় কল্পনার মাধ্যমে। এই বিশেষ অবস্থায় তারা তাদের ঈশ্বরকে অন্তর্যামী বলে মনে করে। অন্তর্যামী এই নামটির মধ্যে নারায়ণ নামের বিশ্লেষণ করা হয়। হিন্দুধর্মের অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মূল লক্ষ ছিল মোক্ষলাভ বা পরমব্রহ্মের সঙ্গে মিলন। এই বৈষ্ণবদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল ভগবান বিষ্ণু বা তার দশাবতারের মধ্যে, যেকোনো একজন অবতারের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। সেবার স্থান হবে মায়াময় জগতের বাইরে বৈকুণ্ঠধাম বা এমন কোনো জায়গা যেখানে থাকবে অনন্ত আনন্দ। ভাগবত পুরাণ অনুসারে বৈষ্ণবদের সর্বোচ্চ সত্ত্বার তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে – ব্রাহ্মণ, পরমাত্মা ও ভগবান। বিশ্বময় বিষ্ণু, হৃদয়যামী বিষ্ণু ও ব্যক্তিরূপী বিষ্ণু।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে পঞ্চতত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। বৈষ্ণবধর্মের মোট পাঁচজন মহান ব্যক্তিত্বের সমাবেশের চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। যথা - চৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য, গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীধর ঠাকুর। বৈষ্ণবরা দীক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়াকে খুব গুরুত্বসহকারে অনুসরণ করে। গুরু কর্তৃক দীক্ষিত হয়ে গুরুর অধীনে তারা বৈষ্ণবধর্মের শিক্ষাপালন করে থাকে। দীক্ষার সময় গুরু শিষ্যকে যেমন্ত্র দান করে সেই নির্দিষ্ট মন্ত্রটিকে পূজার অঙ্গরূপে অনুচ্চারে বারংবার আবৃত্তি করে শিষ্য। এই বারংবার মন্ত্র আবৃত্তিকে জপ নামে বৈষ্ণব সমাজের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলিতে দীক্ষা নেওয়া ও গুরুর অধীনে ধর্মানুশীলন করার নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গুরুবাদের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় *রাধা* উপন্যাসের প্রতিটি ছত্রে এই সহজিয়া বৈষ্ণবদের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এই গুরুবাদের ফলে সৃষ্টি হওয়া গুহ্যসাধনার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে কৃষ্ণদাসী তার বালিকা কন্যা মোহিনিকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এখানে বৈষ্ণবদের আরও পরিচয় পাওয়া যায় -

> মন্দিরে আজ অনেক যাত্রীর সমাগম। বৈষ্ণব বৈষ্ণবী এবং এক শ্রেণীর বিলাসী গৃহস্ত বৈষ্ণবের ভিড় বেশি। তাদের ভিড়ের আর অন্ত নাই। সঙ্গে আশ্রিতা সেবাদাসী। কারও একটি কারও দুতি, কারও কয়েকটি। এমন আখড়াধারী বৈষ্ণব মহান্ত আছে যাদের কয়েক গণ্ডা, তাদের আখড়ায় লীলা চলে। দোলযাত্রায় দোললীলা, ঝুলনে ঝুলনলীলা, রাসে রাসলীলা, এমনকি গোপনতার মধ্যে বস্ত্রহরণলীলাও নাকি হয়ে থাকে।[৫৯]

গীতাতে উল্লিখিত রয়েছে গুরুর কাছে উপস্থিত হয়ে সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে বলা হয়েছে। এই ধর্মের মধ্যে গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে তার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। তারা গুরুকে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি মনে করে। তাদের বিশ্বাস গুরু একমাত্র ব্যক্তি যিনি সত্যকে উপলব্ধি করেছে, শুধুমাত্র এই গুরু জগতের মানুষকে সত্যে উপনীত করতে পারে -

যে শুনয়ে ঈশ্বরপুরীর পুণ্যকথা।
তার বাস হয় কৃষ্ণপাদপদ্ম যথা।।
যত প্রেম মাধবেন্দ্র-পুরীর শরীরে।
সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বরপুরীরে।।
পাইয়া গুরুর প্রেম কৃষ্ণের প্রসাদে।
ভ্রমেন ঈশ্বরপুরী অতি-নির্বিরোধে।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান।।[৬০]

এই গুরুবাদ ছাড়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলি নিজস্ব ঐতিহ্য অনুসারে তাদের পূর্বতন আচার্যদের রচনাকে প্রামাণ্য শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করে এসেছে। চৈতন্যদেবের আগমন এবং ভক্তিবাদী আন্দোলনের পর থেকে মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে দাড়ি টেনে। মানুষকে ঈশ্বরাভিমুখে চালিত করে ঐশ্বরিক আনন্দ উপলব্ধি করত। সমাজে যারা অত্যন্ত দুর্গত, অচ্ছুৎ বলে সমাজের কাছে বিবেচিত ছিল। তাদেরকে চৈতন্যদেব কৃষ্ণের জীব বলে চিহ্নিত করে সমাজের চোখে তাদের অবস্থা ফেরাতে চেষ্টা করেছিলেন। চৈতন্যদেবের নির্দেশে সনাতন ও রূপ নামে দুই গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। যেখানে তারা গুরুর মাহাত্ম্যের কথা আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে জানায়িছে – গুরুর প্রাধান্য ঈশ্বরের পরে। চৈতন্যদেবের ধর্মীয়ভাবনায় শুধু ভগবান ও ভক্ত মাঝখানে কিছু নেই। এখন মাঝখানে এলেন গুরু এবং ভগবান আর ভক্তের প্রিয় বা প্রেমিকা বলে রইলেন না। ভক্তের স্থান হয়ে গেল রাধা। রাধাকে নিয়ে কৃষ্ণের লীলা। এই লীলার সহায়ক ছিলেন গুরু।[৬১] স্মার্তবাদ ও অদ্বৈতবাদী দর্শনে কথিত যেসকল মুখ্যবৃত্তি-র পাওয়া যায়। সেগুলির আক্ষরিক অর্থ অনেকার্থে এই ধর্মের প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্রগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে যিনি বিষ্ণু বা কৃষ্ণের নাম জপ করে পূজা করে। তিনি এই ধর্মানুশীলনের ক্ষেত্রে মূল বৈষ্ণব বলে পরিগণিত হয়। একবার মাত্র কৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ করেছে সেই ব্যক্তিও বৈষ্ণব। এই সকল ব্যক্তিরা আবার বৈষ্ণবদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবীয় সত্ত্বা এবং পূজনীয় হয়ে যায়। যে ব্যক্তি বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে

বিষ্ণুর পূজায় আত্মনিয়োগ করে তিনি বৈষ্ণব। এগুলির মধ্যে একটি ধর্ম যে পালন করে না সে কখন বৈষ্ণব হতে পারে না।

বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীরা মোট চারটি প্রধান উপশাখায় বিভক্ত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আদর্শ কোনো নির্দিষ্ট বৈদিক চরিত্রকে (বিষ্ণু বা কৃষ্ণ) কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে ঘিরে যেসকল মতবাদ গড়ে উঠেছিল সেগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল মতবাদ একই প্রকারের। বৈষ্ণবদের মধ্যে কপালে তিলক অঙ্কনরীতি রয়েছে। দৈনিক উপাসনার অঙ্গ হিসেবে তিলক আঁকেন, তিলক অঙ্কন করেন বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসব উপলক্ষে। বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলির নিজস্ব তিলক অঙ্কনশৈলী রয়েছে। এগুলি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের প্রতীক হিসেবে পরিচিত। সাধারণত তিলকের আকার ইংরেজি ‘Y’ অক্ষরটির মতো। দুই বা ততোধিক লম্বরেখা এবং নাকের উপর অপর একটি রেখা বিশিষ্ট এই তিলক বিষ্ণুপদ ও পদ্মের প্রতীক। ভারতে মহাকাব্য লেখার কাল থেকে, ইতিহাস-এর যুগ থেকে বিষ্ণুপূজা প্রচলিত ছিল। বিষ্ণুধর্ম ছিল ভারতে প্রচলিত একমাত্র স্থানীয় ধর্মসম্প্রদায়। ভগবদ্গীতায় বৈষ্ণবধর্মের ধারণাটি স্পষ্টাকারে পাওয়া যায়। অংশটি কৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে কথোপকথনের আকারে বিধৃত রয়েছে। কৃষ্ণ বিষ্ণুর অন্যতম অবতার এবং এই অংশে অর্জুনের রথের সারথি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও তার পরবর্তীকালের বহু রাজা পরমভাগবত বা ভাগবত বৈষ্ণব নামে পরিচিত ছিলেন।

শৈবধর্ম প্রভাবিত দক্ষিণ ভারতে সপ্তম-দশম খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কালে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ঘটে। এই অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম আজও প্রচলিত। তামিলনাড়ুতে বারোজন অলভর সন্ত ভক্তিমূলক স্তোত্র রচনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। অলভরেরা যেসকল মন্দিরে গমন করেছিল বা যে মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিল সেগুলি দিব্যদেশম নামে পরিচিত। তামিল ভাষায় রচিত তাদের বিষ্ণু বা কৃষ্ণের স্তোত্রকবিতাগুলি *নালয়িরা* বা *দিব্যপ্রবন্ধম* নামে পরিচিত। তামিলনাড়ুতে বৈষ্ণবধর্মের জনপ্রিয়তার মূলে এই সম্প্রদায় রয়েছে। পরবর্তীকালে রামানুজাচার্য, মাধবাচার্য, মানবল মামুনিগল, বেদান্ত দেসিকা, সুরদাস, তুলসীদাস, ত্যাগরাজ প্রমুখ আচার্যগণের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এডওয়ার্ড ওয়াসবার্ন হপকিনস তার *দ্য রিলিজিয়ন অফ ইন্ডিয়া* গ্রন্থে জানিয়েছে, বিষ্ণুধর্ম বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এই ধর্ম ছিল

ব্রাহ্মণ্যধর্মের একটি অংশ। কৃষ্ণধর্মের উদ্ভব হয় অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে। আধ্যাত্মিক বা নৈতিক চরিত্রের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ব্রাহ্মণদের কাছে কৃষ্ণের তুলনায় শিব অধিক গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। পরে এই বিষ্ণুধর্ম কৃষ্ণধর্মের সঙ্গে মিশে যায়। হপকিনসের এই মতবাদটি বর্তমানে সর্বজনগ্রাহ্য। সমগ্র ভারতে আজ এক বিরাট সংখ্যক বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের দেখা পাওয়া যায়। পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও গুজরাটের মতো পশ্চিমভারতীয় রাজ্যগুলিতে তাদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ করা যায়। বৈষ্ণবদের প্রধান প্রধান তীর্থগুলি হল - গুরুভায়ুর মন্দির, শ্রীরঙ্গম, বৃন্দাবন, মথুরা, অযোধ্যা, তিরুপতি, পুরী, মায়াপুর ও দ্বারকা। বিংশ শতাব্দীতে ভারতের বাইরে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা ও রাশিয়ায় বৈষ্ণবধর্ম প্রসারিত হয়। এই প্রসার সম্ভব হয়েছিল ১৯৬৬ সালে অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত ইসকন আন্দোলনের ফলে।

পৌরাণিক মহাকাব্যগুলির মধ্যে বৈষ্ণবীয় প্রভাব রয়েছে চূড়ান্তাকারে। দুটি প্রসিদ্ধ ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত বৈষ্ণব দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রথম মহাকাব্য *রামায়ণ* যেখানে বিষ্ণুর অবতাররূপে রামের উপাখ্যান পরিচিত। ধর্মনীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিচারে ইতিহাসে রামকে আদর্শ রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রামের স্ত্রী সীতা, ভাই লক্ষ্মণ ও ভক্ত হনুমানের আচরণ বৈষ্ণবদের নিকট আদর্শের স্থান দখল করেছে। রামায়ণ মহাকাব্যের খলনায়ক রাবণ একজন রাজা। যাকে সামনে রেখে বৈষ্ণবদের করণীয় কার্যাবলী এবং নিন্দনীয় কার্যাবলীগুলির নমুনা গড়ে তোলে। দ্বিতীয় মহাকাব্য *মহাভারত* কেন্দ্রীয় চরিত্র বিষ্ণুর অপর অবতার কৃষ্ণ। এই মহাকাব্যের মূল উপজীব্য বিষয় সম্পত্তির জন্য পারিবারিক গৃহযুদ্ধ। এই যুদ্ধে কৃষ্ণ ধার্মিক পাণ্ডব ভাতৃগণের পক্ষাবলম্বন করে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাগমুহূর্তে কৃষ্ণ ও অর্জুনের যে কথোপকথন হয় তা ভারতীয় দর্শনের একটি মূল্যবান উপাদান। এই অধ্যায়টি ভগবদ্গীতা নামে হিন্দুদের একটি স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। হিন্দুদর্শনের উপর এই গ্রন্থটির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বৈষ্ণবদের কাছে এই গ্রন্থটি বেশি মূল্যবান। এই গ্রন্থের প্রতিটি বক্তব্য কৃষ্ণের নিজের মুখ থেকে উৎসারিত হয়েছে। প্রথমদিকে বিষ্ণুর প্রভাব বৈষ্ণব সমাজে প্রকট থাকলেও ধীরে ধীরে বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলিতে কৃষ্ণের মর্যাদা অত্যন্ত সম্মানজনক হয়ে উঠতে থাকে -

> ক্রমশ কৃষ্ণই অসামান্য হয়ে উঠলেন। তার কারণসমূহ কিছুটা অনুমান-প্রমাণের দ্বারা নির্ণেয়। যাকে 'হিন্দু-বিশ্ব' বলা হয়, তাতে এক সময়ে জঙ্গীবাদ যথেষ্ট প্রবল ছিল। আর্যদের ভারতে আগমনের সময়

থেকে শুরু করে লক্ষণসেনের পরাজয় পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালে ভারতীয় উপমহাদেশে কত যে যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে, তার সংখ্যা স্থিরভাবে নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। অথচ বলা হয় যে, আধ্যাত্মিকতা, শান্তরস, ভারতীয় হিন্দু-সভ্যতার প্রাণবস্তু! ক্রমশ জঙ্গীবাদের ঐতিহ্য দুর্বল হয়ে যায়। বহু রাজ্যের ও রাজবংশের ঘন ঘন উত্থানপতন ঘটে। ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা প্রথমে লুণ্ঠনের, পরে রাজ্যস্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে এলেন। জাতীয় জীবনে আবসাদের ছাপ পড়ল। বেদান্তের মায়াবাদী ভাষ্যে হয়তো তা কিছুটা প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতার তত্ত্ব হিন্দুধর্মের বৈচিত্রের মধ্যে একটা মূল সুর নিয়ে এল।[৬২]

কোনো সম্প্রদায় তাকে বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার বলে মনে করে। গৌড়ীয় ও নিম্বার্ক সম্প্রদায় তাকে বিষ্ণুসহ সকল অবতারের উৎস মনে বলে করে। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীগণ এই দুই মহাকাব্যের নানা অংশ অবলম্বনে নাট্য রচনা করে থাকে। এই নাটকগুলি সংশ্লিষ্ট অবতারের উৎসবে অভিনীত হয়। ধর্মগ্রন্থ হিসেবে ভগবদ্গীতা বহুপঠিত। ইংরেজিসহ বিশ্বের একাধিক ভাষায় এই গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে।

শাক্তধর্ম হল হিন্দুধর্মের একটি শাখাসম্প্রদায়। যেখানে হিন্দু শক্তিবাদের ধারণাকে উন্মোচন করে এগিয়ে চলেছে। হিন্দুদিব্য মাতৃকাশক্তি বা নারীদের দেবীত্বে বরণ করে নিয়ে তাকে সর্বোচ্চ ঈশ্বর মনে করে এই শাক্তধর্মের উদ্ভব হয়েছিল। এই ধর্মমতাবলম্বীদের শাক্ত নামে অভিহিত করা হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতে শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। আনুমানিক ২২,০০০ বছরের আগে ভারতের প্যালিওলিথিক জনবসতিতে প্রথম দেবীপূজার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে সিন্ধু সভ্যতার যুগে এই সংস্কৃতির উন্নীত রূপ ধরা পড়ে। বৈদিক যুগে শক্তিবাদ পূর্বমর্যাদা হারালে পুনরায় ধ্রুপদী সংস্কৃত যুগে তার পুনরুজ্জীবন ও বিস্তার ঘটে। হিন্দু ঐতিহ্যের ইতিহাসে নারী পুনর্জাগরণের ইতিহাসরূপে এই শক্তিবাদের উত্থান হিসেবে পরিগণিত হয়। দেবীভাবনার মধ্যে নারীবাদের আগমন, এই ধারণার বীজ গ্রোথিত রয়েছে ভারতীয় শক্তিবাদী ভাবনার মধ্যে। ভারতবর্ষ মূলত শক্তিবাদের দেশ। সৃষ্টিতত্ত্বকে ঘিরে আদিদেবীর কল্পনা পৃথিবীর অন্য দেশগুলিতে দেখা গেছে। এই বিশ্ব-প্রসূতি একটি বিশ্ব-শক্তিকে ভারতবর্ষ তার ধর্মজীবনের মধ্যে যেভাবে গ্রহণ করেছে -

পৃথিবীর সমস্ত আদিম সমাজেই ধর্মচেতনার ধারাটা বেশির ভাগ সময়ে বিবর্তিত হয়েছে এক মহামাতৃকাসত্তাকে কেন্দ্র করে। যদি প্রশ্ন করেন, ঠিক করে, কখন, কোথায় এবং কেন এই মাতৃকাসত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করতে শুরু করেছিল মানুষ, অতি আদিমকাল থেকেই (সভ্যতার সূত্রপাতেরও আগে) আমাদের প্রবৃদ্ধ-প্রপিতামহবর্গ প্রায় সমস্ত পৃথিবীতেই ঐ মাতৃকা-কালকে বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৬৩]

এই শক্তিবাদের প্রভাব শুধু যে শাক্ত বা শৈবধর্মের ওপর পড়েছে এমনটা নয়। ভারতবর্ষের মাটিতে বেড়ে ওঠা সকল ধর্মমতের মধ্যে এই প্রভাব লক্ষ করা গেছে। এমনকি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মধ্যে

এই প্রভাব বাদ যায়নি। হিন্দুধর্মের প্রধান তিনটি বিভাগের অন্যতম শাক্তধর্ম। শাক্তধর্ম মতে দেবী হলেন পরব্রহ্ম, তিনি এক বা অদ্বিতীয়। অন্য সকল দেব ও দেবী তার রূপভেদ মাত্র। দর্শন ও ধর্মানুশীলনের ক্ষেত্রে শাক্তধর্মের সঙ্গে শৈবধর্মের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। শাক্তরা কেবলমাত্র ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপিণী নারীমূর্তির পূজা করে থাকে। এই ধর্মে প্রধান পুরুষদেবতা হলেন শিব। শাক্তধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দু দর্শনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল শক্তিবাদ। জনপ্রিয় হিন্দুধর্মের উপর এই মতবাদের প্রভাব রয়েছে অপরিসীম। ভারতীয় উপমহাদেশ ও তার বাইরে বহু অঞ্চলে তান্ত্রিক ও তান্ত্রিক পদ্ধতিসহ একাধিক পন্থায় শাক্ত ধর্মানুশীলন চলে। এই ধর্মের বৃহত্তম ও সর্বাধিক প্রচলিত উপসম্প্রদায় হল দক্ষিণ ভারতের শ্রীকুল (ত্রিপুরসুন্দরী বা শ্রী আরাধক সম্প্রদায়)। উত্তর ও পূর্বভারতে বিশেষত বঙ্গদেশের কালীকুল। শাক্তবিশ্বাস অনুযায়ী *শাক্তদেবী* সর্বোচ্চ ও পরম দৈবসত্ত্বা। তিনি সমগ্র সৃষ্টির উৎস ও স্বরূপ এবং সর্বজীবের চালিকা শক্তি। বিশ্বের ধর্মীয় ইতিহাসে কোথাও এই প্রকার সম্পূর্ণ নারীতান্ত্রিক ব্যবস্থা খুব একটা দেখা না। শাক্ত মতবাদ দৈব নারীসত্ত্বায়পূর্ণ হলে তা পুরুষ বা জড় দৈবসত্ত্বাকে অস্বীকার করে পারে না। উভয় প্রকার দৈবসত্ত্বায় শক্তির উপস্থিতি নিষ্ক্রিয় থাকে না। শৈবসম্প্রদায়ের আনুমানিক প্রতিষ্ঠাতা আদিশংকর তার প্রসিদ্ধ শাক্ত স্তোত্র *সৌন্দর্যলহরী*-র প্রথম পংক্তিতে উল্লেখ করেছেন - শক্তির সঙ্গে মিলিত হলে শিব সৃষ্টিক্ষম হতে পারে, আর মিলন না হলে শক্তির ক্ষমতা অপূর্ণ থাকে। এই কথাকে শাক্তধর্মের মূলতত্ত্ব ধরে দেখা যায়, প্রাণহীন শিবের দেহের উপর দণ্ডায়মান দেবীকালীর বহুপরিচিত মূর্তিটি এই তত্ত্বের মূর্তরূপ। বঙ্গদেশে বিভিন্ন সময়ে মাতৃশক্তির আরাধনার দেবীরূপের পালাবদল হয়েছে। সেগুলির মধ্যে তন্ত্রসাধনাযুক্ত কালীদেবীর প্রাধান্য দীর্ঘকাল বজায় ছিল -

> এই দেবী-পূজার ইতিহাসটাই বাঙলাদেশের শাক্তধর্মের ক্ষেত্রে প্রধান কথা নহে; প্রধান জিনিস হইল দেবীকে অবলম্বন করিয়া বাঙলার তন্ত্র-সাধনা, এই তন্ত্র-সাধনা মুখ্যভাবে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল কালী-সাধনা এবং দশমহাবিদ্যার সাধনার সঙ্গে, এবং খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে আমরা কালী এবং অন্যান্য দশমহাবিদ্যার সাধনা অবলম্বনে বিখ্যাত শক্তি-সাধকগণের কথা জানতে পারি। আমরা পূর্বে কালীপূজার বিধান রচয়িতৃরূপে কৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছি, ইহারা সাধকও ছিলেন। অন্যান্য সাধকগণের মধ্যে ষোড়শ শতকের সর্বানন্দ ঠাকুর অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা জেলার মেহার গ্রামে তাহার আবির্ভাব হয়। তিনি শবরূপী ভৃত্য পূর্ণানন্দের দেহের উপরে বসিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং দশমহাবিদ্যার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।[৬৪]

অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে শিব ও শক্তির কথা জানা যায়। শক্তিকে মহাবিশ্ব বলে মনে করা হয়েছে। তিনি বলশালিতা ও কর্মক্ষমতার মূর্ত প্রতীক। তিনি পার্থিব জগতের অস্তিত্ব ও সকল ক্রিয়ার পশ্চাতে বিদ্যমান কারণস্বরূপা ঐশীশক্তি। শিব তার সহকারী পুরুষ সত্ত্বা, তিনি সমগ্র সত্ত্বার দিব্যক্ষেত্র প্রস্তুত করে। শিব বিনা শক্তি অথবা শক্তি বিনা শিবের আলাদা করে কোনো অস্তিত্ব নেই। শাক্তধর্মকে জীবনবাদী হিন্দুধর্ম বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শাক্তধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করা রয়েছে চৈতন্যরূপে শক্তি ও ব্রহ্মেরসত্ত্বা নামক দুই বোধের মধ্য দিয়ে। ব্রহ্ম হল জড়রূপী শক্তি ও শক্তি হল জীবনরূপী ব্রহ্ম (এখানে ব্রহ্ম অর্থে শিব)। ধর্মীয় শিল্পকলায় অর্ধশক্তি-অর্ধশিব দেবতা অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে এই বিশ্বজীবনতত্ত্ব জোরালো ভাবে মূর্ত হয়েছে। দুই লিঙ্গের মধ্যে নারীসত্ত্বা মহাবিশ্বের প্রধান শক্তিস্বরূপা। সত্যকারের পরম সত্ত্বাকে পেতে দুই লিঙ্গকে পরম সত্ত্বার সঙ্গে যোগ করতে হবে। পুরুষ ও নারী দৈবসত্ত্বার দুই রূপ। বাস্তবিক, তুরীয় ও সর্বেশ্বরবাদী সত্ত্বার এই স্বীকৃতি দিব্যজননী সর্বোচ্চ বিজয়ের সারবত্তা। শিবরূপী সাধক এবং শক্তিরূপী তার সাধনসঙ্গিনীর সঙ্গে পঞ্চমতত্ত্বের যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বামাচার ও কৌলাচার পঞ্চমতত্ত্বের সাধনার মধ্যে দেখা যায় দুটি ভিন্ন মতাদর্শের সমাবেশ। বামাচারের সাধকরা বামা হয়ে পরাশক্তির পূজা করে। কৌলসাধকদের কাছে সমস্ত জগৎ শক্তিময় এবং তিনি স্ত্রী শক্তি। জগতের সমস্ত স্ত্রীসত্ত্বার মধ্যে এই শক্তির প্রভাব রয়েছে।[৬৫] ধীরে ধীরে তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভবের ফলে শক্তিদেবীর নামের বৃহৎ পরিবর্তন হয়েছে। যেমন - নটী, কাপালিকা, রজকী, বেশ্যা, যোগিনী, শ্বপচী, মালিকা নাপিতাঙ্গনা ও ইত্যাদি।

অদ্বৈতবেদান্ত দর্শন হল বৈদিকদর্শনের সর্বেশ্বরবাদী ধর্মচর্চার সাধন-পদ্ধতিগত একটি ধারা। সর্বেশ্বরবাদী। এই ধর্মমতের মধ্যে মানুষের সত্যিকারের সত্ত্বা আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য এবং পরমসত্যকে শুদ্ধচৈতন্য বলা হয়। এই ধর্মের মূলকথা হিসেবে আসলে উপনিষদগুলির একটি সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। অদ্বৈত বেদান্তের প্রধান ব্যাখ্যাকর্তা হলেন আদিশঙ্কর। তিনি এই স্মার্তমতের প্রবর্তক নন। পূর্বপ্রচলচিত অদ্বৈতবাদী মতগুলিকে তিনি সুসংবদ্ধ করেছিলেন -

> বহু শিষ্য ও প্রশিষ্যের দ্বারা শঙ্করাচার্যের প্রবর্তিত দার্শনিক মত বা উপনিষদের ব্যাখ্যা খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিয়াছে। শঙ্করাচার্য গিরি, পুরী, ভারতী, বন, অরণ্য প্রভৃতি দশটি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস-আশ্রম প্রবর্তিত করেন, এবং চারটি প্রধান মঠ স্থাপন করেন। এইজন্য তাঁহার মত সর্ব ভারতে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। বাচস্পতি মিশ্র নবম শতকে শঙ্করের ভাষ্যের উপর ভামতী নামক টীকা লেখেন।[৬৬]

আদিশঙ্করকে ঐতিহ্যবাদী অদ্বৈতবেদান্তের প্রতিষ্ঠাতা ও সংস্কারক মনে করা হয়। ঐতিহাসিক ভাবে স্বীকৃত অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনের প্রথম প্রবক্তা হল গৌড়পাদ, যার ধ্যানস্থ ভঙ্গীমায় একটি মূর্তি পাওয়া যায়। এই ব্যক্তিকে আদিশঙ্করের গুরুগোবিন্দ ভাগবতের গুরু বলে কোথাও উল্লেখ করা রয়েছে। তার হাতে শ্রীগৌড়পাদাচার্য নামক মঠের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এমনটাও অনুমান করা হয়। পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যবাদে দীর্ঘস্থায়ী দর্শন মতের প্রভাব বিস্তারের ফলে ভারতের নব্য-বেদান্ত মত। হিন্দু জাতীয়তাবাদের উপর অদ্বৈত বেদান্তের প্রভাবের জন্য অদ্বৈত মতকে হিন্দুদর্শনের বেদান্ত শাখা। সেই শাখাগুলির সাধনপদ্ধতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মতাদর্শ বলে মনে করা হয়। হিন্দুধর্মের অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অদ্বৈতবাদী শিক্ষার প্রভাব দেখা যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির বাইরে অদ্বৈতবেদান্ত হিন্দু আধ্যাত্মবিদ্যার উল্লেখযোগ্য মতাদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। বেদান্তের প্রতিটি শাখার প্রধান ধর্মগ্রন্থ হল উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র। অদ্বৈত অনুগামীরা আত্মা ও ব্রহ্মজ্ঞান সংক্রান্ত বিদ্যা বা জ্ঞানের সাহায্যে মোক্ষলাভ করতে চায়। এই মোক্ষলাভ একটি দীর্ঘকালীন প্রয়াস। এই মতাবলম্বীরা মনে করে গুরুর অধীনে থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোক্ষলাভ করা সম্ভব। আদিশঙ্করের পূর্বে অদ্বৈতবেদান্ত মতবাদের প্রচলন ছিল এমন মনে করা হয়। আদিশঙ্কর অদ্বৈত তত্ত্বকে সুসংহত ও পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। তিনি শঙ্কর ভাগবদপাদাচার্য বা আদি শঙ্করাচার্য নামে পরিচিত। অদ্বৈতবেদান্তকে তিনি বৈদিক শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এই কাজে তিনি অন্যান্য বৈদান্তিক গুরু, যেমন শঙ্করের গুরু গোবিন্দ ভাগবতপাদ, গোবিন্দের গুরু গৌড়পাদ, গৌড়পাদের গুরু অজাতিবাদকে গ্রহণ করে। তার ব্যাখ্যা ও তার নামে প্রচলিত রচনাগুলি অদ্বৈত বেদান্তদর্শনের প্রামাণিক ব্যাখ্যা বলে বিবেচিত হয়। একথা ঠিক যে আদিশঙ্করের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য এই মতবাদটি জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। ব্রহ্মসূত্র (৪০০-৪৫০ খ্রিস্টাব্দ) রচনার আগে বেদান্তের কোনো শাখা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। ব্রহ্মসূত্র ও শঙ্করের মধ্যবর্তী সময়ের (বিশেষত খ্রিস্টপরবর্তী অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়) কথা বিশেষ জানা যায় না। এই সময়ে লেখা দুটি বই পাওয়া যায়, যথা - ভর্তৃহরির বাক্যপদীয় (পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ) ও গৌড়পাদের মাণ্ডুক্য কারিকা (সপ্তম শতাব্দী), যা থেকে এই দর্শনের বিষয়ে মানুষের ধারণা পরিষ্কার হতে থাকে। শঙ্কর তার রচিত গ্রন্থগুলিতে নিজসম্প্রদায়ের নিরানব্বই জন পূর্বসূরির নাম উল্লেখ করেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্-এর

ভাষ্যে শঙ্কর ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদায়ের গুরুদের প্রণাম জানিয়েছে। প্রাক-শঙ্কর যুগের মতবাদগুলি পরবর্তীকালের শাখাগুলিতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। শঙ্করোত্তরকালের বিভিন্ন নবাগত মতাদর্শের মধ্য দিয়ে প্রাচীন বেদান্ত দর্শনের ধারণাগুলি বিকশিত হতে থাকে। শঙ্কর তার পূর্ববর্তীকালের প্রচলিত অদ্বৈতবাদ মতটিকে সুসংহত রূপ দিয়েছিল। সমস্ত দর্শনগুলির মধ্যে শঙ্করের উল্লিখিত ভাষ্যগুলি দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে রয়েছে। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে অদ্বৈত বেদান্ত ভারতীয় দর্শনে একটি প্রধান স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। ৭৪০ খ্রিস্টাব্দ গৌড়পাদ শ্রীগৌড়পাদাচার্য মঠ স্থাপন করেছিলেন। এই ধর্মস্থানটি দক্ষিণ ভারতের সারস্বত ব্রাহ্মণদের প্রাচীনতম মঠ বলে মনে করা হয়। উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র – এই তিন শ্রুতিশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে অদ্বৈত বেদান্ত মতবাদটি প্রতিষ্ঠিত। আদি শঙ্কর তার ভাষ্যগুলিতে এই গ্রন্থগুলির দার্শনিক ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে নিজের সিদ্ধান্তে অটুট থেকেছে। ধীরে ধীরে এই তিনটি ধর্মগ্রন্থ ও ভাষ্যগুলির উপর ভিত্তি করে অদ্বৈত মতবাদ আরও প্রসারিত হয়েছে। শঙ্করের অন্যতম প্রকরণ গ্রন্থ বিবেকচূড়ামণি-র মধ্যে জানিয়েছে - ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা (জগতের পৃথক অস্তিত্ব নেই), এবং আত্মা ব্রহ্ম থেকে পৃথক নয়। চিরন্তন, নির্গুণ, চৈতন্যরূপ সর্বোচ্চ সত্ত্বা ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। ছান্দোগ্যোপনিষৎ-এ ব্রহ্মচিন্তার বিষয়ে জানানো হয়েছে – পরমাত্মাকে কোনও গুণ বা রূপবিশিষ্টরূপে উপাসনা করাকে ব্রহ্মোপাসনা বলে। এই রূপ বা গুণকে উপাধিস্বরূপ ধরা হয়, যেগুলি তার স্বরূপগত নয়। উপাসনার জন্য শাস্ত্রে এইগুলি উপদিষ্ট হয়েছে।[৬৭] উপনিষদের ভাষ্যকে অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা সচতেনভাবে গ্রহণ করেছিল। বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থের রচনাকারের নাম নিয়ে সংশয় রয়েছে, তবে গ্রন্থটি শঙ্করের রচনা হিসেবে প্রচলিত। এই গ্রন্থটির মধ্যে ব্যক্ত সমস্ত মতবাদের সঙ্গে শঙ্করের দার্শনিক মতবাদগুলির সম্পর্ক রয়েছে। এই গ্রন্থের বহির্ভূত কোনো ব্যাখ্যাকে শঙ্করের ব্যাখ্যাত মতবাদ কিনা এই নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। পাশ্চাত্য জগতে অদ্বৈত বেদান্ত মূলত একটি দার্শনিক মতবাদ হিসেবে প্রচলিত। ভারতবর্ষে প্রচলিত অদ্বৈতবাদের মধ্যে সন্ন্যাস প্রথা স্থান পেয়েছ। যেখানে দর্শন ও সন্ন্যাস এই দুই ভাবনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। অদ্বৈত মতের অধিকাংশ প্রধান লেখকরা সন্ন্যাসী সংঘের সদস্য। অদ্বৈতবাদের দর্শন ও সন্ন্যাস এই দুই মূল ধারণার মূল্যবোধ, আচরণ ও দর্শনের দিক থেকে আসলে একই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। তিনি একদণ্ডী-র অন্তর্ভুক্ত কিছু সন্ন্যাসীকে ঘিরে দশনামী সম্প্রদায়

স্থাপন করেছিলেন। এই আদিশঙ্কর তার ধর্মপ্রচারে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যথা - পশ্চিমে দ্বারকা, পূর্বে জগন্নাথ পুরী, দক্ষিণে শ্রীঙ্গেরি ও উত্তরে বদরিকাশ্রম। প্রতিটি মঠের প্রধান কার্যপ্রধান ছিল শঙ্করের চার প্রধান শিষ্য। যারা বেদান্ত সম্প্রদায়কে পরবর্তীতে নেতৃত্ব দিয়েছিল। বিষ্ণুর দশাবতারের মত শঙ্করকে শিবের অবতার বলে মনে করা হয়। অদ্বৈতসম্প্রদায় সরাসরি শৈব নয়। শৈবধর্মের সঙ্গে এই মতের কোথাও কোথাও যোগ লক্ষ করা যায়। তারা শুধুমাত্র শিব নয়, বিষ্ণু এমনকি শক্তি, গণপতি ও অন্যান্য দেবতাদের পূজার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান করে থাকে। সমসাময়িক শঙ্করাচার্যেরা বৈষ্ণবসম্প্রদায় অপেক্ষা শৈবসম্প্রদায়ের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। অদ্বৈতবাদের ধারার গুরুরা এইভাবে ধীরে ধীরে স্মার্তসম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে। এই স্মার্তগুরুরা হিন্দুধর্মের ভক্তিবাদী ধারার সঙ্গে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের কিছু বিষয়ে মিলন ঘটিয়েছে। শঙ্করের মৃত্যুর পর অদ্বৈত বেদান্তের একাধিক শাখার উদ্ভব হয়। যার মধ্যে দুটি শাখা এখনও বর্তমান রয়েছে।

অদ্বৈতবাদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের চেতনা ব্যতীত আরও একটি অনাদি প্রাকৃতিক সচেতনতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে পৃথিবীতে সমস্ত কিছু পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কিছু পৃথক নয়। একই সময়ে প্রতিটি বস্তু তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলে। প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থ প্রামাণিকতার ভিত্তিতে বৈদিক ধর্মশাস্ত্রকে নিম্নলিখিত ক্রমে ভাগ করা যায়। শ্রুতি যা হল শাস্ত্র হিন্দুধর্মের কেন্দ্রীয় ধর্মশাস্ত্র। হিন্দুধর্মের প্রধান উৎস এবং সেই কারণে হিন্দু বিধিব্যবস্থায় এই গ্রন্থটি সর্বাধিক প্রভাবশালী। স্মৃতি যেখানে হিন্দুধর্মের রীতিনীতিগুলিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উত্তর-বৈদিক যুগে রচিত রামায়ণ, মহাভারত, মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ইত্যাদি গ্রন্থগুলি এই শাস্ত্রের অন্তর্গত। এই ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে মানুষের ধর্মাচরণের নিয়ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাজা, যোদ্ধা, ঋষি ও দেবতাদের বংশতালিকা এবং হিন্দুদর্শনের আলোচনা পাওয়া যায়। শিষ্টাচার যা হল সৎ আচরণবিধি-সংক্রান্ত ধর্মশাস্ত্র। আত্মতুষ্টি যেগুলি মানুষকে সঠিক পথ নির্ণয়ে সাহায্য করে। সিদ্ধিগ্রন্থ প্রস্থানত্রয়ীর পর অদ্বৈত পরম্পরায় চারটি সিদ্ধিগ্রন্থের স্থান দেওয়া হয়েছে। যথা - মণ্ডন মিশ্রের (৭৫০-৮৫০ খ্রিস্টাব্দ) ব্রহ্মসিদ্ধি, সুরেশ্বরের (খ্রিস্টীয় অষ্টমশতাব্দী) নৈষ্কর্মসিদ্ধি, বিমুক্তানন্দের (১২০০ খ্রিস্টাব্দ) ইষ্টসিদ্ধি, মধুসূদন সরস্বতী (১৫৬৫-১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ) অদ্বৈতসিদ্ধি। অদ্বৈতবেদান্তের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থগুলি

হল *অষ্টাবক্র সংহিতা* (প্রাক-শঙ্কর)। তত্ত্ববোধ নামক গ্রন্থে অদ্বৈতবেদান্তের পরিভাষার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আত্মবোধ, বেদান্তসার (রামানুজ, ১০১৭-১১৩৭ খ্রিস্টাব্দ লঘুবাক্যবৃত্তি দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক, পঞ্চীকরণম্, বেদান্ত-পরিভাষা (ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্র), অদ্বৈত-মকরন্দ (লক্ষ্মীধর কবি), অপরোক্ষানুভূতি, দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রম্, পঞ্চদশী (বিদ্যারণ্য), কৌপিন-পঞ্চকম্, সাধন-পঞ্চকম্, মণীষা-পঞ্চকম্, দশশ্লোকী। আধুনিক ধর্মগ্রন্থ অদ্বৈত বেদান্ত সম্পর্কে ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ আধুনিক কালে লেখা হয়েছে। জ্ঞানযোগ স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলি পাশ্চাত্যে অদ্বৈত বেদান্তের প্রসারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র। অদ্বৈবেদান্তের লক্ষ্ হল আত্মা ও ব্রহ্মের একাত্ব অনুভূতির মাধ্যমে মোক্ষ অর্জন। আদিশঙ্করের মতে, উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের দার্শনিক উপলব্ধির মাধ্যমে ব্রহ্ম সম্পর্কে জানা সম্ভব। এখানে সমন্যাস (আত্মসমীক্ষা), শ্রবণ (ঋষিদের বাক্য শোনা), মনন (উপদেশ মনে রাখা) ও ধ্যান (তত্ত্বমসি সত্যের চিন্তা)। এই চারটি স্তর পেরিয়ে আসার বার্তা দেওয়া হয়।

বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব শুরু হয়েছিল গৌতমবুদ্ধের গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তী সময় থেকে। এই ধর্মের প্রভাব ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ অন্যান্য ধর্মগুলিকে প্রভাবিত করতে থাকে। খ্রিস্টপূর্ব সময় থেকে শুরু করে খ্রিস্টপরবর্তী দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের সময়কাল ধরা হলে, বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এই সময়ে চলে আসা অন্যান্য ধর্মীয় ভাবনাগুলি এসে মিলিত হয়েছে। বৈষ্ণবধর্ম সেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এসে মিলিত হয়েছিল। তিব্বতে তান্ত্রিকতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে, সিংহল ও ভারতবর্ষ থেকে ভিক্ষুণীরা দলে দলে হিমালয়ের দিকে যাত্রা করতে থাকে। এইসকল নারীরা তন্ত্রসিদ্ধা নামে খ্যাতি পেতে থাকে। তারা কেউ কেউ অলৌকিক ক্ষমতার আধিকারী ছিলেন। অতীশ দীপঙ্কর তিব্বত যাত্রার পূর্বে বৌদ্ধদেবী মঞ্জুশ্রীর কৃপাভিক্ষা করেছিলেন। তার এই প্রার্থনা এবং দেবীর আদেশগুলি সম্পন্ন করেছিল একজন ভৈরবী। চৈতন্যদেব ষোড়শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে এইরকম একজন ভৈরবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল এমনটাও উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধতান্ত্রিকদের মধ্যে ভৈরবীচক্র গঠনের কথা জানা যায়। বৌদ্ধদের অনুকরণে বঙ্গদেশে নারী ও পুরুষ একসঙ্গে বসে এইরকম চক্র তৈরি করে থাকত –

> বৌদ্ধতন্ত্রের সমস্ত কথা হিন্দুতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে – কিন্তু হিন্দুরা ভ্রমেও বৌদ্ধগণের উল্লেখ করে নাই; তবে বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজের সহিত যাঁহারা পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, বৌদ্ধ ও জৈন সমাজ ও

> সাহিত্যে তাঁহাদের ভাল করিয়া জানা দরকার। বৌদ্ধধর্মের বাহিরের খোলসটা আমরা পোড়াইয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু তাহার প্রাণটা আমাদের সমাজ ও সাহিত্যেকে এমন জড়াইয়া ধরিয়া আছে যে, তাহা এখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখান অসম্ভব। বৌদ্ধ সমাজের প্রত্যেকটি অঙ্গ হিন্দুসমাজের উপর তাহার ছায়াপাত করিয়া রহিয়াছে।[৬৮]

এই ছিল বৌদ্ধধর্মের দ্বারা বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবের প্রতিচ্ছবি। অন্যান্য বৈষ্ণবীয় গ্রন্থের মধ্যে বৌদ্ধপ্রভাব লক্ষ করা যায়।

ভারতের ধর্মলক্ষ্মী সর্বদা ভারতীয় ধর্মীয় ভাবনাগুলিকে পরিপাটী করে গুছিয়ে রেখে সন্তুষ্টি পেয়েছে। শাক্যরাজপুত্র গৌতম জীবের কষ্টমোচনের জন্য, জীবের দুঃখভার নিজের কাঁধের ওপর চাপিয়ে নিয়েছিল। দেবতারা যখন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল সমুদ্রোত্থিত বিষ নিয়ে। এই বিষের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে দেবতারা শিবের অনুসরণ করে। শিব সেই গরল নিজ কণ্ঠে ধারণ করে। বুদ্ধ ঐতিহাসিক চরিত্র আর শিব পুরাণের কল্পনা। বুদ্ধ তৎকালীন সমাজে পালিত ধর্মরীতিতে পশুবধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। শারীরিক কষ্ট দ্বারা মোক্ষলাভ এই ধারণাতে গৌতমবুদ্ধ বিশ্বাসী না হয়ে, তিনি মধ্যম পন্থা-কে গ্রহণ করেছিল। তিনি পৃথিবীর মানুষকে সকল জীবের প্রতি ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন। তিনি যেমন সমাজের উঁচুস্তরের মানুষদের তার সংঘে স্থান দিয়েছিলেন। সমাজের পতিতশ্রেণির মানুষদের সংঘে স্থান দিয়ে সকলের প্রতি উদারতা প্রদান করেছিল।[৬৯] দেবতা শিবের মধ্যে পৌরাণিকতার প্রভাব কাটিয়ে ধীরে ধীরে বাস্তবের মানুষ হয়ে ওঠার যাত্রা লক্ষ করা যায়। সিদ্ধাচার্য থেকে নাথসম্প্রদায়ের উৎপত্তি যেখানে গোরক্ষের চরিত্রের সঙ্গে বৌদ্ধযুগের চরিত্রবল, উচ্চনীতি ও গুরুভক্তি এই সকল বিষয়গুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। বৈষ্ণবধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ গীতা যার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রধান গ্রন্থ ধম্মপদ এই দুটি গ্রন্থের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায় রাজা স্কন্দগুপ্ত হূণদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর বর্ণনা থেকে এই বক্তব্যের সত্যতা জানা যায়। তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন বেশ কিছু হূণদের আক্রমণে গড়ে ওঠা ধ্বংসাবশেষের কথা। এই সময় আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তৎকালীন রাজা বালাদিত্য (৪৬৮ খ্রিস্টাব্দ), যাকে যুদ্ধের প্ররোচনা দিতে গীতার প্রথমাংশ রচিত হয়েছিল -

> সহস্র বৎসরের প্রচলিত বৌদ্ধসভ্যতার প্রতিক্রিয়ারূপেই গীতার সৃষ্টি। একক কোন মতের পক্ষে হয়ত টিকিয়া থাকা তখন সম্ভব ছিল না সেই কারণে সাংখ্য, যোগ, বেদ, উপনিষদ, সগুণ, নির্গুণ, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন মত ও গ্রন্থের শ্লোকাবলী একত্র সংগহীত হয়।[৭০]

গীতার বিভিন্ন শ্লোকের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের ছাপ পাওয়া যায় স্পষ্ট। যেমন - গীতার এবং প্রবর্তিতং চক্রম যেখানে বৌদ্ধ ধর্মচক্রের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। ব্রাহ্মণ্য শক্তির সঙ্গে মিশে বৌদ্ধতন্ত্র নতুন একটি শাক্ত-সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছিল। যাকে কৌল নামে অভিহিত করা হয়। এই কৌল ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পঞ্চকুলের উদ্ভব হয়েছিল - ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী। তন্ত্রে এই কুলগুলিকে একেকটি শক্তি বা প্রজ্ঞা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেশ হিসেবে বাংলাদেশে শক্তিপূজার প্রধান কেন্দ্র। বাংলাদেশে কালীপূজা ও দূর্গাপূজার মধ্যে দিয়ে এখনো পুরনো ঐতিহ্যকে বজায় রেখে চলেছে। এই ব্রাহ্মণ্য শাক্তভাবনার সঙ্গে বৌদ্ধ মহাযান শাখার কিছু ধ্যান-পরিকল্পনার মিল পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মের দেবীদের মধ্যে বৌদ্ধ দেবীদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। বেদান্তের অন্যান্য শাখাগুলির মতো শঙ্করের অদ্বৈত মত নিজেকে প্রধানত উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্রভিত্তিক বলে দাবি করে। সমালোচকেরা জানিয়েছেন – এই বেদান্ত দর্শনের মধ্যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাব স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। মহাযান শাখার অন্তর্ভুক্ত নাগার্জুন প্রবর্তিত মধ্যমক এবং বসুবন্ধু ও অসঙ্গ প্রবর্তিত (প্রথম সহস্রাব্দের প্রথম ভাগে) যোগাচার মতবাদ। এই দুটি ধারার মধ্যে স্মার্ত দর্শনের প্রভাব বিশেষ করে লক্ষ করা যায়। মহাযানের অন্য যেসকল মতাদর্শ রয়েছে যেগুলি সরাসরি বেদান্তের মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছিল। কার্যত বৌদ্ধদের সমস্ত যুক্তিবিদ্যা, পদ্ধতি, ব্যাখ্যা, ধ্যানধারণা, পরিভাষা এমনকি পরমতত্ত্ব সম্পর্কে তাদের যেসকল দর্শন রয়েছে, সেগুলি গ্রহণ করা হয়েছে। শঙ্কর নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার এই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করা যা পরে বৌদ্ধধর্মের পক্ষে ভয়ংকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বৌদ্ধদের মনে করে সর্বোচ্চ সত্য হল শুদ্ধ চৈতন্য (বিজ্ঞপ্তি-মাত্রা, যোগাচার মত) এবং বিশ্বের প্রকৃতি চারমুখী মিথ্যা। এই দুই বিশ্বাসকে গৌড়পাদ গ্রহণ করেছিল। এগুলিকে তিনি মাণ্ডুক্য উপনিষদ্-এর দর্শনের সঙ্গে একীভূত বলে প্রমাণ করেছিলেন। গৌড়পাদ বৌদ্ধদের জ্ঞানতত্ত্বমূলক আদর্শবাদের বিরোধিতা করেছিল। সে জানায় স্বপ্নে দেখা বস্তু এবং বাস্তব জগতের বস্তুর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। যদিও শেষ পর্যন্ত দুটোই মিথ্যে। বিজ্ঞানবাদ শাখার মূল মতবাদ চৈতন্যের বহুত্ব ও ক্ষণস্থায়িত্ব। অবশেষে এই মতের মুক্তিলাভের প্রক্রিয়াকে তিনি অস্বীকার করেছিল। নাগার্জুনের মধ্যমক দর্শন থেকে অজাত (অণুৎপাদ) ধারণাটি গৌড়পাদ গ্রহণ করে। এই অজাতিবাদ বা অসৃষ্টিতত্ত্বের মতবাদ অথবা সৃষ্টিতত্ত্বহীন মতবাদ যা গৌড়পাদের মূল দর্শনতত্ত্ব। বৌদ্ধ সাহিত্যিকরা

অজাতিবাদের ধারণা সম্পর্কে জানিয়েছে - কারণের সারবত্তা বলে কিছু নেই তাই কারণের পরিবর্তন সম্ভব। এই ধারণার বিপরীত ব্যাখ্যা দিয়েছে গৌড়পাদ। তিনি সৃষ্টি ও ধ্বংসকে মিথ্যে বলে ধরে নিয়ে চরম অবস্থানে পৌঁছাতে চেয়েছে। সর্বোচ্চ সত্য ব্রহ্মকে অনাদি ও অপরিবর্তনীয় বলে স্বীকার করেছে। তিনি জানিয়েছেন সর্বোচ্চ সত্য হল জন্মলাভ। পরিবর্তন ও মৃত্যুর অধীন এবং অজ অর্থাৎ জন্মহীন সত্য। জগতের আপাত-বাস্তবতাকে মিথ্যা বলা হয় এবং তাকে চিরস্থায়ী মনে করা হয় না। বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তের প্রবক্তা যমুনাচার্য (দশম শতাব্দী) শঙ্করের অদ্বৈতবাদের বিরোধিতা করে। তার সিদ্ধিরায় গ্রন্থে অদ্বৈতকে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তুলনা করে বলে বৌদ্ধদের মতো অদ্বৈতবাদীরা জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-এর মধ্যেকার পার্থক্যকে মিথ্যা মনে করে। অদ্বৈত মায়ার দিকে নিয়ে যায় এবং বৌদ্ধ মতবাদ বুদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। অপর বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী দার্শনিক রামানুজাচার্য শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। অদ্বৈতবেদান্তে ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের পথদুটিকে সহকারী পথ বলে মনে করা হয়। ভক্তিযোগে ঈশ্বরকে কোনো একটি বিশেষ মূর্তি রূপে (কৃষ্ণ বা কালী) পূজা করা হয়। আদিশঙ্কর নিজে ছিলেন ভক্তিযোগের একজন অন্যতম প্রবক্তা। আদি শঙ্কর নিজে একথা বিশ্বাস করেছিল যে বৈদিক যাগযজ্ঞ, পূজা ও ভক্তির সাধনা ব্যক্তিকে জ্ঞানের পথে নিয়ে যায়। ভক্তির দ্বারা মোক্ষলাভ করা কোনোভাবে সম্ভব নয়। ভক্তিযোগের পথে শুক্লগতিতে মোক্ষে পৌঁছানো যায়। কর্মযোগ হল ব্যক্তিগত লাভ বা ক্ষতির হিসেব না করে কর্তব্য কর্ম করে যাওয়া। আধুনিককালে স্বামী বিবেকানন্দ এই কর্মযোগের প্রসঙ্গে জানিয়েছে - কর্মযোগ হল সকল কর্ম মনোযোগ সহকারে করে তার ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করা। আদিশঙ্কর বেদ থেকে ঈশ্বরের একমাত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছে যে, ঈশ্বর যুক্তি ও চিন্তার অগম্য। জগৎ আশ্চর্যজনকভাবে ঐক্যবদ্ধ এই সৃষ্টির স্রষ্টা বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন। মানুষ ভাল ও মন্দ কাজ করে ইহকালে বা পরকালে ফল ভোগ করে। মানুষ নিজের কর্মের ফল ভালো-মন্দ যাই হোক না কেন সেগুলি কখনও নিজেকে দিতে পারে না। একইভাবে ফলদাতা কখনও চৈতন্যবিহীন হতে পারে না। কর্মের ফলদাতা হল ঈশ্বর। শুধুমাত্র সৎকর্ম সত্যজ্ঞান অর্জনে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। প্রমাণের মাধ্যমে কর্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়। সত্য, অহিংসা, জীবে সেবা ও দয়া হল ধর্ম এবং মিথ্যা, হিংসা, প্রতারণা, স্বার্থপরতা ও লোভ হল অধর্ম। অদ্বৈত মতের বিকাশ ঘটেছিল এক

বহুমুখী ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রেক্ষাপটে। বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, শৈবধর্ম ও বেদান্তের অন্যান্য শাখাগুলির সঙ্গে অদ্বৈতবাদের মতের আদান-প্রদান ঘটেছে।

আনুমানিক ৬৫০-১১০০ খ্রিস্টাব্দকে হিন্দুধর্মের ইতিহাসে উত্তর ধ্রুপদি হিন্দুযুগ বলা হয়। যার পূর্ববর্তী যুগটিকে হিন্দুধর্মের সুবর্ণযুগ (৩২০-৬৫০ খ্রিস্টাব্দ) বলা হয়। গুপ্তশাসনকাল (৩২০-৫৫০ খ্রিস্টাব্দ) থেকে হর্ষ সাম্রাজ্যের পতন (৬০৬-৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ) ধ্রুপদি হিন্দুযুগের অন্তর্গত। এই যুগে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, বৈদেশিক ও আন্তঃবাণিজ্য প্রসারিত হয়েছিল। আইনব্যবস্থা সুসংহত হয়েছিল এবং সাক্ষরতার সার্বিক প্রসার ঘটেছিল। এই যুগে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হতে থাকে। গুপ্ত রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আবার পুনরুজ্জীবিত হয়। সমাজে ব্রাহ্মণদের উচ্চস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম হিন্দুমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গুপ্ত যুগে। গুপ্ত ও হর্ষ সাম্রাজ্যের পতনের পরে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হয়। যেখানে বেশ কয়েকটি বড়ো রাজ্য ও অনেকগুলি আশ্রিত রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই রাজ্যগুলি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশশাসন করত। ছোটো রাজ্যগুলি বড়ো রাজ্যগুলির উপর নির্ভরশীল ছিল। এইসকল রাজ্যের সম্রাটরা বরাবর থাকত সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে। রাজারা যথেষ্ট বিলাসবহুল জীবনযাপন করতো। প্রজারা তাদের দেবতা মনে করে সম্মান প্রদান করত। তান্ত্রিকমণ্ডলগুলিতে রাজাদের এই বৈশিষ্ট্যের চিত্র ধরা পড়েছে। রাজাকে মণ্ডলের কেন্দ্রে কল্পনা করা হত। এইসময় কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে ধর্মের মধ্যে আঞ্চলিকতা দেখা যায়। ধর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং স্থানীয় লোকসংস্কৃতি ও ভাষাগুলি পরিপুষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রথাবহুল হিন্দুধর্মের ক্ষমতা ধীরে ধীর হ্রাস পেতে থাকে। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ভেঙে শৈবধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, ভক্তিবাদ ও তন্ত্র গ্রামীণ ও ভক্তিবাদী এই শাখাগুলির উদ্ভব ঘটতে থাকে। এই সম্প্রদায়গুলি তখনও তেমনভাবে বিস্তারলাভ করে উঠতে পারেনি, তাদের বিকাশের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থান করেছে মাত্র। ধর্মীয় শাখাগুলিকে স্থানীয় শাসকদের অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছিল। এই লড়াইয়ে যে ধর্ম জয়লাভ করেছিল সেই ধর্মের দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার রাস্তা মজবুত হয়েছিল। প্রাচীনযুগের ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে এই লড়াই-এর প্রবণতা পরবর্তীকাল মঙ্গলকাব্যের দৈবীচরিত্র গঠনে অনেকখানি সাহায্য করেছিল।

এই পরিস্থিতিতে বৌদ্ধধর্ম তার স্থান হারাতে শুরু করে। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম অবলুপ্ত হতে শুরু করে। বৌদ্ধধর্মকে সমর্থনকারী প্রাচীন ভারতের নগরসভ্যতা, যেখানে সমগ্র দেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথাগত ধর্মমতের প্রভাবে এই ধর্ম নিজের স্থান হারাতে থাকে। বঙ্গদেশে রাজপাট বদলের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম রাজরোষের সম্মুখীন হয়। এই পরিস্থিতে গৌড়পাদ উপনিষদ্ ব্যাখ্যায় বৌদ্ধদর্শনকে গ্রহণ করলে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। আত্মা ও ব্রহ্ম সজীব সত্ত্বায় পর্যবসিত হয়ে মায়াবাদ-এর জন্ম দেয়। যেখানে আত্মা ও ব্রহ্মকে দেখা হতে থাকে শুদ্ধ জ্ঞানচৈতন্য হিসেবে। সাংখ্যদর্শনের মধ্যে উপনিষদের প্রভাব যথেষ্ট নিগূঢ়ভাবে রয়েছে। অদ্বৈত ও কাশ্মীরি শৈবধর্ম কালক্রমে, অদ্বৈত মতাবলম্বীরা শঙ্করকে শিবের অবতার বলে মানতে শুরু করে। অভিনবগুপ্ত প্রবর্তিত কাশ্মীরি শৈবধর্ম আপাত অদ্বৈত-অনুসারী একটি মতবাদ এমনটা প্রচলিত রয়েছে। যা অনেক স্থানে অদ্বৈত মতের অনুসরণ করলেও, কিছু প্রধান ক্ষেত্রে দুই মতের পার্থক্য রয়েছে। অদ্বৈতবেদান্তের মূলভিত্তি উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র হলেও, কাশ্মীরি শৈবধর্ম ভৈরবতন্ত্র ও কৌলতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। অভিনবগুপ্ত গৌড়পাদ প্রমুখ অদ্বৈতবাদী দার্শনিকেদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মধ্ব ছিলে দ্বৈতবেদান্তের প্রবর্তক, এই মতবাদটি ছিল একটি বৈষ্ণব মতাদর্শ। এই দর্শনের মধ্যে অদ্বৈতবিরোধী একটি উপনিষদ্-ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মধ্বের জীবনীকার নারায়ণ-এর লেখা মধ্ব-জীবনী গ্রন্থ। শঙ্কর ও মধ্ব ছিল আজন্ম শত্রু। শঙ্করকে পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া এক দৈত্য বলে উল্লেখ করেছেন। মধ্ব-সংক্রান্ত প্রচলিত লোককথাগুলির মধ্যে লেখা হয়েছে, শঙ্করের অনুগামীরা চক্রান্তকারী। তারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের মঠ পুড়িয়েছে, গবাদি পশু হত্যা করেছে এবং নারী ও শিশুদের হত্যা করতে দ্বিধা করেনি। হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দু ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মধ্যে বেদান্তকে হিন্দুধর্মের সারমর্ম ধরে নেওয়া হয়। অদ্বৈতবেদান্তকে হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক সত্ত্বার শাস্ত্রীয় উদাহরণ বলে ধরে নেওয়া হয়। হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা এই মতকে সমর্থন করেছে। তারা অদ্বৈত বেদান্তকে ভারতীয় ধর্মগুলির সর্বোচ্চ রূপ বলে প্রচার করেছে। ফলস্বরূপ এই মতটি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এই নব্য হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের হাতে অদ্বৈতবেদান্ত ব্যাখ্যাটি নব্য-বেদান্ত নামে পরিচিত হয়। এই ধর্ম আধুনিক বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তারা মনে করেছে তাদের জন্য পুরোনো মতগুলি চূড়ান্ত নয়। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ মুক্তি অর্জনের জন্য সমাধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

উপনিষদ্ বা শঙ্করের মতবাদের কোথাও সমাধির উপর এতোটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। শঙ্কর ধ্যান ও নির্বিকল্প সমাধিকে আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব অনুভব করার জন্য জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি বলেছে। রাজযোগ হল বিশ্ব ও বিশ্বস্বরূপ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার ধ্যানপদ্ধতি। ব্যক্তি বিশ্বের চূড়ান্ত সত্ত্বা বা চৈতন্যের অনুভূতি প্রাপ্ত হয়।

এইভাবে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা বৃদ্ধি করে বিস্তারলাভ করতে থাকে ভারতবর্ষের মাটিতে। ভারতবর্ষে প্রথমদিকে ধর্ম নিয়ে তেমন কোন বিবাদ ছিল না। একই পরিবারে বিভিন্ন ধর্মীয়মতাদর্শের সদস্যের বসবাস ছিল। তুর্কী আক্রমণের পরে মোট চারটি প্রধান ধর্মীয় মতাদর্শের প্রকটভাবে প্রচলন ছিল, যেমন - দেশীয় প্রাচীন লৌকিক দেবতার পূজা, মহাযান বৌদ্ধমতের একটি স্থানীয় রূপ, যোগী মত ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যমত। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যমত, যেখানে মূলত বিষ্ণু-শিব-চণ্ডী-উপাসনা এই চার পদ্ধতিতে পূজা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমান আক্রমণের পরবর্তীকালে এই প্রধান চারটি ধারা মিলে মিশে জন্ম দেয় পৌরাণিক ও অপৌরাণিক নামক দুটি বৃহৎ ভিন্ন ধারার। কালান্তরে হিন্দুধর্মের রদ বদল ঘটে। হিন্দুধর্মের সঙ্গে সনাতনধর্মের যোগাযোগ বোঝার চেষ্টা করে। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও অদ্বৈত বেদান্ত এই চারটি ধর্মের আলোচনা করা হয়েছে। হিন্দুধর্মের মধ্যে ধীরে ধীরে কীভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ ঘটেছিল সেগুলি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। খ্রিস্টপূর্বকাল থেকে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি এবং এই ধর্ম প্রাচীন ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে ধীরে ধীরে মগধ, বৈশালী, কাশী, বেনারস প্রভৃতি রাজ্যেগুলিতে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলগুলিতে এই ধর্মের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল। একসময় সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। ভারতীয় অন্যান্য ধর্মগুলির সঙ্গে মিশে গিয়ে কখনও নিজেকে বর্ধিত করেছে। কখনও মিশে গেছে অন্য ধর্মস্রোতের গতির কাছে। এইভাবে ভারতীয় ইতিহাসে হিন্দু-বৌদ্ধযুগ নামে একটি নতুনযুগের সূচনা হয়েছিল।

২. ৪) সাহিত্যের ইতিহাস চর্চায় বৌদ্ধ ও জৈন ভাবনার গুরুত্ব

বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে প্রাচীন ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে ধীরে ধীরে মগধ, বৈশালী, কাশী, বেনারস প্রভৃতি রাজ্যেগুলিতে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে যেসকল সনাতন ধর্মের বিরোধী পালনকৃত ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছিল, যেমন - আজীবক ধর্ম, জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম।

এগুলির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব আজও পৃথিবীতে যথেষ্ট প্রকট রয়েছে। এই ধর্ম সমগ্র এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ অংশ জুড়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই ধর্মের আপন উদারতার দৃষ্টান্তে। জৈনধর্ম শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয় তার বাইরেও বেশ প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। পার্শ্বনাথ-শিষ্য শেষ জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীর গৌতমবুদ্ধের কিছুকাল সময় পূর্বের মানব। তার কর্মক্ষেত্রে ছিল মগধ, পাটনা এইসকল অঞ্চলগুলির মধ্যে। ইতিহাস থেকে জানা যায় বঙ্গের রাঢ়ভূমিতে মহাবীর কিছুদিন অবস্থান করে আপন ধর্মমত প্রচার করেছিল। পৌরাণিক যুগের খাপছাড়া ইতিহাস থেকে জানা যায়, কৃষ্ণ-সমাশ্রিত যে আর্য্যধর্ম্মের উত্থান ঘটেছিল সেখানে ব্রাহ্মণকে দেবতার আসনে বসানো হয়েছিল। বৈদিকযুগে ব্রাহ্মণরা এতটা স্বৈরাচারী ছিল না। মাহাভারত রচিত হওয়ার পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যপ্রথায় যে আমূল পরিবর্তন এসেছিল। যার এই গৌরব পতাকাবাহী ধারক ও বাহক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। সম্রাট অশোক এবং অন্যান্য বৌদ্ধরাজারা ব্রাক্ষাণদেরকে সম্মান করত। মহাভারতে বলা হয়েছে – ব্রাহ্মণের সেবা করলে ইহলোক ও পরলোক মানুষের সদগতি প্রাপ্তি হয়। বৌদ্ধধর্মে জোর দিয়ে বলা হয় – কাউকে কিছু দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই, কর্ম্মই লোকের অদৃষ্ট নির্ম্মাণ করে ও কর্ম্মই সর্ব্বফলপ্রসূ হয়। ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবধারার সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন এই অবৈদিক ধারা দুটি দীর্ঘকাল প্রাচীনভারতে সমান্তরালভাবে অবস্থান করেছিল। সিন্ধুসভ্যতা থেকে প্রাপ্ত প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের মূর্তি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে মহাবীরের সময় পর্যন্ত। এই দীর্ঘ জৈনধর্মের ইতিহাসে জীবের প্রতি দয়ার কথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের সময়কাল নির্ধারণ করতে গেলে আমাদের আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে শুরু করে তুর্কি আক্রমণের প্রাককাল। এই সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত গৌতমবুদ্ধের বাণী বা প্রচলিত কাহিনি পাওয়া গেছে সেখানে জীবের প্রতি দয়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যকেন্দ্রিক গ্রন্থ *মহাভারত*-এর মধ্যে জীবের প্রতি অত্যাচার থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।[৭১] মহাভারতের অনুশাসন পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে – মানুষের আত্মপ্রাণের মতো অন্যান্য প্রাণীর প্রাণকে প্রিয়বস্ত ভাবা উচিত। যারা রসনাকে তৃপ্ত করতে পারলে নিজেকে চরিতার্থ মনে করে, তাদের রাক্ষস বলা যেতে পারে। অপরদিকে বলা হয়েছে যারা মাংস ভোজন থেকে বিরত থাকে, তাদের দুর্গম অরণ্য মাঝেও কোনো হিংস্রজন্তু আক্রমণ করে না। প্রাচীন ভারতের এই গ্রন্থে

ব্রাহ্মণদের মাহাত্ম্যের কথা বলা হলেও জীবে দয়া দেখানোর নীতিকে একেবারে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি।

খ্রিস্টপূর্ব সময়কাল থেকে খ্রিস্টপরবর্তী কুষাণসাম্রাজ্যের সমাপ্তির পর গুপ্তসাম্রাজ্যের (চতুর্থ-পঞ্চম খ্রিস্টাব্দ) আগমনের ফলে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেসময়ে ভারতের বর্তমান বিহার প্রদেশের নালন্দা মহাবিহারটি মহাযান শাখার অধ্যয়নের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। নালন্দা নামক এই বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রটির বহু শতাব্দী ধরে বৃহত্তর ও প্রভাবশালী বৌদ্ধবিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে খ্যাত ছিল। নাগার্জুন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছিলেন প্রমাণ পাওয়া যায়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ে যেসকল বৌদ্ধ শিল্পকলাগুলি তৈরি হয়েছিল পরবর্তীকালে সমগ্র বিশ্বের কাছে বিষয়টি অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। হূন আক্রমণ এবং মিহিরকূলের অত্যাচারের পর থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দূর্বল হয়ে পরে। চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাং-এর গ্রন্থ থেকে জানা যায় - অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিল নাড়ু, বিজয়ওয়াড়া তথা সমস্ত দক্ষিণ ভারতে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। তিনি নেপালে জনমানবশূণ্য বৌদ্ধস্তুপের বর্ণনা দিয়েছিলেন। গৌড়রাজ্যের রাজা শশাঙ্ক কর্তৃক বৌদ্ধ নিপীড়নের কথা উল্লেখ করেছেন। একই সময়ের রাজা হর্ষবর্ধন কর্তৃক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার ভূয়শী প্রশংসা করেছেন। হর্ষবর্ধনের শাসনামলের সমাপ্তির পর অনেক ছোট ছোট রাজ্যের উত্থান ঘটে। যা পরবর্তীতে গাঙ্গেয় উপত্যকায় রাজপুত জাতির উত্থান ঘটায় এবং বৌদ্ধ-রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে। বাংলা অঞ্চলে পালসাম্রাজ্যের উত্থানের পর থেকে বৌদ্ধ-রাজবংশ পুনরায় তাদের গৌরব ফিরে পায়। এরপর বাংলায় হিন্দু সেনরাজবংশ কর্তৃক পালরাজ্য আক্রমণ হলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমে আসে। সেন রাজাদের পূর্ব পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম পালসাম্রাজ্যের অধীনে থাকায় বাংলা থেকে সপ্তম-দ্বাদশ শতাব্দীতে সিকিম, ভূটান এবং তিব্বত এই অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পরে। পাল রাজবংশের শাসনামলে বহু মন্দির ও বৌদ্ধ শিল্পকলাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি আরও জানান ভারতবর্ষে তখন মানুষের মধ্যে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করার মতো ছিল। সেসময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের হিন্দধর্ম ও জৈনধর্মে ধর্মান্তরীত হতে দেখা গেছে। অন্যদিকে হিন্দু এবং জৈনরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের মহাযানশাখা বাংলা ও মগধের জন মানুষকে অষ্টম থেকে দ্বাদশ এই চারশো বছর পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছিল।[৭২] দশম শতাব্দীতে পাল রাজবংশের পরাজয় ও বৈষ্ণবীয় মতবাদ

উত্থানের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত হতে থাকে। এরপর ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী আক্রমণের (আনুমানিক ১২০১ খ্রিস্টাব্দ) ফলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের পতন লোকচক্ষুর সামনে সম্পূর্ণ হয়। বৌদ্ধধর্মের এই ঐতিহাসিক যাত্রাপথের মধ্যে দিয়ে মূল বৌদ্ধভাবনার অভ্যন্তরে কালে কালে কয়েকটি ভাববাদী আন্দোলনের উদ্ভাবন ঘটেছিল। বৌদ্ধধর্ম কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হতে শুরু করে – থেরবাদ ও মহাযান এই দুটি মূল শাখা। মহাযান শাখার মধ্যে আরও কিছু বিভাগের জন্ম হয়েছিল, যেমন - বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান। অন্য দিকে জৈনধর্ম পুণ্ড্রবর্ধনে বেশ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রাচীনকাল থেকে জৈনধর্মের চারটি শাখার জন্ম হয়েছিল। যেগুলি হল - তাম্রলিপ্তিক, কোটিবর্ষীয়, পুণ্ড্রবর্ধনীয় ও দাসী-খরবটিক। যেগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি (তাম্রলিপ্তিক, কোটিবর্ষীয় এবং পুণ্ড্রবর্ধনীয়) প্রধান ধর্মমতের জন্ম হয়েছিল বাংলায় –

> আচারাঙ্গ সূত্র বর্ণিত কাহিনী থেকে দেখা যাচ্ছে, রাঢ়ের অস্ট্রো-দ্রাবিড়জন প্রথমে জৈনমতকে বিশেষ আমল দিত না, যদিও খ্রী: পূ: দ্বিতীয় শতকের আগেই বাংলাদেশে জৈনমত সুপ্রচারিত ছিল।[৭৩]

হিউয়েন সাং বৌদ্ধধর্মের বর্ণনার সঙ্গে জৈনধর্মের নমুনা কিছুটা তুলে এনেছিলেন। সেখান থেকে ভারতে সপ্তম শতকে জৈনধর্মের ক্ষীণ অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এই দুই ধর্মমত বেদবিরোধী হয়ে ভারতীয় সংস্কারকে পরিত্যাগ করতে পারেনি। এই মতবাদ দুটি দীর্ঘকাল ধরে পৌরাণিক সংস্কারের পাশে অবস্থান করেছিল।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের উত্থান-পতন ঘটেছে বিভিন্ন সময় ধরে। বৌদ্ধধর্মের সূত্রপাত থেকে শুরু করে বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। একদা বৌদ্ধধর্মের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল ভারতবর্ষে। ধীরে ধীরে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এই সকল অঞ্চলের মধ্যে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম সীমিত হয়ে পড়ে। সম্রাট আশোকের রাজত্বের দু-এক শতক পর থেকে বৌদ্ধধর্ম তার নিজস্বরূপ হারাতে থাকে। এই পরিবর্তন এতটা প্রকট হয়ে যায় যে, প্রথমিক স্তরে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এই রূপবদলকারী বৌদ্ধধর্মের তেমন কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। কিছু ঐতিহাসিক বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির অবলুপ্তির কথা ঘোষণা করে। যা দীর্ঘকাল ধরে সুপ্রচলিত ইতিহাস রূপেগণ্য হয়ে এসেছে। অতিসাম্প্রতিক কালে গবেষকরা এই বিষয়ে সন্দিহান হয়ে, নিখুঁতভাবে এই বিষয়ে পুনরায় গবেষণা শুরু করেছে। পূর্ব গবেষণায় প্রচলিত ধ্বংস হয়ে যাওয়া বৌদ্ধ মতবাদ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এই ধারার একজন গবেষক হলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। যিনি ঊনবিংশ শতকের

শেষদিকে বাংলার সংস্কৃতিকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসংস্কৃতি' বলে সওয়াল করেছিলেন। যা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বিরাট আলোড়ন তুলেছিল। সেসময়ে গড়ে ওঠা শিক্ষাব্যবস্থা, ধর্মস্থান, শিল্পকলা যা মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। প্রাচীন ভারতের পালি ভাষায় লিখিত সাহিত্যগুলিতে ষোড়োশ মহাজনপদের মধ্যে বঙ্গের নাম উল্লিখিত না হলেও অঙ্গুত্তনিকায়–এর মহাবগগ অংশে বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ জাতকের কাহিনিতে রাঢ়বাসী একজন যুবকের কথা জানা যায়, যে শিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় গিয়েছিল। বৌদ্ধগ্রন্থ *মিলিন্দ প্রশ্ন* ও *দিব্যাবদান* এই দুটি গ্রন্থে ও পুণ্ড্ররাজ্যের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় –

> অতি প্রাচীন কাল থেকে বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশে এবং পূর্বাঞ্চলের আরো দূরবর্তী অংশে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বৌদ্ধ ধর্মের আদি প্রত্যয়গুলি এবং পরবর্তী কালের মহাযান বৌদ্ধদের বিভিন্ন মতবাদ মগধ পাটলীপুত্র হয়ে প্রাগজ্যোতিষ চট্টল পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে বিশেষত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার সংস্কৃতির প্রান্তেবাসী অন্ত্যজ শ্রেণী এবং পশ্চাদবর্গের জনসাধারণের মধ্যে মহাযানী বৌদ্ধদের তন্ত্রাশ্রয়ী গোষ্ঠীগুলির বিশেষ ভূমিকায় অবস্থান করে।[৭৪]

এইভাবে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে বঙ্গদেশের গৌরবান্বিত ইতিহাসগুলি জুড়ে রয়েছে। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস নিয়ে যদি বাঙালির কিছু গৌরব করার থাকে সেই ইতিহাস রচিত হয়েছিল বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম সম্প্রসারণের যুগে। জৈনদের সময়ে বাংলাদেশের অস্তিত্বের কথা জানা যায় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে রাঢ় অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত বজ্রভূমি ও সুহ্মভূমিতে মহাবীর জৈনধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। যেখানে তার অভিজ্ঞতা হয়েছিল খুব হতাশাজনক। *আয়ারাঙ্গ সুত্ত* গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায় রাঢ়ভূমির লোকেরা তার দিকে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। তার প্রতি নানাবিধ অশিষ্ট ব্যবহার করেছিল। রাঢ়ভূমির মানুষের আচার-ব্যবহার, ভূমির অবস্থান ও পথঘাঁটের বিষয়ে এই গ্রন্থটি থেকে জানা যায়।[৭৫] এই অঞ্চলের দুর্গম জঙ্গল ও মানুষের অশন-বসন যেগুলির একটিও মহাবীর জৈনের রুচিকর বোধ হয়নি।

পাল রাজাদের সময়ে বৌদ্ধতান্ত্রিক দর্শন ও ন্যায়ের বিশেষ উত্থান ঘটেছিল। এই লেখকদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন জৈনভাবালম্বী, কয়েকজন বৌদ্ধভাবনার দ্বারা প্রভাবিত লেখকগোষ্ঠী। জৈন লেখক ইন্দ্রভূতি যাকে আবার কোথাও কোথাও উল্লেখ করা হয়েছে গৌতম ইন্দ্রভূতি (গৌতম উপাধি) নামে। এই মহান মনীষীর সময়কাল হয়েছিল আনুমানিক ৬০৭-৫১৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। তিনি ছিলেন মগধবাসী এবং মূলত অর্ধমাগধী ভাষাতে সাহিত্যচর্চা করেছেন। যার পরবর্তীকালে বিক্রমাদিত্যের গুরু

সিদ্ধসেন দিবাকর ন্যায়শাস্ত্রকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছিল। এই সিদ্ধসেনকে নিয়ে নানা মতবিরোধ তৈরি হয়েছিল। কিছু সমালোচক অনুমান করেছেন - এই সিদ্ধসেন আসলে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম ব্যক্তি ক্ষপণক। নবম শতাব্দীর দিগম্বর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বিদ্যানন্দ। যিনি *আপ্তমীমাংসালঙ্কৃতি* নামক গ্রন্থে সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, অদ্বৈত, মীমাংসক, সুগত, তথাগত, ভিঙ্গান, ধর্ম্মকীর্ত্তি, প্রজ্ঞাকর, শবর স্বামী ভর্তৃহরি প্রভৃতি বহু হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থকারদের মতামত নিয়ে এই গ্রন্থে ন্যায়ের বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। তিনি পূর্বপ্রচলিত সকল মতাদর্শকে ভেঙে ফেলে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। জিনসেনের *আদিপুরাণ* নামক গ্রন্থে (৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ) বিদ্যানন্দের রচিত ন্যায়গ্রন্থের প্রশংসা করেছিলেন। পৌরাণিক যুগ থেকে শুরু করে ষোড়শ শতক এই সময়কালের মধ্যে আরও যেসকল ন্যায়ায়িকের নাম পাওয়া গেছে তারা গুজরাট, কাশ্মীর, উজ্জয়িনী এই স্থানগুলিতে বসবাস করত। বঙ্গদেশে জৈনদের যথেষ্ট প্রতিপত্তির কথা জানা যায় প্রাপ্ত গ্রন্থগুলি থেকে। এই বৃহৎ স্তরে জৈনপ্রভাব বঙ্গদেশ থেকে লোপ পেয়েছে। জৈন বিদ্বেষী হিন্দুরা এতটা জৈনদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল যে তাদের সরিয়ে দিয়ে, তাদের মন্দির নষ্ট করে ক্ষান্ত হয়েছে। পালিতে লিখিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ন্যায়গ্রন্থের মধ্যে *মিলিন্দ প্রশ্ন* (১০০ খ্রিস্টাব্দ) রাজা মিনাণ্ডারের সঙ্গে ভিক্ষু নাগসেনের তর্ক-বিতর্ক এখানে লিপিবদ্ধ করা রয়েছে। রাজসাহী জেলার ক্ষত্রিয়কুলের বৌদ্ধ চন্দ্রগোমিন ছিল বেশ খ্যাতিসম্পন্ন একজন নৈয়ায়িক। তিনি অশোক-আচার্য্য নামক বৌদ্ধগুরুর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিল। শান্তরক্ষিত (৭৫০-৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ) নামক বাঙালী বৌদ্ধ যিনি স্বভাবপরীক্ষা, ইন্দ্রিয়পরীক্ষা, উভয়পরীক্ষা ও প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রচনা করেছিল। এই মহান পণ্ডিত নালন্দায় শিক্ষকতা করে খ্যাতি অর্জন করেছিল। শান্তরক্ষিতের শিষ্য কমলশীল যে তন্ত্রশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিল। এই সকল বৌদ্ধ ও জৈন প্রাচীন বাঙ্গালার কথা তুলে এনে ভারতের ইতিহাসকে খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। ইউরোপীয় চিত্রকলার মতো ভারতীয় চিত্রকলা যে শুধুমাত্র শিল্পীর উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা বৃত্তি মাত্র নয়। একথা প্রমাণ করে বলার চেষ্টা করা যেতে পারে - ভারতীয় শিল্পীর নিকট এই চিত্রকলা জাতিগত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে। ভারতবর্ষ নামক দেশের প্রাচীনস্তর থেকে সকল স্তরের সাহিত্যের উন্মেষ হয়েছিল ধর্মকে আশ্রয় করে। ধর্মকথাগুলিকে বহন করতে গিয়ে যুগে যুগে নতুন ভাষা ও নতুন সাহিত্যগুলি সভায় আসন পেতে শুরু করেছিল। বাঙ্গালা ভাষার বিষয়ে এই

রীতিকে মেনে চলেছিল। বাংলা ভাষা যখন সদ্যজাত, এই বাংলাভাষার রূপ যখন অত্যন্ত অপরিণত তখন সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করে বাঙালি কবি পণ্ডিতেরা সাহিত্যচর্চা করত। যারা শিক্ষিত ও অভিজাত সমাজের বিপরীতে গিয়ে সাহিত্যচর্চায় ইচ্ছুক ছিল তারা অশিক্ষিত জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় গল্প-গান-ছড়া রচনা করত। এইভাবে প্রথমে বৌদ্ধ ও শৈব সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা সাহিত্যে প্রথম অনুশীলিত হয়েছিল। প্রাচীন মগধ প্রদেশে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হলেও, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রভাব কাটিয়ে সেগুলি একদিন বঙ্গদেশকে আলোড়িত করেছিল। সঠিক সাল-তারিখ জানা না গেলেও অনুমান করা যায় গৌতমবুদ্ধ জীবিত থাকতে বঙ্গদেশে এই ধর্মের বিস্তার ঘটিয়েছিল। মৌর্য্য ও গুপ্তযুগে বৌদ্ধধর্মের যেসকল ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল সেগুলি ধীরে ধীরে শেষের দুই যুগ ধরে বাঙ্গলার নিজস্ব ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল। এখন ভারতবর্ষের সমতল ভূমি থেকে বৌদ্ধধর্ম অন্তর্নিহিত হয়ে গেছে এবং হিন্দুধর্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই হিন্দুধর্ম প্রাচীন বৈদিকধর্ম থেকে পৃথক। এই ধর্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৌদ্ধধর্ম ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে। প্রথম স্তরে বঙ্গদেশের ধর্মের সঙ্গে আগত বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যেসকল ভিন্নতাগুলি চোখে পড়েছিল। সেগুলি ওই দুই ধর্মের মানুষের বিভাজনকে বেশিদিন স্থায়ী করতে পারেনি। অন্তরে উভয় ধর্মের অন্তঃস্থলে সমন্বয়কে বেশি করে সংঘটিত করেছে। যা বেশি করে ধরা পড়েছে পাল রাজাদের রাজত্বকালে। পাল রাজাদের সময় থেকে বঙ্গদেশে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে স্থানীয় কতকগুলি লৌকিক ধর্ম-সংস্কারের সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়।[৭৬] সমালোচকরা উল্লেখ করেছেন বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সুসদৃশ সন্তান। এই প্রসঙ্গ থেকে উঠে আসে হিন্দু-বৌদ্ধ সমন্বয়ের কথা। হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে সামগ্রিক অর্থে একটা সম্প্রীতির ভাব ছিল যা সমকালীন সাহিত্য, শিল্পকলার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সেন রাজাদের রাজত্বকাল একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী এই সময়ে গুপ্তযুগের উদার হিন্দুধর্মের স্থলে জাত্যাভিমানী প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ণব্যবস্থার ফলে সমাজের উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের মানুষের সামাজিক দূরত্ব তৈরি হয়। ফলে উচ্চবর্ণের দেবদেবী ও নিম্নবর্ণের দেবদেবীতে ভাগ হয়ে যায়। এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম তৎকালীন বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার সম্মুখীন হয়ে গিয়ে বিভিন্ন আদর্শের দিক থেকে আবার নূতন সংস্কৃতি লাভ করতে থাকে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে আস্থা রেখে ভারতবর্ষে একসময় বিভিন্ন লৌকিক ধর্মমতগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজের ওপর মূল হিন্দুধর্মের প্রভাব যত

প্রবল হতে থাকে এই বিভিন্নমুখী লৌকিক ধর্মসম্প্রদায়গুলি ততটা এক কেন্দ্রগত আদর্শের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে এসেছিল। এইসময়ে সমাজে ক্রমে পুরাতন ধর্ম-বিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে নবাগত আদর্শের উপর মানুষের আশা ও আশ্বাস স্থাপিত হতে থাকে। রক্ষণশীল এই সমাজ পুরাতনকে একেবারে পরিত্যাগ করি উঠতে পারে না। তারা নূতনকে যেভাবে গ্রহণ করেছিল সেগুলি পুরাতনের রূপান্তর হয়ে দাঁড়ায়। পাল রাজাদের আমলে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে লৌকিক ধর্মের মিশ্রণ যেভাবে স্পষ্ট হয়েছিল। সেখান থেকে অনুমান করা যায় এই দুই সমাজের গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়া আরও পূর্ব থেকে শুরু হয়েছিল। তুর্কী আক্রমণ এখানে শুধুমাত্র অণুঘটকের কাজ করেছিল। এইজন্য মিশ্র কতকগুলি লৌকিকধর্ম যেমন স্পষ্টরূপ পায় তেমনি কিছু মিশ্রসত্ত্ব দেবতাদের উদ্ভব হয়। বৌদ্ধতান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের দেবতারা অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে লৌকিক জনজীবনের সংস্কার, বিশ্বাস, পূজার্চনার মধ্যে নিজেদের প্রতিস্থাপন করে। নিজেদের বিলোপের হাত থেকে রক্ষা করে। এই নূতন পুরাতনের মিশ্রণের ভাবনায় উৎপন্ন দেবতারা নাম পেয়েছিল 'মিশ্রসত্ত্ব দেবতা'। যাদের আমরা বাংলাসাহিত্যের ভাষায় মঙ্গলকাব্যের দেবতা হিসেবে পরিচয় পেয়ে থাকি। যারা পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে স্থান করে নিতে থাকে। ব্রাহ্মণযাত্রার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাত্রা হিসেবে প্রাচীন ভারতবর্ষের সময়কাল থেকে চলে আসছে ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারে নিঃস্বার্থে বিদেশ যাওয়া। বাংলাদেশ থেকে পূর্বে এইরূপ বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রচারের আশায় লোক পাঠানো হত। বাংলাদেশ একসময় যখন বৌদ্ধধর্মের প্লাবনে ভেসে গিয়েছিল, তার পূর্বে জৈনধর্মের ভূমি ছিল বাংলাদেশে। বিশেষ করে পৌণ্ড্রবর্ধনে জৈনধর্মের প্রাধান্য বেশি ছিল। পাহাড়পুরে জৈনধর্মের মন্দির যা পূর্বকাল থেকে ছিল। দিব্যাবদান গ্রন্থে পৌণ্ড্রবর্ধনে জৈনদের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা রয়েছে। হিউয়েন সাং বর্ণিত আজীবকদের সঙ্গে জৈনদের অনেক মিল ছিল। এই দুই মতকে ঘিরে দ্বন্দ তৈরি হয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থগুলি বঙ্গদেশে জৈনদের প্রাদুর্ভাবের কথা অনুমান করা যায় –

> পূর্বেও বলা হইয়াছে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের পূর্বে জৈন মতেরই প্রাদুর্ভাব ছিল। বাঁকুড়া, মানভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় অর্থাৎ রাঢ় দেশে জৈন মূর্তি সর্বত্র পাওয়া যায়। পুরুলিয়া হইতে পাঁচ মাইল দূরে ছররা গ্রামে ১৯১৮ সালে চুনীবাবু ও ডাক্তার এ. ব্যানার্জী শাস্ত্রী অনেকগুলি মূর্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। দামোদর নদীর ধারে বাঁকুড়ার শেষ সীমায় তেলকুপী গ্রামে খুব বিরাট বিরাট জৈনমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। হয়তো সেখানে কোনো জৈন বিহার বা তীর্থস্থান ছিল। মানভূম পাতকুমে নদীতীরে দেখা যায় চারিদিকে শুধু পাষাণ মূর্তি। তাহার মধ্যে অধিকাংশই হইল জৈন তীর্থংকরদের।[৭৭]

পঞ্চকোট রাজ্যে কিছু জৈনমূর্তি পাওয়া যায় যেগুলি হিন্দুধর্মের দেবতারূপে পূজা পেয়ে চলেছে। এইমূর্তিগুলির পূজা করে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা। মূর্তিগুলির নীচে বর্তমানেও জৈনলেখ্য রয়েছে। এই মূর্তিগুলির সামনে এখন পশু বলি দেওয়া হয়। এই ঘটনাগুলি হিন্দু-বৌদ্ধ সমন্বয়ের মতবাদ বঙ্গদেশে হিন্দু ও জৈন সমন্বয়ের কথা প্রমাণ করে।

বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল একসময়ে বিস্তৃতভাবে। বৌদ্ধধর্মের এই প্রসারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে বলে জানা যায়। সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারকারী বিজয় সিংহ এই নামটি ঐতিহাসিকভাবে স্মরণীয় হয়ে উঠেছে –

> সংযুক্তিনিকায়ে ভগবান বুদ্ধের বাংলা দেশের অন্তর্গত শেতক নামক নগরে কিছুদিনের জন্য অবস্থান ও বাঙালি বৌদ্ধচার্য বঙ্গীশের উল্লেখ আছে। অঙ্গুরত্তরনিকায়েও বঙ্গান্তপুত্ত নামক এক জন বাঙালি বৌদ্ধ ভিক্ষুর কথা জানা যায়।[৭৮]

দিব্যাবদান গ্রন্থে বর্ণিত আছে বুদ্ধভক্ত শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ তার কন্যা সুমাগধাকে বিয়ে দিয়েছিল বাংলা দেশের অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্ধনের একজন জনৈক যুবকের সঙ্গে। কথিত আছে সুমাগধার শ্বশুরালয়ের সকলে ছিলেন নির্গ্রন্থ। তাদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালে। গৌতমবুদ্ধ নিজে তখন আমন্ত্রণ রক্ষার্থে বঙ্গদেশে এসেছিল। এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায় ক্ষেমেন্দ্র রচিত *বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা* নামক গ্রন্থে। সুমপা রচিত *পাক-সম-জোন-জং* নামক বৌদ্ধগ্রন্থে মগধভদ্র নামক একজন জনৈক ব্যক্তির গৌতমবুদ্ধকে পুণ্ড্রবর্ধনে আসার আমন্ত্রন জানানোর কথা পাওয়া যায়। সম্রাট আশোকের সময়কালে তিনি যে স্তূপগুলি নির্মাণ করেছিল তার কোনো চিহ্ন বঙ্গদেশে এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় শতকে রচিত ললিতবিস্তরে বঙ্গলিপির উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্ষেমেন্দ্র রচিত গ্রন্থ থেকে বঙ্গে জৈনধর্মের প্রচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেসময় বঙ্গে জৈনদের অবস্থা তেমন কিছু ভালো ছিল না। মানুষ তখন পূর্ব প্রচলিত জৈনধর্ম ছেড়ে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করেছে। গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে জৈনদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করতে গৌতম বুদ্ধকে বঙ্গে আহ্বান করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের ন্যায় জৈনধর্ম গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের সত্যতা যাচাই করে নিতে সাহায্য করে এই বৌদ্ধ ও জৈনযুগের সমকালীন লেখকগোষ্ঠী। রাজা বিম্বিসার সম্পর্কে বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে জানা যায় - তিনি বাংলাদেশের সীমানায় অবস্থিত রাজা অংগের সঙ্গে যথেষ্ট সৌহার্দ্যপূর্ণ সদব্যবহার করতেন বলে জানা যায়। এই

অংগ রাজ্যের রাজধানী ছিল চম্পা। রাজা বিম্বিসারের শেষ জীবনের দুর্গতি ঘটিয়েছিলেন তার পুত্র অজাতশত্রু। এই বর্ণনাগুলি থেকে রাজা রামচন্দ্রের অস্তিত্বের কথা জানা যায় -

> বিম্বিসার ও অজাতশত্রু রাজত্ব সম্বন্ধে যে সব বিবরণ পাই তাতে তাঁরা যে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করেছিলেন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে নীতি হল গঙ্গার তীরবর্তী যতটা সম্ভব অঞ্চল অধিকার করে নেওয়া। মনে হয় ভারতের ইতিহাসে তাঁরাই প্রথম নৃপতি যাঁরা বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গঠনের কথা চিন্তা করেছিলেন। অবশ্য এমন ধারণা প্রচলিত যে তাঁদের আগেও একাধিক রাজচক্রবর্তী ছিলেন যাঁদের আধিপত্য ছিল এক সমুদ্রতীর থেকে আর সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত সারা দেশ জুড়ে। কিন্তু ছায়ার মতো অস্পষ্ট এই রাজচক্রবর্তীরা প্রায় সুনিশ্চিতভাবেই পরাক্রান্ত মৌর্যদের স্মৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত গল্পকারদের অত্যুক্তি-প্রসুত। গল্প ও উপকথার এই সব নায়ক—রাম তাঁদেরই একজন—বুদ্ধপূর্ব যুগের ঐতিহাসিক চরিত্র তো নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁদের বিপুল জয়যাত্রা ও অসামান্য বিজয়গৌরবের কোনো ঐতিহাসিক সাক্ষ্য আমাদের জানা নাই।[৭৯]

ধর্মীয় কারণে লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক তত্ত্বকে তুলে ধরার জন্য লিখিত না হলেও, গ্রন্থ মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে তথ্য খুঁজে বার করা যায়। বৌদ্ধ ও জৈন এই প্রতিবাদীধর্ম দুটির উদ্ভব ও বিকাশ শুধুমাত্র সমকালীন সমাজের ধর্মীয় পরিবেশের বিরুদ্ধে ছিল না। এমনকি সমাজের মৌলিক পরিবর্তনগুলিকে মানিয়ে নিতে নতুন সমাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। এই পরিবর্তন এসেছিল প্রধানত অর্থনীতির হাত ধরে। এই অর্থনীতির সঙ্গে সমাজের ধর্মীয় ও দার্শনিক পরিকাঠামোর যোগসূত্র, নতুন ধর্মব্যবস্থার যেমন আগমন ঘটিয়েছিল। সময়োপযোগী নতুন নিয়ম-কানুন চালু করেছিল। জাতিভেদ প্রথার কড়াকড়ির জন্য ব্রাহ্মণরা সমাজের সকল মর্যাদার আসনগুলি দখল করে আরাম-আয়েশে দিনাতিপাত করতে শুরু করেছিল। ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে দুই ক্ষত্রিয়ের আহ্বানে সারা দিয়ে মানুষ নতুন করে জেগে উঠতে চেয়েছিল। তারা ব্রাহ্মণ শাসিত দীর্ঘস্থায়ী সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। এই ভাবনার সঙ্গে অব্রাহ্মণদের ভাবনার মিলন ঘটেছিল। দলে দলে মানুষ এই দুই ক্ষত্রিয় মানবের পাশে এসে দাঁড়াতে শুরু করেছিল -

> জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান আদর্শ ছিল অহিংসা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধিসাধন। এছাড়া, বুদ্ধদেব জাতিভেদহীন সমাজের কথা ঘোষণা করেছিলেন। কেবল যে সমাজে সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে সম্পদশালী বণিকরা পিছিয়ে ছিল তাই ন্য, বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বহু বিধিনিষেধ তাদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। অথচ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে তাদের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল মতবাদ প্রচলিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৈদিক ধর্মসূত্রগুলিতে টাকা ধার ও সুদের ব্যবসাকে ঘৃণার চোখে দেখা হত। সুদগ্রাহীতার হাতে ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল।[৮০]

বাণিজ্যলক্ষ্মীর কল্যাণে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতক থেকে বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসেবে অর্থলগ্নীর কারবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। জৈন এবং বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে সুদের ব্যবসাকে তেমন খারাপ নজরে দেখা হত না। এখানে সমাজের ব্যাবসা-বাণিজ্যের বারবারন্তের জন্য বেশ প্রশংসামূলক প্রশস্তি রচনা করা হয়েছে। সুদে অর্থবৃদ্ধির বিষয়ে কোনো ঘৃণাসূচক বাক্য রচনা করেনি। বৈদিক গ্রন্থগুলিতে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার ব্যাপারে যেসকল বিধিনিষেধ তৈরি করেছিল। যেমন - বৌধায়ণ তার ধর্মশাস্ত্রে সমুদ্রযাত্রাকে পাপ বলে উল্লেখ করেছে। এই বিষয়ে গৌতমবুদ্ধ আশ্বাসবাণী শুনিয়ে ছিলেন মানুষকে। যার উল্লেখ রয়েছে প্রাকপর্বের বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে। বৈদিক ধর্মের এইসকল কঠোর নিয়ম-কানুনের বেড়াজালকে কাটিয়ে উঠতে অব্রাহ্মণরা বিশেষ করে বৈশ্য এবং বণিকশ্রেণীর মানুষেরা। পূর্বতন ধর্মীয়ব্যবস্থাকে ত্যাগ করে নবআগত ধর্মীয়ব্যবস্থাকে বরণ করে নিয়েছিল।

এই দুই বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রভাব পরবর্তী হিন্দুধর্মের মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে। যার বেশিরভাগটা প্রমাণ পাওয়া যায় উভয় ধর্মের দৈবীভাবনার মধ্যে। বঙ্গদেশে বিভিন্ন সময়ে একাধিক ধর্মের আগমন হয়েছে। সেই ধর্মগুলি কিছুকাল স্থায়ী হলেও একসময় সেই ধর্মীয়ভাবনার অবসান ঘটেছে। পুরোনো ভাবনাগুলি নতুনধর্মীয় ভাবনার মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস খুঁজতে গেলে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস থেকে প্রথমে বাংলাদেশে ধর্মের ইতিহাস খুঁজে বার করে। সেখানে ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ইতিহাস উঠে আসে। যেখান থেকে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যগুলি চিহ্নিতিকরণ সম্ভব হয়।

২. ৫) উপসংহার:

বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের রচনার জন্য মধ্যযুগের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটাতে মঙ্গলকাব্যের প্রয়োজনীয়তা যেমন গুরুত্ব রাখে। প্রাচীন যুগের সঙ্গে পাঠকের পরিচিতি বৃদ্ধি করতে বৌদ্ধ ও জৈনযুগের ধর্মীয়সাহিত্যগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে। খ্রিস্টপূর্ব সময়ে যখন বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম দুটির প্রচলন হলেও, জৈনধর্ম ভারতবর্ষের বাইরে খুব একটা বিস্তার লাভ করতে পারেনি। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের বাইরে সমগ্র এশিয়া মহাদেশকে আলোড়িত করতে পেরেছিল। উভয় ধর্মের উৎসস্থল ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলগুলি। প্রাচীনযুগের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের তুলনায় জৈনধর্মের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা যথেষ্ট পাওয়া না। বর্তমান ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের তুলনায় জৈনধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য বেশি দেখা যায়।

গৌতমবুদ্ধ দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে ধর্ম প্রচার করেন। তার মৃত্যুর পর তার এই ধর্মমত আরও বেশি খ্যাতি পেয়েছিল। প্রাচীন ভারতে প্রথমে বৈদিক যুগের সূচনা হয়। যেখানে কিছু মানুষ শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থে সমাজের নিয়ম-কানুনের বহর বাড়িয়ে তোলে। এই বৈদিক নিয়মের দ্বারা শোষিত সমাজ পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে। এই পরিবর্তন আসে বৈদিক ধর্মের বিরোধী দুই ধর্ম। যারা খ্রিস্টপূর্ব সময় থেকে শুরু করে খ্রিস্টপরবর্তী দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল। বিদেশী আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। যেখানে হিন্দুধর্ম নামে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটে। এই ধর্মসম্প্রদায় নিজেকে প্রাচীন সনাতনধর্মের অংশ বিশেষ বলে নিজের পরিচিতি বৃদ্ধি করতে থাকে। একসময়ে সমাজ রক্ষার জন্য বৈদিকধর্মের বাইরে অন্য কোনো বিরোধী ধর্মের প্রয়োজন লক্ষ করা গিয়েছিল। বৌদ্ধ ও জৈন এই দুই ধর্মের দীর্ঘকাল অবস্থানের পর তাদের কলুষিত হয়ে ওঠা সমাজ থেকে মানুষ পরিত্রান পেতে অন্যধর্মের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাচীন ও মধ্যযুগ ধরে রাজত্ব করে যাওয়া এই তিন ধর্মমতকে একত্রে পাশাপাশি দাঁড় করালে প্রথমে আসে বৌদ্ধ ও জৈন যুগ এবং হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ। এই দুটি যুগের বিভাজনের ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস কিছুটা স্পষ্ট রূপ পেয়ে যায়। যা সমগ্র ভারতবাসীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বের।

টীকা

১) ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (১৪১৯)। *বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম* । কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ। পৃ. ৪৫।

২) রামচরিত: রামপালদেবের পুত্র মদনপালদেবের মন্ত্রী সন্ধ্যাকর নন্দী এই *রামচরিত* নামক কাব্যটি রচনা করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তালপাতায় লেখা রামচরিত পুথিটি আবিষ্কার করেন। এই কাব্যের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকাহিনি এবং রাজা রামপালের জীবনকাহিনি দ্ব্যর্থক অর্থে একত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। পুঁথির শেষাংশে কবি নিজের আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। যেখান থেকে বেশ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার সন্ধান পাওয়া গেছে। একটি শ্লোকে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘের বর্ণনা করা হয়েছে।

সূত্র: সেন, সুকুমার (১৯৪০)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* । আদি হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্য্যন্ত। কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী। পৃ. ১৭-২০।

৩) জয়দেবের গীতগোবিন্দম্: গীতগোবিন্দম্ কাব্যটি গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছিলেন, গ্রন্থটির রচনাকাল দ্বাদশ শতকে। নবরসিক জয়দেব এই কাব্যে শৃঙ্গার রসের মাধুর্যব্যঞ্জক বর্ণযুক্ত বৈদর্ভী রীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। কাব্যটির বারোটি সর্গে যথা – সমোদদামোদর, সক্লেশকেশব, মুগ্ধ মধুসূদন, স্নিগ্ধ মধুসূদন, সাকাংক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ, কুণ্ঠবৈকুণ্ঠ, নাগরনারায়ণ, বিলক্ষলক্ষ্মীপতি, মন্দমুকুন্দ, চতুর চতুর্ভুজ, সানন্দ দামোদর, সুপ্রীতিপীতাম্বর।

সূত্র: চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ (সম্পাদিত) (১৩৬৬)। *জয়দেব ও গীতগোবিন্দ* । কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর। পৃ. ১-২৯৯।

৪) কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়: এই গ্রন্থের সংকলনকর্তা ছিলেন বৌদ্ধরা এমনটা অনুমান করা যায়। এই গ্রন্থের একেকটি শ্লোক সংগ্রহের নাম ব্রজ্যা। প্রথমে সুগত ব্রজ্যা, তারপর লোকেশ্বর বা অবলোকিতেশ্বর ব্রজ্যা, এরপর হরি ব্রজ্যা ও সূর্যব্রজ্যা প্রভৃতি। গ্রন্থের সংগ্রহকর্তার নাম পাওয়া যায়নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুথিটি নেপাল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। এই গ্রন্থে বেশ কিছু বাঙালি রচয়িতার নাম পাওয়া যায়, যথা - বীর্যমিত্র, শ্রীধর নন্দী, অভিনন্দ গৌড়, মধু শীল ও প্রভৃতি।

সূত্র: সেন, ক্ষিতিমোহন (১৯৫৮)। *চিন্ময় বঙ্গ* । কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ১১৩-১১৪।

৫) সদুক্তিকর্ণামৃত: কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় কাব্য রচনার কিছু দিন পরে রচিত হয় *সদুক্তিকর্ণামৃত* নামক গ্রন্থটি। যেখানে রয়েছে মূলত কিছু শ্লোকসংগ্রহ, যেগুলি যত্নসহকারে সংগ্রহ করেছিলেন লক্ষণসেনদেবের মহাসামন্তচূড়ামণি বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাস। গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ১১২৭-১২০৫ খ্রিস্টাব্দ এই সময়কালের মধ্যে। এই কাব্যের মধ্যে জয়দেব, উমাপতি ধর, শরণ, আচায্য গোবর্ধন, ধোয়ী ও লক্ষণসেন প্রভৃতি ব্যক্তিদের নামের উল্লেখ করা হয়েছে। কেশবসেন ও যুবরাজ দিবাকর ছাড়াও আরও বাঙালী ব্যক্তিদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সূত্র: তদেব। পৃ. ১৭-২০।

৬) প্রাকৃত-পৈঙ্গল: অপভ্রংশ ছন্দের লক্ষণবিচার বিষয়ক গ্রন্থ হিসেবে *প্রাকৃত-পৈঙ্গল* গ্রন্থটি পরিচিতি পায়। আনুমানিক চতুর্দশ শতকে গ্রন্থটি লিখিত হয়েছিল। প্রাচীন অর্বাচীন অপভ্রংশ ভাষায় এখানে অধিকাংশ কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল। এখানে বেশ কিছু কবিতায় প্রাচীন হিন্দিভাষার প্রয়োগ লক্ষ করা গেছে। এই গ্রন্থের রচয়িতাদের মধ্যে বাঙালীদের নাম উঠে আসে।

সূত্র: তদেব। পৃ. ৩০-৩২।

৭) ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০০)। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*। কলকাতা: এ. মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১১।

৮) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন: বড়ুচণ্ডীদাস নামে একজন মধ্যযুগীয় কবি *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* নামক এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। যেখানে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথাকে মূল বিষয়বস্তু ধরে একটি আখ্যানকাব্য রচনা করেছিলেন। ১৯০৯ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে অযত্নরক্ষিত

অবস্থায় এই কাব্যের একটি পুথি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ সালে তারই সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* নামে পুথিটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

সূত্র: ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পাদিত) (২০১৬)। *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ১৭৫-২০০।

৯) ইউসুফ-জোলেখা: বাংলাসাহিত্যের রোমান্টিক কাব্যধারার মধ্যে ইউসুফ-জুলেখা কাব্যটি বেশ গুরুত্ব রাখে। পনেরো শতকে শাহ মুহম্মদ সগীর এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪১০) সভাকবি। কুরআনে ইউসুফ-জোলেখার প্রেমকাহিনি আল্লাহর মহিমা প্রচারের নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর, গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৯৩-১৪০৯ খ্রিস্টাব্দ) ইউসুফ-জোলেখা কাব্যটি রচনা করেছিলেন।

সূত্র: গনী, ওসমান (২০০০)। *ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি*। কলকাতা: রত্নাবলী। পৃ. ৭৫।

১০) শূন্যপুরাণ: ধর্মপূজা বিষয়ক গ্রন্থ রচনাকারী মধ্যযুগের বাঙালি কবি হলেন রামাই পন্ডিত। আনুমানিক ১৩০০-১৪০০ খ্রিস্টাব্দ এই সময়কালের মধ্যে কবির জন্ম হয়েছিল। *শূন্যপুরাণ* নামক গ্রন্থটির সময়কাল ও সঠিকভাবে নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। রামাই পণ্ডিত রচিত এই গ্রন্থে প্রথম ধর্মপূজা নিয়ে বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত গ্রন্থটির নাম ছিল *ধর্ম্মপূজা পদ্ধতি*। এই গ্রন্থের মধ্যে ধর্ম পূজার আড়ালে বৌদ্ধ ধর্মের উল্লেখ রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। রামাই পন্ডিত রচিত এই ধর্ম পূজার শাস্ত্র গ্রন্থ – শূন্যপুরাণে বৌদ্ধ ধর্মীয় তত্ত্বের গ্রন্থ, এমনটাও মনে করা হয়।

সূত্র: সেন, সুকুমার (১৯৪০)। তদেব। পৃ. ৬৫০-৬৫৩।

১১) সেক শুভোদয়া: হলায়ুধ মিশ্র রচিত কাব্য হল সেক শুভোদয়া। দ্বাদশ শতকে কাব্যটি রচিত হয়েছিল। হিন্দু দেবদেবীর গীত বিষয়ক কিছু গীত পাওয়া যায় এখানে, পীরগাথা এখানে পাওয়া যায়। পীরের উদ্দেশ্যে মানত করার প্রক্রিয়া এবং বিপদে আপদে পীরের কাছে প্রথমে যাওয়া এই রীতিগুলির এখানে স্পষ্টাকারে ব্যাখ্যা করা রয়েছে।

সূত্র: সেন, সুকুমার (১৪২৩)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ৩৯৭।

১২) শাস্ত্রী, শ্রীতীর্থপতি (সম্পাদিত) (২০১৮)। *খনার বচন*। কলকাতা: সাহিত্য তীর্থ। পৃ. ৯।

১৩) ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০০)। তদেব। ৬২-৬৩।

১৪) দাশগুপ্ত, তমোনাশ (১৯৫১)। *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৮৮।

১৫) বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী* । কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ২৯।

১৬) ভট্টাচার্য, সুকুমারী (২০১২)। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: গাঙচিল। পৃ. ১৪।

১৭)বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। তদেব। পৃ. ৩২৩।

১৮) দুর্গাকিঙ্কর (১৩৭৭)। *সভ্যতা ও ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ* । প্রথম অধ্যায়। কলকাতা: পাবলিসিটি প্রিন্টার্স। পৃ. ৩৬৭।

১৯) গোস্বামী, অচ্যুত (১৯৬১)। *বাংলা উপন্যাসের ধারা*। কলকাতা: পাঠভবন। পৃ. ১৪।

২০) মুখোপাধ্যায়, নিশীথ (সম্পাদিত) (২০১৫)। *রায়গুনাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল*। কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ। পৃ. ১৩৩।

২১) চৈতন্য-ভাগবত: বৈষ্ণব সন্ত কবি বৃন্দাবন দাস ঠাকুর (১৫০৭–১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দ) রচিত চৈতন্য মহাপ্রভুকে ঘিরে একটি জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছিল যার নাম হল চৈতন্যভাগবত কাব্য। এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম চৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ। এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জীবন বৃত্তান্ত এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের

প্রবর্তকরূপে তার ভূমিকার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। গ্রন্থে রাধা ও কৃষ্ণের যুগ্ম অবতাররূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তসমাজে প্রচলিত চৈতন্যদেবের অবতার তত্ত্বের ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

সূত্র: সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (১৯৮৩)। *কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত লঘু সংস্করণ*। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমী। পৃ. ৭- ২২।

২৩) চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত) (২০১২)। *বাংলার ব্রত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর*। কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ। পৃ. ১৫।

২৪) গিরি, সত্যবতী (২০০৭)। তদেব। পৃ. ৫৬।

২৫) বিদ্যাবিনোদ, কালীকিশোর ও চৌধুরী সুরেশ (সম্পাদিত) (২০১৭)। *বৃহৎ বারোমেসে মেয়েদের ব্রতকথা*। কলকাতা: অক্ষয় লাইব্রেরী। পৃ. ১৩২।

২৬) নস্কর, সনৎকুমার (সম্পাদিত) (২০১৫)। *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল*। কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ। পৃ. ১৪-১৬।

২৭) ভট্টাচার্য, সুকুমারী (২০১২)। তদেব। পৃ. ৩৩।

২৮) সেন, সুকুমার (১৯৯৯)। *বঙ্গ ভূমিকা* । কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি।পৃ. ১১০।

২৯) চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ ও সেন, সুনীল (২০১২)। *প্রাচীন যুগের কথা*। কলকাতা: অনুষ্টুপ। পৃ. ১০৪।

৩০) চট্টোপাধ্যায়,সুনীল (২০০৮)। *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ১৮০।

৩১) আচারাঙ্গসূত্র: এই গ্রন্থ থেকে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহাবীরের রাঢ়দেশের ভ্রমণের কাহিনি জানতে পারা যায়। এই দেশে এসে তিনি যে সকল কঠিন পরিস্থিতি ও অপমানজনক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় *আচারাঙ্গসূত্র* নামক এই গ্রন্থ থেকে। আচারাঙ্গসূত্র মতে, মহাবীর ছিলেন সর্বদর্শী। এই গ্রন্থে ষষ্ঠীধারী সন্ন্যাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায় যাদের আজীবকগোষ্ঠীর সন্ন্যাসী বলে অনুমান করা হয়।

সূত্র: ঘোষ, তপনকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮)। *বাংলা ভাষায় জৈনধর্ম চর্চা*। কলকাতা: প্যাপিরাস। পৃ. ৬৬।

৩২) কল্পসূত্র: কল্পসূত্র হল একটি জৈন ধর্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থে জৈন তীর্থঙ্করদের জীবনী এবং পরবর্তীকালে জৈনধর্মের বিভিন্ন শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়। তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের জীবনী এই গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের অন্তর্গত জৈন সাহিত্যের ছয়টি শাখার মধ্যে কল্পসূত্র গ্রন্থটিকে অন্যতম চেদসূত্র মনে করা হয়। এই গ্রন্থের রচয়িতা হলেন ভদ্রবাহু। তার গ্রন্থে বর্ণিত গোদাস গণের উল্লেখ থেকে যে সকল শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে চারটি শাখার নাম বঙ্গদেশের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। যেগুলি হল - তাম্রলিপ্তিয়া তমলুক সহর, কোটিবর্ষিয়া দিনাজপুরের নিকটস্ত বানগড়, পুণ্ড্রবর্দ্ধনিয়া বগুড়ার নিকটস্থ মহাস্থান গড় এবং দাসী খর্বটিয়া মেদিনীপুরের নিকটস্থ খর্বট। এই বর্ণনাগুলি থেকে বঙ্গদেশে জৈনধর্মের বিস্তৃতিলাভের সাফল্যতার দিকটি ধরা পড়ে।

সূত্র: তদেব। পৃ. ৫৮।

৩৩) ত্রিষষ্ঠি-শকল-পুরুষ-চরিত্র: ত্রিষষ্টি-শলাকা-পুরুষ-চরিত্র বা চৌষট্টি মহৎ ব্যক্তির জীবনী, চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর এবং শলাকা পুরুষ নামে পরিচিত জৈনদর্শনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা গুলিকে একত্রে এই জীবনী মূলক গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে তাদের সন্ন্যাসগ্রহণ ও জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিলাভের ইতিবৃত্তের সঙ্গে সঙ্গে জৈন প্রভাবের কিংবদন্তীমূলক ঘটনাগুলির বিস্তারিত জানানো হয়েছে। গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন দেবচন্দ্রের শিষ্য হেমচন্দ্র সূরি। তিনি কলিকালসর্বজ্ঞ উপাধি লাভ করেছিলেন।

সূত্র: ভট্টাচার্য, অমিত (সম্পাদিত) (১৪১৫)। *সায়ণ মাধবীয় সর্বদর্শনসংগ্রহ চার্বাক-বৌদ্ধ-জৈনদর্শন*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। পৃ. ১৭০।

৩৪) তদেব। পৃ. ১৬৩।

৩৫) চট্টোপাধ্যায়, সুনীল (২০০৮)। *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*। প্রথমখণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গরাজ্যপুস্তকপর্ষৎ। পৃ. ৯৪।

৩৬) সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ: জৈন সন্ন্যাসীরা বছরে আটমাস পরিব্রাজকের জীবনযাপন করেন এবং বর্ষাকালের চারমাস চতুর্মাস উপলক্ষ্যে একজায়গায় বাস করেন। হেমচন্দ্র ও চতুর্মাস উপলক্ষ্যেই আহ্নিলওয়াড়পাটনে অবস্থান করেছিলেন। সেখানে তার অধিকাংশ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এইসময় একদা সিদ্ধরাজ সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ (যেটি লক্ষণ প্রকাশ নামেও পরিচিত) নামে সংস্কৃত ব্যাকরণসংক্রান্ত একটি সন্দর্ভ আবিষ্কার করেন।

সূত্র: ভট্টাচার্য, অমিত (সম্পাদিত) (১৪১৫)। তদেব। পৃ. ১৭০।

৩৭) সিদ্ধ-হেম-শব্দানুশাসন: এই সংস্কৃত ব্যাকরণটি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের আদলে লিখিত। এই গ্রন্থ মধ্যে ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। প্রত্যেকটি অধ্যায় ভোজের ব্যাকরণের আদলে চারটি ভাগে বিভক্ত। সিদ্ধ-হেম-শব্দানুশাসন গ্রন্থে ছটি প্রাকৃত ভাষা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যথাক্রমে- প্রামাণ্য প্রাকৃত (প্রকৃত পক্ষে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত), শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী, অন্য ক্ষেত্রে অনুল্লিখিত চুলিকা পৈশাচী ও অপভ্রংশ (প্রকৃত পক্ষে গুর্জর অপভ্রংশ, যেটি সেই সময় গুজরাত ও রাজস্থান অঞ্চলে প্রচলিত ছিল এবং যেটি থেকে গুজরাতি ভাষার উৎপত্তি ঘটে)। এই গ্রন্থটি একমাত্র অপভ্রংশ ব্যাকরণ।

সূত্র: তদেব। পৃ. ১৭০।

৩৮) পাল, বিপদভঞ্জন (২০১৪)। *ভারতীয় দর্শন*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।পৃ. ১০০।

৩৯) কপিলাবস্তু: কপিলাবস্তু উত্তর প্রদেশের বর্তমান গণয়ারিয়া অঞ্চলের পূর্ব নাম, যেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ তার বাল্যকাল অতিবাহিত করেছিলেন। অঞ্চলটি প্রাচীন শাক্যরাজ্যের রাজধানী ছিল। এখানে গৌতম বুদ্ধের পরিবারের গৃহ, উদ্যানসহ আরো বেশ কিছু পারিবারিক স্থাপনা রয়েছে। কপিলাবস্তু একসময় বেশ সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। আর এই স্থানের রাজা ছিলেন গৌতম বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোধন। রাজা শুদ্ধোধনের প্রথমা মহিষীর গর্ভেই গৌতমবুদ্ধের জন্ম হয়েছিল।

সূত্র: বড়ুয়া, মনোরঞ্জন (২০১৬)। *বৌদ্ধতীর্থ পর্যটন*। কলকাতা: মহাবোধি। পৃ. ২-৪।

৪০) সেন, সুনীল ও চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (২০১২)। তদেব। পৃ. ১০৪।

৪১) ঘোষ, বিনয়তোষ (১৯৭৮)। *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*। কলকাতা: প্রকাশভবন। পৃ. ১০৪।

৪২) চট্টোপাধ্যায়, সুনীল (২০০৮)। তদেব। পৃ.৬৪।

৪৩) বেদ: ভূমিকা অংশের ১ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

সূত্র: বসু, যোগীরাজ (২০১৫)। *বেদের পরিচয়*। পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা: ফার্মা. কে. এল. এম.। পৃ. ১-৫০।

৪৪) উপনিষদ: উপনিষদ হিন্দুধর্মের এক বিশেষ ধরণের ধর্মগ্রন্থের সমষ্টি। এই গ্রন্থগুলিতে হিন্দুধর্মের তাত্ত্বিক ভিত্তিটি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত। ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা বিশ্বাস করে - উপনিষদ্‌গুলিতে সর্বোচ্চ সত্য স্রষ্টা বা ব্রহ্মের প্রকৃতি এবং মানুষের মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভের উপায় বর্ণিত হয়েছে। উপনিষদ্‌গুলি মূলত অর্থববেদের পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল। সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক এগুলিরও শেষের দিকে উপনিষদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

সূত্র: সেন, অতুল চন্দ্র তত্ত্বভূষণ, সীতানাথ ঘোষ, মহেশচন্দ্র (সম্পাদিত) (২০০০)। *উপনিষদ*। অখণ্ড সংস্করণ। কলকাতা: হরফ। পৃ. ১৮-৪৮।

৪৫) পুরাণ: হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন অর্থাৎ সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের গুরুত্বপূর্ণ কাহিনি অবলম্বনে যে সকল আখ্যায়িকা রচিত হয়েছিল সেগুলিকে বলা হয় পুরাণ। পুরাণে সৃষ্টি থেকে প্রলয় পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস, রাজন্যবর্গ, যোদ্ধৃবর্গ, ঋষি ও উপদেবতাগণের বংশবৃত্তান্ত এবং হিন্দুধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব, দর্শন ও ভূগোলতত্ত্ব এইসমস্ত কিছুই এখানে লিখিত হয়েছে। পুরাণে সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো

দেবতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তাছাড়াও অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, মুনি এই সমস্ত বিশ্বের প্রাণীদের কথা বর্ণনা করা হয়।

সূত্র: সরকার, সুধীরচন্দ্র (সম্পাদিত) (১৩৭০)। *পৌরাণিক অভিধান*। কলকাতা: এম. সি. সরকার. অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৩০৪-৩০৮।

সূত্র: দাস, হরিদাস (সম্পাদিত) (১৪২১)। *শ্রীশ্রী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো। পৃ. ৪৫৫।

৪৬) রামায়ণ: রামায়ণ হল একটি প্রাচীন সংস্কৃত মহাকাব্য। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী ঋষি বাল্মীকি এই রামায়ণ মহাকাব্যটি রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি হিন্দুশাস্ত্রের স্মৃতি সাহিত্যের অন্তর্গত। পরবর্তীকালের সংস্কৃত কাব্য, ভারতীয় জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে এই কাব্যের প্রভাব অপরিসীম। ভারতের সংস্কৃতি চেতনার মৌলিক উপাদানগুলিই প্রতিফলিত হয়েছে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, হনুমান ও রাবণ চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে।

সূত্র: মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত)। *রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ১০-২০।

৪৭) মহাভারত: সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন ভারতের দুটি প্রধান মহাকাব্যের অন্যতম একটি কাব্য হল মহাভারত। এই মহাকাব্যটি হিন্দুশাস্ত্রের ইতিহাস অংশের অন্তর্গত। মহাভারত-এর মূল উপজীব্য বিষয় হল কৌরব ও পাণ্ডবদের গৃহবিবাদ এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বাপর ঘটনাবলি। এই আখ্যানভাগের বাইরেও দর্শন ও ভক্তির অধিকাংশ উপাদান এই মহাকাব্যে সংযোজিত হয়েছে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চার পুরুষার্থ-সংক্রান্ত একটি আলোচনা অংশ এখানে সংযোজিত হয়েছে। মহাভারত-এর রচয়িতা ছিলেন ব্যাসদেব।

সূত্র: বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পাদিত) (১৯৯২)। *কাশীদাসী মহাভারত*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ১-৫৩।

৪৮) ভগবদ্গীতা: শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা গীতা যা মূলত সাতশো শ্লোক সমন্বিত একটি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ। এটি প্রাচীন সংস্কৃত মহাকাব্য মহাভারত-এর একটি অংশবিশেষ। গীতা একটি স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থ তথা একটি পৃথক উপনিষদের মর্যাদা পেয়ে থাকে। হিন্দুরা গীতা-কে ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী মনে করেন। হিন্দুধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের ইতিহাসে গীতা এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। গীতা-র কথক কৃষ্ণ হিন্দুদের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের অবতার পরমাত্মা স্বয়ং। গীতা-য় তাকে বলা হয়েছে শ্রীভগবান। গীতা-র বিষয়বস্তু কৃষ্ণ ও পাণ্ডব রাজকুমার অর্জুনের কথোপকথন।

সূত্র: গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীল রাধাবিনোদ (অনূদিত) স্মৃতিতীর্থেন, কৃষ্ণচন্দ্র (সম্পাদিত) (২০০৬)। *শ্রীমদ্ভাগবত্*। কলকাতা: গিরিজা। পৃ. ১-২৪।

৪৯) চৈতন্য মহাপ্রভু: ছিলেন একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এবং ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট বৈষ্ণব ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক। তিনি অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার বলে মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছিলেন ভাগবত পুরাণ ও ভগবদ্গীতা-য় উল্লিখিত দর্শনের ভিত্তিতে সৃষ্ট বৈষ্ণব ভক্তিযোগ মতবাদের একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা। তিনি বিশেষত রাধা ও কৃষ্ণ রূপে পরম সত্ত্বার পূজা প্রচার করেন। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে অব্রাহ্মণ চণ্ডালদের কাছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রটি জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

সূত্র: বন্দোপাধ্যায়, দেবাশিস (১৯৯৭)। *চৈতন্যচর্চার পাঁচশো বছর*। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ১-৪৩।

৫০) ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ (১৯৬৩)। *ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য*। কলকাতা: অক্ষয় লাইব্রেরী। পৃ. ১২।
৫১) তদেব। পৃ. ১২।
৫২) তদেব। পৃ. ১৩।
৫৩) রত্নাগর, শিরিন (২০১৮)। *হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে বৃহত্তর সিন্ধু উপত্যকায়*। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৯৫-৯৬।

৫৪)) বিষ্ণুপদ, ভট্টাচার্যপ্ (১৯৬৩)। তদেব। পৃ. ১৯৬।
৫৫) দশাবতার: দশাবতার বলতে বিষ্ণুর প্রধান দশ অবতারের কথা বলা হয়েছে। বৈষ্ণব দর্শনে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে মর্ত্যে অবতীর্ণ পরম সত্ত্বাকে *অবতার* নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বিষ্ণুর দশ মুখ্য অবতারকে একত্রে দশাবতার নামে চিহ্নিত করা হয়। যারা হলেন - মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বলরাম, কল্কি।
সূত্র: বন্দোপাধ্যায়, অমল কুমার (১৯২১)। *পৌরাণিকা*। প্রথম খণ্ড: অ-প। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম লিমিটেড। পৃ. ৪৫৫।
৫৬) গিরি, সত্যবতী (১৯৮৮)। তদেব। পৃ. ১৯।
৫৭) চক্রবর্তী, রমাকান্ত (২০১৭)। *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম* । কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ১১।
৫৮) ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পাদিত) (২০১৫)। *বৃন্দাবন দাস-বিরচিত শ্রী শ্রী চৈতন্যভাগবত* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৬২।
৫৯) বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর (১৪১৪)। *রাধা* । কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ। পৃ.৫২।
৬০) ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। পৃ. ১০৩।
৬১) সেন, সুকুমার (১৯৭৮)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ৬২।
৬২) চক্রবর্তী, রমাকান্ত (২০১৭)। *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম* । কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ১১।
৬৩) সেনগুপ্ত, পল্লব (২০০১)। *পূজা-পার্বণের উৎসকথা* । কলকাতা: পুস্তক বিপণী। পৃ.৬৩।
৬৪) দাশগুপ্ত, শশিভূষণ (১৪০৯)। *ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ৭৬।
৬৫) দাস, উপেন্দ্রকুমার (২০১১)। *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা*। কলকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার। পৃ. ৬৬০।
৬৬) দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ (২০০৪)। *ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা* । কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন। পৃ. ১৬।
৬৭) গম্ভীরানন্দ, স্বামী (সম্পাদিত) (১৯৯১)। *উপনিষদ গ্রন্থাবলী* । কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়। পৃ. ১০।
৬৮) সেন, দীনেশচন্দ্র (২০০৬)। *বৃহৎবঙ্গ* । কলকাতা: দ্বে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৩২২।
৬৯) ভট্টাচার্য, সুকুমারী (২০১৩)। *প্রবন্ধসংগ্রহ – ৩* । কলকাতা: গাঙচিল। পৃ. ৪৩৬।
৭০) মহাস্থবির, ধর্মাধার (১৯৫৪)। *ধম্মপদ*। মূল ও বঙ্গানুবাদ। কলকাতা: ধর্মাঙ্কুর সভা। পৃ. ৩০।
৭১) সেন, দীনেশচন্দ্র (২০০৬)। *বৃহৎ বঙ্গ* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং । পৃ. ৫১।
৭২) বড়ুয়া, সুমিতকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮)। *আশা দাশ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি* । কলকাতা: ছোঁয়া। পৃ. ৫৫।
৭৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত (১৯৮৩)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৩৬।
৭৪) গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ (১৯৯৪)। *মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। পৃ. ৬।
৭৫) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার (১৯৬৭)।*বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা* । কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি । পৃ. ১২।
৭৬) সেন, দীনেশচন্দ্র (২০০৬)। *বৃহৎ বঙ্গ* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং । পৃ. ৩৩৫।
৭৭) সেন, ক্ষিতিমোহন (১৯৫৮)। *চিন্ময় বঙ্গ* । কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ১১।
৭৮) সরকার, পবিত্র (সম্পাদিত) (২০০৫)। *বঙ্গদর্পণ* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সমাজ-রূপান্তর সন্ধানী তৃতীয় সহস্রাব্দ সমিতি থার্ড মিলেনিয়াম কমিটি ফর সোশ্যাল ট্রানজিশন। পৃ. ১১৬।
৭৯) দাশগুপ্ত, অংশুপতি (অনূদিত) (২০০৫)। *অতীতের উজ্জ্বল ভারত*। A. L. Basham লিখিত 'The Wonder that was India' নামক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। পৃ. ৬৭।
৮০) সিনহা, গোপাল চন্দ্র (২০০৮)। *ভারতবর্ষের ইতিহাস*। প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। পৃ. ২৩

তৃতীয় অধ্যায়

মঙ্গলকাব্যের দেবভাবনা ও দর্শনে, বৌদ্ধ ও জৈন দেবভাবনা ও দর্শনের পৌরাণিক ও লোকায়ত উপাদানের প্রতিগ্রহণ

৩. ০ ভূমিকা

বৌদ্ধধর্ম বহুকাল স্বমহিমায় বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আপন প্রবাহধারায় বাংলাদেশকে প্লাবিত করেছিল। বৌদ্ধধর্মের পরবর্তীতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা ও প্রসারলাভ করেছিল। বাংলার আদিম জনসাধারণ অনার্যবিদ্বেষী আর্যগণের সভ্যতা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রসারকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বাংলার জনসাধারণের আত্মিক সংযোগ গড়ে উঠেছিল। সর্বধর্মের প্রতি সহিষ্ণু, জাতিভেদ ও বর্ণবিদ্বেষ এইগুলিকে পিছনে ঠেলে সর্বধর্মকে এক ছাতার নীচে আহ্বান জানিয়েছিল। অন্য ধর্মের মতো বৌদ্ধধর্ম অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে লোকমুখীন প্রবাহধারায় প্রবাহিত হয়ে জনগণের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছিল। বাংলার ইতিহাসে পালযুগ রাজশক্তির পরিপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণ ও লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সমন্বয়ের সুবর্ণ যুগ। সেন-বর্মণ যুগের পটভূমিকা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার যুগ। সেন রাজসভায় লোকজীবনের ধারাকে গুরুত্ব না দিয়ে অবহেলায় ফেলে রাখে। তারা সহজিয়া বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করে সমাজের অন্তরালে গোপন সাধন পদ্ধতিকে স্বীকার করে চরম অধঃপতনকে ডেকে আনে। বাঙালি জীবনের এই চরম বিপর্যয়ের সময় তুর্কী আক্রমণ হয়েছিল। ঐতিহাসিক রাষ্ট্রসঙ্কটের ঝড়ঝঞ্ঝায় বাঙালি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পথ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্মের চরম অবলুপ্তিকে স্বীকৃতি জানিয়ে, বৌদ্ধ ও লৌকিক জনজীবনের সমন্বয়ে সংগঠিত সংস্কার, বিশ্বাস, পূজার্চনাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। বৌদ্ধ, জৈন ও লৌকিকধর্মের যৌথমূর্তিধারী দেবদেবীগণ আর্য আভিজাত্যে মণ্ডিত হয়ে ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। লোকজীবনের এই পরিণতিতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনরায় নিজের আত্মসম্প্রসারণের পথ খুঁজে পায়। বৌদ্ধ প্রভাবিত লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের চিহ্ন হিসেবে মঙ্গলকাব্যগুলি প্রমাণ বহন করে চলেছে। এইকারণে মঙ্গলকাব্যকে যুগ-সন্ধিক্ষণের কাব্য বলা হয়। অবসিত প্রায় বৌদ্ধযুগ ও আগত প্রায় ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠার যুগ, উক্ত দুই যুগের সমগ্র বৈশিষ্ট্যগুলি একত্রে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে গ্রথিত রয়েছে। ফলত মঙ্গলকাব্যের দেবতা বর্ণনা ও কাজের

বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পৌরাণিক ও লোকায়ত উভয় উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় প্রধান এবং অপ্রধান সকল মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে।

৩. ১ মঙ্গলকাব্যের দেবভাবনা ও দর্শনে বৌদ্ধ-জৈন দেবভাবনা ও দর্শনের পৌরাণিক উপাদান:

পৌরাণিক শব্দটি বুঝতে হলে পুরাণ বলতে কী বোঝায় এই বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। পুরাণের সঙ্গে ইতিহাস শব্দের আবার বিশেষ যোগ রয়েছে। ইতিহাস বলতে প্রাচীনযুগের পুরোনো গল্প, লোককথা, তথ্যপঞ্জী ও প্রভৃতি বিষয়কে একত্রে বোঝানো হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে এই পুরাতন অর্থে ইতিহাস এই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে -

> "ইতি হ আস পুরাণম্" – 'এই রকমই ছিল সেকালের ব্যাপার'। এই বাক্যটি পরে দাঁড়াইল একটি মাত্র পদে- "ইতিহাসপুরাণম্"। পদটিকে সমাহারদ্বন্দ্ব সমান মনে করিয়া এই শব্দটিকে ভাঙ্গিয়া দুইটি শব্দ পাওয়া গেল- 'ইতিহাস' ও 'পুরাণ'। বেদের পরবর্তীকালে এইভাবে প্রাচীন কিছু কথাবস্তু বিভিন্নজাতের দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। যাহাকে 'ইতিহাস' নাম দেওয়া হইল তাহাতে মানুষ লইয়াই কারবার, সেখানে দেবতার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব নাই। দেবতা মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া যোগ দিতে পারেন তবে তাঁহার ভূমিকা কিছু গৌণ। তবে মানুষ কিছু কিছু অলৌকিক কাজ করিতে পারে। ইতিহাসের পাত্রপাত্রী মানুষই। ইতিহাসের ঘটনায় বাস্তবের রঙ থাকিবে কিন্তু সে ঘটনায় বাস্তব ও কল্পনা পৃথক করা যায় না। এই জন্য 'মহাভারত' ইতিহাস। পুরাণের কারবার প্রধানত দেবতা ও অসুর, কখনও কখনও দেবকল্প বা অসুরকল্প মানুষ লইয়া । পুরাণের মানুষকে ইতিহাসে ধরা যায় না, বাস্তবে তো নয়ই। সে সম্পর্ণভাবে মিথলজির। ইতিহাসের তুলনায় পুরাণে দেবতার অবতারের ক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত।[১]

শুধুমাত্র দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণনাকে আর ইতিহাস না বলে লোক-ক্রমগত কথাকে ইতিহাস বলা যেতে পারে। মনুসংহিতায় আবার ইতিহাসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চার বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উপদেশমূলক পুরাবৃত্তকে বলা হয় ইতিহাস। মানুষ জীবনের টানে সৃষ্টি করে চলে, আর ইতিহাস হয়ে থাকে এই সৃষ্টিলীলার দর্শক। ইতিহাস তার স্বভাব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দিয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যের ছাপ রেখে চলে। ইতিহাসের ধারার মধ্যে প্রাচীনযুগের সমগ্র ধর্মবিশ্বাসী যেমন - হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এইসকল ধর্মাবলম্বীদের আখ্যানমূলক ধর্মগ্রন্থগুলিকে বলা হয় পুরাণ। পুরাণে সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো দেবতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং তাতে ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তার প্রাবল্যতা লক্ষ করা হয়। পুরাণ নামে উল্লিখিত কোন গ্রন্থের রচনা সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময়কালকে নির্ধারণ করা যায় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে - মহাভারত ও রামায়ণ–এর কথা। মহাভারত ব্যাসদেবের হাতে লিখিত হলেও অনুমান করা যায় পূর্ববর্তী এক সহস্রাব্দ কাল ধরে এই কাহিনিগুলি সমাজের মধ্যে মৌখিকভাবে প্রচারিত হয়ে এসেছে। ব্যসদেব এই গ্রন্থটি রচনা করে বিভিন্ন পুরাণসমূহের

সংকলক হয়ে উঠেছেন। একটা সময় পর্যন্ত লিখিত পাঠ্যগুলির রচনাতারিখ পুরাণের প্রকৃত রচনাতারিখ নয়। পরবর্তীকালে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এগুলির আকার ও রূপ পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। পুরাণের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পাঠগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যের (তৃতীয়-পঞ্চম খ্রিস্টাব্দ) সমসাময়িক। পুরাণগ্রন্থগুলি ভারতের নানা স্থানে রচিত হয়েছিল। পুরাণের সামগ্রিক পাঠে কিছু সাধারণ ধারণা লক্ষিত হয়। একটি পুরাণের উপর অপর আরেকটি পুরাণের প্রভাব অন্বেষণ দুঃসাধ্য। তাই সাধারণভাবে এগুলিকে সমসাময়িক বলে ধরে নেওয়া হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে রচিত ছান্দগ্যো উপনিষদে পুরাণের একটি প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদ পুরাণকে পঞ্চম বেদ নাম দেওয়া হয়েছে। যা থেকে প্রাচীন যুগে পুরাণের ধর্মীয় গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

মৎস্যপুরাণ থেকে পুরাণের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে, প্রধান পাঁচটি উপাদান সমগ্র পুরাণগুলিতে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। যেগুলিকে একত্রে পঞ্চলক্ষণ নাম দেওয়া হয়ে থাকে, যথা - সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ ও মন্বন্তর। মনুর শাসনকালের কথা এই শাসনকাল একাত্তরটি দিব্যযুগ বা বংশানুচরিতম্ (রাজবংশের ইতিহাস)। পুরাণে বংশবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। হিন্দু সাহত্যের পুরাণগুলিকে দুটি ভাগে করা হয়েছে, যথা - মহাপুরাণ[২] ও উপপুরাণ[৩]। পুরাণের মধ্যে লক্ষণীয় বিষয়গুলি হল –

> বেদের মত পুরাণেও বহুদেবতার উপাসনা প্রচলিত। এক বা একাধিক দেবতার মহিমা কীর্তিত হয়েছে এক একটি পুরাণে। অধিকাংশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণেও বহু দেবতার প্রসঙ্গ আছে। পুরুষ দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রধান। এ ছাড়াও আছেন গণেশ, কার্ত্তিকেয়, সুর্য্য, চন্দ্র, পবন, বরুণ, ইন্দ্র, মদন, যম, কুবের, দক্ষ, অগ্নি প্রভৃতি আরও কত দেবতা! শক্তি-দেবতা দুর্গা বা পার্বতী। কিন্তু তাঁরও কত রূপভেদ – কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি শক্তিদেবতারূপে পূজিতা। বিষ্ণুর যেমন আছেন দশাবতার, তেমনি আছেন দশ মহাবিদ্যা – শক্তিদেবতার প্রকারভেদ। সরস্বতি, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি আরও বহু স্ত্রী-দেবতা শক্তি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন পুরাণে ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেবীদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।[৪]

পুরাণের মধ্যে স্থলপুরাণ, কুলপুরাণ নামে দুটি পুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সংস্কৃতে ‘স্থল’ শব্দের অর্থ হল ‘স্থান’। পুরাণের এই বিশেষ তীর্থের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে। স্থলপুরাণের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষায় রচিত হতে দেখা যায়। পরবর্তীকালে কয়েকটি স্থলপুরাণের সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ হতে দেখা যায়। সংস্কৃতে কুল শব্দের অর্থ পরিবার বা গোত্র। কুলপুরাণের মধ্যে সাধারণত নির্দিষ্ট বর্ণের উদ্ভব, আখ্যান ও কিংবদন্তির বর্ণনা দেওয়া হয়ে থাকে। কুলপুরাণগুলি স্থানীয় ভাষায় লিখিত হয়ে থাকে আবার অনেক ক্ষেত্রে মৌখিক পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে থাকে। হিন্দু পুরাণগুলি

ছাড়া জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে কিছু পুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন - 'বৌদ্ধ স্বয়ম্ভু পুরাণে' কাঠমান্ডু উপত্যকার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। জৈন পুরাণগুলিতে বর্ণিত হয়েছে জৈন লোকগাথা, ইতিহাস ও কিংবদন্তির কথা। জৈনপুরাণ প্রাচীন কন্নড় সাহিত্যের প্রধান উপাদান। এই পুরাণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আচার্য জিনসেনের মহাপুরাণ। উপপুরাণগুলিকে সম্প্রদায়ভেদে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও অসাম্প্রদায়িক - এই বিভাগগুলিতে ভাগ করা হয়েছে। বৈষ্ণব উপপুরাণগুলির মধ্যে থাকে বিষ্ণুধর্ম পুরাণ, বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ, নরসিংহ পুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ ও ক্রিয়াযোগসার। শাক্ত উপপুরাণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মহাভাগবত পুরাণ, দেবীভাগবত পুরাণ, ভগবতী পুরাণ, চণ্ডীপুরাণ ও সতীপুরাণ। শৈব উপপুরাণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিবপুরাণ, সৌরপুরাণ, শিবধর্ম পুরাণ, শিবধর্মোত্তর পুরাণ, শিবরহস্য পুরাণ, পরাশর পুরাণ, বশিষ্ঠ লৈঙ্গ পুরাণ ও বিখ্যাদ পুরাণ। শুধুমাত্র সাম্ব পুরাণ-কে সৌর উপপুরাণ বলা যেতে পারে। গাণপত্য উপপুরাণগুলির মধ্যে রয়েছে মুদগল পুরাণ ও গণেশ পুরাণ। অসাম্প্রদায়িক পুরাণ ভবিষ্যোত্তর পুরাণ, কপিল পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণ। এই পুরাণগুলিকে কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। তাই এইরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের আদিম জনসাধারণ অনার্যবিদ্বেষী আর্যগণের সভ্যতা ও সংস্কৃতিগুলিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। বৈদিকধর্মের বিপরীতে গড়ে ওঠা প্রথমে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বাংলার জনসাধারণের আত্মিক সংযোগ গড়ে উঠেছিল দুইধর্মের আপন মহিমাবলে। প্রাচীনযুগে মহাবীর ও বুদ্ধ প্রবর্তিত দুই ধর্মের বাণীর মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল সর্বধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা। জাতিভেদ ও বর্ণবিদ্বেষ এইগুলিকে পিছনে ঠেলে সর্বধর্মকে একটি ছাতার নীচে আহ্বান জানিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের মতো জৈন ও বৌদ্ধধর্ম অভিজাতশ্রেণির মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে লোকমুখিন প্রবাহধারায় প্রবাহিত হয়ে সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। জৈনসন্ন্যাসী মহাবীর ভগবান বুদ্ধের পূর্ববর্তী ধর্মীয় প্রবক্তা ছিলেন। গৌতমবুদ্ধ মহাবীরের প্রচলিত ধর্মীয় পন্থার কিছু বৈশিষ্ট্য আপন ধর্মের মধ্যে গ্রহণ করে নিজস্ব রূপদান করেছিল। ধীরে ধীরে জৈনধর্মের প্রভাব বঙ্গদেশে ক্ষীণ হতে থাকে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের চূড়ান্ত বিরোধীধর্মের স্থান সম্পূর্নভাবে দখল করে নিতে থাকে বুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম। উভয় ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় -

1) Both accepted the theories of *Karma*, rebirth and *Mokṣa* (*Nibbāna*), 2) Both provided *Vratas* (Vows) but used different terms. Jainism used *Paca-Vratas* and Buddhism used *Paca-Sla*, 3) Both have their own three Gems or *'Tri Ratna'*. *Tri-Ratna* of Jainism consists of right philosophy, right knowledge and right character. But in Buddhism, *Ti-Rattana* consist of the *Budhha, Dhamma* and *Sangha*, 4) *Ahiṃsā* (Non-violence) is the essential principle of both religions, 5) both emphasized right conduct, right knowledge and right wisdom as the way to achieve the enlightenment but they used different ideas of interpretation and ways of practice.[৫]

বৌদ্ধধর্ম আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে স্বমহিমায় বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আপন প্রবাহধারায় বাংলাদেশকে প্লাবিত করেছিল দীর্ঘকাল ধরে। বৌদ্ধধর্মের পরবর্তীতে পুনরায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা ও প্রসারলাভ করেছিল। যার ইতিহাস রচনা করতে গেলে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজাদের ধর্মীয় রীতিনীতির কিছুটা ভূমিকা লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে পাল রাজশক্তির (৭৭৫-১১৯৫ খ্রিস্টাব্দ) পরিপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণ ও লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সমন্বয় সাধনের উপযোগী পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। পাল রাজাদের পরবর্তী সেন-বর্মণযুগের (১০৪৫-১২১৫ খ্রিস্টাব্দ) পটভূমিকায় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা সংস্কৃতির পুনরুত্থানের সুবর্ণ সময় বলে বিবেচিত হয়। সেন রাজসভায় পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যরীতিকে সামনে রেখে, লোকজীবনের ধারাকে গুরুত্ব না দিয়ে অবহেলার নজরে দেখতে শুরু করে। এই অবস্থায় গ্রামবাংলার বেড়ে ওঠা লৌকিকধারাগুলি সহজিয়া বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করে সমাজের অন্তরালে গোপন সাধন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়। বাংলাদেশের সমাজে ধর্মীয় পরিস্থিতিতে এক চরমতম অবক্ষয়ের যুগ শুরু হয়। বাঙালি জনজীবনের এই বিপর্যস্ত ধর্মীয় অবস্থাকালে তুর্কী আক্রমণ (১২০১ খ্রিস্টাব্দ) হয়েছিল। এই আক্রমণের ফলে ঐতিহাসিক রাষ্ট্রসঙ্কটের ঝটিকার মাঝে বাঙালি সাহিত্যে ও সংস্কৃতি চর্চার পথ অনির্দিষ্টকালের জন্য দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্মের চরম অবলুপ্তিকে স্বীকৃতি জানিয়ে, বৌদ্ধ ও লৌকিক জনজীবনের সমন্বয়ে সংগঠিত সংস্কার, বিশ্বাস, পূজার্চনাকে অভিনন্দন জানিয়ে নতুন যুগের যাত্রা পথকে সুদৃঢ় করেছিল। এই সুযোগে বৌদ্ধ ও লৌকিকধর্মের যৌথমূর্তিধারী দেবদেবীগণ যারা আর্য আভিজাত্যে মণ্ডিত হয়ে ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেদের মহিমা কীর্তন প্রচারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। লোকজীবনের এই পরিণতিতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম দীর্ঘ অপেক্ষার পরে পুনরায় নিজেদের আত্মসম্প্রসারণের রাস্তা ফিরে পায়। বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবিত লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের চিহ্ন হিসেবে

মঙ্গলকাব্যগুলি বেশ কিছু প্রমাণ বহন করে চলেছে, এইকারণে মঙ্গলকাব্যকে যুগ-সন্ধিক্ষণের কাব্য বলা হয়ে থাকে। জৈনধর্মের পরে অবসিতপ্রায় বেদ-বিরোধী বৌদ্ধযুগ ও আগতপ্রায় ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠার যুগ শুরু হয়। এই যুগগুলির সমগ্র বৈশিষ্ট্যগুলি একত্রে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে গ্রথিত রয়েছে।

ক. শিবমঙ্গলকাব্য: শিব শব্দটির অন্য একটি অর্থ হল পবিত্র ব্যক্তি। যার মধ্যে প্রকৃতির - সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের সমাবেশ থাকবে। প্রাচীনকালে মানুষ বিশ্বাস করত এই দেবতার নাম উচ্চারণ মাত্র মানুষ পাপমুক্ত হতে পারে। ভারতীয় প্রাগ-বৈদিক সমাজের দেবতা হিসেবে অনুমান করা হয় দেবতা শিবকে। যেখান থেকে অনুমান করা হয় বর্তমান দেবতা শিব প্রাগ-আর্য সভ্যতা থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্যের দেবতা শিবে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রাচীন যুগের ধ্বংসাবশেষ থেকে সমকালীন ধর্মীয় ব্যাখ্যা যতটুকু পাওয়া সম্ভব হয়েছে সেখানে দেখা গেছে, মাতৃকারূপের পূজা সেখানে বেশি প্রচলিত ছিল। সিলমোহর বা মাটির পাত্রে এই সকল নারীদেবীদের বেশ প্রতিপত্তি দেখা গেছে। শিবের অনুরূপ একজন দেবতার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এই দেবতার ঘটা করে পূজা হত বলে খানিকটা অনুমান করা যায়। প্রাপ্ত দেবতার সঙ্গে অনেকগুলি শিবলিঙ্গের মতো মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।[৬] সর্বোচ্চ স্তরে শিবকে সর্বোৎকর্ষ, অপরিবর্তনশীল পরম ব্রহ্ম বলে মনে করা হয়। শিবের অনেকগুলি রূপের মধ্যে সদাশয় ও ভয়ঙ্কর মূর্তি রয়েছে। সদাশয় রূপে তিনি একজন সর্বজ্ঞ যোগী। তিনি কৈলাস পর্বতে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন। গৃহস্থ রূপে তিনি পার্বতীর স্বামী। গণেশ ও কার্তিক নামে এই দেবীর দুই পুত্রের কথা জানা যায়। ভয়ঙ্কর রূপে তাকে দৈত্যবিনাশী বলে বর্ণনা করা হয়। শিবকে যোগ, ধ্যান ও শিল্পকলার দেবতা মনে করা হয়। তিনি চিকিৎসা বিদ্যা ও কৃষিবিদ্যার আবিষ্কারক। শিবমূর্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল তার তৃতীয় নয়ন, গলায় বাসুকী নাগ, জটায় অর্ধচন্দ্র, জটার উপর থেকে প্রবাহিত গঙ্গা, অস্ত্র ত্রিশূল ও বাদ্য ডমরু। শিবকে সাধারণত শিবলিঙ্গ নামক বিমূর্ত প্রতীকে পূজা করা হয়। সমগ্র হিন্দু সমাজে শিবপূজা প্রচলিত রয়েছে। ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের কিছু অংশে শিবপূজার ব্যাপক প্রচলন লক্ষিত হয়। সনাতন ধর্মীয় শাস্ত্রসমূহে শিব পূজাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক ফলপ্রদ বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এখনও পর্যন্ত হিন্দু দেবতা শিবের মধ্যে এই সকল বৈশিষ্ট্য দেখে মহেঞ্জদারোর প্রাপ্ত মূর্তিটিকে আদি-শিব এর নিদর্শন বলে দাবি করা হয়ে থাকে। এই মূর্তিটি হিন্দু দেবতা শিবের কিনা এই নিয়ে মতবিরোধ তৈরি হয়েছে। জৈনপন্থীদের যে চব্বিশজন

তীর্থঙ্করের নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ বা আদিনাথ এমনটা জৈনরা দাবী করে। সিন্ধুসভ্যতায় প্রাপ্ত এই মূর্তিটিতে দেখা যায় পুরুষ মূর্তিটি হাটুমুড়ে যোগভঙ্গিমায় বসে রয়েছে। তার পাশে একটি ষাঁড় আবস্থান করে রয়েছে। প্রাচীনযুগের ধংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত ঋষভনাথের ফলকে সর্বদা একটি ষাঁড়ের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। শিবের সঙ্গে ঋষভনাথের এই সাদৃশ্য মঙ্গলকাব্যের দেবতা শিবের মধ্যে জৈন ভাবনার উপস্থিতির কথা মনে করায়। প্রাচীনযুগে গাছগাছালি ও পশু, যেমন - কুমির, সাপ, ষাঁড় এই সকল জন্তুর মূর্তি পাওয়া যায়। তখনকার মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল পশুপালন এবং বন্যপশুর চামড়া দিয়ে পোশাক তৈরির নমুনা পাওয়া যায়। নন্দী নামের একটি পৌরাণিক ষাঁড়ের কথা জানা যায়, যে ছিল শিবের বাহন। শিবকে পশুদের রক্ষাকারী দেবতা মনে করা হয়, তাই শিবের অপর একটি নাম হল পশুপতি, যার অর্থ গবাদি পশুর দেবতা। 'শিবায়ন' কাব্যে সতী দক্ষযজ্ঞে যাওয়ার জন্য শিবকে তুষ্ট করতে এবং পিতৃগৃহে যাওয়ার জন্য শিবের কাছে বিদায় চেয়েছে যখন তখন শিবকে স্তুতির ছলে সতী বলেছে -

বাপাকে বিস্তর কয়্যা　　পূজিব তোমারে লয়্যা
যজ্ঞভাগ দিয়াইব আগে।।
নতুবা করিব ভঙ্গ　　পাপিজাত পাপ অঙ্গ
জনমিব শৈবের ভুবনে।
তপস্যা করিব তথি　　পশুপতি হবে পতি
দরশন দিবে তপোবনে।।[৭]

পশুদের দেবতা বলে শিবের এইরূপ নামকরণ করা হয়েছে। অথর্ববেদ ও শতপথব্রাহ্মণ্য-তে পশুপতি নামে শিবকে সম্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের দেবতা শিবের সঙ্গে বৌদ্ধ দৈবীভাবনার কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধদের অমিতাভকুলের একজন 'সপ্তশতিক হয়গ্রীব' নামে একজন দেবতার নাম পাওয়া যায়। যার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যায় - অমিতাভকুলের এই দেবতা মহাবলের মতো দেখতে ভীষণাকৃতি। দংষ্ট্রাকরাল বদন, সর্পের আভরণ, অগ্নিজ্বালাসদৃশ কেশরাজি, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, খর্ব ও লম্বোদর আকৃতির এই রূপ সুরাসুরদের ভয় তৈরিতে সাহায্য করে।[৮] হিন্দুদেবতা শিবের পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে ব্যাঘ্রচর্ম বা বাঘছাল ব্যবহৃত হয়। শিবের অপর একটি নাম হল কৃত্তিবাস। কখনও কখনও শিব ব্যাঘ্রচর্মের আসনের উপর উপবিষ্ট থাকে। ব্যাঘ্রচর্মের আসন ছিল প্রাচীন ভারতের ঋষিদের জন্য রক্ষিত একটি বিশেষ সম্মান। এই দেবতা শিবের গলায় একটি সাপ সর্বদা শোভা বৃদ্ধি করতে থাকে।

'বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর' সম্প্রদায়ের দেবতা 'নীলকণ্ঠ'। যার গঠন সম্পর্কে জানা যায় – দ্বিভুজ যার একটি হাতের ওপর অন্য হাত সমাধিমুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে। হাতের উপর নানা রত্ন পরিপূর্ণ একটি কপল থাকে, শরীর নিরলংকার এবং ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় বিরাজ করে। দুটি ফণাধর সাপ পরস্পর পুচ্ছ জরিয়ে দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। দেবতার কণ্ঠে নীলবর্ণ বিষগুটিকা থাকে। এই বিষগুটিকার জন্য এই দেবতার নাম রাখা হয়েছে নীলকন্ঠ। হিন্দুদের দেবতা শিবের এইরূপ নীলকণ্ঠ নামের কথা জানা যায়। একটি মিথ ও প্রচলিত রয়েছে, যথা - একবার দেবতা আর অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে অমৃত পান করে অর্মত্য লাভের জন্য। এই যুদ্ধে দেবতারা জয়লাভ করে এবং অমৃতের জন্যে দেবতারা সমুদ্রমন্থন করছিল। এই মন্থনকালে একসময়ে সমুদ্র থেকে হলাহল বিষ উত্থিত হতে থাকে। সেই বিষে দেবতারা অজ্ঞান হয়ে যায় এবং সৃষ্টি ধ্বংসের সম্মুখীন এসে উপস্থিত হয়। দেবতাদের রক্ষা করার জন্য ভগবান শিব সেই মৃত্যুদায়ী বিষ পান করে। থেকে দেবতা শিবের কন্ঠ নীল হয়ে যায়। ভগবান শিব নীলকণ্ঠ নামে পরিচিত হতে থাকে। এই বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবতার একত্রীকরণ বিষয়টি এইরূপ –

> Apparently, the conception of this god has been modeled on the Hindu deity Siva, who is said to have saved the world from destruction by swallowing the poison that issued from the mouth of vasuki, the lord of serpents, while the gods and demons were churning the ocean together.[৯]

বৌদ্ধদেবতা নীলকণ্ঠ ও হিন্দু দেবতা শিবরূপী নীলকণ্ঠের মধ্যে সাদৃশ্যের নৈকট্যতা বজায় রয়েছে। বেদ-এ শিবকে এইজন্য আবার নীলগ্রীব ও শিতিকণ্ঠ নামে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে। বৌদ্ধ বজ্রযানে শিব আবার তিনটি বিভিন্ন মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেমন- ঈশান, মহেশ্বর ও মহাকাল। এই নামগুলি আবার হিন্দু পুরাণে স্বীকৃত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যে শিবের মহাকাল রূপের প্রকাশ পেয়েছে। সতীর দেহ নাশ হয়েছে সেসময় শিবের দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করতে এই মহাকাল রূপ ধারণ করেছিল। পুরাণে অষ্টদিকপালের শ্রেষ্ঠ হল ঈশান কোণের অধিষ্ঠিত দেবতা ঈশান। বৌদ্ধতন্ত্রে ঈশান কোণের অধিষ্ঠিত দেবতা ঈশান। যিনি বৃষারূঢ়, ত্রিশূলধারী, ব্যাঘ্রচর্মধারী ও পূর্ণচন্দ্রসদৃশ বর্ণ। হিন্দুপুরাণ মতে বিশ্বাস করা হয় - যখন আলোর উৎস ছিল না, অন্ধকারের কোন সন্ধান ছিল না, এমনকি দিন-রাতের কোনো ভেদাভেদ ছিল না, সৎ-অসৎ-এর কোন নমুনা ছিল না। তখন থেকে ভগবান শিবের অস্তিত্ব ছিল। বৈদিক সনাতন ধর্মের মূলগ্রন্থ বেদের শিরোভাগে বলা হয়েছে শিব 'এক কেবলম্'। সম্পূর্ণ বেদান্তে শিব ব্যতীত আর কোনো দেবতা সম্পর্কে এভাবে বলা হয়নি। সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র শিব বর্তমান ছিল।

যিনি লীলাচ্ছলে ব্রহ্মারূপে পৃথিবী সৃষ্টি করেছে, বিষ্ণুরূপ ধারণ করে পালন করেছে আবার রুদ্ররূপ ধারন করে সংহার করে থাকে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই তিনরূপের বিবর্তন আসলে একসাথে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এই তিনের ভিন্ন ভিন্ন রূপভেদ মাত্র। এই তিনরূপের মধ্যে আসলে এক সত্বার বিভিন্ন বাহ্যিক রূপ ফুটে উঠেছে শুধুমাত্র। শিব সৃষ্টির প্রাক্কালে বিষ্ণুকে উল্লেখ করেছে, শিব-বিষ্ণু-ব্রহ্মা এবং রুদ্র নামক দেবতারা আসলে প্রত্যেকে এক। এই চারের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। ভেদ থাকলে বন্ধন হতে পারে না। তথাপি এই শিবরূপ হল সনাতনরূপ। যা সকলের মূল স্বরূপ বলে কথিত রয়েছে, এবং সেইসঙ্গে সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ। ভগবান বিষ্ণু এবং তার অন্যান্য অবতারগণ সর্বদা শিবের উপাসনা করে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের আরাধ্য হিসেবে পরমেশ্বর শিবকে পাওয়া যায়। ভগবান শিবের বরে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের ভগবত্ব লাভ হয়েছিল। হিন্দুধর্মের মূল স্তম্ভ ত্রিশক্তির ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতার মধ্যে দেবতা শিবই প্রধান। তিনি সমসাময়িক হিন্দুধর্মের তিনটি সর্বাধিক প্রাচীন সম্প্রদায়ের অন্যতম শৈবসম্প্রদায়ের প্রধান দেবতা। শিব স্মার্তসম্প্রদায়ে পূজিত ঈশ্বরের পাঁচটি প্রধান রূপ যথা - গণেশ, শিব, সূর্য, বিষ্ণু ও দুর্গা। এইগুলির মধ্যে শিব একজন গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ হল ঋগ্বেদ (আনুমানিক ১৭০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্ব)। ঋগ্বেদে রুদ্র নামে এক দেবতার উল্লেখ রয়েছে। রুদ্র নামটি আজও শিবের অপর নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ঋগ্বেদে যাকে মরুৎগণের পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে; মরুৎগণ হলেন ঝঞ্ঝার দেবতাদের মধ্যে একজন। ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদে প্রাপ্ত রুদ্রম্ স্তোত্রটিতে রুদ্রকে নানা ক্ষেত্রে শিব নামে বন্দনা করা হয়েছে। এই স্তোত্রটি হিন্দুদের নিকট একটি অতি পবিত্র স্তোত্র। শিব শব্দটি ইন্দ্র, মিত্র ও অগ্নির বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হত। ভগবান শিবের পরবর্তীতে তৈরি হওয়া রুদ্ররূপটি বিশেষত ধ্বংস, সংহার ও প্রলয়ের মিলিত একটি রূপ। উদাহরণ –

> ঋগ্বেদে অগ্নি, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ভগ, অর্য্যামা, পূষা ও ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণের নিকট বৈদিক আর্য্যগণ সূত্র, বিত্ত, ঐশ্বর্য্য ও শত্রুনাশ প্রভৃতি কামনা করিয়াছেন। কিন্তু সংহারের দেবতা, মরুদগণের পিতা, উগ্র রুদ্রের নিকট তাহারা ভীত! অরণ্যপূর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশের যাযাবরগণের নিকট ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ, মেঘগর্জ্জন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ অত্যন্ত কষ্টদায়ক। তাই তাহারা রুদ্রকে প্রসন্ন করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন- হে রুদ্র! আমাদের মধ্যে যাঁহারা বৃদ্ধ, যাহারা বালক, সন্তান জনয়িতা ,এবং গর্ভস্থ সন্তান ও আমাদের পিতা মাতাকে বধ করিও না, আমাদের প্রিয় শরীরের অনিষ্ট করিও না। হে রুদ্র! আমাদের সন্তান এবং অপর সকলকে, আমাদের গো ও অশ্বদিগকে হিংসা করিও না। হে রুদ্র! তোমার কোপানল আমাদিগের বীরগণকে যেন হিংসা না করে, আমরা সর্ব্বদাই হব্য লইয়া তোমাকে আহ্বান করি।[১০]

পরবর্তীকালে শিব শব্দটি কেবলমাত্র রুদ্র ছাড়া আরও বেশ কিছু বৈদিক দেবদেবীদের অভিধা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

খ. মনসামঙ্গলকাব্য: মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গলকাব্য সব থেকে বেশি প্রাচীনতার দাবী রাখে। *ঋগবেদে*-এ প্রথম সর্প শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈন দেবতাদের মধ্যে পদ্মাবতী নামে একজন দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দেবী পদ্মাবতী তেইশতম জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের শাসন দেবী বা রক্ষয়িত্রী দেবী হিসেবে বিবেচিত হয়। শাসন দেবতা হিসেবে পার্শ্বযক্ষ নামক দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈন সাহিত্যে একটি গল্প প্রচলিত রয়েছে যেখান থেকে জানা যায় - তাপস কামাথ নামে এক শ্রমণ গাছের গুঁড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। ওই গাছের কোটরে থাকা এক নাগ ও নাগিনীর মৃত্যুবস্থা ঘনিয়ে আসে। তখন এই তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ এই দুই নাগনাগিনীকে ওই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। এই নাগদম্পতি মৃত্যুর পর ইন্দ্র বা ধরণেন্দ্র ও পদ্মাবতী নামে জন্মগ্রহণ করেছিল। যারা পরবর্তীকালে পার্শ্বনাথকে মেঘমালীর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। জৈন শ্বেতাম্বরপন্থীরা মনে করে পদ্মাবতী ধরণেন্দ্রর প্রধান পত্নীগণের অন্যতমা নয়। এই পার্শ্বনাথের মূর্তির সঙ্গে সর্বদা সাপের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। জৈন পদ্মাবতী দেবীর মূর্তিতে দেখা যায় হাতে সাপ এবং মুকুটে পার্শ্বনাথের ছোটো একটি মূর্তি ধারণ করে থাকে। এই দেবীকে জৈন শাস্ত্রে সাপের রক্ষয়িত্রী দেবী হিসেবে গণনা করা হয়ে থাকে। সর্পের সঙ্গে পার্শ্বনাথের সম্পর্ক ছিল আজন্মের –

> Before his birth the queen saw a black snake crawling by the side of her bed. So named him Parshwanatha from child the prince had a soft corner for snakes. In his youth he become a fearless warrior.[১১]

তান্ত্রিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে 'জাঙ্গুলী' নামে একজন দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বৌদ্ধদেবীর সঙ্গে মনসামঙ্গলকাব্যের মনসাদেবীর সাদৃশ্য রয়েছে। জাঙ্গুলীদেবীর প্রাচীনত্ব বুঝতে তন্ত্রশাস্ত্র নামক গ্রন্থে উল্লিখিত অংশ থেকে জানা যায় – ভগবান বুদ্ধ তার অনুগত শিষ্য আনন্দকে জাঙ্গুলীদেবীর পূজার মন্ত্র গোপনে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সাধনমালা গ্রন্থে সর্পদেবীকে জাঙ্গুলী নামে অভিহিত করা হয়েছে। যিনি সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং সর্প বিষ বিনাশকারী দেবী। সর্পদংশনের বিষ বিনষ্ট করতে এই দেবীর মন্ত্র অদ্বিতীয়। সেই যুগে এই জাঙ্গুলীদেবীর প্রভাব ছিল প্রকট। সর্প চিকিৎসককে বলা হত জাঙ্গুলিক। সাধনমালা গ্রন্থে দেবীর কিছু রূপচিত্রের

নিদর্শন পাওয়া যায়। ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যকুলের এই দেবী সম্পর্কে উল্লেখ্য – জাঙ্গুলীর নাম শুনলে সাপ পালিয়ে যায়, এই বিশ্বাস সেকালের বৌদ্ধদের ছিল। তার নাম করলে সাপের বিষ সঞ্চার করে না বলেও তাদের বিশ্বাস ছিল। এমনকি কোন ব্যক্তি সাপের মন্ত্র মুখস্ত করলে ওই ব্যক্তি সারাজীবন সর্প ভয় থেকে মুক্তি পেতে পারে। এই জাঙ্গুলীদেবী অথর্ববেদ-এর সর্পবিষ বিদ্যানিপুণা কিরাতকন্যা বা ঘৃতাচী এবং সরস্বতী দেবীর সমন্বিত মূর্তি। এই তিনটি চরিত্রের প্রভাব জাঙ্গুলী দেবীর মধ্যে কল্পনা করা হয়েছে। জাঙ্গুলী ও মনসাদেবীর অভিন্নতার কথা তার ধ্যানমন্ত্রে স্পষ্ট রয়েছে। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্যে মনসাকে জাগুলি নামে বন্দনা করা হয়েছে। তুর্কী আক্রমণের হাত থেকে প্রাণরক্ষা পাওয়া বৌদ্ধরা প্রাণ বাঁচাতে নেপাল, তিব্বত ও তিব্বত পেরিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। জাঙ্গুলীদেবী পৌঁছে যায় বিলোপের পথে, কিন্তু বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গলকাব্যে সামান্য এই নামটির অস্তিত্ব রয়েছে মাত্র। বৌদ্ধ ভাস্কর্যে ও সাহিত্যে নাগদেবতা এবং নাগগণের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করেছে। বৌদ্ধধর্মের সর্বজীবের প্রতি উদারতা এই নাগদের মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। তারা এখানে নবরূপ লাভ করেছে। বৌদ্ধশিল্পে ও সাহিত্যে নাগেরা হিংস্রতা হারিয়ে কোমল রূপের অধিকারী হয়েছে। তারা মানবের প্রতি ক্রূর দৃষ্টিবর্ষণ করেনি বরং তারা মানবের প্রতি সহানুভূতিশীল মনের প্রমাণ দিয়েছে। এই নাগেরা জলভাগের অধিবাসী, তারা বৃষ্টিপাতকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ছিল। বৌদ্ধসাহিত্যে নাগরাজ বিরূপাক্ষ-এর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নাগরাজ বিরূপাক্ষ যিনি চতুর্লোকপালের অন্তর্গত দেবতা। হিন্দুপুরাণ থেকে অষ্টনাগের কথা জানা যায়। তাদের মধ্যে বাসুকী, তক্ষক, শেষ, অনন্ত, কালীয় ও এলাপত্র এই সকল নাগেদের প্রাধান্য দেখা গেছে সমাজে। হিন্দুপুরাণ অনুসারে দেবতা বিষ্ণুর মাথার ওপর শেষনাগের ফণা থাকে। এই ফণার ওপর অবস্থান করে পৃথিবী। পুরাণে যখন অমৃতের সন্ধান চলেছিল তখন রজ্জু হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল বাসুকী নাগ। মঙ্গলকাব্যে বাসুকীনাগের সাহচর্যে মনসা বেড়ে উঠতে থাকে। সুমেরু পর্বতে ছিল এই রাজার রাজ্য, কিন্তু প্রধান বাসস্থান ছিল ভোগবতী-সমুদ্রতলের তিনহাজার যোজন দূরে। মনসামঙ্গলকাব্যগুলিতে উল্লিখিত রয়েছে – নাগরাজ্য অবস্থান করত পাতালপুরীতে, যাদের মেঘ-বৃষ্টিকে আয়ত্তে আনার নিদর্শন রয়েছে। নাগেদের সঙ্গে মনসার আরও কিছু সম্পর্কের কথা

জানা যায়। শিব মনসাকে তার কন্যার প্রমাণ দিতে বললে মনসা আপন মূর্তি ধারণ করেছে এইভাবে -

এতসুনি পদ্যাবতী আন্তরিক্ষ হইল।
জত সব নাগ লয়া সাজিতে লাগিল।।
নাগের হারে নাগের কঙ্কন নাগের বসন।
নাগের সঙ্খ সিন্দুর পদ্যার সাজন।।
নাগের খাট সিংহাসন নাগের বিছান।
নাগের ঝারিতে জল খায়ে নাগের বাটাতে পান।।
সাজিলেক পদ্যাবতি লইয়া নাগগণ।
ব্যার্ল্লিস নাগে হইল পদ্যার সাজন।।[১২]

বৌদ্ধসাহিত্যে নাগেদের এই অলৌকিক ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভিনিষ্ক্রমণের সময় ভবিষ্যৎ বুদ্ধকে নাগরাজ বরুণ, মনস্বী, সাগর প্রভৃতি নাগেরা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। মনসামঙ্গলকাব্যে দেখা যায় চাঁদ সওদাগর কালিদহের কাছে এলে মনসার আদেশে বরুণদেব ঝড়ের সৃষ্টি করেছে। বৌদ্ধসাহিত্যে এলাপত্র নাগের উল্লেখ রয়েছে। এই এলাপত্র নাগ ছদ্মবেশে বুদ্ধবাণী শ্রবণ করত, সর্বজ্ঞ বুদ্ধ এইকথা বুঝতে পেরে নাগকে তার স্বমূর্তিতে আহ্বান জানিয়েছে। এই নাগ তাতে সন্তুষ্ট হয়ে নিজরূপে ফিরে আসে।

নাগেদের শত্রু গরুড় এইকথা বৌদ্ধসাহিত্যে ও উল্লিখিত রয়েছে। গরুড়ের অত্যাচারে উৎপীড়িত নাগেরা ভগবান বুদ্ধের কাছে অত্যাচার থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে চেয়েছে। বুদ্ধ তখন বজ্রপাণি নামক দেবতাকে পাঠিয়ে, একটি চীবরকে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করে দিতে বলেন। এই চীবরের জন্য গরুড় নাগেদের আর ক্ষতি করতে সক্ষম হয় না। এই কাহিনি থেকে মঙ্গলকাব্যের মনসার সাপেদের মধ্যে শিবের কণ্ঠ থেকে নির্গত বিষের বিতরণ কাহিনি অনুপ্রাণিত একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বৌদ্ধকাহিনির মধ্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনি রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে – ভগবান বুদ্ধ *প্রজ্ঞাপারমিতা*[১৩] নামক বৌদ্ধ গ্রন্থটি এই নাগেদের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যতদিন মানুষ এই গ্রন্থের মর্যাদা রক্ষায় অক্ষম থাকবে ততদিন এই গ্রন্থের অধিকারী থাকবে নাগজাতি। নাগার্জুন এই *প্রজ্ঞাপারমিতা* গ্রন্থটি নাগেদের সংস্পর্শ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। মঙ্গলকাব্যের দেবী মনসা ও পাতালপুরীতে নাগেদের মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছেন। বহুপূর্বে তন্ত্রশাস্ত্রে এই দেবীর আরাধনা করা হয়েছিল। মঙ্গলকাব্যের মনসাদেবীর রূপের মধ্যে দিয়ে যেন সেই দেবীর রূপ পরিস্ফুটিত হয়েছে। বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ বিনয়বস্তুর অন্তর্গত *মহামায়ূরীবিদ্যা সূত্র*-এ

মনসাদেবীকে অমলে, বিমলে, নির্মলে দেবীকে ভূষিত করা হয়েছে। তন্ত্রে এই দেবী আধাত্ম্যলোকে অবস্থান করেছেন। মধ্যযুগের সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের মনসাদেবী কাব্যরসের সঞ্চার করেছেন। ভাস্কর্যের মধ্যে ধীরে ধীরে দেবী নাগরূপের পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমদিকে দেবদেবীমূর্তির পশ্চাৎভাগে বিজোর সংখ্যার ফণা নিয়ে অবস্থান করতেন। এই ফণার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে, যেমন - তিন, পাঁচ ও সাতটি ফণারও দৃশ্য দেখা গেছে। দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে এই মূর্তিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। নাগমূর্তিগুলির নীচের অংশে লেজযুক্ত হলেও ওপরের অংশে মানবরূপের প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। বৌদ্ধসাহিত্যে এই নাগরূপগুলি মঙ্গলকাব্যের মনসাদেবীর রূপ প্রদানে সাহায্য করেছে। রাজগীরে পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় কিছু নাগমূর্তির আবিষ্কার হয়েছে মনিয়ার মঠ থেকে। ওই নাগমূর্তিগুলি স্থানীয় মানুষের দ্বারা পূজিত হত বলে অনুমান করা যায়। স্থানীয় মানুষেরা মনে করে – এইসকল নাগেরা লখিন্দরের বাসরঘরে প্রবেশ করে তাকে দংশন করেছিল। ভারতবর্ষে বৃক্ষপূজা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। বৌদ্ধসাহিত্যে নাগেরা বৃক্ষদেবতা ও বর্ষণদেবতা রূপে পরিচিতি পেয়েছে। এলাপত্র নাগ ও বোধিবৃক্ষকে পূজা করেছে। বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে স্নুহী বৃক্ষের পূজার কথা জানা যায়। মঙ্গলকাব্যগুলিতে মনসাদেবীর অবস্থানের স্থানস্বরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় সীজবৃক্ষের নামের কথা। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসা 'সিজবৃক্ষে' অবস্থান করেছিলেন। মনসা ব্রতকথায় মনসা নিজ পূজার প্রচলন করতে গিয়ে বলেছেন, যে – আমি বাস করব ফণীমনসা গাছে। দশহরা আর নাগপঞ্চমীর দিন, ওই গাছের ডাল এনে বাড়িতে পুজো করো। প্রত্যেক বছর ভাদ্রমাসের শনি ও মঙ্গলবারে আমার পূজো করে পান্তাভাত ভোগ দিয়ো, তাহলে কখনও সাপের ভয় থাকবে না।[১৪] বাংলাদেশের রাজশাহী ও ময়মনসিংহ জেলা থেকে যে মনসামূর্তিগুলি পাওয়া গেছে সেখানে দেখা গেছে – দেবী মূর্তির স্কন্ধের দুইপাশ থেকে বৃক্ষশাখা রয়েছে। একটি মূর্তির ডানহাতে রয়েছে বৃক্ষশাখা। জৈনদেবী পদ্মাবতীর ইতিহাস থেকে জানা যায়, তিনিও নিম্ন হিমালয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার সহচর হল নাগরাজ বা শেষনাগ।

গ. চণ্ডীমঙ্গলকাব্য: মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীদেবী হলেন মিশ্রদেবী। তিনি স্থানভেদে নিজের রূপ পরিবর্তন করেছেন। তিনি কোথাও বিনাশের দেবী, কোথাও ভয়ঙ্করী, রণরঙ্গিণী মহাকালী রূপে অধিষ্ঠিতা হয়েছেন। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন ও অনার্য ভাবনার একত্রে মিলনের ফলে মঙ্গলকাব্যের এই চণ্ডীদেবীর

সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে। জৈনদের মোট ষোলোজন বিদ্যাদেবীর নাম জানতে পারা যায়। যাদের মধ্যে কালী, মহাকালী এবং গৌরী এই তিনটি নাম পাওয়া যায় -

> That the Jains set a very high value on learning is proved by the importance they ascribed to one class of divinities described by them as Vidyadevis. They are, according to the Jain tradition, sixteen in number, at whose head is Sarasvati, the one Sruta-devi, the goddess of learning *parexcellence.* They are known by such names as Rohi! Prajiiapti, VajraSririlkhaUi, Kali, Mahakiili, *Gauri,* Manavi and others among which we find the names of many. Yakshit is, but the iconography of these two orders is different.[১৫]

পরবর্তীকালে এই কালী এবং মহাকালী দুই দেবীর সঙ্গে শক্তিদেবীর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এই দেবীদের সঙ্গে পরবর্তীকালের মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীদেবীর যোগ থাকাটা তেমন কিছু আস্বাভাবিক নয়। অম্বিকা নামে একজন দেবীর নাম পাওয়া যায়। যিনি সিংহবাহনা, এই দেবীর সঙ্গে হিন্দু দেবী দূর্গার কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

বৌদ্ধ দৈবীভাবনায় মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীদেবীর রূপ বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য পাওয়া যায় বেশ কয়েকজন বৌদ্ধ দেবীদের মধ্যে। যারা হলেন প্রাথমিক ভাবে – বজ্রশারদা[১৬], নীলতারা[১৭], একজটা[১৮], বজ্রধাতেশ্বরী[১৯] এই সকল বৌদ্ধ দেবী। যাদের ঐতিহ্য গ্রহণ করে মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীদেবী সম্পূর্ণ রূপ লাভ করেছে এমনটা ধারণা করা যায়। এছাড়াও কিছু বৌদ্ধ দেবী ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবীর বৈশিষ্ট্যের সান্নিধ্যের কারণে জাঙ্গুলীতারা, পর্ণশবরী[২০], কুরুকুল্লা ও বাসুলী[২১]-কে চণ্ডীদেবীর পূর্বকালে প্রচলিত একটি রূপ বলে মনে করা হয়ে থাকে। কুরুকুল্লা যিনি অমিতাভের স্ত্রী নামে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দেবীর বেশ কয়েকটি সাধনার কথা জানতে পারা গেছে। যেমন – তিনি দুটি হাতে অবস্থান করে তার নাম *শুক্ল কুরুকুল্লা*। তিনি চতুর্ভুজা রূপে বিরাজ করে তখন তার নাম হয় হেবজ্রক্রম কুরুকুল্লা, উড্ডিয়ান কুরুকুল্লা ও কল্পোক্ত কুরুকুল্লা। এই দেবীর অষ্টভুজের মূর্তি পাওয়া যায়। এই দেবীর দর্শন ভীষণাকৃতি, বিকরাল বদন, মুণ্ডমালা গলায়, জ্বলৎপিঙ্গল কেশরাজি, ললজ্জিহ্বা প্রভৃতি। অনেক সময়ে ব্রাহ্মণ্যদেবী দুর্গার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীর সাদৃশ্য খোজার চেষ্টা করা হয়েছে। বৌদ্ধ মহাযান শাখার অক্ষোভ্যকুলের দেবী হলেন – একজটা ও পর্ণশবরী। এই বৌদ্ধদেবী একজটার মন্ত্র একবার শ্রবণ করলে অনুসরণকারীর নির্বিঘ্নতা আসে। ব্যক্তির নিত্য সৌভাগ্য আসে, ধর্মের প্রতি শুভভাবনা ফিরে আসে ও তার শত্রুর বিনাশ ঘটে। *সাধনমালা* গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে আর্য নাগার্জুন

ভোটদেশ থেকে এই দেবীর সাধনা উদ্ধার করে এনেছিলেন। এই দেবীর মূর্তি সম্পর্কে জানা যায়, একজটার রং নীল এবং তার মূর্তি ভীষণদর্শনা। তার কেশরাজি পিঙ্গলবর্ণ এবং অগ্নিশিখার ন্যায় মস্তকের উপর উত্থিত হয়ে থাকে সর্বদা। তিনি একমুখী, দ্বিভুজা এবং একটি হাতে কর্ত্রি ও অপর হাতে কপোল ধারণ করে থাকে। তিনি শবোপরি প্রত্যালীঢ় পদে লম্বমান ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই দেবীর চতুর্ভুজ ও অষ্টভুজের মূর্তি পাওয়া গেছে। বৌদ্ধদেবী নীলতারা একজটা নামে পরিচিত, উল্লেখ্য এই নীলতারা অনেক বেশি উগ্ররূপের প্রকাশ লক্ষ করা গেছে। *কালিকাপুরাণে* উল্লিখিত মঙ্গলচণ্ডী নামের আড়ালে বৌদ্ধদেবী নীলতারার অস্তিত্ব বহন করে চলেছে। অক্ষোভ্যকুলের অন্য একজন দেবী হলেন পর্ণশবরী। এই মূর্তির পদতলে গণেশের মূর্তি শোয়ায়িত অবস্থায় দেখা যায়। নীলতারা দেবীর সঙ্গে *চণ্ডী-রত্নামৃত* গ্রন্থে দেবীর বন্দনা অংশে বলা হয়েছে –

দুর্গতি-নাশিনী দুরিত-বাহিনী
দুর্জ্জন-ত্রাসিনী মুক্তকেশী
গিরীশ-নন্দিনী গিরিশ-বন্দিনী
গিরিশ-মোহিনী ঘোরবেশী
ভৈরবী ভীষণা মৃগেন্দ্র-আসনা
বিবশ-বাসনা ত্রিনয়না
... ...
অমর-সঙ্গিনী সমর-রঙ্গিণী
ভূভয়-ভঙ্গিনী ভয়ঙ্করী।[২২]

বজ্রধাতেশ্বরী দেবীর প্রভাব ও পড়েছে মঙ্গলকাব্যের দেবী চণ্ডীর ওপরে। বজ্রধাতেশ্বরী রত্নসম্ভব[২৩]-এর শক্তিস্বরূপিণী। চণ্ডীদেবীর মূর্তিকে ঘিরে যেমন কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ঘিরে থাকে। এই বৌদ্ধ শক্তিস্বরূপিণী দেবীকে ঘিরে কিছু দেবতারা অবস্থান করেন, যারা হলেন – মামকী[২৪], তারা[২৫], লোচনা[২৬] ও পাণ্ডরা[২৭]। এই বজ্রধাতেশ্বরীদেবী চণ্ডীদেবীর মতো বৌদ্ধ পশুকুলের দেবীরূপে পূজা পেতেন যার উল্লেখ পাওয়া যায় – এই বজ্রধাত্বেশ্বরী দেবীর সঙ্গে কতকগুলি হিংস্র পশুর সংস্রব দেখা যায়। সম্ভবত অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী মৃগয়া-জীবীর সমাজ থেকে এই বজ্রধাতেশ্বরী দেবী বজ্রযান বৌদ্ধ সমাজে প্রবেশ করেছেন। পঞ্চরক্ষা নামক বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থে পঞ্চদেবীর উপাসনার কথা জানা যায়। এই পঞ্চরক্ষার পুঁথি প্রায় সকল বৌদ্ধ গৃহস্থের বাড়িতে পাওয়া রক্ষিত হয়। তারা বিশ্বাস করে –

> হিন্দুদিগের যেরূপ চণ্ডী, বৌদ্ধদের সেইরূপ পঞ্চরক্ষা। পাঁচজন রক্ষাকর্তা দেবী বৌদ্ধ গৃহস্থকে সকল বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। বিপদ-আপদ, অসুখবিসুখ, ঋণযোগ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, গ্রহাদির পীড়া হইতে রক্ষা করিতে এই দেবীরা অদ্বিতীয়। বিপদ-আপদে এবং

> রোগাদিতে পঞ্চরক্ষা পুথি হইতে অংশবিশেষের পাঠ বজ্রযানী বৌদ্ধদের ভিতর এখনও প্রচলিত আছে। পঞ্চরক্ষার পুথি খুব যত্ন করিয়া লেখা হয়, ভালো কাগজে সোনালি-রুপোলি অক্ষরে, নানারূপ রঙিন ক্ষুদ্র চিত্র সহিত এই পুথিগুলি লেখা হয় এবং সময়ে সময়ে এই পুথিরই পূজা হয়।[২৮]

বজ্রধাতেশ্বরী দেবী পরবর্তীকালে হিন্দুদের বাসুলী দেবীতে পরিণত হয়েছিলেন। বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের প্রভাবে যখন শৈব ধর্মের প্রভাব নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। মানুষের ভাবনায় উঠে এসেছিল নতুন দৈবীকল্পনা। এই নতুন দেবতা ভাবনার মধ্যে নতুন দেবীর উদ্ভব হলেও, সেই দেবীকে হতে হয়েছিল শিবের পত্নী। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বজায় ছিল বৌদ্ধশক্তি বাসুলীর ক্ষমতা বহন করে। এই দেবীর পরিচয়ে বলা যায় তিনি অত্যন্ত উদ্যমশীলা, যা তার নামের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও ধরা পরে। তান্ত্রিকদেবী বিশালক্ষীর সঙ্গে বাসুলীদেবীর মিল রয়েছে বলে ধরা হয়। জাপানের সপ্তকোটি বুদ্ধমাতৃকা চনষ্টিদেবী এবং চণ্ডীদেবী সম-ঐতিহ্য বহন করেছে। 'চনষ্টী' ও 'চণ্ডী' শব্দ দুটির অর্থ করলে দাঁড়ায় 'অতি কোপনস্বভাবা বা কলহপ্রিয় নারী'। মঙ্গলকাব্যধারার কবি মুকুন্দরামের চণ্ডী বন্দনাতে দেবীর এই ভয়ংকর রূপের ছবি ধড়া পড়েছে এইভাবে –

> বিঘ্ন-বিনাশিনী ভৈরবী ভবানী
> নগেন্দ্রনন্দিনী চণ্ডী।
> মুরজ মন্দিরা বীণা সপ্তস্বরা
> বাজায়্যা দুন্দুভি ডিণ্ডি।।[২৯]

মহাবস্তু গ্রন্থে বুদ্ধদেব অভয়াদেবীর শরণ নিয়ে চরণবন্দনা করেছেন। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে দেখা যায় চণ্ডীর অন্যনাম অভয়া। এই নাম ব্যবহার করে লেখা হয়েছে অভয়ামঙ্গলকাব্য। ভক্তের মঙ্গলসাধনের জন্য সর্বমঙ্গলা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রবর্তিত হয়েছিল। এইরূপ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-এ কথিত রয়েছে। দেবীচণ্ডী আর্য বা অনার্য যেই গোষ্ঠীর থেকে উৎপন্ন হোক না কেন এইকথা বলতে হবে যে - ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও লৌকিক সকল গোষ্ঠীর শক্তিদেবতার পরিকল্পনা এই চণ্ডীদেবীর রূপচিন্তনে সাহায্য করেছে। জৈন ও বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দেবীদের সম্মিলিত রূপ মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী।

ঘ. ধর্মমঙ্গলকাব্য: ধর্মমঙ্গল মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যধারার একটি অন্যতম শাখা। এই কাব্যরচনার প্রধান উদ্দেশ্য দক্ষিণ বঙ্গের লৌকিক ও পৌরাণিক সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা দেবতা ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার করা। ধর্মমঙ্গলকাব্যের যে দীর্ঘকাহিনি পাওয়া যায় তার মধ্যে দুটি ভাগ রয়েছে, যথা - একটি পৌরাণিক ও অপরটি লৌকিক। পৌরাণিক খণ্ডের মধ্যে রয়েছে 'হরিশচন্দ্রের পালা' যেখানে দেখা যায় - রাজা হরিশচন্দ্র (কোনো কোনো পুথিতে হরিচন্দ্র) ও রানি মদনার সন্তানাদি

ছিল না বলে সমাজে উঁচু থেকে নীচু সকল মানুষের কাছে নানা প্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করতে হত। একদা রাজা-রানি সংসার ত্যাগ করে সাধনায় নিমজ্জিত হয়। একসময়ে ঘুরতে ঘুরতে তারা বল্লুকা নদীর তীরে সন্ন্যাসীর থেকে ধর্মঠাকুরের পূজার পদ্ধতি জেনে, তারা পুত্রকামনা করে ধর্মপূজা করে। দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে তারা চন্দ্রবাণে ঝাঁপ দেয়। দেবতার কাছে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় বারোবছর পর ধর্মের নিকট এই সন্তানকে বলি দিতে হবে। এই শর্তে তারা ধর্মঠাকুর-এর থেকে পুত্রবর গ্রহণ করে। কালক্রমে লুইচন্দ্র নামে তাদের একটি সর্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। কিছু সময় পরে রাজা-রানি ধর্মদেবতাকে দেওয়া তাদের প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়। উল্লুক মারফত লুইচন্দ্রের খবর পেয়ে যথাকালে ধর্মঠাকুর এক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে উপস্থিত হয় হরিশচন্দ্রের রাজদরবারে। সে রাজার অন্দরমহলে এসে জানায় যে তিনি পূর্ব দিন থেকে উপবাস রয়েছে, শুনে রাজা তাকে উপবাস ভঙ্গ করতে অনুরোধ করলে, সে লুইচন্দ্রের মাংস খেতে চায়। এই কথা শুনে রাজা ও রানি তাকে কাতর অনুনয়-বিনয় করতে থাকে এই ইচ্ছা ফিরিয়ে নিতে। সে উল্টে বলে লুইয়ের মাংস না পেলে সে অনাহারে চলে যাবে। হরিশচন্দ্র রাজি হলে সে তাদেরকে তার সঙ্গে বসে পুত্রমাংস ভক্ষণ করার আদেশ দেয়। অগত্যা রাজা ও রানি লুইচন্দ্রকে খড়্গাঘাতে হত্যা করে তার মাংস রন্ধন করে। সেই মাংস খাওয়ার পূর্বে ব্রাহ্মণবেশ ছেড়ে ধর্মঠাকুর স্ববেশ ধারণ করে। তাদের হাতে তাদের প্রিয় সন্তান লুইচন্দ্রকে ফিরিয়ে দেয়। তখন তারা লুইচন্দ্রের মুখ থেকে জানতে পারে তাকে সন্ন্যাসী নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল। ধর্মঠাকুরের মায়ায় হরিশচন্দ্র মায়া-লুইকে হত্যা করেছিল। তারা আসলে লুইকে নিজের কোলে লুকিয়ে রেখে ধর্মঠাকুর রাজা ও রানিকে পরীক্ষা করছিল। পুত্রকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেয়ে রাজা ও রানি মহাখুশি হয়ে মহাসমারোহে ধর্মপূজার আয়োজন করে।[৩০]

এই কাহিনিটি অতি প্রাচীন বলে মনে করা হয়। অনুমান করা হয় পূর্বে ধর্মপূজার আসরে কেবল এই উপাখ্যানটি গীত হত। আজও ধর্মপূজার দ্বিতীয় দিনে এই অংশটি গীত হয়। সকল ধর্মমঙ্গলকাব্যে এই কাহিনিটি রয়েছে। কোনো কোনো ধর্মমঙ্গলকাব্যে আবার লাউসেনের প্রধান উপাখ্যানটির বদলে কেবল এই গল্পটি স্থান পেয়েছে। ধর্মমঙ্গলকাব্যে জৈনধর্মের প্রভাব ধরা পড়ে এই কাহিনিতে বর্ণিত রাজা হরিশচন্দ্র আর রানি মদনার দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখতে কৃচ্ছসাধনার মধ্যে দিয়ে। এবং বল্লুকার তীরে তারা বাঘের ছাল বিছিয়ে বসে থাকা ব্রহ্মচারীর কাছে ধর্মপূজা পদ্ধতি শিক্ষালাভ

করেছিল। এই ধরণের ব্রহ্মচারীদের কথা হিউয়েন সাং তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন - এখনও গায়ে ছাইভস্ম মেখে একদল সন্ন্যাসী হাতে কমণ্ডলু নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বাংলাদেশে। এই ধরনের সন্ন্যাসী রাঢ়দেশে বেশি দেখা যেত। জৈনগ্রন্থ *আচারাঙ্গ সূত্র* থেকে জানা যায় মহাবীরের রাঢ় বঙ্গে প্রবেশের ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রতিকূলতার কথা। পরবর্তীকালে জৈনধর্মের প্রভাব পড়েছিল এই রাঢ় দেশে। তাই রাঢ়ের কাব্য ধর্মমঙ্গল-এ রানি মদনা লুইচন্দ্রকে বধ করতে বলা ব্রাহ্মণবেশী ধর্মঠাকুরকে বলেছে -

অহিংসা পরম ধর্ম   তবে কেন হেন কর্ম্ম
ব্রহ্মময় অতিথি হইয়া।।[৩১]

ধর্মমঙ্গলকাব্যের দেবতা ধর্মঠাকুরের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সরাসরি যোগ রয়েছে। ধর্মঠাকুরের পূজা করে ডোমশ্রেণির মানুষেরা। এই দেবতার প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল বল্লুকার তীরে। ধর্মঠাকুরের শক্তিদেবীর নাম কামিন্যা। শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র *ধর্ম্মপূজাবিধি* নামে একটি পুথি আবিষ্কার করেছিলেন যেখান থেকে ধর্মঠাকুরের পূজাবিধি ও মন্ত্র পাওয়া জায়। এই মন্ত্রগুলি থেকে বৌদ্ধধারণা আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সমগ্র বাংলার ধর্মঠাকুরের বিভিন্ন মন্দিরে ভ্রমণ করে। তাদের পূজাপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে ধর্মঠাকুরের মধ্যে যে এখনও বৌদ্ধধর্ম জীবিত আছে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন -

> ধর্মঠাকুরের মূর্তি কচ্ছপের ন্যায়। এইটি বুঝিতে হইলে বৌদ্ধধর্মের অনেক কথা বুঝিতে হয়। বৌদ্ধদের তিনটি রত্ন ছিল। তিনটিই উপাসনার বস্তু- বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ। বুদ্ধ বলিতে শাক্যসিংহ বুঝাইত, ধর্ম বলিতে গ্রন্থাবলী বুঝাইত এবং সংঘ বলিতে ভিক্ষুমণ্ডলী বুঝাইত। কোনো কোনো সম্প্রদায় বুদ্ধকে প্রথম স্থান না দিয়া ধর্মকেই প্রথম স্থান দিতেন। তাঁহাদের মতে ত্রিরত্ন হইত "ধর্ম, বুদ্ধ ও সংঘ"। ক্রমে ধর্ম বলিতে স্তূপ বুঝাইত। পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে মহাযান মতে শাক্যসিংহ কেবলমাত্র লেখক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন – ত্রিরত্নের মধ্যে তাঁহার স্থান নাই। সেখানে ধ্যানীবুদ্ধেরা আসিয়া উপস্থিত হিয়াছেন। এই সকল ধ্যানীবুদ্ধ অনাদি ও অনন্ত। ধ্যানীবুদ্ধগণের মন্দির ক্রমে স্তূপের গায়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্থাৎ ধর্ম ও তথাগত এক হইয়া গেল। [৩২]

বৌদ্ধ ত্রিরত্ন স্তূপের গায়ে একসময় কুলুঙ্গি কেটে অমিতাভ, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমোঘসিদ্ধি এবং মূল ধ্যানীবুদ্ধ এই সকল বৌদ্ধদেবতাদের মিলিয়ে কুলুঙ্গি কাটা স্তূপের রূপ দেখতে অনেকটা মনে হয় কচ্ছপের মতো। স্তূপকে আবার ধরা হত ধর্মের প্রতিমূর্তি হিসেবে। ধর্ম-স্তূপ-কচ্ছপাকৃতি বৌদ্ধ এই তিন একদেবতা হয়ে ধরা দিয়েছিল। বৌদ্ধদের শূন্যবাদ নিরঞ্জনের শূন্যমূর্তি নির্মাণে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। শুন্যাকার যে ধর্মশিলা সেটি বৌদ্ধদের প্রভাবজাত শূন্যবাদী ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

এইজন্য ধর্মমঙ্গলকাব্যের আদিগ্রন্থ *শূন্যপুরাণ* এবং *ধর্মমঙ্গল* এই দুইয়ের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে শূন্যবাদী বৌদ্ধদের সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ধর্মদেবতার উৎসব মূলত বৈশাখী পূর্নিমায় পালিত হয়, যা আসলে বুদ্ধপূর্ণিমা। ধর্মপূজার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হল শঙ্খ তেমনি বৌদ্ধদের একটি ব্যবহৃত উপাদেয় ছিল শঙ্খ।

হিন্দুদের বেশ কিছু দেবদেবীকে ধর্মঠাকুরের উৎস দেবতা বলে মনে করা হয়। যারা হলেন সূর্য, বরুণ, বিষ্ণু, যম ও শিব। ধর্মমঙ্গল কাব্যানুযায়ী বিশ্বাস করা হয় ধর্মঠাকুর হলেন সর্বোচ্চ দেবতা। তিনি মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও ধারক। তার স্থান ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের এই তিন দেবতার ঊর্ধ্বে। কোথাও কোথাও ধর্ম নিজে এই তিন দেবতার সমতুল্য। ধর্মঠাকুর বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনি আদিদেবতা এমনটা শূন্যপুরাণ গ্রন্থ থেকে জানা যায় -

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চীন।
ববী সসি নহি ছিল নহি বাতি দিন।।
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দাব ন ছিল ন ছিল কৈলাস।।
নহি ছিল ছিষ্টি আর নহি ছিল চলাচল।[৩৩]

ধর্মরাজের প্রসঙ্গে শিবের সাযুজ্যের কথা বলতে গিয়ে উঠে আসে শিবের গাজনের কথা। ধর্মের উৎসবের নাম দেওয়া হয়েছে ধর্মের গাজন। শিবলিঙ্গের নমুনা হিসেবে যেমন পাথর ব্যবহৃত হয় তেমনি ধর্মঠাকুরের মূর্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয় পাথর টুকরো। পাথরের গায়ে আবার সোনা বা রূপোর চোখ তৈরি করা হয়ে থাকে। শিবের অবস্থান যেমন কৈলাসে তেমনি ধর্মরাজকে *ধর্মপূজা বিধান*-এ কৈলাস থেকে আহ্বান করা হয়েছে। পুরাণে হিন্দুদেবতা যমের আরেক নাম হিসেবে পাওয়া যায় ধর্মরাজ শব্দটি। স্কন্দ পুরাণে স্বয়ং শিব যমকে স্তত্তি করে ধর্মরাজ আখ্যা দিয়েছে। দেবতা যমের রং ধবল তেমনি ধর্মরাজের বর্ণ ও সাদা যা মঙ্গলকাব্য থেকে পাওয়া যায়। সুকুমার সেন মনে করেছেন - ধর্মদেবতার সঙ্গে হিন্দুদেবতা বরুণের সম্পর্ক নিগূঢ়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত রাজা হরিশচন্দ্র ও তাহার পুত্র রোহিতের যে কাহিনি রয়েছে। সেই কাহিনির সঙ্গে ধর্মমঙ্গলকাব্যে বর্ণিত হরিশচন্দ্র ও লুইচন্দ্রের কাহিনির যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। দেবতা বরুণ মূলত পুত্রদানের জন্য বিশেষ পরিচিত দেবতা। তেমনি রাজা হরিশচন্দ্রকে ধর্মরাজ পুত্রবর দান করেছিল। ধর্মদেবতার সঙ্গে বিষ্ণুর সম্পর্ককে

অস্বীকার করা যায় না। বিষ্ণুর এক অবতার কচ্ছপ তেমনি ধর্মের প্রতীক পাথর খণ্ড হয় কচ্ছপাকৃতি। ধর্মমঙ্গলকাব্যে একাধিকবার ধর্ম দেবতা বিষ্ণু বা কৃষ্ণের মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে –

দেখি যদি চতুর্ভুজে   তবে প্রভু পদাম্বুজে
মজে চিত্ত মেগে লব বর ।
শুনি স্নেহে মায়াধারী   হল ভক্ত মনোহারী
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর।।[৩৪]

বিষ্ণুর অবতার রামরূপের মধ্যে ধর্মদেবতার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পশু হল হনুমান, তেমনি ধর্ম ঠাকুরের বাহন উলুক বা হনুমান। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে হিন্দুদেবতা সূর্যের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। দেবতাসূর্য বেদে ও পুরাণে কুষ্ঠরোগের প্রতিকার করে তেমনি ধর্মঠাকুর কুষ্ঠরোগ প্রতিকারের দেবতা হিসেবে রাঢ় বঙ্গে প্রচলিত। সূর্যের আকৃতি গোলাকার সেদিক থেকে ধর্মের শূন্যমূর্তির সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য রাখে। কোথাও কোথাও ধর্মদেবতার বাহন রূপে পাওয়া যায় ঘোড়াকে, তেমনি সূর্যের সঙ্গে ঘোড়ার সম্পর্কের কথা মনে করায়।

ঙ. অন্নদামঙ্গলকাব্য: অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের দেবীদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য দেবী হল অন্নদাদেবী। মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্য রচয়িতা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এই অন্নদামঙ্গলকাব্যটি রচনা করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের কাব্য ছাড়া অন্য কোনো অন্নদামঙ্গলকাব্য বাংলা মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে পাওয়া যায় না। এই কাব্য মধ্যে দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মধ্যযুগের অবসানকালে (১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ) ভারতচন্দ্র এই কাব্য রচনা করেছিলেন। বাংলাদেশে প্রতিমায় এই অন্নপূর্ণাদেবীর পূজার প্রচলন করেছিলেন। তৎকালীন ভারতচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র-এর অনুরোধে ভারতচন্দ্র এই মঙ্গলকাব্যটি রচনা করেছিলেন। মঙ্গলকাব্যের রচয়িতার প্রাপ্ত 'রায়গুণাকর' উপাধি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের থেকে পাওয়া। এই মঙ্গলকাব্যটির নাম *অন্নদামঙ্গলকাব্য* হলেও, এইখানে মোট তিনটি খণ্ড রয়েছে। যথা - (ক) অন্নদামঙ্গল বা অন্নদামাহাত্ম্য, (খ) বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল (গ) মানসিংহ বা অন্নপূর্ণামঙ্গল। অন্নদামঙ্গল খন্ডে দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাহিনির প্রারম্ভে দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, শিব-পার্বতীর বিবাহ এই সকল পৌরাণিক কাহিনিগুলি তুলে ধরা হয়েছে। অন্নদামঙ্গলকাব্যের অন্নদাদেবীর সঙ্গে আগামবাগীশের তন্ত্রসার গ্রন্থে বর্ণিত অন্নপূর্ণা ভৈরবী নামে একজন দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। অন্নপূর্ণা দেবীর ধ্যানে দেবীর রূপ বর্ণনা করা হয়েছে, এইভাবে – রক্তবর্ণা, বিচিত্র বস্ত্রপরিহিতা, মস্তকে অর্ধচন্দ্রভূষিতা, অন্নপ্রদানরত,

স্তনভারনম্রা, নৃত্যকারী চন্দ্রশেখরকে দেখে আনন্দিতা দু:খনাশিনী ভগবতীকে ভজনা করি।[৩৫] অন্নদামঙ্গলকাব্যের দেবীর ধ্যানে বলা হয়েছে -

কৃপাবলোকন কর ভক্তের দুরতি হর
দারিদ্র্য দুর্গতি কর চূর্ণ
তুমি দেবী পরাৎপরা সুখদাত্রী দুঃখহরা
অন্নপূর্ণা অন্নে কর পূর্ণা।।[৩৬]

এই দেবীর সঙ্গে হিন্দু পৌরাণিক দেবী লক্ষ্মী ও দূর্গার যথেষ্ট মিল লক্ষ করা যায়। অন্নপূর্ণা দেবীর যেই মূর্তিটি পূজিত হয়, বাংলাদেশে সেখানে দেখা যায় - দেবীর পাশে কুবের দণ্ডায়মান থাকে। এই কাব্যের পৌরাণিক অংশের সঙ্গে মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গলকাব্য*-এর পৌরাণিক অংশের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। অন্নদামঙ্গলকাব্যের কৌষিকী বন্দনা অংশে, দেবীর অন্য নাম হিসেবে চণ্ডীর নাম পাওয়া যায় -

কৌষিকি কালিকে চণ্ডিকে অম্বিকে
প্রসীদ নগনন্দিনি
চণ্ড বিনাশিনি মুণ্ডনিপাতিনি
শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনি।।[৩৭]

এই কাব্যে লক্ষ্মীদেবীর বন্দনা করা হয়েছে। অন্নপূর্ণাদেবীর হাতে অমৃতের পানপাত্র দান করা হয়েছে।

চ. শীতলামঙ্গলকাব্য: শীতলাদেবীর প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে রয়েছে। এমনকি বর্তমান ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এই শীতলাদেবীর পূজাপদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়। শীতলা বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এই রোগের বৃদ্ধি ও প্রশমন দুটোই তিনি করতে পারতেন। শীতলাদেবীর সঙ্গে বৌদ্ধ হারিতি দেবীর যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। নেপালে বৌদ্ধ হারিতি দেবীকে বসন্তরোগের উপশমকারী দেবীরূপে পূজা পেতে দেখা গেছে। নেপালের বৌদ্ধমন্দিরের পাশে এই দেবীর মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এই দেবীর মূর্তি দুইভাবে পাওয়া গেছে - কোথাও তিনি সন্তান হরণকারিণী রূপে আবির্ভূত, কোথাও তাকে সন্তানকে দুধ দান করতে দেখা গেছে। মঙ্গলকাব্যে শীতলাদেবীকে চৌষট্টি রোগের ভার দেওয়া হয়েছে। রোগ নিরাময়ের কথা উল্লিখিত রয়েছে – যেখানে শিব জ্বর-জ্বালাসহ চৌষট্টি বসন্তের ভার দেওয়া হয়েছে এই শীতলা দেবীর হাতে। শীতলা দেবীকে ব্রহ্মার দুহিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে -

গাইলাম গোলককাণ্ড পদ্মকল্প সুধাখণ্ড
ব্রহ্মাকল্প ভক্ত ব্যাস ব্রহ্ম।
বরাহকল্পের হর্দ্দে ব্রহ্মার ঔরষ পড়মে পদ্মে
সুন শীতলার পূণজন্ম।[৩৮]

এই শীতলাদেবীর স্তব পাওয়া যায় স্কন্দপুরাণের অবন্ত্যখণ্ডে মর্কটেশ্বরের তীর্থমহিমা বর্ণনা অংশে। যেখানে তাকে দারিদ্র দূরকারী দেবী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হিন্দুদের অর্থাভাব নাশকারী দেবী হিসেবে পূজিতা হয় লক্ষ্মীদেবী। শীতলাদেবীকে দুর্গার অংশ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে মঙ্গলকাব্যে। শীতলাদেবী যেমন প্রথমে ভয়ংকরী হয়ে নিমার সন্তানদের প্রাণ নাশ করেছে। পরে আবার নিমার কান্না শুনে তার সন্তানদের প্রাণদান করেছে।[৩৯] হারিতি দেবীর জীবনে দুটি পর্যায়ে সম্পূর্ণ হয়েছে প্রথমে তিনি ছিলেন কলঙ্কিত দেবী, যিনি ত্রাস সৃষ্টি করতেন। পরবর্তীকালে ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদে এই দেবী সকলের ভালো করতে এগিয়ে এসেছেন। প্রথমে তিনি শিশুবিনষ্টির মধ্যে দিয়ে নিজের অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখিয়েছেন। জরাসুর নামক অসুরের মাধ্যমে দেবী তার রোগের প্রকোপবৃদ্ধি বা নিরাময় করে দিতে পারতেন। হরিদেবের শীতলা মঙ্গলকাব্যে কবি বলেছেন -

জরাসুর হরিষে রাজপুর প্রবেশে
ধরিলে নৃপতিতরে
প্রিতিব বসন্ত বড়ই দুরন্ত
রোগগণ চারিদিগে ধরে।
... ...
নগরে নগরে নৃপতির পুরে
জত ছিল অপর জন
রাজার মহিনি তাহারে ধরিলে
কোপেতে বসন্তগণ।
রাজার নন্দন আছিল ছয় জন
প্রধানে রাখিয়া তার
নৃপতিদুহিতা চলিলেন তথা
গলে জার রতনের হার।[৪০]

হিন্দুদেবী শীতলা ও বৌদ্ধদেবী হারিতি উভয়ে বসন্তরোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। উভয়দেবীর পূজারি ছিলেন ডোম পুরোহিত।[৪১] এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা মঙ্গলকাব্যের দেবীর সঙ্গে বৌদ্ধদেবীর যোগ আরও স্পষ্ট হয়েছে। পূর্বে মানুষের প্লেগ, কলেরা, মহামারি প্রভৃতি দেখা দিলে মানুষ অক্ষোভ্যকুলের দেবী পর্ণশবরীর পূজা করে, হোম করে বায়ুকে শুদ্ধ করতেন। এই দেবীর দুখানি প্রস্তরমূর্তি পূর্ববঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে। যা থেকে অনুমান করা যায়, সেই সময়ে পাকামন্দিরে এই দেবীর পূজার প্রচলন ছিল।[৪২] পর্ণশবরী দেবীর রং পীতবর্ণ, পর্ণভূষণা, পর্ণবসন, পরিহিতা ও প্রত্যালীঢ় পদে মারীরূপ বিঘ্নকে দলিত করেন। শীতলা মূর্তিতে ধরা পড়ে শ্বেতাঙ্গী, দিগম্বরী বিস্ফোটক, গলগণ্ড ও জ্বরপ্রদাহদায়িনী।

পর্ণশবরীর অর্চনা করে যেমন মারের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, তেমনি মঙ্গলকাব্যের এই দেবীর পূজা করে রাজা তার সন্তানদের ফিরিয়ে পেয়েছেন।

ছ. ষষ্ঠীমঙ্গলকাব্য: ষষ্ঠীদেবী বেদবহির্ভূতা, অর্বাচীন পুরাণে এই দেবীর পূজার কথা বলা হয়েছে। এই দেবীর বাহন কালো বিড়াল, শিশুর রক্ষাকর্তৃরূপে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এই দেবীর সঙ্গে পরবর্তীতে পৌরাণিক দেবী দুর্গার সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। এই দেবী বিশেষ করে সন্তান প্রদানকারী দেবী। সন্তান পরিবৃত্তা হয়ে এই দেবীর অধিকাংশ মূর্তিগুলি পাওয়া গেছে। এই দেবীর সঙ্গে আবার জৈনদেবী অম্বিকার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। জৈন তীর্থঙ্কর নেমিনাথের শাসনদেবী রূপে পাওয়া যায় এই দেবীকে। জৈন ইকাসিনি অম্বিকা দেবীর কোলে ও আশেপাশে কয়েকজন শিশুর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।[৪৩] বৌদ্ধ হারিতিদেবীর সঙ্গে ষষ্ঠীদেবীর সাদৃশ্যের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। প্রাচীনকাল থেকে দেখা গেছে শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিবসে সুতিকাগৃহে ষষ্ঠীদেবীর পূজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যের নায়ক-নায়িকার জন্মলাভের পরে ষষ্ঠীপূজা করতে দেখা গেছে। কালকেতুর জন্মের পরে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করা হয়েছিল -

গোমুণ্ড স্থাপিল ষষ্ঠী দ্বার-ডানি-ভাগে।
পূজা করি ধর্ম্মকেতু তারে বর মাগে।।
তিন দিনে নিদয়ার সুপথ্যি পাচন।
ছয়দিনে ষাটিয়ারা কৈল জাগরণ।।
অষ্টডীণে অষ্টকলাই কৈল ধর্ম্মকেতু ।
নয়দিনে নবনত্তা কৈল শুভ হেতু।।
আনরূপ ব্যাধসুত দিবসে দিবসে।
ষষ্ঠী –পূজা কৈল তার একত্রিশ দিবসে।।[৪৪]

শীতলাদেবীকে স্ত্রী-সমাজের পূজ্য দেবী হিসেবে বেশি পরিচিত। এই দেবীর কর্মবিধি ও রূপ বৈশিষ্ট্য দেখে অনুমান করা যায়, পৃথিবী সৃষ্টির আদিকাল থেকে শিশুর মঙ্গলার্থে যেসকল দেবীর উদ্ভব হয়েছিল তাদের সকলে একত্রে ষষ্ঠীদেবীর মধ্যে এসে মিলিত হয়েছে। বাংলাদেশে এই জন্য বারোমাসের মধ্যে বিভিন্ন ষষ্ঠীদেবীর উদ্ভব ঘটেছে। রুদ্ররাম চক্রবর্তী রচিত ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে তিনটি কাহিনি পাওয়া গেছে, যেখানে সবগুলিতে পৌরাণিকতার ছাপ রয়েছে।[৪৫] প্রথম কাহিনিতে বলা হয়েছে কার্তিকের কথা। দ্বিতীয় কাহিনিতে রয়েছে রাজা ক্ষেত্রমিশ্রের মাতা দেবীষষ্ঠীর আশীর্বাদে পুত্রলাভ ও রাজ্যলাভের কাহিনি। তৃতীয় কাহিনিতে রয়েছে কলাবতীর উপাখ্যান। বাংলাদেশে প্রাচীন কাল থেকে সূতিকা গৃহে শিশু জন্মের ষষ্ঠ দিনে এই ষষ্ঠদেবীর পূজা হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে এই রীতির বিধান পাওয়া

যায়।[৪৬] বৌদ্ধদের তান্ত্রিক সমাজের দেবী হারিতি। যাকে বৌদ্ধভাস্কর্যে শিশু-পরিবৃতা, একটি শিশুকে মাতৃস্তন্য দানরত, কাঁধে দুটি শিশু, পায়ের কাছে শিশুরা খেলা করছে। এই শিশুদের মুখে মাতৃসাহচর্যের আনন্দের রেখা ফুটে উঠেছে। বৌদ্ধকাহিনিতে পাওয়া যায় এই দেবীর পাঁচশো সন্তান ছিল, যার মধ্যে চারশো নিরানব্বইটি সন্তান সে নিজেই হত্যা করে। সর্বকনিষ্ঠ সন্তান পিণ্ডোলকে গৌতমবুদ্ধ ঝোলার মধ্যে লুকিয়ে রাখে, এই ঘটনায় লজ্জিতা যক্ষিণী ভগবান বুদ্ধের কাছে এসে নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চায়। সে সন্তানদাত্রী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা পায়।[৪৭] প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কারকে লক্ষ করে একথা বলা যায় যে প্রাচীনকাল থেকে সমাজে শিশুর রক্ষাকর্তৃ এবং গৃহ-দেবতা রূপে একজন দেবীর পূজা হত। এই দেবীর সঙ্গে ষষ্ঠীদেবীর সদৃশ থাকাটা অসম্ভব নয়।

জ. কালিকামঙ্গলকাব্য: মঙ্গলকাব্য ধারার মধ্যে কালিকামঙ্গলকাব্যের কয়েকটি উদাহরণ পাওয়া যায়। তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে এই দেবীর পৌরাণিকতা দান করা হয়েছে। লিঙ্গপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি পুরাণগুলিতে বেশ কিছু কাহিনির সঙ্গে কালিকামঙ্গলের কাহিনির বেশ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কালীদেবীর আবার বেশ কয়েকটি ভিন্নরূপের পূজা পাওয়ার কথা জানা যায়। যেমন - ভদ্রকালী, রক্ষাকালী, শ্মশানকালী, নিশিকালী, মহাকালী, উন্মত্তকালী প্রভৃতি। আগমবাগীশের *তন্ত্রসার* গ্রন্থে এই ভদ্রকালীর ধ্যান পাওয়া গেছে। দেবীর কল্পনা অনেকটা এইরূপ – মসীমলিনমুখী, মুক্তকেশী, রুদ্রমূর্তি, এবং অতৃপ্ত বদন জগতকে গ্রাস করতে চাইছে। কালীমূর্তির কিছু নমুনা প্রাচীন ভাস্কর্যের মধ্যে পাওয়া যায়। কলকাতার কালীঘাটের মূর্তিতে এই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। এই কালীকে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আরাধনা করা হয়েছে। কালিকামঙ্গলকাব্যের যে কাহিনি পাওয়া যায়, সেই কাহিনির সঙ্গে জৈন কবি রাজশেখর সুরির লিখিত কাহিনির যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। কালীদেবীর সঙ্গে বৌদ্ধ রত্নসম্ভবকুলের দেবী অপরাজিতা, বজ্রযোগিনী ও প্রসন্নতারা এই সকল দেবীদের নৈকট্য লক্ষ করা যায়। নালন্দা থেকে অপরাজিতা-র একটি মূর্তি পাওয়া যায় যেখানে দেখা যায় দেবীর পায়ের নীচে গণেশের অবস্থান। এই দেবীর হাতে চপেট-মুদ্রা থাকে। বামে পাশযুক্ত তর্জনি থাকে। এই দেবীর মুখ অতি ভয়ংকর, করাল এবং রৌদ্র।[৪৮] বজ্রযোগিনী দেবী যাকে দেখতে হিন্দুদেবতা ছিন্নমস্তার ন্যায়। এই দেবী নিজের মস্তক দক্ষিণ হস্তধৃত কর্ত্রি দ্বারা কর্তিত করে বাম হাত বক্ষের কাছে ধারণ করে। এই দেবীর বামপদ সংকুচিত ও ডানপদ প্রসারিত থাকে। তার কবন্ধ থেকে নিঃসৃত একটি রক্তের ধারা

দেবীর মুখে যায়, বাকি দুটি ধারা যায় তার পাশে অবস্থানকারী যোগিনীদের মুখে। বৌদ্ধদেবী প্রসন্নতারা এই দেবীর মূর্তি অতি ভয়ংকর –

> বদনমণ্ডল ক্রোধোদ্ভাসিত, অগ্নিশিখার ন্যায় তাঁহার পিঙ্গল কেশরাজি মস্তকের উপর উত্থিত হয়। তিনি অষ্টমুখা ও ষোড়শভুজা। আটটি দক্ষিণ হস্তে খট্বাঙ্গ, উৎপল, বাণ, বজ্র অঙ্কুশ, মুদ্গর, কর্ত্রি এবং অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করেন। আটটি বাম হস্তে পাশযুক্ত তর্জনী, কপাল, ধনু, খট্বাঙ্গ , বজ্র, পাশ, বক্ষমুণ্ড এবং রত্নপূরিত ঘট ধারণা করিয়া থাকেন। দেবী প্রত্যালীঢ় পদে দাঁড়াইয়া বাম পদে ইন্দ্রকে এবং দক্ষিণ পদ দ্বারা উপেন্দ্রকে দলিত করেন এবং দুই পদের মধ্যে রুদ্র, ব্রহ্মা ও অপরাপর মারগণকেনিষ্পেষিত করিয়া থাকেন।[৪৯]

বাংলা মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যের ধারায় কালিকামঙ্গলকাব্যের কাহিনি বিদ্যাসুন্দরের পালাটিতে দেবীর ধ্যানবর্ণনা অংশে এইরূপ দর্শন পাওয়া যায়।

ঝ. সারদামঙ্গলকাব্য: সারদা বা সরস্বতী দেবী হলেন বিদ্যা বা চারুকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই দেবীর কল্পিত মাহাত্ম্য রচনা করা ছিল কবিদের প্রধান উদ্দেশ্য। দয়ারাম রচিত সারদামঙ্গলকাব্যের একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের এই দেবীর সঙ্গে জৈনদের ষোলোজন বিদ্যাদেবীর সাদৃশ্য বজায় রয়েছে। তাদের মধ্যে সরস্বতী হল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীদেবী। এই দেবী শ্রুত দেবতা এবং বিদ্যার অধিকারিণী তীর্থংকর বা কেবলীদের জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ১৩২ খ্রিস্টাব্দে তৈরি একটি জৈনদের সরস্বতীদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। যেখানে দেবীর হাতে থাকতে দেখা যায় পুস্তক। জৈনরা জ্ঞানপঞ্চমীতে সরস্বতীদেবীর পূজা করে থাকে। হিন্দুদের শুক্লা পঞ্চমী আসলে জৈনদের জ্ঞানপঞ্চমী।[৫০] জৈনদের এই দেবীর আবার দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ এবং ষোড়শভুজ পর্যন্ত পাওয়া যায়। বৌদ্ধসমাজে হিন্দু সরস্বতীর ন্যায় বেশ কিছু দেবীর নাম উঠে আসে। যেমন - সিতাতারা[৫১], বজ্রতারা[৫২], বাগীশ্বরী[৫৩] যিনি বৌদ্ধদের মঞ্জুশ্রী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে বেশি পরিচিত। বৌদ্ধতন্ত্রে সরস্বতী বিচিত্র নামে পূজিত হয়ে থাকে। যেমন - মহাসরস্বতী, বজ্রবীণাসরস্বতী, বজ্রসারদা, আর্য্যসরস্বতী ও বজ্রসরস্বতী। মহাসরস্বতী যিনি শ্বেতপদ্মের ওপর অবস্থান করে। বাম হাতে শ্বেতপদ্ম ধারণ করে। হাস্যমুখী, অতিকরুণাময়ী, শ্বেতচন্দন, শ্বেতকুসুম ও শ্বেতবস্ত্রধারিণী, হারশোভিতা, এবং নানা অলংকার পরিধান করে থাকে। বজ্রবীণাসরস্বতী দেবী অনেকাংশে মহাসরস্বতীর অনুরূপ। দেবী শ্বেতবর্ণা ও হাতে বীণা ধারণ করে। বজ্রসারদা এই দেবীর মূর্তিতে দেখা যায় দুই হাতে বীণাবাদনরত অবস্থায়। বাকি দুই হাতে পদ্ম ও পুস্তকধারণ করে। উজ্জ্বল দেহকান্তি ও শ্বেতপদ্মের ওপর অবস্থান করে। আর্য্যসরস্বতী দেবী অনেকাংশে বজ্রসারদা দেবীর ন্যায়। এই দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়

নেপালিদের দেবী মূর্তিকল্পনার মধ্যে। বজ্রসরস্বতী এই দেবীর তিনটি মুখ এবং ষড়ভুজ এবং প্রত্যালীঢ় পদে অবস্থান করে। এই দেবীর বর্ণ শুভ্র, বাম হাতে ধারণ করে রক্তপদ্ম আর দক্ষিণ হস্তে ধারণ করে প্রজ্ঞাপারমিতা।[৫৪] সরস্বতী দেবীর সঙ্গে হিন্দু পৌরাণিক দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পুরাণে দেখা যায় ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী। বাগদেবীকে ব্রহ্মার পত্নী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় পুরাণে। বরেন্দ্র মিউজিয়ামে রাখা বগুড়া জেলা থেকে প্রাপ্ত একটি সরস্বতী মূর্তি পাওয়া যায় সেখানে দেখা যায় দেবী চতুর্ভুজা –

> The four-armed figure is carved on a pointed stele with a *pañcaratha.* Pedestal. Sarasvati is represented sitting as in, her right leg pendent and resting on the back of a ram, which is crounching at the base of the pedestal between a pair of rosettes, with a kneeling worshipper and another rosette to1. In the u.r.h. the goddess holds an *aksamala* as well as a lotus.[৫৫]

দয়ারাম দাস রচিত মঙ্গলকাব্যের দেবী বন্দনা অংশে দেবীর রূপের মধ্যেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ঞ. সূর্যমঙ্গলকাব্য: মঙ্গলকাব্যের ধারায় সূর্য মঙ্গলকাব্যের ও উল্লেখ পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের ধারায় রামজীবন রচিত সূর্যমঙ্গলকাব্যের কাহিনি পাওয়া যায়। এই মঙ্গলকাব্যের সূর্যদেবতার সঙ্গে পৌরাণিকতার নিদর্শন পাওয়া যায়। বৌদ্ধ বৈরোচনকুলের দেবী *মারীচী,* যার সঙ্গে হিন্দু সূর্যদেবতার সাদৃশ্য পাওয়া যায় –

> মারীচী বৌদ্ধদিগের সূর্যদেবতা, দেবীরূপে কল্পিতা হইয়াছেন। হিন্দুদের সূর্যদেবতা যেমন সপ্তারথে বিচরণ করেন, মারীচী তেমনই সপ্তশূকররথে আরূঢ়া। মারীচীর বিবরণ বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থে প্রভূত পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাঁহার রূপকল্পনাও নানা প্রকারের দেখা যায়।[৫৬]

এই মারীচী দেবীর বেশিরভাগ প্রস্তরনির্মিত মূর্তিগুলি অষ্টভুজা ও ত্রিমুখী। বর্ণ সূর্যের ন্যায় স্বর্ণ এবং রক্তবস্ত্র পরিধেয়। তিনটি মুখের মধ্যে প্রথম মুখটি পীতবর্ণের, বাম মুখটি নীলবর্ণের ও দক্ষিণ মুখটি রক্তবর্ণের। দেবী রথের ওপর আলীঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রাচীনযুগে প্রাপ্ত সূর্যদেবতার মূর্তিতে ঠিক এই প্রকার বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় –

> At the high base of the sculpture are the seven horses of súrya’s chariot, carved in profile, withthe single wheel in the middle. Above, on the pañcaratha pedestal, is aruna, seated cross legged behind a half lotus device, holding the whipe and reins.[৫৭]

অগ্নিপুরাণে সূর্যদেবতাকে বরুণ, সূর্য, অরুণ ধাতা তপন, সবিতা নামে আহ্বান করা হয়েছে। মার্কেণ্ডেয় পুরাণে সূর্যকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

ট. রায়মঙ্গলকাব্য: আদিম মানব সমাজের সঙ্গে বন্য পশুদের ছিল নিত্য প্রতিবেশীর সম্পর্ক। প্রতিবেশী হওয়ার জন্য একে-অপরের ওপর প্রভাব বজায় রাখতে গিয়ে উভয়ের মধ্যে আক্রমনাত্মক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিছু পশু মানবের কাছে পোষ মানলেও কিছু হিংস্র পশুর কাছে মানুষ হেরে যেতে থাকে। এই সকল পশুদের থেকে রক্ষা পেতে মানুষ একজন করে দেবতার জন্ম দিয়েছে। যেই দেবতার পূজার মধ্যে দিয়ে ওই সকল পশুদেরকে প্রসন্ন করা সম্ভব হবে। মানুষের আত্মরক্ষায় সহায় হবে। মঙ্গলকাব্যের একজন পশুদের রক্ষা কর্তা হলেন – দক্ষিণ রায়। যিনি মূলত বাঘের দেবতা। প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে এই বাঘের পূজার প্রচলন ছিল। সিন্ধু সভ্যতায় (খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০-১৯০০) যেখানে সীলের মধ্যে এক-শৃঙ্গ ষাঁড়, বাঘ, বাইসন কুজবিশিষ্ট ষাঁড় ও ইত্যাদি পশুদের দেখা যায়। এই পশুগুলিকে কোনো দেবতার প্রতিমূর্তি হিসেবে ধরা যেতে পারে। কিছু ঐতিহাসিক বলেছেন এই পশুগুলির মূর্তি হয়ত সেই সমাজের মানুষের গোত্র বা বংশের প্রতীক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। মহেঞ্জোদারো সভ্যতার (২৬৫০-১৯৭৫ খ্রিস্টপূর্ব) শিলমোহর যেখানে - একজন মানুষ একটি আসনে বসে আছে ‘বদ্ধ কোণাসন’ ভঙ্গিতে। তার দুটি বাহু বালায় ঢাকা। এই মানবাকৃতি মূর্তিটির দুপাশে রয়েছে কিছু পশু মূর্তি। একপাশে গণ্ডার ও মহিষ আর অন্যপাশে হাতি ও বাঘ।[৫৮] প্রাচীন সভ্যতায় প্রাপ্ত পশুপতি মূর্তি যার মধ্যে জৈনপ্রভাব বর্তমান বলে দাবী করা হয়েছে। সেখানে এই বাঘের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। বৌদ্ধদের দেবতাকুলের মধ্যে বেশ কিছু দেবতার বসন দেখা গেছে ব্যাঘ্রছাল। যেমন - বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর কুলের দেবতা সিংহনাদ। এই দেবতার মন্ত্রপাঠে মানুষের অসুখ-বিসুখ দূর হয়ে যায়। এই দেবতার মূর্তিটি এইরূপ - বর্ণ শ্বেত, ত্রিনেত্র, জটামুকুটধারী, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত এবং সিংহের ওপর মহারাজ লীলায় উপবিষ্ট।[৫৯] রায়মঙ্গলকাব্যের কাহিনির তিনটি পালা পাওয়া যায়। যথা - ক) রায়-গাজি-যুদ্ধ খ) রতা বাউলিয়া গ) পুষ্পদত্ত বণিক পালা। দ্বিতীয় পালা ‘রতা বাউলিয়া’ পালার কাহিনিটি এইরূপ - রতা বাউলিয়ার সঙ্গে তার পুত্র বুলচন্দ্র একদিন বনে যায় কাঠ কাটতে। অনেক খুঁজে সেদিন বনে তারা ভালো কোনো কাঠ পেল না। এরপর দেবতা দক্ষিণ রায় তাকে স্বপ্নাদেশ দিল যদি সে সমাঙ্গ রুধির পূজো করে তাহলে তার উদ্দেশ্য সাধন হবে। রতা বাউলিয়া তখন পূজো করতে স্বীকার হয়। এরপর নির্দিষ্ট সময়ে পূজার আয়োজন না দেখে দেবতা অসন্তুষ্ট হয় এবং অভিশাপ দিতে উদগ্রীব হয়। দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে তখন রতা নিজের মাথা কেটে

দেবতাকে অর্পন করতে চায়। দেবতা তখন বেঁকে বসে এবং দক্ষিণ রায় রতা পুত্র বলুচন্দ্রের মুণ্ড চায়। এই ঘোষণায় রতা দুঃখিত হয়ে দেবতার কাছে অনুরোধ করতে থাকে এই ইচ্ছা ফিরিয়ে নিতে। দেবতা তার কথা না শুনলে রতাকে প্রবোধ দিতে হরিশচন্দ্রের কাহিনির কথা মনে করিয়ে দিতে থাকে।[৬০] পুরাণে বর্ণিত এই শুনঃশেপের কাহিনি ও হরিশচন্দ্রের কাহিনির মধ্যে পিতা তার পুত্রকে দেবতার কাছে বলি দিয়েছিল তাদের ইষ্টদেবতাকে সন্তুষ্ট করতে। এই কাব্যের কাহিনির মধ্যে পৌরাণিকতার ছোঁয়াকে এইভাবে টেনে আনা হয়েছিল মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী।

ঠ. গঙ্গামঙ্গলকাব্য: বিষ্ণুর পদনির্গত জল থেকে গঙ্গার উৎপত্তি হয়েছিল। সেখান থেকে শিবের জটায় গঙ্গাকে ধারণ করেছিল। গঙ্গা মাহাত্ম্য এবং ভাগীরথ কতৃক মর্ত্যে গঙ্গা আনয়ন এই বিষয়গুলিকে মূল উপজীব্য বিষয় করে কয়েকটি মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে, যেগুলিকে নাম দেওয়া হয়েছে গঙ্গা মঙ্গলকাব্য। গঙ্গাদেবীর মূর্তিপূজা লক্ষ্মী বা সরস্বতী অন্যান্য দেবতাদের মতো ততোটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। গঙ্গাদেবীর পূজা ঠিক কোন সময় থেকে বিস্তার লাভ করেছিল তা সঠিক করে জানা যায়নি। সরস্বতী নদীকে ঘিরে দেবী পদে উন্নীত হওয়ার ভাবনা থেকে একসময় গঙ্গার দেবীত্ব পদ লাভ অনেক সহজ হয়েছিল। প্রাচীন সভ্যতায় কিছু বিচিত্র দেবীরূপের মূর্তি পাওয়া গেছে। সেখানে নদীকে দেবীরূপে পূজা করার আলাদা করে প্রমাণ সেভাবে পাওয়া যায়নি। প্রাচীন সাহিত্যে গঙ্গা নদীর মাটি, জল এগুলিকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করা হত। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রধান পাঁচটি নদীর (যমুনা, অচিরাবতী, সরভূ, মহানদী ও গঙ্গা) মধ্যে গঙ্গা নদীকে অন্যতম মনে করা হয়। পূর্বে সরস্বতী যে মহিমার অধিকারী হয়েছিল ধীরে ধীরে গঙ্গা সেই গুণের অধিকারী হয়ে উঠেছে। সরস্বতীর সঙ্গে পৌরাণিক ব্রহ্মার যোগ ঘটানো হয়েছে, একইভাবে গঙ্গাকে পৌরাণিক শিবের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। গঙ্গানদীর বহুল উল্লেখ পাওয়া যায় পালি সাহিত্যের মধ্যে। বৌদ্ধজাতক থেকে জানা যায় - গঙ্গানদীর মিগসম্মতা নামে একটি হিমবন্ত শাখার কথা। বুদ্ধ যখন রাজগৃহ থেকে বৈশালী যায়, পাটলীপুত্র পার হওয়ার সময় সেখানে বিশেষ কিছু অনুষ্ঠান হয়েছিল। যা পরবর্তীতে গৌতমতীর্থ নাম পেয়েছে। বুদ্ধ যখন বৈশালী থেকে রাজগৃহে ফিরে এসেছিল সেসময় সেখানে গঙ্গারোহণ উৎসব হয়েছিল।[৬১] এই দেবীকে কেন্দ্র করে সপ্তদশ শতকে রচিত কিছু কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। মাধবাচার্যের পুথিটি কিছুটা বেশি প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়। জয়রাম রচিত গঙ্গামঙ্গল, দ্বিজ কমলাকান্ত রচিত গঙ্গার

পাঁচালী, দ্বিজ গৌরাঙ্গ প্রণীত গঙ্গামঙ্গল ও সীতারাম সুর বিরচিত জাহ্নবীমঙ্গলকাব্য। এই জাহ্নবীমঙ্গলকাব্যের মোট আঠারোটি পালা রয়েছে। যথা - দেব সম্ভাষণ, গঙ্গার জন্ম, বলি উপাখ্যান, ভাগীরথ জন্ম, সগর বংশ পালা, সৌদাস মুক্ত পালা, গৃর্ধর পালা, ভেকভেকী পালা, বকীমুক্ত, কালকল্প উপাখ্যান, প্রয়াগ মাহাত্ম্য, মাধব সুলোচনা পালা, সুলোচনা হরণ, মাধব স্বর্গবাস, বারাণসী মাহাত্ম্য, কৃষ্ণনৃপ স্বর্গবাস, গঙ্গার বিবাহ তবে ষোড়শ পালাটি খণ্ডিত তাই নাম জানা যায়নি।[৬২] এই মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়। বিষয় নির্বাচনে কবি সম্পূর্ণ মহাভারতের কাহিনি ও পদ্মাপুরাণের কাহিনির বিষয়ের দিকে বেশি নজর দিয়েছিলেন।

ড. পঞ্চাননমঙ্গলকাব্য: রঘুনন্দন লিখিত দুটি পঞ্চাননমঙ্গলকাব্য পাওয়া যায়। এই কাব্যের কাহিনির মধ্যে দেখা যায় পৌরাণিকতাকে ছুঁয়ে যাওয়ার লক্ষণ। কার্তিকের হাতে তারক বীরের উদ্ধারের কাহিনিকে ঘিরে যখন দেবতারা চিন্তিত তখন শিবকে অনুরোধ করা হয় গান গাইতে। হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এই সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ দেবতা আদিদেবতা শিবের বিগলিত সংগীত ধারা থেকে, দেবতা পঞ্চাননের জন্ম হয়। বৌদ্ধধর্মে অমিতাভ কুলে একজন দেবতা পাওয়া যায় যিনি কার্তিকেয় নাম ধারণ করেছে। এই দেবতা ময়ূরের ওপর অবস্থান করে। রক্তবর্ণ, ষণ্মুখ, চতুর্ভুজ যার দুটি দক্ষিণ হাতে থাকে শক্তি শেল ও বজ্র থাকে অন্য বাকি দুই বাম হাতে ধরে কুক্কুট বা মুরগী। একটি দক্ষিণ ও একটি বাম হাত দ্বারা অঞ্জলি প্রদর্শন করে।[৬৩] এই দেবতার সঙ্গে পঞ্চানন দেবতার কিছু সাদৃশ্য আশা করা যেতে পারে। লৌকিক কাহিনিতে দেখা যায় মঙ্গলকাব্যের নায়ক মণিময় পঞ্চানন দেবতার স্মরণ করে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিল। পঞ্চানন মঙ্গলকাব্যে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলির যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়।

ঢ. সুবচনীমঙ্গলকাব্য: সুবচনীমঙ্গলকাব্য-এর আর একটি নাম হল সুভদা মঙ্গল। নারীদের সমাজে পূজা করার প্রক্রিয়া বহুকাল ধরে চলে আসছে। সমাজ সৃষ্টির গোড়া থেকেই নারীদের দেবী ভাবনায় দ্বারা প্রভাবিত হতে দেখা গেছে। সুভদামঙ্গলকাব্যে দেখা যায় এই দেবী আরাধনা করা হয় গৃহে কোনো শুভকর্ম হলে।[৬৪] মঙ্গলকাব্যের এই দেবীর মতো বৌদ্ধধর্মের দেবীদের মধ্যে এইরূপ কিছুজন দেবতার উপস্থিতি দেখা যায়। বৌদ্ধদের পঞ্চরক্ষাদেবী যারা বৌদ্ধগৃহস্থকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করে চলে। এই দেবীদের মধ্যে রয়েছে – মহা প্রতিসরা, মহাসাহস্রপ্রমর্দিনী, মহামন্ত্রানুসারিণী, মহাসিতবতী ও

মহামায়ূরী দেবী। গৃহস্তের বাড়িতে এই দেবীর পুঁথি অতিযত্ন সহকারে রক্ষা করা হয়। নিষ্পন্ন যোগাবলীতে এই দেবীদের সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

ণ. তীর্থমঙ্গলকাব্য: তীর্থের মাহাত্ম্যকে নিয়ে লিখিত একটি মঙ্গলকাব্য হল এই তীর্থমঙ্গলকাব্য। প্রাচীনকালে যেসকল ভ্রমণকাহিনি লিখিত হত সেই ধারাকে এখানে মঙ্গলকাব্য নাম দেওয়া হয়েছে। তীর্থমঙ্গলকাব্যটির রচয়িতা বিজয়রাম সেন। এই কাব্যে পৌরাণিক দেবতা শিবকে কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাচীনকালের সকল ধর্মীয় মতবাদ জৈন এবং বৌদ্ধধর্মের মধ্যে দিয়ে সমাজে বিভিন্ন নামে চলে আসা দেবতা শিবের প্রতিষ্ঠিত বাসস্থান কাশীকে কাব্যের বিষয়বস্তু করা হয়েছে। এখানে তীর্থের গুনাগুণের কথা আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় ধর্মীয় সাহিত্যের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, সকল ধর্মীয় মতবাদগুলি নিজ ধর্মক্ষেত্রগুলি মাহাত্ম্য বর্ণনার দিকে বিশেষ জোড় দিয়েছেন। এই মঙ্গলকাব্যটি এই ভাবনা থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

ত. অন্যান্য মঙ্গলকাব্য: অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের মধ্যে অতি অল্প উল্লিখিত কয়েকজন দেবদেবীর নাম পাওয়া যায়। এইসকল দেবতাদের ঘিরে বৃহৎ কোনো মঙ্গলকাব্য রচিত হতে পারেনি। এই দেবতাদের ঘিরে লিখিত পাঁচালী আকারের গ্রন্থগুলির শেষেও মঙ্গল শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন - লক্ষ্মীমঙ্গল, কপিলামঙ্গল, বরদামঙ্গল ও গোসানিমঙ্গল। লক্ষ্মীমঙ্গলকাব্যে দেবীভাগবত অর্বাচীন পুরাণের নবমস্কন্দ অনুকরণে এই মঙ্গলকাব্যটি লিখিত হয়েছে। লক্ষ্মীকে ধন-সম্পত্তির দেবী হিসেবে মঙ্গলকাব্যে দেখানো হয়েছে। বৌদ্ধদের দেবী ধনদ-তারা যিনি ঐশ্বর্য্যের দেবী। এই দেবী চতুর্ভুজা, শুক্লবর্ণা ও সৌম্যদর্শনা। মূল দুটি হাতে উৎপল মুদ্রা প্রদর্শন করে, দ্বিতীয় দুটি হাতে অক্ষসূত্র ও বরদমুদ্রা প্রদান করে। দেবী হরিদবর্ণা, সৌম্যদর্শনা ও নরবাহনা।[৬৫] কপিলামঙ্গলকাব্য যেখানে কপিলা ধেনু অপহরণের কাহিনি রয়েছে। পৌরাণিক দেবতা ব্রহ্মাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বরদামঙ্গলকাব্য যেখানে বরদেশ্বরী দেবীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করা হয়েছে। ত্রিপুরা জেলার নন্দকিশোর নামক একজন কবির হাতে এই কাব্যটি লিখিত হয়েছিল। গোসানিমঙ্গলকাব্য ও কামাখ্যামঙ্গলকাব্য যেখানে কামরূপ কামাখ্যার কিছু লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পৌরাণিক দেবতাদের সঙ্গে লৌকিক দেবীদের সংযোগ ঘটানো হয়েছে এই মঙ্গলকাব্যগুলিতে।

৩. ২ মঙ্গলকাব্যের দেবভাবনা ও দর্শনে, বৌদ্ধ-জৈন দেবভাবনা ও দর্শনের লোকায়ত উপাদান

বাংলার লৌকিক ধর্মের উপর পৌরাণিক আভিজাত্য আরোপ করা মঙ্গলকাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ঠিক যেমন দাক্ষিণাত্যের তামিল অঞ্চলের প্রচলিত লৌকিক ধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংমিশ্রণের ফলে সমাজে এক নতুন ধর্মাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। একই ভাবে বাংলাদেশে প্রথমে জৈনদের সঙ্গে হিন্দুদের এইরূপ একটি সংমিশ্রিত জাতির উদ্ভব হয়েছিল। তুর্কী আক্রমণের ফলে হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন ধর্মাবলম্বী মানুষদের সংমিশ্রণ ঘটে। বাংলার লোকায়ত ধর্মের দেবতারা সুযোগ বুঝে হিন্দু পৌরাণিক দেবভাবনার মধ্যে প্রবেশ করে নিজেদের স্থান চিরস্থায়ী করে নিয়েছে। মঙ্গলকাব্যের দৈবীভাবনায় হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন দৈবীভাবনায় পৌরাণিকতার ছাপ রয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন ধর্মীয় সমাজের লোকায়ত ধর্মভাবনাগুলিও এসে মিলিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে জানা যায় যে ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী এই সময়ের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের রচনাকালের প্রমাণ পাওয়া গেলেও, এই কাব্যগুলির আখ্যানের মূল রূপ আরও প্রাচীন। সমগ্র মঙ্গলকাব্যের কবিরা প্রচলিত লৌকিক উৎসকে নিজেদের কাব্যের মধ্যে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করেছে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে লৌকিক শব্দের অর্থগত পরিধি সম্পর্কে মাথায় রাখা দরকার – ব্রাহ্মণ্য পুরাণবহির্ভূত এবং পৌরাণিক প্রভাবের পূর্বে বা পরে হিন্দু সমাজে যে সমস্ত বিষয়গুলি আবির্ভূত বা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল সেগুলিকে লৌকিক ভাবনার অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা যেতে পারে। এই লৌকিক উপাদানগুলি দীর্ঘদিন ছিল মৌখিক। এই লিখিত মঙ্গলকাব্যের প্রয়োজনে ওই উপাদানগুলি লিখিত রূপ পেয়েছে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে। মঙ্গলকাব্য মধ্যে প্রাপ্ত এই সকল লোকায়ত উপাদান ও কাহিনিগুলির স্পর্শ এতটাই গভীর ছিল যে কখনও কখনও পৌরাণিকতার প্রভাব এখানে ছাপিয়ে গিয়েছে। পৌরাণিকতা সেখানে ম্লান হয়ে ধরা দিয়েছে, জাতীয় আদর্শের জয় হয়েছে। পুরাণের সঙ্গে লোকায়তের সামঞ্জস্যের ব্যবধান ঘটেছে।

ক. শিবমঙ্গলকাব্য: লৌকিক দেবতাদের মধ্যে শিবের অস্তিত্ব সবচেয়ে প্রাচীন। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অবসানের পর হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে দেবতা শিবের লোকায়ত সংস্পর্শে সর্বাগ্রে মিলন ঘটেছিল। সমাজের আপামর হিন্দু জনসাধারণ শিবকে নিজেদের জাতীয় আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছিল। বঙ্গদেশে শিব চরিত্রের পুরাণ বহির্ভুত আরও একটি অভিনব রূপের

প্রকাশ ঘটেছে। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত শিব একেবারে বাঙালির নিজস্ব শিব। প্রাচীনযুগে রচিত খনার বচনগুলি যেমন ছিল বেশিরভাগ গ্রাম্য কৃষিবিষয়ক। হরপ্পাসভ্যতা থেকে প্রাপ্ত ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ পাওয়া গেছে। এই কৃষিকাজের জন্য দরকার হত শক্তসামর্থ্য গবাদি পশুর। পশুচারণবৃত্তি ও যথেষ্ট গুরুত্ব রেখেছে সেই সমাজ ব্যবস্থায়। সিন্ধু সভ্যতার প্রাপ্ত সিলমোহরে গবাদি পশু মূর্তির নমুনা পাওয়া যায়। মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত সীলে মুদ্রিত একশৃঙ্গবিশিষ্ট দেবতার উপবিষ্ট মূর্তি পাওয়া গেছে। যাকে জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথ বলে মনে করেছে। হিন্দুরা এই দেবতাকে শিবের প্রাচীন পশুপতি রূপ হিসেবে কল্পনা করেছে। এই পশুপতিকে সমগ্র পশুর দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। এই দেবতার সঙ্গে বাহন হিসেবে রয়েছে ষাঁড়। প্রাচীন সভ্যতার এই মূর্তিগুলিতে গবাদি পশুর প্রতি শ্রদ্ধাভাব ধরা পড়েছে। এই বোধ থেকে তারা পশুদেরকে তাদের দেবতার পাশে জায়গা করে দিয়েছে।[৬৬] মঙ্গলকাব্যে একাধিকবার দেবতা শিবকে বৃষধ্বজের ওপর আসন গ্রহণ করতে দেখা গেছে। দেবতা রুদ্রের পড়নে থাকে পশুচর্ম। দেবতা শিব কৃত্তিবাস হওয়া সত্ত্বেও তিনি নগ্ন। দেবতা শিবের এই পোশাকের প্রতি অনীহা বঙ্গদেশের নগ্ন জৈন সন্ন্যাসীদের প্রভাবজাত এমনটা বলা যেতে পারে। এইদিকে দেবতা রুদ্ররূপের স্বরূপ পাওয়া যায় অনাবৃত। সূর্যাগ্নির তেজকে যেমন সমস্তটুকু আবৃত করা যায় না। রুদ্র-শিব-দিগম্বর–এর তেজ দশদিক ব্যাপ্ত হতে থাকে। যা সহজে ধারণ করা যায় না। পদ্মপুরাণে উল্লিখিত রয়েছে শিব যখন সমাজের নীচব্যক্তিদের মেলামেশা করে তখন সে থাকে উলঙ্গ। শিব তার সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখে বলে তার অন্য এক নাম হয়েছে বিভূতি। শিবের ভৈরবরূপে শিবের প্রাচীন ভারতীয় শ্মশান বৈরাগ্যের দর্শনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কহীন কয়েকটি গোষ্ঠী এই মত অনুযায়ী শিব উপাসনা করে থাকে। থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের পালি ধর্মগ্রন্থে এই শ্মশান সাধনার উল্লেখ রয়েছে। মঙ্গলকাব্যে দক্ষযজ্ঞ অংশে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় -

অমঙ্গল সকল লক্ষণ তার শুন।
মহাদেব নাম কিন্তু মহাপ্রেত যেন।।
ভূত-প্রেত-প্রমথ-অসুর লয়্যা সঙ্গ।
শ্মশানে শবের পারা সদাই উলঙ্গ।।
ভুজঙ্গ ভূষণ অঙ্গ চিতাভস্ম গায়।
দেব মাঝে সে কি সাজে দেখ্যা ডর পায়।।[৬৭]

হিউয়েন সাং ভারত ভ্রমণে এসে এক ধরণের ক্ষপণক সন্ন্যাসী দেখেছিলেন। সেই সন্ন্যাসীদের বর্ণনার সঙ্গে শিবের এইরূপের যথেষ্ট নৈকট্যতা রয়েছে। বৌদ্ধদের নীলকণ্ঠ-এর গলায় সর্বদা একটি সর্পের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মানুষের সর্পের ভয়ভীতি থেকে, সর্পকে পূজনীয় করে তুলেছিল। বৌদ্ধবজ্রযানে কয়েকটি পশুকে দেবতা হিসেবে কল্পনা করে পূজা করা হয়। নিষ্পন্নাযোগাবলীতে এইসকল পশুমুখী দেবী চতুষ্টয়ের কথা জানতে পারা যায়। এই সকল দেবীরা চতুর্মুখা, চতুর্ভুজা এবং তারা বজ্রাঙ্কুশী প্রমুখ দেবতাদের প্রতীক চিহ্ন ধারণ করে। দেবতা শিবের তৃতীয় নয়ন যা বহুল চর্চিত বিষয়। শিবের তৃতীয় নয়ন দ্বারা শিব কামকে ভস্ম করেছিলো। এই তিন নয়নের জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে শিবের ত্র্যম্বকম্ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই তৃতীয় চক্ষুকে সাধারণত শিবের দিব্যচক্ষু মনে করা হয়। শিবের এই দিব্যচক্ষু প্রাপ্তির ন্যায় বৌদ্ধজাতকে সিবি (শিবি) নামে চারশো নিরানব্বই সংখ্যক জাতক পাওয়া যায়। যেখানে বলা হয়েছে - পুরাকালে শিবি রাজ্যের অবিষ্টপুর নগরে শিবি রাজকুমার রাজত্ব করার সময়, তিনি প্রাসাদের গায়ে ছয়টি দানশালা নির্মাণ করে ছয়লক্ষ মুদ্রা প্রতিদিন দান করত। একদিন রাজা একজন অন্ধকে দেখে, নিজের দুটি চোখ সেই অন্ধকে দান করতে চায়। রাজার নগরবাসী ও অন্দরমহলের সকলের বারণ করা সত্ত্বেও, রাজা জীবককে ডেকে নিজের দুটি চক্ষু সেই অন্ধ ব্যক্তিকে দান করে। কিছুদিন পরে রাজার অন্ধত্ব দশা তার নিজের কাছে বোঝা মনে হতে থাকে। সে দেবতার স্মরণ নেয়। দেবরাজ শক্র সন্তুষ্ট হয়ে ওই রাজার চক্ষু দুটি ফিরিয়ে দিতে চায়। একদিন দেবরাজ শক্র রাজাকে পুষ্করিণীর ঘাটে বসে থাকতে দেখে। রাজাকে ডেকে দুটি বর দিতে চায়। দেবতার কাছে তখন শিবি রাজা তার অন্ধত্ব দশা মোচন না হলে মৃত্যু বর চায়। দেবরাজ শক্র রাজাকে জানায় যদি সে সত্যক্রিয়া করে তাহলে সে দুটি চোখই ফিরে পাবে। শিবি রাজা প্রথম সত্যক্রিয়া করে বলে - উচ্চ-নীচ যে কোন যাচক তার কাছে এসে যা চেয়েছে সে তাকে সবকিছু দান করেছে। এই সত্যক্রিয়ার ফলে সে একটি চক্ষু ফিরে পায়। এরপর সে দ্বিতীয় সত্যক্রিয়ার জন্য বলে – তার কাছে এক অন্ধ ব্যক্তি চোখ চাইলে, তাকে তার দুটি চোখ দান করেছে। এইকথা বলার পর রাজা তার দ্বিতীয় চোখটিও ফিরে পায়। দেবরাজ শক্রের অনুভাব বলে এই দিব্যচক্ষুর মাধ্যমে সে একশ যোজন দূরে অবস্থিত সমস্ত কিছু দৃষ্টিগোচর করতে সক্ষম হয়। শিবিরাজের এই অলৌকিক চক্ষুপ্রাপ্তির কথা সমগ্র দেশে প্রচার পায় এবং দেশের জনসাধারণ ধর্মপথে

চালিত হতে থাকে।[৬৮] শিবের সহচরের নাম হল নন্দী। যে বলবান এবং তাকে সবসময় শিবের আশেপাশে তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হিসেবে পাওয়া যায়। গুরুর আদেশ পালন করতে সে সর্বদা উৎসুখ। তেমনি বৌদ্ধ জাতকে আঠাশ নম্বর বুদ্ধ-এর পূর্বকথার নাম *নন্দিবিলাস*। যেখানে বোধিসত্ত্ব গোজন্ম প্রাপ্ত হয়েছিল। গল্পটি হল এইরূপ - বোধিসত্ত্বের এই গোজন্মে নাম ছিল নন্দিবিলাস। তরুণ বয়স থেকে সে এক ব্রাহ্মণের কাছে যত্নে পালিত হতে থাকে। বোধিসত্ত্ব একদিন ব্রাহ্মণের উপকার করতে চেয়ে মালিককে বলে। আপনি কোনো এক শ্রেষ্ঠীকে গিয়ে বলুন আমার গরু খুব বলবান সে একসঙ্গে একশো গাড়ি বোঝাই সমেত একসঙ্গে টানতে পারে। একথা শুনে একজন শ্রেষ্ঠী একশো মুদ্রা বাজি রাখে। পরদিন সকালে নন্দিবিলাসকে স্নান করিয়ে এবং শুদ্ধ করিয়ে গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেয়। ব্রাহ্মণ গাড়ির ওপর নিজে চড়ে বসে আস্ফালন করতে করতে বলে – ওরে বদমাশ জোরে টান। এই কথা শুনে বোধিসত্ত্বের রাগ হয়। ভাবে সে বদমাশ নয় তবু তার মালিক তাকে বদমাশ বলছে। সে গাড়ি না টেনে স্থির হয়ে থাকে, ব্রাহ্মণকে শিক্ষা দিতে চেয়ে। এই ঘটনায় ব্রাহ্মণ নিজের লসের কথা ভেবে অনিদ্রায় রাত্রিযাপন করতে থাকে। ব্রাহ্মণের এই দশা দেখে নন্দিবিলাস তখন ব্রাহ্মণকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে ঠাকুর আমি কি কখনও আপনাকে কোনো কষ্ট দিয়েছি? কোনো ক্ষতি করেছি? কখনও কি আপনার কোন ভাঁড় বা দ্রব্য ভেঙেছি বা অস্থানে মলমূত্র ত্যাগ করেছি? তাহলে আপনি আমায় বদমাস বললেন কেন? তখন ব্রাহ্মণ তার ভুল বুঝতে পারে। নন্দিবিলাস আবার বলে এবার আপনি কোনো শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে বাজি ধরুন দু'শো মুদ্রা। সেই ভাবে ব্রাহ্মণ পণ রাখল এবং নন্দিবিলাসের গাড়ির সঙ্গে একশো গাড়ি জুড়ে দিয়ে। গাড়ির ওপর নিজে বসে মিষ্ট কথায় বলতে লাগল - যাদু আমার, বাছা আমার টানতো দেখি গাড়ি। একসঙ্গে জুড়ে রাখা একশোটি গাড়ি টেনে নিয়ে যেতে থাকে। ব্রাহ্মণের দু'শো মুদ্রা লাভ হয়। শ্রেষ্ঠী খুশি হয়ে আরও কিছু মুদ্রা নন্দিবিলাসকে দান করে যেগুলিও ব্রাহ্মণের হয়ে যায়।[৬৯] এইভাবে নন্দীর কথা হয়ত মঙ্গলকাব্যের শিবের সঙ্গে জুড়ে গেছে। শিবকীর্ত্তন পালায়ও দেখা যায় নন্দী বড়ো প্রভু ভক্ত, শিবের নিন্দা শুনতে না পেরে বলে –

শিবের সেবক নন্দী জানে নানা সন্ধি।
ব্যাখ্যা কর‍্যা বলিল বেদান্তবেদ আদি।।
কল্পকল্পান্তরে কথা পুরাণের মত।
দক্ষ লক্ষ্য কর‍্যা কহে শুনে সভাসদ।।
পূর্বে শচী সহিতে সেবিত শিবে শক্র।

বৃন্দাবক বৃন্দ তাতে হইলেন বক্র।।
বলে ইনি দেবরাণী তুমি দেবরাজ ।
দিগম্বর দেখে মায়্যা ভাল নহে কাজ।। [৭০]

শিবের মস্তকের কেশরাশি থাকে জটাবদ্ধ অবস্থায়। এই কারণে শিবের অপর নাম জটী বা কপর্দী। শিবের এক হাতে সবসময় থাকে ত্রিশূল। শিবের হাতে ডমরু নামে একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র শোভা পায়। নটরাজ নামে পরিচিত শিবের নৃত্যরত মূর্তির এক বিশেষ রূপ। ডমরুধারণের জন্য নির্দিষ্ট একটি মুদ্রা বা হস্তভঙ্গিমা ডমরুহস্ত নামে পরিচিত। ডমরু একদিকে আবার কাপালিক সম্প্রদায়ের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বৌদ্ধদের ত্রৈল্যোকেশঙ্কর নামে একজন দেবতার কথা জানতে পারা যায় সাধনমালা থেকে। ত্রৈলোক্যশঙ্কর নামে দেবতা যিনি অবলোকিতেশ্বর। এই লোকেশ্বর উড্ডিয়ান নামে পরিচিত। মধ্যযুগে উড্ডিয়ানে তন্ত্রের একটি বিখ্যাত পাঠস্থান। ত্রৈলোক্যশঙ্কর বা উড্ডিয়ান লোকেশ্বর পূজা বহুল প্রচলিত ছিল। নেপালে এই দেবতার একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি পাওয়া গেছে। যেখানে দেখা যায় দেবতার - একমুখ বিশিষ্ট, দুই বাহু, ত্রি-নয়ন যুক্ত। মস্তকে জটা, দুটি হাতের মধ্যে এক হাতে অঙ্কুশ ও অপর হাতে বজ্র। তিনি বজ্রপর্যাঙ্কাসনে পদ্মের উপর বসে ধ্যানমগ্ন এবং পরনে নানাবিধ গহনা ও দিব্যাভরণ। তার শরীরের রঙ লাল।[৭১] শিবের মস্তকে একটি অর্ধচন্দ্র বিরাজ করে। যেকারণে শিবের অপর নাম চন্দ্রশেখর। শিবের রুদ্ররূপে এরূপ অর্ধচন্দ্রের ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। বৈদিক পরবর্তীকালে সাহিত্যে চন্দ্রদেবতা সোম ও রুদ্রের একত্রীকরণের সময় থেকে শিবের সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যটি যুক্ত হয়েছিল। বারাণসী শিবের প্রিয় নগরী। এই স্থানটি পরবর্তীকালে হিন্দুদের পবিত্রতম তীর্থগুলির মধ্যে অন্যতম দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। দক্ষ যজ্ঞের পরে শিবের কৈলাসে ফিরে যাওয়ার বর্ণনা করা হয়েছে এই কাব্যমধ্যে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে এই নগরী আবার কাশীধাম নামে বিশেষ পরিচিতি পেয়েছে। শিবসঙ্কীর্তনের গৌরীর রন্ধনশালা–তে পাওয়া গেছে মর্ত্যের মানুষের খাদ্যাখাদ্যের বর্ণনা। এই দেবতারা লৌকিক মানুষদের মত নিজেদের পাওনা বুঝে নিতে কলহ করতে পিছপা হত না। যার বর্ণনা পাওয়া যায় 'হরগৌরীর কলহ' অংশে। জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের সঙ্গে কৃষির যোগ পাওয়া যায়। রামেশ্বর কাব্যে কৃষির বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই ভাবে যথা -

চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।
নহে দাসদাসী আদি ছাড় পরিজন।।
চরণে ধরিয়া চণ্ডী চন্দ্রচূড়ে সাধে।
নরমে গরমে কয় ভয় নাই বাধে।।[৭২]

এই অংশে চাষিদের সুখ-দুঃখের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা একান্তই লৌকিক। শিব লাঙ্গল নিয়ে ভূমি কর্ষণে গেছে। বীজের জন্য গেছে কুবেরের বাড়ি। অনটন থেকে মুক্তি পেতে শিব ত্রিশূল ভেঙে লাঙল প্রস্তুত করতেও দ্বিধা করেনি।

খ. মনসামঙ্গলকাব্য: উৎসের দিক থেকে মনসামঙ্গলকাব্যগুলি লৌকিকতার পরিচয় বহন করে চলেছে। হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার প্রত্নসামগ্রী থেকে প্রাপ্ত শীলে দেখা যায় যে শিব মূর্তির দু'পাশে প্রার্থনার ভঙ্গিতে দুটি সাপের খোদিত মূর্তি আঁকা রয়েছে। বেদ, পুরাণ, মহাভারত ও বৌদ্ধ *জাতক* গ্রন্থগুলিতে নাগ ও সাপের উল্লেখ পাওয়া গেছে। নাগ ও সাপ একই অর্থ বহন করে কিনা এই নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। নাগ বলতে গন্ধর্ভ, যক্ষ বা কিন্নর জাতীয় একশ্রেণির উপজাতিকে বোঝাতো। জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মাথার ওপর সাপের ফণা দেখা যায়। এই তীর্থঙ্করের মাথায় সাতটি ফণাযুক্ত সর্পছত্র দেখা যায়। তার পাশে অবস্থানকারী যক্ষী পদ্মাবতীর মাথায় আবার পাঁচটি ফণাযুক্ত সর্পছত্র দেখা যায়। জৈন তীর্থঙ্কর সুপার্শ্বনাথ-এর মাথার ওপর এক, পাঁচ, সাত ও নয়টি ফণাযুক্ত সর্পছত্র দেখা যায়। কাশ্মীরে নাগ উপাধি বিশিষ্ট এক জাতির কথা জানতে পারা যায় কলহন্-এর *রাজতরঙ্গিনী* থেকে। যেখানে উল্লিখিত হয়েছে নীলনাগ নামটি। যিনি একদা কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। এই উক্তি থেকে অনুমান করা যায় নাগ আসলে কোন জাতিবিশেষ। *মহাভারত*-এ নাগ একটি স্বতন্ত্রজাতি হিসেবে গণ্য হয়েছে, যারা আর্যবিরোধী জাতি নামেই পরিচিত ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধভাস্কর্যে নাগ ও সর্পের ভিন্নতার কথা বলা হয়েছে। যেখানে আরও বলা হয়েছে যে এই জাতির রাজা বা নাগরাজ যিনি কখনও সাপের মূর্তি ধারণ করতে পারতেন। অর্ধনাগ ও অর্ধমানব কল্পনার রূপ। এই জাতির অধিপতি বাসুকি সর্পরাজ রূপে পূজা পেতে শুরু করে। নাগরাজ বাসুকির ভগিনী বাংলাদেশে এসে মনসা রূপলাভ করেছে।[৭৩] অনুমেয় যে এই নাগজাতিরা সাপকে টোটেম[৭৪] হিসেবে ব্যবহার করত বলে তাদের এইরকম নামকরণ হতে পারে। *মহাভারত*-এর সময়ে যা ছিল মানবসমাজের একটা শাখা মাত্র পরে তা হয়ে যায় সরীসৃপ। বৌদ্ধজাতকে নাগরাজ নামক একটি কাহিনি পাওয়া যায়। যেখানে বলা হয়েছে - বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা বাণিজ্যযাত্রায় যায় এবং প্রথমে কিছুদিন তার নৌকা সমুদ্র পথে চলতে শুরু করলেও। কিছুদিন পরে একদিন সমুদ্রে ঝড় উঠলে বণিকের সমস্ত নৌকা ডুবে যায়। এর ফলে সমুদ্রের মাছেরা নৌকার সকল মানুষকে খেয়ে ফেলে। শুধুমাত্র সেই বণিক কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে

ফিরে আসে। সে জনপদে উঠে এসে ভিক্ষা করে দিনাতিপাত করতে থাকে। তাকে গ্রামবাসীরা পোষাক দিতে চাইলে সে কোনো রকম পোষাক পরিধানের জন্য গ্রহণ করে না। এতে গ্রামবাসীরা সকলে খুশি হয়ে সন্ন্যাসীরূপী বণিককে করম্বিক অচেলক বা নগ্ন সন্ন্যাসী নাম দেয়। এই সন্ন্যাসীকে নাগরাজ পাণ্ডুর ও সুপর্ণরাজ দুজনে সম্মান করত। একদিন সুপর্ণরাজ এই সন্ন্যাসীকে বলে নাগেদের থেকে যেন সে তাদের সহজভাবে ধরার গুপ্ত উপায় জেনে নেয়। এই ভণ্ড সন্ন্যাসী নাগরাজকে ছল করে তাদের দীর্ঘদিন শিকারীর হাত থেকে বেঁচে থাকার উপায় জেনে নেয়। নাগরাজ সন্ন্যাসীরূপী বণিককে জানায় - আমরা বড় বড় পাথর খেয়ে শুয়ে থাকি। আমাদের ওজন খুব ভারী হয়ে যায়। সুপর্ণরা আমাদের মাথা ধরে তুলতে গেলে আমরা তাদের দংশন করি। এই গোপন কথাগুলি সন্ন্যাসী সুপর্ণরাজকে বলে দেয়। এই উপায়ে সুপর্ণরাজ নাগরাজকে ধরে ফেলে। নাগরাজ খেদোক্তি করতে থাকে। নাগের এই দুঃখ শুনে সুপর্ণরাজ তাকে ধর্মকথা শোনাতে থাকে। নাগরাজ সন্তুষ্ট হয়ে সুপর্ণের কাছে পুত্রজ্ঞানে প্রাণ ভিক্ষা চায় ও নাগরাজ তার প্রাণ ফিরে পায়। তারা আবার সেই ভণ্ড সন্ন্যাসীর আশ্রমে যায়। নাগরাজ সন্ন্যাসীকে কারুর গোপন তথ্য অন্যের কাছে ফাঁস করে দেওয়ার শাস্তি দেয়।[৭৫] এই নাগ ও সর্পের একাত্মতা এখনও লক্ষ করা যায় শ্রাবণমাসের নাগপঞ্চমীতে। তিথিটি নাগপঞ্চমী নামে পরিচিত হয়, এবং মানুষ ওই দিন সর্পের উদ্দেশ্যে পূজা দেয়। সমাজে জীবিত সর্পের পূজার সঙ্গে সঙ্গে মূলত সর্পপূজার প্রচলন শুরু হয়েছিল। এখনও কিছু সমাজের মধ্যে বাস্তুসাপের পূজার প্রচলন দেখা যায়। তন্ত্রসাহিত্যে উল্লিখিত যে এই বাস্তরূপী সর্পদেবতা নররক্ত পিপাসু হয়ে ওঠে। নররক্ত না পেলে এই সর্প ব্যক্তি ও তার পরিবারের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত হয়। এই লৌকিক বিশ্বাস থেকে মধ্যযুগে নরবলি দেওয়া হত সর্পদেবতার সামনে।[৭৬] সমাজ সৃষ্টির গোড়ার দিকে তাকালে দেখা যায় যে মানুষ মূলত ভয় থেকে দেবতা সৃষ্টিতে উৎসাহী হয়েছিল। এই দেবতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সমাজের অন্য একদল মানুষ নিযুক্ত ছিল। যারা সমাজে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিল। সর্প ও সাপের রক্ষয়িত্রী দেবী মনসাকে এইরূপ একশ্রেণির মানুষ। যারা লোকসমাজের চোখে নিয়ন্ত্রণ করত বৈদ্য বা ওঝা শ্রেণি হিসেবে। যারা এক প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে সাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখত বলে মনে করা হত।[৭৭] বৃক্ষের সঙ্গে সাপের সম্পর্ক ব্যাপক উভয়ে উর্বরাশক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৭৮] মনসার

সঙ্গে স্নুহীবৃক্ষের যোগ রয়েছে। মনসাকে তার পিতা শিব ঘুমন্ত অবস্থায় এই স্নুহীবৃক্ষতলে একা ফেলে রেখে গিয়েছিল। মনসাপূজার জন্য শিব বরদানের সময় নানা দ্রব্যের সঙ্গে একথা উল্লেখ করেছেন -

আখণ্ড সিজের ডাল করিয়া রোপণ। আতব তণ্ডুল রম্ভা নানা আয়োজন।।
করিব তোমার পূজা দেবাসুরগণে।[৭৯]

গাছটির রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা রয়েছে প্রকট। সাপ জলদেবতার প্রতীক ও পূর্বপুরুষদের আত্মার যোগসূত্র বলে বিবেচিত হয়েছে।

মনসামঙ্গলকাব্যের সমগ্র কাহিনিগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয়গত মিল রয়েছে। মঙ্গলকাব্যের নিয়মানুসারে এখানে দেবখণ্ড এবং আখেটিকখণ্ড নামের ভাগ রয়েছে। দুটি কাহিনি পরস্পর এইরূপ – বল্লুকার তীরে ধর্ম দেবতা নিরঞ্জনের দর্শনের আশায় শিব বারো বছর তপস্যা করেন। তিনি কালিদহে প্রত্যহ ফুল তুলতে যান। বসন্ত আগমনের ফলে পরিবেশের প্রেমমুখোর আবহাওয়ায় পদ্মবনে শিব একদিন কামাসক্ত হয়ে পড়েন এবং সেখানে তার বীর্যস্খলন হয়। এই বীর্য পদ্মনালি বেয়ে চলে যায় পাতালে, যেখানে বাসুকি মাতা সেই বীর্য দিয়ে তৈরি করেন মনসা নামক এক কন্যা। পদ্মনালি বেয়ে যাওয়ার জন্য মনসার অন্য নাম হয় পদ্মাবতী। পদ্মাবতী একদিন শিবের সঙ্গে দেখা করে দেবতা শিবকে তাদের পিতা-পুত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে জানায়। শিবপত্নী চণ্ডী মনসাকে মেয়ে হিসেবে মেনে নিতে চায় না। পিতা শিব বাধ্য হয়ে তাকে অন্যস্থানে রেখে আসে। কন্যাকে রেখে আসার সময় শিবের চোখ থেকে যে বেদনাশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল, যার থেকে জন্ম হয় নেতা নামী এক কন্যার। যে মনসার দেখভালের দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্বকর্মার হাতে তৈরি সিজুয়া বা সাতালি পর্বতের ঘরে মনসার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। এদিকে দেবতারা সমুদ্রমন্থনে নামলে, সমুদ্রের তলদেশ থেকে বিষ উঠে আসে। সৃষ্টিকে বাঁচাতে যা শিব পান করেন। এই বিষের প্রকোপে শিব অসুস্থ হয়ে গেলে দেবসভায় মনসার ডাক আসে, তিনি পিতার দেহ রক্ষার্থে সমগ্র গরল বাইরে বের করে সাপেদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। মনসার বিয়ে হয় জরৎকারুর সঙ্গে। তাদের একজন পুত্র জন্ম হয় যার নাম হয় আস্তিক। এই সন্তান জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের হাত থেকে সর্পকূলকে রক্ষা করে।

মর্ত্যখণ্ডে দেখা যায় – মর্ত্যের চম্পকনগরের চাঁদ সওদাগর যিনি অত্যন্ত শিব উপাসক। একদিন মাতা চণ্ডী তাকে মনসা সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। মনসা মর্ত্যে পূজা প্রচারে এসে চাঁদের দুই প্রজা ঝালু, মালুর পূজা আদায় করে। যাদের থেকে মনসা পূজার ঘট এনে পূজা দিতে বসে সদাগর

পত্নী সনকা, চাঁদ এই পূজা স্থানে এসে মনসার ঘটকে পায়ে লাথি মেরে ভেঙে ফেলেন। এরপর থেকে শুরু হয় চাঁদ-মনসার লড়াই। চাঁদের মহাজ্ঞান অপহরণ করে মনসা, ধন্বন্তরির মৃত্যু ঘটিয়ে, চাঁদের পুত্রদের হত্যা করে মনসা চাঁদের থেকে পূজা আদায়ের চেষ্টায় থাকেন। চাঁদ অনড় থেকে জানায় – যে হাতে পুঁজি আমি দেব শূলপানি, সে হাতে না পূজিব চ্যাংমুড়ি কানি। এই কথায় মনসা আরও রেগে গিয়ে চাঁদের বাণিজ্যের সকল ডিঙা ডুবিয়ে দিয়ে তাকে পুনরায় নিঃস্ব করে দেয়। অন্যদিকে চাঁদের শেষ সম্বল একমাত্র পুত্র লক্ষ্মীন্দর দিনে দিনে বড় হয়ে ওঠে, চাঁদ সব কষ্ট ভুলে পুত্রের বিয়ে ঠিক করে উজানি নগরের এক বেনের মেয়ে বেহুলা নামধারী কন্যার সঙ্গে। ভবিষ্যদ্বাণী কাটিয়ে উঠতে চাঁদ তার পুত্র ও পুত্রবধূর জন্য সাতালি পর্বতে লোহার বাসর ঘর বানায়। সেখানে কালনাগিনী এসে লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করে এবং সদাগর পুত্রের মৃত্যু হয়। এই মৃত স্বামীকে নিয়ে বেহুলা ভেলায় করে গাঙুরের জলে ভেসেছিল। যাত্রাপথের বহু বিপদকে পিছনে ফেলে বেহুলা একদিন এসে উপস্থিত হয় নেতার ঘাঁটে। নেতার সঙ্গে সে যায় ইন্দ্রের সভায়, সেখানে নৃত্য পরিদর্শন করিয়ে দেবতাদের তুষ্ট করে। সে স্বামীর প্রাণ ফিরে পায়। চাঁদের হারিয়ে যাওয়া সম্পত্তি ও পুত্রদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বিনিময়ে চাঁদকে মনসা পূজা করতে বলে। চাঁদ পূজা দিতে রাজি হয়। সে শর্ত রাখে যে হাতে শিবের পূজা করে সেই হাতে মনসার পূজা না করে বাম হাতে পূজা দিতে চানক। দেবী মনসা খুশী হয়ে তাতেই রাজি হয়েছিলেন।

কাহিনিতে দেখা যায় লৌকিক বৌদ্ধধর্মের প্রভাব রয়েছে। কেননা বৌদ্ধ 'নাগরাজ' জাতকে দেখা গেছে নাগের মৃত্যু রহস্য ছল করে জেনে নিয়েছে সন্ন্যাসী। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত বেহুলার কাহিনিতে সাতালি পর্বতে বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দরের বাসস্থান নির্ধারিত হয়। দীর্ঘনিকায়-এ বর্ণিত রয়েছে সাত নামক পাহাড়ে নাগেদের বাস ছিল। এই সাত ও সাঁতালি পাহাড় যাদের মধ্যে কিছুটা নৈকট্যতা ধরা পড়ে।[৮০] বিপ্রদাস পিপিলাই-এর মনসামঙ্গলকাব্যের অষ্টমপালার প্রথম অংশের বর্ণনা পাওয়া যায় - যেখানে দেখা যায় চাঁদের পুত্রদের বধের জন্য মনসার অনুরোধে রাজি হয় ঢোঁড়াসাপ। ঢোঁড়াসাপটি সঙ্গে নেয় ধামাইর রথটি। সেই সময়টা ছিল আষাঢ়মাস, মর্ত্যে তখন সকলস্থানে বৃষ্টির প্রকোপ। মৎস্য এবং ভেকেদের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়। এই সময় একজন কৃষক মাছ ধরতে আল বেঁধে গাই কেটে ঘোনা পেতে রাখে মাছ ধরতে। ঢোঁড়া পেট ভড়ে ভেক এবং মাছ খেয়ে আরাম করে ঘুমিয়ে ভাসতে ভাসতে

ঘোনার মধ্যে আটকে যায়। কৃষক এসে তার দোহারটি তুললে সেখানে ধরা পরে ঢোঁড়া সাপটি এবং তাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করা হয়।[৮১] এই কাহিনির সঙ্গে 'হরিতমাত-জাতক' নামক বৌদ্ধজাতকের কাহিনির সঙ্গে অনেকাংশে মিল রয়েছে। যথা - একবার বারাণসীর রাজা ব্রাহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব নীলমণ্ডূক বা ব্যাঙ রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিল। সেসময়ে মানুষ মাছ ধরার জন্য নদী, খাল, বিলে ঘোণা বা ঘুণি পেতে রাখত। একদিন এইরকম একটি ঘোণায় অনেক মাছ ঢুকে আটকে পড়েছিল। এই মাছগুলিকে খাওয়ার জন্য একটি ঢোঁড়াসাপ ঢুকে পড়েছিল। সকল মাছেরা একজোট হয়ে সাপটিকে আক্রমণ করে। সাপটি আক্রান্ত হয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচে ও জলের ধারে আধমরা হয়ে সুয়ে থাকে। এমন সময় সেখানে একটি ব্যাঙ এলে সাপটি তার পরাজয়ের কাহিনি শুনিয়ে বলে এই কাজ কী ঠিক করেছে মাছেরা? বোধিসত্ত্ব রূপী ব্যাং তখন বলে তুমিও তো তোমার নাগালের মধ্যে পেয়ে মাছেদের খেয়ে নিতে পিছপা হওনি। মাছেরা তোমাকে ছেড়ে দেব কেন। একথা শুনে মাছেরা ভাবে শত্রুর শেষ রাখতে নেই তাই তারা জল থেকে উঠে এসে সাপটির প্রাণান্ত করে আবার জলে চলে যায়।[৮২] মনসামঙ্গলকাব্যের গ্রন্থারম্ভে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের ফলে এই মঙ্গলকাব্যে ধর্মঠাকুরের প্রবেশ ঘটেছে। মনসামঙ্গলকাব্যগুলি বিভিন্ন অঞ্চলভেদে দ্বিবিধ রূপলাভ করেছে। উত্তরবঙ্গীয় কবি বিভূতি তার কাব্য মধ্যে জানিয়েছেন – দেবতা শিব একদা ধর্মপূজার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। সেই কথা হঠাৎ মনে পড়লে তিনি ধর্মপূজার ফুল আনতে মানস সরোবরে যান। সেই স্থানে তার নির্গত বীর্য বিন্দু পদ্মনালি বেয়ে পাতালে যায়। তার ওপর বাসুকির ছিটিয়ে দেওয়া জলে জন্ম হয় দেবী মনসার -

ঘন ঘন পিএ মধু, ঘন যায় সঙ্গ। কামরসে মহেশের পুলকিত অঙ্গ।।
টলিয়া হরের বীর্য পড়ে পদ্মপাতে। জয় জয় পুষ্পবৃষ্টি।।
হর হারাইল বীর্য্য পদ্মপাতে থুয়্যা। পাতাল ভুবনে গেল পদ্মনাল বায়্যা।।
গড়িয়া পড়িল বীর্য্য বাসুকীর কোলে। যত্নে বাসুকী লয়্যা থুইল তাম্র খোলে।।
বাসুকি আনিঞা দিল বিধাতার স্থান। বিধাতা পাইয়া তাহা করিল নির্ম্মাণ।।[৮৩]

মনসামঙ্গলকাব্যের কাহিনির চরিত্রচিত্রণে রয়েছে লৌকিক বিশ্বাসের প্রভাব। লোকবিশ্বাস বা লোকসংস্কারের ধারণাগুলি গড়ে উঠেছে মানুষের জীবন-যাপনের ওপর নির্ভর করে। যেগুলির ভিত্তি সর্বদা বৈজ্ঞানিক যুক্তি তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে না। এখানে স্থান পায় মন্ত্রতন্ত্র, কুসংস্কার ও লোকচিকিৎসা বিধিগুলি। মঙ্গলকাব্যের চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে - সেগুলি পূর্বের

ধারণাগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তাদের মধ্যে লৌকিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মনসাদেবীর মর্ত্যে পূজাপ্রচারের উদ্দেশ্যে স্বর্গভ্রষ্টা ঊষা ও অনিরুদ্ধকে, কবিরা লৌকিক করে এঁকেছিলেন। মঙ্গলকাব্যের প্রেক্ষাপটে ছিল জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করত জাগুলিদেবীর সাপের বিষ নাশ করার অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। প্রাচীনকালে যারা সাপের বিষের প্রভাব নষ্ট করতে সক্ষম হত তাদের লোকায়ত মানুষ জাগুলি নামে চিহ্নিত করত। সেই নামানুসারে বৌদ্ধদের এই জাঙ্গুলী দেবীর নামকরণ ও উৎপত্তি হয়েছিল। চাঁদবেনে যখন বেহুলার সঙ্গে লক্ষ্মীন্দরের বিয়ের পাকা কথা বলতে যান। সে বেহুলার কিছু পরীক্ষা নিতে চায়। লোহার কলাই ডাল রান্না করতে বললে, বেহুলা মনসাকে স্মরণ করে। এই অসাধ্য সাধন করে -

হেনকালে চাঁদবেনে কহে আর কথা ।
যদি সে তোমার কন্যা হয় পতিব্রতা।।
লোহার কলাই দিবে করিয়া রন্ধন।
সেই ধনী বিভা করে আমার নন্দন।।[৮৪]

ঘটক বিবাহের কথা পাকা করতে তুলসী বদল করে। মনসামঙ্গলকাব্যের কবি কেতকাদাসের কাব্যের প্রতিটি অংশে লোকায়ত প্রভাব স্পষ্ট রয়েছে। বৌদ্ধতন্ত্র গুপ্তসাধনায় মন্ত্রের দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করার কথা জানা যায়। এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে বেহুলা তার মৃত স্বামীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল গাঙ্গুরের জলে মান্দারের ভেলাকে সম্বল করে। তার সৌভাগ্যের ফলাফল বাড়ির লোকেদের বোঝার সুবিধার্থে বাড়িতে রেখে যায় কিছু অলৌকিক নমুনা -

হের দেখ সাইল ধান সিজান শুখান।
ভাজা কলাই দেখ করে ঠন ঠন।।
আর দেখ হরিদ্রা সিজান শুখান।
এই তিন দ্রব্য দেখ থুইলাম বিদ্যমান।।
সিজান ধানেতে যদি মেলয়ে অঙ্কুর।
তবে জানিবা বেউলা গেল দেবপুর।।
সিদ্ধ হরিদ্রায়ে যদি মেলিবেক গেজ।
তবে জানিবা বেউলা সাধিল নিজ কাজ।।
ভাজা কলাই যদি মেলিলেক পাত।
তবে জানিবা বেউলা জিয়াইল প্রাণনাথ।[৮৫]

ধন্বন্তরী ওঝা প্রসঙ্গে মন্ত্রশক্তির আরও নিদর্শন রয়েছে। তিনি মন্ত্রশক্তির দ্বারা মনসার হরণ করে নেওয়া সকল ধন-সম্পত্তি পুনরায় চাঁদ সদাগরকে ফিরিয়ে দিতে পারতো। জগজ্জীবনের মনসা মঙ্গলকাব্যে ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্রের প্রভাব বেশি দেখা গেছে। শিবের কণ্ঠের বিষ নাশের সময়ে মনসা

মন্ত্রের কারসাজি দেখিয়ে দেবতা শিবকে রক্ষা করেছিল। মঙ্গলকাব্যের কবিরা লোকপ্রচলিত কিছু শুভ, অশুভ লক্ষণের কথাও বলেছিলেন। কেতকাদাসের কাব্যে মনসার শিবের প্রাণদান অংশ বর্ণিত হয়েছে এইভাবে –

বিয়নির বায় দিয়া বাহরে চিয়াইয়া
বাপের বিষ ঝাড়ে বেটি।
... ...
পরম মন্ত্র শুনি ঠাকুর শূলপাণি
উপারিয়া দিল কালকূটি।।[৮৬]

বৌদ্ধধর্মের দেবী জাগুলির ন্যায় মনসা মন্ত্রের সাহায্য গরলের প্রকোপ থেকে পিতার প্রাণ ফিরিয়ে এনেছেন। মনসামঙ্গলকাব্য বৌদ্ধধর্মের প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এই ধারার কবিগণ আপন মনের মাধুর্য দিয়ে বৌদ্ধ লোকায়ত বিশ্বাসকে নিজেদের কাব্যের মহিমা বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত করেছেন।

গ. চণ্ডীমঙ্গলকাব্য: বাংলার সমগ্র শক্তিদেবীদের মধ্যে চণ্ডীদেবীর প্রকৃতি সর্বাধিক জটিল। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে লোকায়ত স্তরে যেই সকল স্ত্রীরূপী শক্তিদেবীদের উদ্ভব হয়েছিল তাদের একত্রে সংমিশ্রিত রূপ হল দেবী 'চণ্ডী'। বাংলাদেশের ধর্মীয় সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও পূজিত মহাশক্তিরূপী দেবীর নাম হিসেবে উঠে আসে দেবীচণ্ডীর কথা। *ব্রহ্ম্যবৈবর্তপুরাণ*-এ এই শক্তিদেবীর যেইসকল নামগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল - দূর্গা, নারায়ণী, ঈশানী, বিষ্ণুমায়া, শিবা, সতী, নিত্যা, সত্যা, ভগবতী, সর্বাণী, সর্বমঙ্গলা, অম্বিকা, বৈষ্ণবী, গৌরী, পার্বতী ও সনাতনী। 'চণ্ডী' শব্দটির মধ্যে অনার্য সমাজের লোকায়ত প্রভাব খুব স্পষ্ট হয়। মঙ্গলকাব্যের এই চণ্ডীরদেবীর সঙ্গে জৈনদেবী অম্বিকার কিছু লোকায়ত বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। চণ্ডীমঙ্গল-এর অধিদেবতা হিসেবে ধরা হয় দূর্গাদেবীকে। দূর্গাদেবীর সঙ্গে যেমন তার সন্তানেরা ঘিরে থাকে। জৈন অম্বিকা দেবীও তেমনি থাকে সন্তান পরিবিষ্টা হয়ে। জৈন ধর্মাবলম্বীরা সন্তানদের মঙ্গলার্থে এই দেবীর পূজা করে থাকে। এই অম্বিকা দেবীকে প্রথমে হিন্দুপুরাণে দেবতা রুদ্রের ভগিনী রূপে পাওয়া যায়। পরে তাকে রুদ্রের পত্নীরূপে আরাধনা করা হয়েছে। মঙ্গলকাব্যে চণ্ডীদেবীকে ঈশান পত্নী বলা হয়েছে। এই দেবীর অবস্থান করেন তন্ত্রভাবনার মধ্যে যেকথা উল্লেখ করা হয়েছে মঙ্গলকাব্যমধ্যে -

তুমি রমা তুমি বাণী যোগনিদ্রা নারায়নী
গিরি-কন্যা ঈশান- গৃহিণী।
আগম-নিগম-তন্ত্র বীজরূপা নানা-মন্ত্র
বেদমাতা বিশ্বের জননী।[৮৭]

‘চণ্ডী’ নামটি আসলে অর্বাচীন পুরাণ থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। *মহাভারত*–এর পূর্বে দেবী চণ্ডী–কে শিব পত্নীরূপে পাওয়া যায় না। রামায়ণে ‘চণ্ড’ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের প্রকাশ প্রথম পাওয়া যায় *রামায়ণ*-এ। *অথর্ববেদ*-এ অপদেবতা চণ্ডকন্যাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। হরিবংশে রোগজনক অপবাদ হিসেবে চণ্ডী-র উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে আরও কিছু লৌকিক চণ্ডী দেবীর নামোল্লেখ পাওয়া যায়, যাদের এখোনো লোকায়ত স্তরে পূজা হয়ে থাকে। যথা - নাটাইচণ্ডী, ঘোড়চণ্ডী, উড়নচণ্ডী, কুলুইচণ্ডী, শুভ বা সুবচনীচণ্ডী, খাড়াচণ্ডী, রথাইচণ্ডী, উদ্ধারচণ্ডী, রণচণ্ডী, ওলাইচণ্ডী, বসনচণ্ডী, অবাকচণ্ডী, কলাইচণ্ডী, ককাইচণ্ডী, ঢেলাইচণ্ডী ও মঙ্গলচণ্ডী। মঙ্গলচণ্ডীর আবার কিছু নাম পাওয়া যায় যেমন - বারমেসে মঙ্গলচণ্ডী বা নিত্যামঙ্গলচণ্ডী, জয়মঙ্গলচণ্ডী, হরিষমঙ্গলচণ্ডী, কুলুইমঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কটমঙ্গলচণ্ডী, উদয়মঙ্গলচণ্ডী, ভাউত্তামঙ্গলচণ্ডী ও ইত্যাদি। চণ্ডীদেবীকে মঙ্গল শব্দ দ্বারা পরিবৃত্ত করার কারণ হয়ত এই চণ্ডীদেবীর ভীষণা প্রকৃতির জন্য। তার কাছ থেকে অমঙ্গলের আশঙ্কা বেশি থাকে। তাকে সন্তুষ্ট রাখতে এবং অপ্রিয় নামটি দূরে রাখতে এই মঙ্গল শব্দটির ব্যবহার হয়। চণ্ডীদেবীর নাম অভয়া, যেই নামে দেবীকে পাওয়া যায় বেশ কিছু স্থানে। এই বিন্ধ্যবাসিনী এবং চণ্ডমুণ্ডমহিষাসুরবিনাশিনী নন, আবার তিনি অভয়া। প্রাচীন চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের কবিরা নিজেদের কাব্যের নাম দিতেন অভয়ামঙ্গলকাব্য। এই অভয়া মূর্তিতে দেবী সঙ্কটনাশিনী ও দীন উদ্ধারিণী রূপেও পূজিতা হয়ে থাকে -

সঙ্কট তরাইয়া রাখ তুয়া পদতলে।।
ব্রহ্মাদি স্তবিলা যদি যথ দেবগণ।
অভয়া বরদা সে যে দিলা দরশন।।
অভয়াএ বোলে তোরা না ভাবিঅ ডর।
সংহারিতে যাই আমি মঙ্গল অসুর।।[৮৮]

অভয়ামঙ্গলকাব্যে যখন কালকেতু বনের সকল পশুদের অত্যাচার করে এবং বন্য পশুরা চণ্ডীদেবীর স্মরণ নেয়। দেবী পশুদের অভয় দান করে এবং কালকেতুকে প্রাণী হত্যা থেকে প্রতিহত করে। দেবীর বনরাজ্যে সকলে প্রবেশ করতে পারে, যতক্ষণ না সেসকল প্রাণীদের মধ্যে হিংসা প্রবেশ করে।

এই অভয়ামঙ্গলকাব্যে এবং চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের যে কাহিনি পাওয়া যায়। যার মধ্যে রয়েছে উৎসজাত বৌদ্ধলৌকিক উপাদানের সমাহার। মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এখানে দুটি উপাখ্যান বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা - একটি ধনপতি উপাখ্যান, দ্বিতীয়টি আখেটিক খণ্ড বা কালকেতুর উপ্যাখ্যান। ধনপতি উপাখ্যানে রয়েছে – ধনপতি নামে একজন সদাগরের কথা। একদিন পায়রা ওড়াতে গিয়ে

দেখা হয় তার খুড়তুতো শ্যালিকা খুল্লনার সঙ্গে। যার রূপে মুগ্ধ হয়ে সদাগর দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব পাঠান জনার্দন ওঝাকে দিয়ে। এরপর তাদের বিয়ে হয়, কিন্তু সদাগরকে রাজার ডাকে কাজ সারতে শীঘ্র যেতে হয় গৌড়ে। খুল্লনাকে রেখে যান তার পূর্বের ভগিনী ও বর্তমানে সতীন হয়ে যাওয়া লহনার হাতে। তাদের দুজনের ভালোবাসার সম্পর্ক মেনে নিতে পারে না তাদের বাড়ির দীর্ঘকালের পরিচারিকা দুর্বলা দাসী। সে লহনাকে ভুল বুঝিয়ে খুল্লনার ওপর অত্যাচার শুরু করে। স্বামীর চোখে খুল্লনাকে খারাপ করতে লহনা তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্য নেয়। স্বামীর নামাঙ্কিত একটি চিঠি খুল্লনাকে দিয়ে, তার নিয়মবিধি মেনে চলতে বাধ্য করে। যেই চিঠিতে ছিল শুধু দুর্ভোগের সহ্য করার কথা – কারণ সেখানে বলা হয়েছিল খুল্লনার জন্য একবেলার ভাত বরাদ্দ। তার শোবার স্থান দেয় ঢেঁকিশালে ও পরিধানের জন্য পাবে ছিন্নবস্ত্র। এই চিঠি ছল একথা জেনে খুল্লনা বাধ্য হয়ে সে এই গুলি মেনে নেয়। একদিন ছাগল চড়াতে গিয়ে সে ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়লে, তার সর্বশী ছাগলটি হারিয়ে যায়। সেই ছাগল খুঁজতে গিয়ে তার পঞ্চ দেবকন্যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। যাদের থেকে সে চণ্ডীদেবীর পূজা শিখে নেয়। সে দেবীপূজা করে, আপন ছাগল ফিরে পায়। এইদিকে তাদের স্বামী ফিরে এলে লহনা স্বামীর চোখে খুল্লনাকে খারাপ করে দেখালেও, সদাগর সেই কথায় কান দেন না। লহনা শৈবস্বামীর কাছে, খুল্লনার চণ্ডীপূজার কথা জানালে, এতে সদাগর ক্রুদ্ধ হয়ে ডাকিনী পূজা বলে চণ্ডীপূজাকে অবহেলা করেন। পূজার ঘট লাথি মেরে ভেঙে দেন। সদাগর বাণিজ্যে গেলে রাস্তায় দেখে 'কমলেকামিনী রূপ' কিন্তু আসলে এটা ছিল চণ্ডীর ছলনা। দেশের রাজাকে গিয়ে কমলেকামিনীর কথা বললেও সে সময়মতো এইরূপ দেখাতে পারে না। সদাগর কারাবন্দী হন। খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত মাতা চণ্ডীর কৃপায় সিংহল রাজ্যে গিয়ে রাজার শর্ত মতো রাজাকে কমলেকামিনী রূপ দেখায়। রাজকন্যা ও অর্ধরাজ্যের অধিকারী হয়। পিতা ধনপতিকে ছাড়িয়ে নিয়ে সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে ফিরে এসে দেবী চণ্ডীর পূজা করে।

দ্বিতীয় খণ্ড কালকেতুর উপাখ্যানে পাওয়া যায় – চণ্ডীর মর্ত্যলোকে পূজা প্রচারের কাহিনি। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর ও পুত্রবধূ ছায়া এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মর্ত্যে আসে এবং ব্যাধ কালকেতু ও ফুল্লরা নামে জীবনধারণ করে। কালকেতু শৈশব থেকেই ভয়হীন, বীর ও বলশালী বালক। ব্যাধ কন্যা ফুল্লরার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। সে বন থেকে পশু শিকার করে জীবন নির্বাহ করত, তার অত্যাচারে আর না থাকতে পেরে পশুরা দেবী চণ্ডীর কাছে নালিশ করে। দেবী তাদের রক্ষার জন্য নিজে

স্বর্ণগোধিকার রূপধারণ করে। কালকেতু সারা বনে শিকার না পেয়ে এই গোধিকাকে বাড়ি এনে বিপদে পড়ে। দেবী প্রথমে ছদ্মবেশে ফুল্লরাকে ছলনা করে কিন্তু পরে নিজের মূর্তি ধরে রাজ্য স্থাপনের জন্য তাদের প্রচুর সম্পত্তি দিয়ে যান। এই রাজ্য আক্রমণ হলে কালকেতু দেবী চণ্ডীর স্তব করে মুক্তি লাভ করে। এরপর দেবী মাহাত্ম্যের কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আখেটিকখণ্ডের কাহিনি মুকুন্দ চক্রবর্তী পেয়েছিলেন মূলত লৌকিক বৌদ্ধজাতক থেকে। বৌদ্ধদের জাতক গ্রন্থের একশো আটত্রিশ সংখ্যক জাতকের নাম হল গোধাজাতক।[৮৯] বারাণসীরাজ সুপ্রভ, নিজের পুত্রকে রাজসিংহাসন থেকে বঞ্চিত করতে, পুত্রবধূসহ তাদের নির্বাসন দেয়। তারা বনে কোনরকমে পশু-পাখি মেরে খেয়ে কষ্টে দিনযাপন করতে থাকে। একদিন একটি বিড়াল গোধা মেরে তাদের আশ্রমের সামনে ফেলে রেখে যায়। সুতেজ গোধাটিকে আহারের জন্য সেদ্ধ করে। ছাল ছাড়িয়ে রাখা দেখে তার পত্নীর এই বস্তুটি খেতে ইচ্ছে করে। রাজকন্যার সুতেজের প্রতি ভালোবাসার অভাব অনুভব করে সম্পূর্ণ গোধাটি একাই খেয়ে ফেলে। পত্নীকে জানায় গোধাটি পালিয়ে গেছে। রাজকন্যা এইকথা বিশ্বাস করে না। রাজকন্যার স্বামীর ভালোবাসা নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগে। এই অবস্থা চলাকালীন সেই রাজ্যের রাজার মৃত্যু হয়। অমাত্যরা এসে রাজকুমারকে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাজার পদে বসান। রাজকন্যা, রাজরানী হয়েও একথা ভুলতে পারে না। এই গোধাজাতকের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রেখেছে কালকেতুর উপাখ্যান-এর সঙ্গে। মঙ্গলকাব্যের কবি মুকুন্দের কালকেতুর কাহিনি ও বৌদ্ধ গোধাজাতক দুইয়ের মধ্যে দেখা যায় - নায়ক-নায়িকারা বনে বাস করে, তাদের প্রধান কর্ম ছিল মৃগয়াবিজয়। বন থেকে জীবন ধারণের জন্য আহার সংগ্রহ করত। দুটি গল্পে গোধা বা গোধিকা নায়কের প্রতি প্রসন্ন হয়েছে। শেষপর্যন্ত গোধা লাভের পরে তাদের রাজ্যলাভ হয়েছে। কালকেতু তৈরি করেছে নতুন রাজ্য, আর সুতেজ ফিরে গেছে পুরনো রাজ্যে।

জাতক সংখ্যা তিনশো তেত্রিশ যেখানে 'গোধাজাতক'-এর ন্যায় আর একটি কাহিনি পাওয়া যায়। এখানে স্বামী-স্ত্রী তারা দুজনে বনে বাস করে। একদিন তাদের এক ব্যাধ রান্না করা গোধা উপহার দেয়। পত্নীর অবর্তমানে তার স্বামী সম্পূর্ণ গোধার মাংস নিজে একা খেয়ে ফেলে আর তার পত্নীকে জানায় গোধাটি পালিয়ে গেছে। তার পত্নী সমস্ত বিষয়টা বুঝতে পেরে স্বামীকে কিছু বলে না। এরপর তারা পথ চলার ক্লান্ত দূর করতে ও জলপান করতে জেতবনে প্রবেশ করে। সেখানে

গন্ধকুটিতে শাস্তা তাদের জন্য অপেক্ষারত ছিল। তখন শাস্তা তাকে প্রশ্ন করে - উপাসিকে তোমার স্বামী তোমার সম্বন্ধে হিতকাম, সস্নেহ ও উপকারক? এই প্রশ্নের উত্তরে রমণী জানায় – আমি আমার স্বামী সম্বন্ধে হিতকাঙ্খিণী ও স্নেহপরায়ণা। আমার স্বামী আমার প্রতি নিঃস্নেহ। তখন শাস্তা তাকে বলে এই ব্যক্তির আসলে বৈশিষ্ট্য এইরকম। সে যখন তোমার গুণ মনে করে তখন তোমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের পূর্বকাহিনি মনে করিয়ে দেয় যেখানে একবার তার এই স্বামী রাজা ছিল এবং রানির সুকৃতকার্যের জন্য তাকে সমগ্র রাজ্য দান করেছিল।[৯০] এই কাহিনির সঙ্গে খানিকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায় ধনপতি উপাখ্যানের। যেখানে ধনপতিকে বিবাহ করার পর থেকে খুল্লনার জীবনে নানাবিধ কষ্টের আগমন হয়। খুল্লনা সবকিছু বুঝতে পেরেও সহ্য করে, স্বামীকে কিছু জানায় না। স্বামী দ্বারা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সকল অত্যাচারকে মুখ বুজে সহ্য করে, এমনকি ধনপতি খুল্লনাকে ভুল বোঝে। পরে ধনপতি নিজের ভুল বুঝতে পেরে খুল্লনাকে আপন করে নেয়।

বৌদ্ধদেবী বজ্রধাত্বেশ্বরী যাকে পশুদের দেবতা বলা হয়ে থাকে। এই দেবী পশুদের রক্ষাকর্তৃ হিসেবে বিবেচিত হতেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী তার কাব্যে দিগ-বন্দনা অংশে লৌকিক দেবতা নিরঞ্জনের উল্লেখ করে বলেছেন –

আদি দেব বন্দিব ঠাকুর নিরঞ্জন।
যাঁহার সৃজন সৃষ্টি সকল ভুবন।।
মাতা বসুমতী বান্দা জোড় করি হাথ।
বৌদ্ধরূপে বন্দিব ঠাকুর জগন্নাথ।।[৯১]

কাব্যের মধ্যে দেবীর কমলেকামিনী রূপধারণ, যেখানে ঐন্দ্রজাল বিভূতির স্বাক্ষর বহন করেছে। বৌদ্ধদেবী একজটা যার স্তব উচ্চারণ করলে মানুষের নির্বিঘ্নতা আসে, শত্রুর বিনাশও হয়। মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীদেবী ধনপতি পুত্র শ্রীমন্ত, খুল্লনা ও কালকেতু প্রত্যেকে নিজেদের বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য দেবীচণ্ডীকে স্মরণ করেছেন। সেসকল কাজে প্রত্যেকে সফল হয়েছে। খনার বচনের সময়কাল সম্পর্কে জানা যায় – হিন্দু-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সমাজের সমন্বয়ের সময়ে এইগুলি গঠিত হয়েছিল। সেখানে দেখা যায় স্বাস্থ্যসম্পর্কে সচেতন হতে মানুষ ঝাড়ফোঁকের সাহায্য নিয়েছে। মঙ্গলকাব্যেগুলিতে দেখা যায় বিভিন্ন লৌকিক প্রভাবের মাধ্যমে দীর্ঘায়ু কামনা ও সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনার দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *বেণের মেয়ে* উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায়, সেকালের সমাজে উচ্চস্তরের ক্ষমতাশালী মানব বলে তারা গণ্য হত যারা বাণিজ্যযাত্রা এবং সম্পত্তির অধিকারী হত।[৯২] এই শ্রেণির

লোকেদের সকলধর্মের লোকেরা নিজেদের দল ভারী করতে নিজেদের দিকে আকর্ষিত করতে চাইত। বিধবা ধনী বেণের মেয়েকে নিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয় বিরোধ। এই চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে দেখা যায় ধনপতির হাতে দেবী চণ্ডী পূজা পেতে চায়। ধনপতি সমাজের উঁচুস্তরের মানুষ, তার কাছে স্বীকৃত হলে সদাগরের অনুগত সকল প্রজার কাছে দেবী স্বীকৃতি পেতে পারে। এই মঙ্গলকাব্যের দেবী যেকোন প্রকারে কাজ হাসিল করতে চেয়েছেন। যেমন ভাবে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দুবেলা এসে বেনের মেয়েকে সুপরামর্শ দিতে থাকে যোগিনী হতে।[৯৩] তৎকালীন সমাজে প্রচলিত শুভাশুভের ভাবনা অর্থাৎ কুসংস্কারগুলিকে এই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে টেনে আনা হয়েছে। যেমন – দ্বিজমাধবের কালকেতু শিকারে কিছু না পেয়ে আক্ষেপ করে বলেছে –

গুরুবারে দক্ষিণ স্বরে রজনী প্রভাতে।
এহার কারণে মোড় স্পন্দিল দক্ষিণ হাতে।।
এহার কারণে খঞ্জন দেখিনু কমলে। [৯৪]

বৌদ্ধ যোগীদের লেখা গ্রন্থ চর্যাপদে দেখা গেছে প্রচলিত প্রবাদ এবং ধাঁধার ব্যবহারের বাহুল্যতা, এই চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধাঁধা-প্রবাদ-প্রবচন।

ঘ. ধর্মমঙ্গলকাব্য: ধর্মমঙ্গলকাব্যের উপাদান মূলত রাঢ় বাংলার লৌকিক রাজনৈতিক ও সামাজিক উপাদানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ধর্মঠাকুর বঙ্গদেশের রাঢ় অঞ্চলের গ্রামীণ জনসাধারণ কর্তৃক পূজিত একজন জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু এই তিন ধর্মীয়ভাবনা দ্বারা গঠিত একজন মিশ্র দেবতা হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকেন। এই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে দেবতা বৈশিষ্ট্যে ইসলামি ধারার কিছু বৈশিষ্ট্যের নমুনা পাওয়া যায়। নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গলকাব্যে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই কবি বন্দনা পর্বে হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম পীর পয়গম্বরদের বন্দনা করেছেন। লাউসেনের হাকণ্ড যাত্রা পথে, লাউসেন যেমন কপিল মুনির আশ্রম দর্শন করেছিল, রামের সেতুবন্ধন দর্শন করেছিল তেমনি গড় মান্দারনে লাউসেন পীরের মোকাম দর্শন করেছিল। কবি লাউসেনকে মক্কা মদিনার ঘরও দর্শন করিয়েছেন। আধুনিককালের ধর্মমঙ্গলকাব্য ধারার কবি নরসিংহ বসুর ভিন্নধর্মের প্রতি সমদৃষ্টি পোষণের মহানুভবতা হয়ত তিনি আয়ত্ব করেছিলেন তার বিধর্মী রাজার নিকট দীর্ঘকাল কাজে নিযুক্ত থাকার ফলশ্রুতিস্বরূপ। তিনি পাঠান বংশজাত রাজা আসাদুল্লাহ খানের রাজদরবারে ওকালতির কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[৯৫] ধর্মমঙ্গলকাব্যের দেবতা ধর্মরাজ 'ধর্মশিলা' দ্বারা পূজিত হয়ে থাকে। এই ধর্মশিলার সঙ্গে বৌদ্ধশিলার যোগ খোঁজা হয়েছে। বৌদ্ধ শূন্যমূর্তির সঙ্গে ধর্মদেবতার

সাদৃশ্য রয়েছে এমনটা গবেষকরা মনে করেছেন। কোথাও একটি সিঁদুর মাখানো পাথর বা প্রস্তরখণ্ড রাখা হয় গাছের তলায়। মন্দিরে রেখে পূজা করা হয় এরূপ প্রস্তরখণ্ড। এই ঠাকুরের নির্দিষ্ট কোনো আঁকার নেই। এই ধর্মদেবতার সঙ্গে হিন্দু প্রভাবিত অঞ্চলে বিষ্ণুর কূর্মমূর্তির ন্যায় পূজা করা হয়। ঘনরামের ধর্মমঙ্গলকাব্যের বন্দনা অংশে ধর্মদেবতাকে কূর্মরূপে ধর্মকে বন্দনা করা হয়েছে -

জলের উপরে মহী করে টলমল।
সৃজিলা বাসুকী কূর্ম্ম অষ্ট কুলাচল।।
সুমেরু পর্ব্বত হৈল সকলের মূল।
পরিমাণে পৃথিবী হৈল সুপ্রতুল।।
সপ্ত স্বর্গ পাতাল পৃথিবী সপ্ত দ্বীপ।
ব্রহ্মধাম বৈকুণ্ঠ কৈলাস নাগাধিপ।।
আপনি করিলা সৃষ্টি অখিল আধান।[৯৬]

রিজলী তার *Tribes and Castes of Bengal* গ্রন্থে দেখিয়েছেন হিন্দু প্রভাবিত অঞ্চলের বাইরে ধর্মঠাকুরের মৎস্যপুচ্ছ বিশিষ্ট নরাকৃতি ধর্মঠাকুরের পূজা হয়ে থাকে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অথবা ভাদ্রমাসের সংক্রান্তির দিন ধর্মঠাকুরের বিশেষ পূজা করা হয়ে থাকে। প্রধানত বাউড়ি, বাগদি, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি নিম্নশ্রেণির মানুষেরা ধর্মঠাকুরের পূজা করে থাকে। *আচারাঙ্গ সূত্র* নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় এই অঞ্চল ছিল আদিবাসীদের বাসভূমি। এই জৈনগ্রন্থে বর্ণিত রাঢ় অঞ্চলের মানুষের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের কাব্যে বর্ণিত রাঢ় অঞ্চলের মানুষের বর্ণনায় যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই ধর্মমঙ্গলকাব্যের যে সকল সন্ন্যাসীদের দেখা যায় তাদের মধ্যে ছাই ভস্ম মাখা সন্ন্যাসীদের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। যারা ধর্মঠাকুরের পূজার মাসের একমাস ধর্মের সেবক হয়ে থাকে। হিউয়েন সাং-এর বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় - তিনি ভারতবর্ষে ভ্রমণকালে রাঢ়বঙ্গে এইরূপ কিছু সন্ন্যাসীকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিলেন। ধর্মমঙ্গলকাব্যের মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন ধর্মের লৌকিক বৈশিষ্ট্যগুলি এসে সম্মিলিত হয়েছে এই কাব্যের লোকায়ত কাহিনির মধ্যে। বৌদ্ধ দর্শনে 'ভাবনা-হিতজনক সপ্ত বিধি' নামক যে সকল বিধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে একটি হল আলাপ-আলোচনা। যেখানে বলা হয়েছে - রাজনৈতিক, ভয়জনক, কামোদ্দীপক ও দ্বেষমূলক আলোচনা না করা। পত্রিকা, উপন্যাস ও সারহীন গ্রন্থাদি পাঠ না করা, যেগুলির প্রভাবে যোগীর ধ্যান নিমিত্তের অন্তর্দ্ধান হয়। যেসকল আর্য্যসম্মত মিতালাপে যোগীর হিত সাধিত হয়। তৃষ্ণাক্ষয়কর আলাপ, সসন্তোষ আলাপ, অসৎসঙ্গ বর্জ্জন ও সমাধি-প্রজ্ঞা-বিমুক্তিমূলক আলাপ যোগীর

পক্ষে হিতজনক।[৯৭] বৌদ্ধদর্শনের এই মতের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলকাব্যের গঠনের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যখন রঞ্জা পুত্রলাভের চেষ্টায় চিন্তিত হয়ে পড়ে। সুমলা রঞ্জাকে হরিশচন্দ্রের পুত্রলাভের কাহিনি শুনিয়ে; রঞ্জাকে পুত্রলাভের জন্য আরও উৎসাহী করে তোলে। এরপর বহু বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে রঞ্জা ধর্ম দেবতাকে সন্তুষ্ট করে পুত্র লাউসেনকে লাভ করেছে।

ধর্মমঙ্গলকাব্যের কাহিনি কয়েকটি পালায় বিভক্ত থাকে। এই পালাগুলির প্রথম দিকের অংশে থাকে রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনি। যেখানে রাজা হরিশচন্দ্রের পুত্রলাভের কাহিনি বর্ণিত রয়েছে। পরবর্তী পালাগুলিতে বর্ণিত হয়েছে লাউসেনের উপাখ্যান। ধর্মমঙ্গলকাব্যের দ্বিতীয় কাহিনিটি গড়ে উঠেছে লাউসেনের বীরত্ব গাথাটিকে কেন্দ্র করে। ধর্মপূজার *ঘরভরা* অনুষ্ঠানের জন্য এই কাহিনিটিকে গীত আকারে চব্বিশ পালায় বিভক্ত করে বারো দিন ধরে গাওয়া হয়। এই কাহিনিটির অপর নাম বারোমতি বা বার্মাতি। ধর্মঠাকুর মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য উৎসুক ছিলেন। এমন সময় স্বর্গের নর্তকী জাম্ববতী শাপগ্রস্থ হয়ে বমতি নগরে বেণুরায়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম হয় রঞ্জাবতী। রঞ্জাবতীর দিদি ছিলেন গৌড়েশ্বরের রাজমহিষী এবং তার দাদা মহামদ ছিলেন গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী। গৌড়েশ্বরের বিদ্রোহী সামন্ত তথা চণ্ডীর বরপুত্র ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে গৌড়েশ্বরের অপর সামন্ত তথা ঢেকুরগড়ের অধিপতি কর্ণসেনের ছয় পুত্র ও পুত্রবধূগণ যুদ্ধে নিহত হন। কর্ণসেন নিজেও পরাজিত হন। কর্ণসেনকে সান্ত্বনাস্বরূপ গৌড়েশ্বর নিজ শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে তার বিবাহ দেন। বিবাহের পর রঞ্জাবতীকে নিয়ে কর্ণসেন ময়নাগড়ে নতুন সামন্তের পদে অধিষ্ঠিত হন। এদিকে বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে বোনের বিবাহ হওয়ায় ক্ষুব্ধ হন মহামদ। গৌড়েশ্বরের কাজের প্রতিবাদ করতে না পেরে কর্ণসেনের সঙ্গেই শত্রুতা করেন তিনি। কর্ণসেনকে বারবার পুত্রহীন বলে গালি দিতে থাকেন মহামদ। এতে বিচলিত হয়ে রঞ্জাবতী পুত্রকামনায় কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন সহ ধর্মঠাকুরের পূজা করতে থাকেন। যথাকালে ধর্মঠাকুরের কৃপায় এক স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা রঞ্জাবতীর গর্ভে জন্ম নেন। তার নাম রাখা হয় লাউসেন। এতে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মহামদ ইন্দা মেটে নামে এক অনুচরকে পাঠিয়ে লাউসেনকে অপহরণ করলেন।

ধর্মঠাকুর কর্পূরবিন্দু থেকে আলাদা একটি ছেলে সৃষ্টি করে রঞ্জাবতীকে দিলেন। তার নাম হল কর্পূর ধবল। এদিকে ধর্মঠাকুরের আজ্ঞায় হনুমান লাউসেনকে উদ্ধার করে রঞ্জাবতীর কোলে

ফিরিয়ে দিলেন। এইভাবে রঞ্জাবতী হলেন দুই পুত্রের জননী। ক্রমে লাউসেন বড়ো হয়ে ওঠে। লেখাপড়া ও অস্ত্রবিদ্যায় অর্জন করে বিশেষ দক্ষতা এবং মল্লযুদ্ধেও হয়ে ওঠে এক অপ্রতিরথ যোদ্ধা। গৌড়েশ্বরকে নিজ বীরত্ব দেখিয়ে খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে সে ভাই কর্পূর ধবলকে নিয়ে গৌড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথে যেতে যেতে সে বাঘ, কুমির ইত্যাদি হিংস্র জন্তু বধ করতে করতে এগোতে থাকে। সে নিজের খ্যাতি বৃদ্ধি করতে থাকে। ভ্রষ্টা নারীদের প্রলোভন এড়িয়ে সে নৈতিক শুচিতার পরিচয় দেয়। গৌড়ে পৌঁছে লাউসেন মহামদের চক্রান্তে বন্দী হয়। গৌড়েশ্বরকে বাহুবল দেখিয়ে খুশি করে সে অচিরেই মুক্তিলাভ করে। গৌড়েশ্বর তাকে প্রচুর পুরস্কার ও ময়নাগড়ের ইজারা দেন। গৌড় থেকে ফেরার পথে কালু ডোম ও তার বউ লখ্যার সঙ্গে লাউসেনের সখ্যতা হয়। লাউসেন তাদের ময়নাগড়ে নিয়ে আসে এবং কালুকে তার সেনাপতি পদে নিয়োগ করে। মহামদের চক্রান্তে গৌড়েশ্বরের রাজা লাউসেনকে কামরূপের তৎকালীন ক্ষমতা থাকা রাজাকে দমন করতে পাঠানো হয়। লাউসেনের উন্নতিতে অসন্তুষ্ট অহংকারী মহামদ ভেবেছিলেন প্রবল প্রতাপশালী কামরূপরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে লাউসেনের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন কামরূপের রাজাকে পরাজিত করে তার কন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করে সুস্থ শরীরে দেশে ফিরে আসে। যা দেখে মহামদ ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ হতে থাকে। সে পুনরায় চক্রান্তে করে গৌড়েশ্বরকে দিয়ে লাউসেনকে শিমূল রাজ্য আক্রমণ করতে পাঠান। লাউসেন সেখানে গিয়ে লোহার গণ্ডার কেটে শিমূল রাজকন্যা কানাড়াকে বিবাহ করে ফিরে আসে। লাউসেনকে কোনোভাবে হারাতে না পেড়ে মহামদের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার চক্রান্তে অজয় নদের তীরে ইছাই ঘোষের সঙ্গে লাউসেনের প্রবল যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধে ইছাই ঘোষ পরাজিত ও নিহত হয়। এরপর মহামদ লাউসেনকে অন্যভাবে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করে। সে কৌশলে গৌড়েশ্বরকে দিয়ে লাউসেনের প্রতি আদেশ করালেন - লাউসেন যদি সত্যি ধর্মঠাকুরের বরপুত্র হয়। তাহলে তাকে পশ্চিমে সূর্যোদয় ঘটিয়ে দেখাতে হবে, নচেৎ তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। হাকন্দ নামক স্থানে ধর্মঠাকুরের কঠোর তপস্যা করে লাউসেন এই অসাধ্যটি সাধন করে। লাউসেন যখন হাকন্দে তপস্যা করছিল, তখন সেই সুযোগে মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করে। মহামদের আক্রমণ আটকাতে গিয়ে যুদ্ধে সপত্নী কালুরায়ের মৃত্যু হয়। লাউসেনের প্রথমা স্ত্রী কলিঙ্গা বীরবীক্রমে এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে। শেষে বীরাঙ্গনা কানাড়ার হাতে পরাজিত হয়ে মহামদ পালিয়ে

যেতে বাধ্য হন। দেশে ফিরে ধর্মঠাকুরের স্তব করে সকলকে পুনরায় বাঁচিয়ে তোলে লাউসেন। মর্ত্যে ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। মহামদ তার কৃত পাপের জন্য কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ হয়। দয়াপরবশ হয়ে লাউসেন ধর্মঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করে তাকে রোগ থেকে মুক্তি দেয়। এরপর পরম গৌরবে কিছুকাল রাজত্ব করে পুত্র চিত্রসেনের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে স্বর্গারোহণ করে লাউসেন।[৭৮]

কাহিনিতে দেখা যায় অলৌকিক উপায়ে মৃতদের পুনরায় জীবিত করে তোলা হয়েছে। এই অলৌকিক উপায়ে অসম্ভবকে সম্ভব করার ধারণা মানুষের আদিম ভাবনাজাত। স্বর্গের দেবতা মর্ত্যের মানবের কাছে নেমে এসেছে কখনও ভক্তকে তার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিতে, আবার কখনও ভক্তের ডাকে সারা দিয়ে। এই সবই হয়েছে লেখকের তৎকালীন সমাজের বিশ্বাস ও লোকায়ত আচারের কথা মাথায় রেখে। ধর্মমঙ্গলকাব্যের ধারার আরও কিছু প্রধান কবির নাম পাওয়া যায় যেমন - রূপরাম চক্রবর্তী যিনি সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। এই কাব্যের অন্য একজন পৌরাণিক কবি হলেন ময়ূরভট্ট যাকে ধর্মমঙ্গলকাব্যের আদিকবি বলে উল্লেখ করা হয়। শ্যামপণ্ডিত, ধর্মদাস, রামদাস আদক, সীতারাম দাস, যদুনাথ বা যাদবনাথ পণ্ডিত ও খেলারাম চক্রবর্তী। এই সকল কাব্যকারের কাহিনির মধ্যে সাদৃশ্য বজায় রয়েছে।

ধর্মঠাকুরের বাহন হল ঘোড়া। বিভিন্ন স্থানে হাতি এবং উলুককে ধর্মঠাকুরের বাহন হিসেবে পাওয়া যায়। রাঢ় অঞ্চলে পোড়ামাটি ও কাঠের তৈরি ঘোড়া দিয়ে ধর্মঠাকুরের পূজা করা হয়। গ্রামবাসীরা ধর্মঠাকুরের কাছে ঘোড়া মানত করে এবং ধর্মপূজার সময় মাটির ঘোড়া বলি দেওয়া হয়। অনার্য জাতির প্রভাবে অনার্য দেবতার ধর্মঠাকুরের সঙ্গে ঘোড়ার যোগের একটু ইতিহাস রয়েছে। নর্ডিক জাতিগোষ্ঠী ভারতে ঘোড়া ও লোহার ব্যবহার প্রবর্তন করে। এই নর্ডিকজাতির মধ্যে সূর্যপূজার প্রচলন লক্ষ করা গেছে। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সূর্যদেবতার সাদৃশ্য এবং সেই ভাবনা থেকে ধর্মপূজায় ঘোড়া মানত করা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। ধর্মদেবতার উপাসনা বা বন্দনার মধ্যে ধবল বা সাদা রঙের যোগ অনুমান করে। ধর্মঠাকুরের ভক্তরা সাদা ছাগল, সাদা মুরগী ও সাদা পায়রা বলি দিয়ে থাকে -

ধবল আসন ধবল ভূষণ
ধবল চন্দন গায়।
ধবল অম্বর ধবল চামর

ধবল পাদুকা পায়।।[৯৯]

এই সাদাবর্ণের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়তো ধর্মের অনুগামী সন্ন্যাসীরা শরীরে ছাইভস্ম মেখে থাকে। ধর্মের গাজন উৎসবের গান ও নাচগুলি স্পষ্টত অনার্য সংস্কৃতি থেকে উঠে এসেছে বলে অনুমান করা হয়। মাথার খুলি নিয়ে নাচ গাজনের একটি অঙ্গ, যাকে অনার্য সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত বলে মনে করা হয়। এগুলি দ্রাবিড় বা তিব্বতি-চীনা উৎস থেকে আগত। ধর্মঠাকুর তথাকথিত নিম্নবর্গীয় মানুষদের দেবতা। ব্রাহ্মণ্যধর্মে যখন নিম্নবর্গের মানুষকে গ্রহণ করা হত না তখন তারা নিজেদের লোকায়ত দেবতাদের পূজার আসনে অধিষ্ঠিত করে। অন্যান্য ধর্মের বৈশিষ্ট্যকে নিজেদের ভাবনার মধ্যে গ্রহণ করে এগিয়ে চলে। গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণরা দলে দলে এসে বাংলায় বসবাস করতে শুরু করে। তারা বাংলাদেশের আদি বাসিন্দা ছিল না। ধর্মঠাকুরকে সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্য দেবতা বলা চলে না। ধর্মদেবতা কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দেবতা ছিলেন না। তিনি তৎকালীন সমাজে পূজিত একজন গণদেবতা। সেসময়ে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে এই ধর্মদেবতার পূজা করত। হাড়ি, ডোম ও চণ্ডাল এই খেটে খাওয়া বৃহৎ সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মানুষেরা এই দেবতার পূজা বেশি করত। ধর্মঠাকুরের পূজার উৎসবকে বলা হয় ধর্মের গাজন। বাংলার পল্লিগ্রামে শিবের গাজনের কথা জানা যায়। ধর্মের গাজনের সঙ্গে শিবের গাজনের কিছু বৈসাদৃশ্য রয়েছে। ধর্মের গাজনে ঘোড়ার ব্যবহার আবশ্যক কিন্তু শিবের গাজনে এই আবশ্যকতা লক্ষ করা যায় না। গাজনের সন্ন্যাসীদের ভক্ত বলা হয়ে থাকে। তারা এই পূজা চলাকালীন এমন কতকগুলি অনুষ্ঠান পালন করে থাকে, যা অন্ত্যেষ্টী সৎকার প্রথার অনুরূপ। এই ধর্মের গাজনকে আবার ধর্মঠাকুর ও দেবী মুক্তির বিবাহ উৎসব বলে মনে করা হয়। ধর্মদেবতাকে আবার শূন্যরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এই দেবতার জন্ম, জরা ও মৃত্যুবোধ নিয়ে ভীতি নেই এরূপ কল্পনা করে ধর্মঠাকুরকে কল্পনা করা হয়েছে -

নাহি আদি মধ্য অন্ত   কর পদ কায় পান্ত
শোক মৃত্যু জরা জন্ম ভয়।
উল্লুক উপরে ভর   শূন্যগতি নিরন্তর
শূন্যরূপী সদানন্দময়।।[১০০]

এই শূন্যের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট যোগাযোগ রয়েছে। বৌদ্ধ মতে শূন্য শব্দ থেকে দুই প্রকার প্রতীতি জন্মে। প্রথম অংশে ঘট শূন্য বলতে জলাদি আধেয়ের অভাব বোঝা যায়, তবে এখানে ঘটাদির অবিদ্যমানতা বোঝায় না। দ্বিতীয় অংশে পট শূন্য বলতে বোঝায় সর্বশূন্যতা। বৌদ্ধধর্মের এই

সর্বশূন্যতার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের ধর্মদেবতার সংযোগ লক্ষ করা গেছে। এইভাবে ধর্মমঙ্গলকাব্যের মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন ধর্মের লোকায়ত উপাদানের সমাহার আবৃত হয়ে রয়েছে।

ঙ. অন্নদামঙ্গলকাব্য: অন্নদামঙ্গলকাব্যের ধারার অন্যতম কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। যার কাব্যে প্রথাসিদ্ধ মঙ্গলকাব্য ধারার পূর্ব ঐতিহ্য ও আঙ্গিককে অনুসরণ করলেও, বিষয়বস্তুর অবতারণায় কিছু নতুনত্বের নিদর্শন রেখেছেন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় অন্নদামঙ্গলকাব্যটি গ্রামীণ পটভূমিতে গড়ে উঠতে পারেনি। কাব্যটি একান্তই রাজসভার কাব্য হিসেবে গড়ে উঠেছে। ভারতচন্দ্র এই কাব্যের আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করেছিলেন - কাশীখণ্ড উপপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, বিলহনের চৌর-পঞ্চাশিকা (চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা)। 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিম্' এই জাতীয় কিছু পৌরাণিক গ্রন্থ্ এবং সেইসঙ্গে লোকপ্রচলিত জনশ্রুতি থেকে কিছু উপাদান সংগ্রহ করে। অন্নদাদেবীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে লৌকিক ভাবনার প্রতিচ্ছবি। অন্নদানের মধ্যে দিয়ে দেবী ভক্তের আহার জোগার করেছেন। কাব্যে অন্নদান অংশটি এইরূপ –

অন্নপূর্ণা দিলে শিবেরে অন্ন।
অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন।।
কারণ-অমৃত পূরিত করি।
রত্ন-পানপত্রে দিলা ঈশ্বরী।।
সঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাত।
পরশেন হরে হরিষে মাতা।।[১০১]

শিবের খাবার বর্ণনায় যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেও লোকায়ত মানবের খাবার গ্রহণের দৃশ্য স্পষ্ট হয়েছে। যেমন - চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া, চুমুকে চক চক পেয় পিয়া ও ইত্যাদি। অন্নপূর্ণা দেবীর মূর্তিকল্পনায় দূর্গা ও লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে ভূমি বা পৃথিবীদেবীর কল্পনাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই মঙ্গলকাব্যে লোকায়ত উপাদানের যথেষ্ট প্রাধান্য দেখা গেছে। কারণ কাব্যে দেবী মায়া করে বুড়ীর রূপ ধারণ করে। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী কাশীর গুণগান করা হয়েছে। মধ্যযুগের প্রচলন অনুযায়ী সেইসময়ের বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে ডোমনীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায় খেয়া-পারাপারকারিণীর রূপে। অন্নদামঙ্গলকাব্যে কবি ঈশ্বরী নামে একজন পাটুনীর উল্লেখ করেছেন। যে নিজের সন্তানদের মঙ্গলার্থে দেবীর কাছে বর চেয়ে নিয়েছে মর্ত্যের সর্বদা সন্তান চিন্তায় ব্যস্ত মাতার মতো। উদাহরণ -

বর মাগো মনোনীত যাহা চাব দিব।।
প্রণমিয়া পাটুনী করিছে যোড় হাতে।

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।।
তথাস্ত বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।।[১০২]

অলৌকিক উপায়ে দেবীপদস্পর্শে পাটুনীর কাঠের সেঁউতি সোনার সেঁউতিতে পরিণত হয়েছে। এই দেবী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে অনাহারীকে অন্ন দ্বারা পূর্ণ করার ছবি।

চ. শীতলামঙ্গলকাব্য: শীতলাদেবী লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় দারিদ্র্য দূর করে। লোক বিশ্বাসানুসারে বাসি নৈবেদ্য দিয়ে শীতলাদেবীর পূজা করা হয়। দাক্ষিণাত্যে শীতলাম্মা নামে একজন লৌকিকদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যিনি মূলত জলের দেবী। মঙ্গলকাব্যের শীতলাদেবীর মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এই সকল ধর্মের লোকায়ত উপাদানের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। অর্বাচীন পৌরাণিক সাহিত্যে এবং *আয়ুর্বেদ* গ্রন্থে শীতলাদেবীকে মহামারী বসন্তরোগের অধিকারী এবং প্রশমনের দেবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দেবীর ধ্যানমন্ত্রে দেবীর চিত্র আঁকা হয়েছে এইভাবে – দেবীর মুখমণ্ডলে ব্রনচিহ্ন অঙ্কিত, যিনি গর্দভবাহিনী, মাথায় সুবর্ণের কুলা বা সূর্প, বামকক্ষে জলপূর্ণ কলস, দক্ষিণ হস্তে ধৃত সম্মার্জনী। দেবীর গঠন সজ্জার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে লৌকিকতার প্রকাশ।[১০৩] দেবীর বাহন হল গর্দভ, এই পশুটি অতি সহজে মানুষের বশ্যতা স্বীকার করে নেয় এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ উপকারে লাগে। আয়ুর্বেদ গ্রন্থে উল্লিখিত রয়েছে গর্দভীর দুধের সঙ্গে বসন্ত রোগের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। গর্দভীর দুগ্ধপানে বসন্তের গুটি অত্যাধিক প্রকাশিত এবং বিস্তারিত হতে পারে না। শীতলাদেবীর কোমরের কলসীতে থাকে শুদ্ধ শীতল জল, যা দিয়ে বসন্ত রোগীর শরীরকে ঠাণ্ডা রাখা হয়। জৈনদের জীবনযাত্রাতে দেখা যায় শুদ্ধজলের গুরুত্ব। তারা পানীয় জলকে জীবানু মুক্ত করতে কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করে থাকে। জৈনদের মধ্যে সম্মার্জনী ব্যবহারের প্রথা লক্ষ করা যায়। দেবীর মাথায় রাখা কুলার কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় রোগীর কষ্ট ও যন্ত্রণা বিলোপের ক্ষেত্রে এই দ্রব্যগুলি প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার্য। সম্মার্জনী দ্বারা মানুষের বিপদ দূর করা হয় এমনটি লৌকিক বিশ্বাসে ধরা পড়ে। গ্রামবাংলার গাছতলা এবং শহরের পাড়ার মোড়ে মোড়ে এই শীতলা দেবীর মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। সকল স্থানে যে দেবীর মূর্তি থাকে এমনটি নয়। কোথাও কোথাও আবার দেবীর প্রতীক মনে করে শুধু একটি জলপূর্ণ ঘটি রাখা হয়। শীতলাদেবীর প্রাচীনরূপ পাওয়া যায় ক্ষুদ্র ব্রণ চিহ্নযুক্ত শিলাখণ্ডের মধ্যে।

শীতলামঙ্গলকাব্যের বেশ কিছু পালার নাম পাওয়া যায় বিভিন্ন কবিদের প্রাপ্ত শীতলামঙ্গলকাব্য থেকে। অঞ্চল এবং সময়ের ভিন্নতার জন্য এই মঙ্গলকাব্যের কাহিনিগুলি কখনও কখনও আংশিক পরিবর্তিত হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রাপ্ত একটি শীতলামঙ্গলকাব্য পাওয়া যায়। যেখানে দেখা গেছে একটি কাব্যের মধ্যে স্বতন্ত্র চারটি পালা রয়েছে আবার যাদের লেখকরাও স্বতন্ত্র। ওই গ্রন্থে বর্ণিত পালা গুলি হল – গোকুল পালা, বিরাট পালা, চন্দ্রকেতুর পালা ও রঘুনাথ দত্তের পালা। চন্দ্রকেতুর পালায় দেখা যায় – শীতলা মর্ত্যে পূজাপ্রচারের জন্য জরাসুরকে নিয়োগ করতে চায়। জরাসুর ও তার সঙ্গে চৌষট্টি বসন্তকে ডাকলেন। সকলে মিলে সিদ্ধান্ত করে একসাথে কাজে বেরিয়ে পড়ে। তারা এই সিদ্ধান্ত করে – জরা প্রথমে মানুষের দেহে প্রবেশ করে, পরে দেবী শীতলা তাকে অনুসরণ করে। শীতলা ছদ্মবেশে চৌষট্টি বসন্তের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে রাজা চন্দ্রকেতুর রাজ্যের দিকে এগোতে লাগলেন। এরপর রাজ অন্ত:পুরে গেলে রানীসহ রাজ অন্ত:পুরের রমণীরা তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই ঘটনায় দেবী অপমানিতবোধ করে ক্রুদ্ধ হন। শীতলাদেবী নগরের পথে খেলারত বালকদের মধ্যে এই বসন্ত রোগের বীজ ছড়িয়ে দেন। বালকেরা বসন্ত রোগের কবলগ্রস্ত হয়। রাজসভায় গিয়ে দেবী শৈবরাজা চন্দ্রকেতুকে শিব পূজা ছেড়ে শীতলা পূজা করতে বলেন। রাজা এই অনুরোধে ক্ষুণ্ণ হয়ে দেবীকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। এরপর শীতলা দেবী জরাসুরকে আদেশ দেন রাজ্যে বসন্তের প্রভাব আরও বাড়িয়ে তুলতে। রাজপুত্রেরা এই রোগের কবল থেকে রেহাই পায় না। শেষ পর্যন্ত রাজার ডাকে সারা দিয়ে তার রাজ্যকে রক্ষা করতে ভগবান শিব নিজে এসে নিজ ভক্তকে শীতলা পূজা করতে আদেশ দেন। রাজা চন্দ্রকেতু শীতলা পূজা করে হারিয়ে যাওয়া সন্তান ও রাজ্য উভয় ফিরিয়ে পায়।

দ্বিজ নিত্যানন্দের শীতলামঙ্গলকাব্যের গোকুল পূজা অংশে ধরা পড়েছে সরাসরি কিছু বৌদ্ধ লৌকিক বিশ্বাসের ছবি। যেখানে নন্দরাণী নন্দরাজকে ডেকে কিছু অমঙ্গলসূচক লক্ষণ দেখে ব্রাহ্মণ বুড়ীর উদ্দেশে বলেছে –

বুড়ী মুখে এত শুনি, চমৎকার নন্দরাণী,
অন্ধকার দেখে দু'নয়নে। আকাশ ভাঙ্গিল মাথে,
প্রায় বুঝি বুড়ি হইতে, গোকুল মজিল এত দিনে।।
ব্রাহ্মণী মনুষ্য নয়, যক্ষিণী ডাকিনী হয় মাঘিনী
যোগিনী রাক্ষসিনী। অশ্রু মুখে ত্রাস পায়্যা,

নন্দের নিকটে গিয়া, শোকাতুরে কহে জোরপানি।।[১০৪]

বুড়ীকে নন্দরাণী সম্বোধন করেছে যোগিনী ডাকিনী রাক্ষসিনী প্রভৃতি শব্দগুলির দ্বারা। বৌদ্ধদেবী পর্ণশবরী যিনি অক্ষোভ্যকুলের দেবী। যার পরিচয় দিতে গিয়ে লৌকিক কার্যবিধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে –

> পূর্বে মহামারি দেখা দিলে লোকে মহাধূমধামে দেবদেবীর পূজা করিয়া শব্দের তরঙ্গে দূষিত হাওয়া শুদ্ধ হইত। হোমের শুদ্ধ ঘি পুড়িয়া যে ধূম উদগত হইত, তাহাতেও দূষিত হাওয়া শুদ্ধ হইত। পর্ণশবরীর পূজা মন্ত্র হোম ইত্যাদির দূষিত হাওয়া শুদ্ধ করিবার শক্তি ছিল বলিয়া মারিকালে তাঁহার পূজার প্রচলন হইয়াছিল।[১০৫]

শীতলাদেবীর সঙ্গে বৌদ্ধ লোকায়ত দেবী হারিতির যোগাযোগ রয়েছে। বৌদ্ধ লৌকিক বিশ্বাস হিন্দু দেবতা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এসে মিলিত হয়েছে –

> Hariti is a Yaksini. It is difficult to ascertain whether Hindus has taken citala from the Buddhistic Hariti or the Buddhist is from the Hindu Citala. I am inclined to think that the Hindus are the borrowers. Because always call her a goddess and from of kali, but the Buddhist call her a Yaksini.[১০৬]

দ্বিজ দুর্গারামের শীতলামঙ্গলকাব্যের জন্মপালায় দেখা যায় ব্রহ্মা ও শিবসহ সকল দেবতারা মিলে যজ্ঞ করেন। দেবতার যজ্ঞবেদীতে ঘি আহূতি দেওয়া হয়। এই যজ্ঞবেদী থেকে উৎপন্ন হয় শীতলাদেবীর –

বসিল দেবসভা। আনন্দিত হয়ে যজ্ঞ আরম্ভিল
ব্রহ্মা।। ঘন ঘন ঘোর শব্দ হয় শঙখনাদ।
যজ্ঞের শব্দে সবে গুনিল প্রমাদ।। বসে ব্রহ্মা কুণ্ডধারে
তারি বাম ভিতে। ঘৃতের কলসী আনি ঢালিছে কুণ্ডেতে।।
প্রকাণ্ড অগ্নির তেজ অগ্নি নাহি তুটে। অগ্নির ভিতর
হইতে কন্যা এক উঠে।। কন্যার তেজেতে অগ্নি নিভস্ত হইল।[১০৭]

শীতলাদেবীর নামের মধ্যে রয়েছে লৌকিকতার প্রকাশ। বসন্তরোগের মতো অঙ্গ প্রদাহকারী রোগের রক্ষয়িত্রীর নাম হয়েছে বিপরীতার্থক, অর্থাৎ বসন্তের মতো ভয়াবহরোগকে আয়ত্তে আনতে এই দেবীর নাম রাখা হয়েছে শীতলা। এই রোগকে প্রশমন করে ভক্তকে রক্ষা করবেন তাই এইরূপ নামকরণ। শীতলাদেবীর পরিচয়ে আরও একটি সম্ভাবনার দিককে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। শীতলা চণ্ডীদাসের বাসুলীর মতো বিশেষ শক্তিসম্পন্ন শীতলা নামের একজন ডাকিনী বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর পরিপূরক। এই রমণী বসন্তরোগ নিবারণে পারদর্শী ছিলেন। এই রোগের প্রতি তার দক্ষতা জনসমাজে তাকে ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারিণী করে তুলেছিল। প্রাচীনকালের ইতিহাস থেকে জানা যায় মানুষ বিভিন্ন রোগশোক ও মহামারী থেকে মুক্তি পেতে নরবলি দিয়ে থাকত। মহামারী থেকে এড়িয়ে

থাকতে দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখতে আগে থেকে শীতলাদেবীর সামনে বলি দেওয়া হত। *পিচ্ছিলাতন্ত্র*-এ শীতলাদেবীর ধ্যানমন্ত্র পাওয়া যায়, যেখানে দেবীকে শীতলাকে বিস্ফোটক, উগ্রতাপ এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হরিদেবের শীতলামঙ্গলকাব্যের মধ্যে সাধুপুত্র কারাগারে বসে দেবীবন্দনা করতে গিয়ে বলেছেন – মুক্তকেশী পিঙ্গললোচন, গলে মুণ্ডমালা ও প্রভৃতি।[১০৮] হরিদেবের শীতলামঙ্গলকাব্যে *মৃতসঞ্জারিণী মন্ত্র*-এর উল্লেখ করা হয়েছে। যার সাহায্যে মৃত মানুষকে পুনরায় জীবিত করা যায়। এই মন্ত্রের মধ্যে রয়েছে ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার কথা, যা বৌদ্ধধর্মের তন্ত্র সাধনার দিককে ইঙ্গিত করে।

ছ. ষষ্ঠীমঙ্গলকাব্যে: ষষ্ঠীদেবী বেদবহির্ভূতা, প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণ বা ধর্মসাহিত্যে এই দেবীর স্থান হয়নি, অর্বাচীন পুরাণগুলিতে এই অনভিজাত দেবীর উপস্থিতি ধরা পড়েছে। এই দেবীর পূজাপদ্ধতি, মূর্তি পরিকল্পনাগুলির সঙ্গে আভিজাত দেবভাবনার সঙ্গে কোন মিল নেই। ষষ্ঠীদেবীর বাহন হল সমাজের খুব পরিচিত পোষ্য কালো বিড়াল। ষষ্ঠীমঙ্গলকাব্যের খুব বেশি সংখ্যক কাহিনি পাওয়া যায়নি। কবি শঙ্কর রচিত ষষ্ঠীমঙ্গলকাব্যের একটি কাহিনি পাওয়া যায় – একদিন দেবী ষষ্ঠী সুলোচনাকে পূজা প্রচারের কথা বললে তারা দিলীপ নগরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ওই নগরের রাজা জয়সিংহ যার সাত রাণী ছিল, কিন্তু তাদের কোন সন্তান ছিল না। সেই রাজ্যে বুড়ীর ছদ্মবেশে গিয়ে রাজসভায় হাজির হলে, রাজা ভুল বুঝে দেবীকে তাড়িয়ে দেয়, তখন দেবী নদীর ঘাঁটে ছোটরাণীকে পুত্রবর দেন। যথাসময়ে তার একটি পুত্রসন্তান জন্মায়, কিন্তু অন্য রাণীরা তাকে হিংসা করত। শিশু রাজপুত্রকে জলে ফেলে দেয় এবং রাজাকে মিথ্যে কথা বলে। রাজা রাণীর কাট-কুটো জন্ম দেওয়ার অপরাধে তাকে বধ করার নির্দেশ দেন। পাত্র-মিত্রের অনুরোধে রাণীকে ঘোড়াশালায় বন্দী করে রাখেন। দেবীষষ্ঠী রাণীকে এসে রোজ নিয়ে যেত বাচ্চাদের মাতৃদুগ্ধ খাওয়ানোর জন্য আবার সময় মতো বন্দীশালায় রেখে যেত। রাণীর প্রতিদিন রাতে রাজগৃহের বাইরে যাওয়ার কথা রাষ্ট্র হয়ে গেলে রাজা রাণীকে দ্বিচারিণী বলে সন্দেহ করেন। রাণী রাজাকে সরোবরের কাছে নিয়ে গিয়ে ষষ্ঠীদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়। দেবীষষ্ঠী রাজার সাত সন্তানকে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর থেকে এই দিলীপনগরে ষষ্ঠীপূজা শুরু হয়।[১০৯]

ষষ্ঠীমঙ্গলকাব্যের এই কাহিনির সঙ্গে বৌদ্ধদের শিশুমার-জাতকের সামান্য মিল পাওয়া যায়। এই মঙ্গলকাব্যে শিশুদের দেবী জলের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছিল রাণীদের হাত থেকে। বৌদ্ধ এই লৌকিক

কাহিনিতে রয়েছে – মানুষ খাওয়া কুমীরের কথা।[১১০] শিশুরা জলে স্নানে যেতে পছন্দ করে, আর কুমীর সুযোগ বুঝে শিশুদের খেয়ে ফেলত। বৌদ্ধ মায়েদের সুসু বা শিশুমার– এর কাহিনি বাঙালি মায়েদের কাছে এসে জলষষ্ঠী নামে পরিচিত হয়েছে, এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। এই মঙ্গলকাব্যে দেখতে পাওয়া যায় একটি কালো বিড়ালের উপস্থিতি রয়েছে, আবার বৌদ্ধ যক্ষিণীর কাহিনিতে দেখা যায় সে হিংসা পরায়ণ হয়ে নবজাত শিশুদের হত্যা করে। অরণ্যষষ্ঠীর কাহিনিতে দেখা যায় ছোট বউ নিজে পূজার নৈবেদ্য ভক্ষন করে কালো বিড়ালের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে। শেষপর্যন্ত কাহিনির অন্তে বৌদ্ধ যক্ষিণী বুদ্ধের আশীর্বাদে দেবীত্বে আসীন হয়েছেন। ছোটবউ দেবীষষ্ঠীর কৃপায় সন্তানদের ফিরিয়ে পেয়ে মাতৃত্বের পদে পুনরায় আসীন হয়েছেন। জৈনদের দেবী অম্বিকা যার মূর্তিতে দেখা যায় ষষ্ঠীদেবীর মূর্তির ন্যায় দেবীমূর্তির সঙ্গে কিছু শিশুমূর্তি। বাংলাদেশে প্রাপ্ত মূর্তির মধ্যে এইরূপ বেশ কিছু মাতৃরূপী মূর্তি পাওয়া গেছে। সেই মাতৃমূর্তির সঙ্গে হাসতে খেলতে থাকা কিছু শিশুদের মূর্তিকে সর্বদা একসঙ্গে অবস্থান করতে দেখা গেছে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত জৈন ইকাসা এবং ইকাসিনী দেবদেবীরূপের একই আসনে বসা কতগুলি মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে দেখা যায় এই দেবীদের কোলে শিশুমূর্তি অবস্থান করে রয়েছে।[১১১] বঙ্গদেশের এই লোকায়ত ভাবনা পরবর্তীকালে বঙ্গদেশের দৈবীকল্পনার মধ্যে উঠে এসেছিল। সেই ভাবনাগুলি মঙ্গলকাব্যের ষষ্ঠীদেবীর মূর্তি কল্পনাতে সাহায্য করেছে।

জ. কালিকামঙ্গলকাব্য: তন্ত্রশাস্ত্র থেকে জানা যায় কালী চণ্ডীদেবীর অন্য আর একটি রূপমাত্র। মঙ্গলকাব্যের এই কালিকাদেবীর বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। এই দেবীর উৎপত্তি হয়েছে নিম্নস্তরের অনার্য সমাজ থেকে। এমনকি এই দেবীর মধ্যে আসামের নরমুণ্ড শিকারী নাগজাতির প্রভাব থাকতে পারে এমনটা অনুমান করা হয়েছে। কালিদেবীর সঙ্গে সমগ্র অনার্যসমাজের মানুষ নিজেদের শক্তি দৈবীভাবনার একত্রীকরণ ঘটিয়েছে এবং কালিদেবীর অজস্র নামকরণ করেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে জানা যায় দস্যু বা তস্করেরা এই শক্তিদেবীর পূজা করত। কালিকা মঙ্গলকাব্যের কাহিনি থেকে জানা যায় - রাজকুমার সুন্দর রাজা বীরসিংহের কন্যা বিদ্যার রূপগুণের কথা শুনে তাকে পাওয়ার আশায় ভদ্রকালীর উপাসনা করে।[১১২] লৌকিক বিশ্বাস থেকে কালিকাদেবীর কাছে নর, পশু এমনকি ফল বলি দেওয়া হয়ে থাকে। কালিকামঙ্গলকাব্যের কাহিনি বিদ্যাসুন্দর পালার

সঙ্গে বৌদ্ধজাতক গ্রন্থের অন্তর্গত 'উমমগগ জাতক'-এর কাহিনির যথেষ্ট মিল রয়েছে। জৈনগ্রন্থ চৌর-পঞ্চাশিকার কাহিনির সঙ্গে স্বল্প সাদৃশ্য পাওয়া যায়। জৈনকবি রাজশেখর সূরীর লেখাতে প্রথম এই বিদ্যাসুন্দরের কাহিনির সূত্রপাত ঘটেছিল – উজ্জয়িনীর দিগম্বর সন্ন্যাসী বিশালাকৃতির শিষ্য মদনকীর্তি। যিনি সকল দেশের তার্কিকদের জয় করে এবং রাজা কুন্তীভোজকে নিজের প্রতিভা দ্বারা মুগ্ধ করেন। রাজা কুন্তীভোজ তাকে রাজার পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্য প্রশস্তিবাক্য রচনার কাজে নিয়োগ করে। কাজের সুবিধার্থে রাজপ্রাসাদের নিকট থাকার জন্য একটি বাসস্থান দেওয়া হয়। মদনকীর্তি রাজাকে অনুরোধ করেন সে দিনে বহু শ্লোক তৈরি করতে পারবেন যদি তাকে তার উচ্চারিত শ্লোকগুলি লিখে রাখার জন্য একজন লোক দেওয়া হয়। এই কাজের জন্য রাজা রাজকন্যাকে নিয়োগ করেন। পর্দার আড়ালে থেকে রাজকন্যা এই পদগুলির লিখিত রূপ দিতে থাকে। মদনকীর্তির সুমধুর কণ্ঠস্বরে রাজকন্যা দিগম্বর সাধুর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে। উভয়ে তাদের প্রণয় ভাবাবেগে পূর্ণ হয়ে গিয়ে নিজেদের মূল কাজের কথা ভুলে যায়। তখন রাজা এই কাজের খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারেন, তার কাজে বিলম্ব হওয়ার কারণ রাজকন্যা ও মদনকীর্তির প্রণয়। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য এবং দিগম্বর সাধুকে তার কার্যের দণ্ড হিসেবে রাজা মদনকীর্তির প্রাণনাশের আদেশ দেন। এই কথা জানতে পেরে রাজকন্যা ও তার বত্রিশজন সখী মিলে হাতে ছুরি নিয়ে রাজাকে জানায়। যদি বিনা অপরাধে মদনকীর্তির প্রাণ যায় তাহলে তারা একজোট হয়ে আত্মহত্যা করবে। সকলের প্রাণ বলিদানের জন্য দায়ী হবে রাজা। রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজকন্যাকে মদনকীর্তির সঙ্গে বিবাহ দেন।[১১৩] জৈন ও বৌদ্ধদেবীর রূপকল্পের মধ্যে মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত কালিকাদেবীর রূপবর্ণনার সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

ঝ. সারদামঙ্গলকাব্য: মঙ্গলকাব্যের বাঙালি কবিরা পৌরাণিক দেবী সরস্বতীর সকল বৈশিষ্ট্য বর্জন করে। মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য সকল স্ত্রী-দেবতার মতো এই দেবী চরিত্রটিকে পুনর্গঠন করেছে। পূর্বকালে ধনীগৃহে সারদামঙ্গলকাব্যের গীত অনুষ্ঠিত হত। সারদামঙ্গলকাব্যের কাহিনিতে পাওয়া যায়– সুরেশ্বর রাজ্যের রাজা সুবাহুর কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় সে পুত্রের জন্য দেবতা শিবের কাছে তপস্যা করে। ভগবান শিব রাজা সুবাহুর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে পুত্রসন্তান বর দেয়। যার নাম রাখা হয় লক্ষধর। এই পুত্রকে বিদ্যাদানের বহুবিধ প্রচেষ্টা করা হলেও, লক্ষধর কোনো ভাবেই বিদ্যা অর্জন

করতে পারে না। রাজা অতি কষ্টে এই মূর্খ পুত্রের মৃত্যুদণ্ড আদেশ দেন। কোটালের দয়ায় রাজকুমার লক্ষধর ছাড়া পায় এবং প্রাণ নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সেখান থেকে সে একদা মলিনবেশে বৈদেব রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়। নিজ পাণ্ডিত্যের দ্বারা সকলের মন জয় করে। অবশেষে দেবী সরস্বতী নিজে এসে বৈদেব রাজ্যের রাজাকে লক্ষধরের আসল পরিচয় দিয়ে রাজকন্যাদের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করে। রাজকুমার নিজ দেশে ফিরে যায়, পিতাপুত্রের মিলন হয়।[১১৪] মঙ্গলকাব্যের এই কাহিনির মধ্যে কোন পুরাণের প্রভাব ততোটা দেখা যায় না। এখানে বাংলাদেশের লৌকিক উপাদানের সমাহার বেশি ধরা পড়ে। হিন্দুতন্ত্রে সরস্বতীর ব্যাপক জনপ্রিয়তা লক্ষ করা গেছে একসময়ে। বৌদ্ধ মহাযান তন্ত্রে এই সরস্বতীর প্রভাব ধরা পড়েছে পরবর্তীকালে। বৌদ্ধতন্ত্রে বিচিত্র নামে সরস্বতীদেবীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। জৈনধর্মে সরস্বতীদেবীর উপস্থিতি ধরা পড়েছে। এই জৈন সরস্বতীর বাহন হিসেবে হাঁসকে নিবার্চিত করা হয়ে থাকে।[১১৫] মঙ্গলকাব্যের দেবী সরস্বতীর বাহন হিসেবে পাওয়া যায় জলচর প্রানী হাঁসকে এবং দুহাতে থাকে বীণা। বৌদ্ধ জাঙ্গুলীমূর্তিতে দেখা যায় দেবীর হাতে থাকে বীণা। বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত অন্যান্য সরস্বতী দেবীর সঙ্গে হাঁস এবং বীণার সম্পর্ক লক্ষ করা গেছে।

ঞ. সূর্যমঙ্গলকাব্য: সূর্যপূজার মধ্যে অনার্য সমাজের প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের কুমারী মেয়েদের 'মাঘমণ্ডল ব্রত'-এর মধ্যে দিয়ে প্রাচীন বাংলার লৌকিক সূর্যোপাসনার একটি ধারা বেঁচে রয়েছে। চার-পাঁচ বছর বয়সী কিশোরী কুমারীরা সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যা ত্যাগ করে মাঘের শীতে পুকুরঘাটে এসে হাতে একটি করে ফুল নিয়ে সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে কিছু লৌকিক ছড়া আবৃত্তি করে। এই ছড়াগুলির মধ্যে দিয়ে সূর্যদেবতার শৈশব, যৌবনপ্রাপ্তি, বিবাহ এই সকল বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়। সূর্যমঙ্গলকাব্যের একটি কাহিনি পাওয়া গেছে। যেখানে গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে - *আদিত্য চরিত*। লেখক রামজীবন ময়মনসিংহে প্রচলিত করমাদি ব্রতে প্রচলিত কাহিনিকে তার মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আসলে এই করমাদি ব্রতটি হল সূর্যদেবের উপাসনার ভিন্ন নাম মাত্র। অন্য কবি মালাধর বসুর ক্ষুদ্র কাব্যে সূর্যকে অষ্টলোকপাল নামে উল্লেখ করেছেন।[১১৬] এই কাব্যের কাহিনিতে দেখা যায় পার্বতীপুরের রাজা অনঙ্গশেখর তার পত্নী এবং পুত্রকে ফিরে পেয়ে। সকল অমঙ্গল থেকে মুক্তি পেতে সাতজন হাড়ী জাতির মানুষের শিরচ্ছেদের নির্দেশ দেন। ওই সাতজন হাড়ীর জননীরা পুত্রশোকে বিহ্বল হয়ে পরে। যা দেখে সূর্য দেবতা উক্ত সাতজন হাড়ীর প্রাণ ফিরিয়ে দেন। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে রাজার সূর্যদেবতার প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং সূর্যের পূজা

করেন। সূর্যদেবের মূর্তিতে দেখা যায় সাতটি ঘোড়ায় টানা রথে সূর্যদেব বসে থাকে। যার বর্ণ রক্তিম ও দ্বিভুজ বিশিষ্ট। এই রক্তবর্ণ অমিতাভকুলের দ্যোতক।[১১৭] মানুষ মূলত সূর্যের সপ্ত তুরগকে সূর্যের সপ্তরশ্মি এমনটাই কল্পনা করা হয়েছে। এই সাত ধরণের সাতটি রশ্মিকে একত্রে সংক্ষেপে 'Vibgyor' নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। বৌদ্ধ বৈরোচনকুলের দেবী মারীচী যার রথের সাতটি রশ্মি সাতটি শূকর টেনে নিয়ে যায়। শতসহস্র বছর পূর্বে হিন্দু এবং বৌদ্ধরা এই সপ্তরশ্মির বিশ্লেষণ করেছিল।

ট. রায়মঙ্গলকাব্য: ব্যাঘ্রবাহনে আবির্ভূত দক্ষিণরায়ের মহিমাকীর্ত্তন করা এই মঙ্গলকাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। ব্যাঘ্রের অধিকারী দেবতাকে রায় বা রাজ উপাধি দেওয়া হয়ে থাকে। নিম্নবঙ্গে ব্যাঘ্রের উৎপাত বেশি থাকায় আর এই অঞ্চলটি বাংলার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত হওয়ায় এই দেবতাকে দক্ষিণ রায় নাম দেওয়া হয়েছে।[১১৮] ব্যাঘ্র অধ্যুষিত অঞ্চল সুন্দরবনের মানুষ বাঘের হাত থেকে রেহাই পেতে এইরূপ ব্যাঘ্রদেবতার কল্পনা করেছে। এই দেবতার সেনাবাহিনী হয় বনের বাঘেরা। উত্তরবঙ্গের ব্যাঘ্রের দেবতার নাম সোনারায়। এই পূজাকে পশুপূজার অন্তর্গত ভাবনা থেকে উদ্ভূত এমনটা অনুমান করা হয়ে থাকে। দক্ষিণরায়ের প্রতীক হিসবে সিঁদুরমণ্ডিত প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের অনেক পূর্ব থেকে এই ব্যাঘ্রপূজার কথাকে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে রূপ দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধদের মধ্যে এইরূপ ব্যাঘ্র দেবতার উল্লেখ পাওয়া গেছে। তিব্বতে পঞ্চ মহারাজ নামক একজন দেবতার উল্লেখ পাওয়া গেছে। যিনি সমস্ত অনিষ্টকারী শক্তির আক্রমণ থেকে ভক্তকে রক্ষা করে। বৌদ্ধ ব্যাঘ্র জাতক-এর কাহিনির সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের রায়মঙ্গল দেবতা গড়ে ওঠার ইতিহাস কতক অনুমান করা যায়। ব্যাঘ্র জাতক-এর কাহিনিতে দেখা যায় - একটি বনে বোধিসত্ত্বের বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণকালে সেই বনে সিংহ ও বাঘের পদচিহ্ন দেখে ভয়ে ভীত হয়ে সেই বনে সাধারণ মানুষের আনাগোনা খুব একটা দেখা যেত না। এই দেখে ওই বনের অন্য একজন বৃক্ষদেবতা অসন্তুষ্ট হয়। বোধিসত্ত্বের বারণ করা সত্ত্বেও ওই বন থেকে সিংহ ও বাঘকে ভয় দেখিয়ে বিতারণ করে। এর কিছুদিন পরে মানুষ ওই বনে সিংহ ও বাঘের পদচিহ্ন না দেখতে পেয়ে বাঘভীতি কেটে যায়। বন কেটে নিজেদের প্রয়োজনে বাসস্থান এবং চাষের উপযোগী জমি তৈরি করে। বৃক্ষরূপী দেবতার নিজের প্রাণের আশঙ্কা দেখা যায় এবং সে তখন সিংহ এবং ব্যাঘ্রকে ফিরিয়ে আনতে যায়।[১১৯] এইখানেও দেখা যায় মানুষ বাঘের ভয় থেকে মুক্তি পেতে চায়। এই রায়মঙ্গলকাব্যের মূলে রয়েছে বাঘের ভয়

থেকে নিস্তারের জন্য দেবতার গুণগান। জৈনদের দেবতা সমাজে এইরূপ পশুদের ঘিরে লোকায়ত স্তরে দেবতা পরিকল্পনার কথা জানা যায়।

ঠ. গঙ্গামঙ্গলকাব্য: গঙ্গামঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় এখানে মানবের লোকায়ত স্তরের ভাবনা থেকে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব হয়েছিল। ক্রিয়াযোগসাগরে যে কাহিনি পাওয়া যায় সেখানে দেখা যায়। রাজপুত্র মাধব যুবতী রমণীর স্নানরতা দৃশ্য দেখে, সেই রমণীকে প্রার্থনা করে এবং সেই নারী শরীর বর্ণনায় মর্ত্যলোকের ছায়া স্পষ্ট ধরা পড়ে। গঙ্গানদীর জলকে মানুষ দৈনিক জীবন অতিবাহিত করার জন্য ব্যবহার করত। এই নদীর গুণগান করতে মঙ্গলকাব্যের গীত রচিত হয়েছিল। ভারতীয় জনজীবনে গঙ্গানদীর মহিমা ছড়িয়ে যেতে থাকে এবং শেষে গঙ্গা একটি বৃহৎ তীর্থস্থানে পরিণত হয়। গঙ্গার জল মানবের কাছে সর্বপাপহরণকারীরূপে গণিত হয়। লৌকিক বিশ্বাস থেকে আরও উঠে আসে গঙ্গা দর্শন, গঙ্গাস্নান, গঙ্গাজল পান এবং গঙ্গাপাড়ে শব সৎকার প্রভৃতি ইহকাল ও পরকালের পাথেয় হয়ে মানুষকে মুক্তির উপায় হিসেবে পরিগণিত হয়।[১২০] লোকমতে গঙ্গার দূরবর্তীতে মানুষ ধনী হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে গঙ্গার তীরে বাস করে হতদরিদ্র অবস্থাতে দিনাতিপাত করতেও সুখ অনুভূত হয়। গঙ্গাদেবীর বাহন হল মকর। নদীতে প্রচুর মকর বাস করে। এই মকরের হাত থেকে রেহাই পেতে মানুষ মকরকে গঙ্গাদেবীর বাহনরূপে কল্পনা করেছে। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব বিস্তারকালে এইরূপ মাতারূপী দেবীমূর্তির পূজার প্রচলন লক্ষ করা গেছে। বৌদ্ধদের অষ্টদিকপালের দেবতা বরুণ যার বাহন হিসেবে পাওয়া যায় মকরকে। এই দেবতা বরুণ বৈরোচনকুলের দ্যোতক হিসেবে শ্বেতবর্ণ ও সর্পের নাগপাশ ধারণ করে। এই মঙ্গলকাব্যের এই গঙ্গাদেবীর রূপের সঙ্গে বৌদ্ধ শিশুমারের কাহিনিতে প্রাপ্ত দেবীরূপের সঙ্গে খানিকটা সাদৃশ্য থাকতে পারে।

ড. পঞ্চাননমঙ্গলকাব্য: এই মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে লোকায়ত মানবের বিস্তর প্রভাব লক্ষ করা গেছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্যের ন্যায় এই মঙ্গলকাব্যের দেবতা পঞ্চানন। যিনি নিজ প্রচারের আশায় ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মর্ত্যে এসে উপস্থিত হয়। অবন্তীপুরের রাজবাড়িতে চৌষট্টিব্যাধির প্রকোপ বাড়ায় এবং রাজপুত্র মণিময়কে এই ব্যাধির থেকে রেহাই দেয় না। শেষে রাজা রাজপুত্র মণিময়কে বাঁচাতে দেবতার নির্দেশে এই দেবতার পূজা করে। এই মণিময়কে দিয়ে পরবর্তীতে মঙ্গলকাব্যের

দেবতা আরও বিভিন্ন দেশে নিজ পূজার প্রচলন করে। এই মঙ্গলকাব্যের দেবতার সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধ সমাজের দেবতা বৈশিষ্ট্যের কিছু সাদৃশ্যেকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

ঢ. সুবচনীমঙ্গলকাব্য: সুবচনী ব্রতের কথাকে সুভদা মঙ্গলকাব্যের রূপ দেওয়া হয়েছে। এই সুভদা মঙ্গলকাব্যের কাহিনিটি পাঁচালীর ঢঙে বেশি লেখা হয়েছিল। মানুষের মঙ্গলের জন্য এই কাব্য এবং দেবীর কল্পনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈনদের দেবী কল্পনার মধ্যে এইরূপ শুভভাবনার লক্ষণ দেখা যায়। যেমন - বৌদ্ধদের দেবী সুমতি, বিভিন্ন তারাদেবীর রূপ, এবং জৈনদের ইকাসিনি দেবীর মধ্যে এই মাতৃরূপের কল্পনায় এই শুভ লক্ষণের প্রকাশ রয়েছে।

ণ. তীর্থমঙ্গলকাব্য: ভ্রমণের কাহিনিকে কেন্দ্র করে এই মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছিল। এই তীর্থক্ষেত্রগুলি মর্ত্যের মাটিতে গড়ে উঠেছিল। এই তীর্থের মাহাত্ম্যগুলি নিয়ে কবিরা নিজেদের মনের এবং সমাজের ভাবনাকে কাব্য মধ্যে গ্রথিত করতে চেয়েছেন। তীর্থমঙ্গলকাব্যের রচয়িতা বিজয়রাম সেন। যিনি কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে সে কাশী যাত্রা করে। কবি এই যাত্রাপথের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন এবং বেশ কিছু জায়গার নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন - নবদ্বীপ, হাঁড়রা, ঝিনুকঘাঁটা, টুঙ্গীবালী, জলঙ্গী, রাজমঙ্গল, মুঙ্গের, গয়া, রামনাথ, কাশী, প্রয়াগ, বিন্ধ্যগিরি ও ইত্যাদি। তারা যেহেতু নদীপথে যাত্রা শুরু করেছিল তাই গঙ্গার তীরবর্তী শহরগুলির বর্ণনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিদের ভ্রমণ কাহিনি লিখে রাখার প্রচলন দেখা গেছে। হিউয়েন সাং-এর ভারত ভ্রমণের কথা থেকে জানা যায় জম্বুদ্বীপের রাজা কনিষ্ক এবং এক বালকের তৈরি অলৌকিক জোড়াস্তূপ-এর কথা। এই স্তূপটি সম্পর্কে গৌতমবুদ্ধ ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন -

> যখন এই স্তূপে সাতবার অগ্নিদাহ ও সাতবার পুনর্নির্মাণ হবে, তখন ধরাধাম থেকে তার ধর্মেরও অন্ত হবে।[১২১]

হিউয়েন সাং যখন ওই স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তখন সেই স্থানে চতুর্থবার অগ্নিকাণ্ডের পর পুনরায় নির্মাণ কাজ চলছে। যা এখন বৌদ্ধদের পুণ্যস্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। জৈনদের *কল্পসূত্র, আচারাঙ্গ সূত্র* গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় একদা প্রাচ্যদেশে জৈনধর্মের সর্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল একসময়ে।[১২২] যা বৌদ্ধদের বোধিসত্ব-কল্পলতা, দিব্যাবদান ও ইত্যাদি গ্রন্থগুলি থেকে বৌদ্ধ ও জৈনদের মহৎ তীর্থস্থানগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়।

ত. অন্যান্য মঙ্গলকাব্য: অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মধ্যে লক্ষ্মী মঙ্গলকাব্য, কপিলা মঙ্গলকাব্য, গোসানী মঙ্গল ও বরদা মঙ্গলকাব্য এই কাব্যগুলির মধ্যেও লৌকিক ভাবনার যথেষ্ট প্রভাব ধরা পরে। লক্ষ্মীদেবী

ভক্তের আহার জোগাতে সাহায্য করে। বাকি মঙ্গলকাব্যের দেবতারা বিশেষ কিছু স্থানের খ্যাতনামা হয়ে ওঠার জন্য তাদের ঘিরে লোকায়ত ভাবনার সঙ্গে পৌরাণিকের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে মঙ্গলকাব্য রচনা করা হয়েছে। হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এই সকল ধর্মের লোকায়ত ভাবনাগুলি এসে মঙ্গলকাব্যের কাহিনিতে স্থান করে নিয়েছে।

৩. ৩ উপসংহার

বাংলা মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশের জন্য যে সময় ও সমাজভাবনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, তা ছিল আদিমধ্যযুগ থেকে শুরু করে সমগ্র মধ্যযুগ। যেখানে মানুষ আত্মসংকটের মুখোমুখি হয়েছিল। ভারতবর্ষে পূর্বে চলে আসা ধর্ম যেমন সমাজের বৃহৎ অঙ্কে বৌদ্ধ এবং সামান্য কিছু জৈনধর্মের প্রভাব ছিল। এই অবস্থায় বিদেশী শক্তির আক্রমণে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। মানুষ তখন একসঙ্গে ধর্মসঙ্কট ও অর্থসঙ্কটের সম্মুখীন হয়। তখন মানুষ যে কোন উপায়ে নানাবিধ লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এই টিকে থাকার জন্য তারা তাদের পাশাপাশি চলে আসা সমাজের অন্যান্য ধর্মীয় ভাবানা ও বিশ্বাসগুলিকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। তাদের পূর্বের ধর্মীয় বা সামাজিক ধারণাগুলি পরিবর্তিত এবং কখনো কখনো বিকৃত হয়েছে। সমাজের এই সকল ভাবনাগুলিকে সমাজের কিছু প্রতিনিধিশ্রেণির মানুষ আবার কখনো বা শিক্ষিত মানুষেরা তাদের এই অবস্থার কথাকে সাহিত্যে রূপদান করেছে। এই কাব্য গড়তে গিয়ে পৌরাণিক ও লোকায়ত দেবতাদের আশ্রয় নিয়েছে। মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের চরিত্রে এবং গল্পের কাহিনিতে মিশ্রসমাজের প্রতিফলন ঘটেছে। এই শ্রেণির কবিরা নিজেদের বিশ্বাসের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পৌরাণিক ও লোকায়ত বিশ্বাসকে কাব্য মধ্যে এনেছে। এই অন্য ধর্মীয়গোষ্ঠী সেটা পৌরাণিক বা লৌকিক যাই হোক, সেগুলির সঙ্গে নিজ ধ্যান-ধারণাগুলির মিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা দান করেছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন ধর্মের পৌরাণিক ও লৌকিক সকল বৈশিষ্ট্যেগুলিকে চিহ্নিত করা যায়।

টীকা

১) সেন, সুকুমার (২০১৪)। *ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৮৪।

২) মহাপুরাণ: বেদব্যাস রচিত অষ্টাদশ পুরাণকে বলা হয় মহাপুরাণ। এই পুরাণের মধ্যে সর্গাদিদশলক্ষণ এবং বংশানুচরিতের দীর্ঘ বর্ণনা করা হয়ে থাকে। পুরাণের মধ্যে মহাপুরাণ সব থেকে বেশি গুরুত্ব রাখে। সাধারণ বিশ্বাস অনুযায়ী মহাপুরাণের সংখ্যা আঠারো এবং এগুলি ছয়টি করে পুরাণযুক্ত তিনটি পৃথক শ্রেণিতে বিন্যস্ত রয়েছে।

সূত্র: হক, মুহম্মদ এনামুল, লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন, সরকার, স্বরোচিষ (সম্পাদিত)। *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। পৃ. ২৭৯।

৩) উপপুরাণ: উপপুরাণ হল এক শ্রেণির হিন্দু ধর্মগ্রন্থ। পুরাণ সাহিত্যের দিক থেকে বিচার করলে মহাপুরাণগুলির স্থানের ঠিক পরে এই পুরাণগুলি গুরুত্ব রাখে। অষ্টাদশ মহাপুরাণের অতিরিক্ত পুরাণগুলিকে বলা হয়েছে উপপুরাণ। এই পুরাণগুলির অধিকাংশ মহাপুরাণগুলির রচিত হয়ে যাওয়ার পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল।

সূত্র: বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকুমার (১৯৮৫)। *পৌরাণিকা বিশ্বকোষ হিন্দুধর্ম*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ২২৯।

৪) ভট্টাচার্য্য, হংসনারায়ণ (২০০৪)। *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* । প্রথম পর্ব। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১৯।

৫) Shakya, Miroj (২০১৫)। *Jainism and Buddisim: A Comparative Survey of Their Ethics.* California, Department of Buddhist Chaplaincy University of The West Los Angeles. পৃ. ১৬.

৬) চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ ও সেন, সুনীলকুমার (২০১২)। *প্রাচীন যুগের কথা*। কলকাতা: অনুষ্টুপ। পৃ. ৫২।

৭) চক্রবর্তী, পঞ্চানন (সম্পাদিত) (১৩১৭)। *রামেশ্বর রচনাবলী*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। পৃ. ৩৬৫।

৮) চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (২০১৫)। *বৌদ্ধদের দেবদেবী বিনয়তোষ ভট্টাচার্য*। কলকাতা: চিরায়ত। পৃ. ৬০।

৯) Bhattacharyya, Benoytosh (2013). *The Indian Buddhist Iconography.* New Delhi: Cosmo Publication. পৃ. ১৬৯.

১০) চক্রবর্তী, পঞ্চানন (সম্পাদিত) (১৩১৭)। *রামেশ্বর রচনাবলী*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। পৃ. ১০৬।

১১) Gupte, R. S. (1972). *The Iconography of The Hindus Buddhist and Jains.* Bombay: D. B Taraporavala Sons and Co Private Limited. পৃ. ১৭৫।

১২) দাশগুপ্ত, শ্রীতমোনাশ (২০১১)। *সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ২৪।

১৩) প্রজ্ঞাপারমিতা: প্রজ্ঞাপারমিতা বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থের নাম। শূন্যবাদের আদিগ্রন্থ অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা এবং বিজ্ঞানবাদের আদিগ্রন্থ পঞ্চবিংশতি-সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা। মহাযান থেকে উদ্ভূত সকল বৌদ্ধ শাখার কাছে এই গ্রন্থ সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয়। নাগার্জুন এই গ্রন্থটি নাগলোক থেকে উদ্ধার করেছিলেন। ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের সন্ততিদের মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থটি একটু বিশেষত্ব লাভ করেছে। এই গ্রন্থকে দেবীরূপে কল্পনা করা হয়েছে বজ্রযানে। এই দেবীর বিভিন্ন মূর্তি পাওয়া গেছে, যেমন – একস্থানে তিনি একমুখ ও দ্বিভুজ ধারণ করেন। শ্বেতপদ্মের ওপর বসে থাকেন, তাঁর বর্ণ ও শুভ্র। তিনি দক্ষিণহস্তে রক্তপদ্ম এবং বাম হাতে প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক ধারণ করেন। এই দেবীর মাথায় অক্ষোভ্যের ক্ষুদ্র মূর্তি চিহ্ন ধারণ করে।

সূত্র: ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ (২০১৫) চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত)। তদেব। পৃ. ৭৭।

১৪) বিদ্যাবিনোদ, কালীকিশোর (সম্পাদিত) (২০১৭)। *মেয়েদের ব্রতকথা*। কলকাতা: অক্ষয় লাইব্রেরী। পৃ. ৭৫।

১৫) Munshi, K. M, Majumdar, R. C (edited) (1960). *The Age of Imperial Unity.* Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan. পৃ. ৪৩০।

১৬) বজ্রশারদা: বজ্রযান তন্ত্রের দেবী হলেন বজ্রসারদা। এই দেবীর মূর্তিতে পাওয়া যায়, শুভ্রপদ্মের ওপর তিনি বসেন। একটি মুখ ও দুটি হাত থাকে। বাম হাতে থাকে পুস্তক আর দক্ষিণ হাতে থাকে পদ্ম। এই দেবীর সঙ্গে চারজন আবরণদেবতা থাকেন, যথা –প্রজ্ঞা, মেধা, মতি ও স্মৃতি। বৌদ্ধ এই দেবীর সঙ্গে হিন্দু দেবী সরস্বতীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

সূত্র: ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ (২০১৫) চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত)। তদেব। পৃ. ১৩৫।

১৭) নীলতারা: নীলবর্ণের তারা নামে দুইজন দেবীকে পাওয়া যায়। একটি একজটা ও অপরটি মহাচিনতারা। একজটার অনেকগুলি নীলমূর্তি রয়েছে। দ্বিতীয় মহাচিনতারা যিনি একমুখী, চতুর্ভুজা ও শববাহনা।

সূত্র: ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ (২০১৫) চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত)। তদেব। পৃ. ১০৬।

১৮) একজটা: অক্ষোভ্যেকুলের এই দেবীর মন্ত্ররাজকে মহাশক্তিশালী বলা হয়েছে। এই দেবীর মন্ত্র একবার শ্রবণ করলে নির্বিঘ্ন হওয়া যায়, নিত্য সৌভাগ্য হয়, শত্রু ধ্বংস হয়, ধর্মে মতি হয়। একজটা দেবীর রং নীল, তার মূর্তি ভীষণদর্শনা, কেশরাজি পিঙ্গলবর্ণ, অগ্নিশিখার ন্যায় মস্তক। তিনি একমুখী এবং দ্বিভুজা, এখাতে থাকে কর্ত্রি ও অপর হাতে থাকে কপাল। এই দেবীর চতুর্ভুজ ও অষ্টভুজ মূর্তিও পাওয়া যায়। কথিত আছে নাগার্জুন ভোটদেশ থেকে এই দেবীর সাধনা উদ্ধার করে আনেন।

সূত্র: ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ (২০১৫) চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত)। তদেব। পৃ. ৭৬।

১৯) বজ্রধাতেশ্বরী: বজ্রধাতেশ্বরী ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের শক্তিরূপে গণ্য হন। গুহ্যসমাজতন্ত্রে 'ঈর্ষারতি' মন্ত্রপদ থেকে উৎপন্ন হয়ে মন্ত্রপুরুষরূপে আবির্ভূত হন। মাথার ওপরে এই দেবী কুলচিহ্ন রত্নসম্ভবের মূর্তি ধারণ করেন। এই দেবীর দুইপাশে দুটি পদ্ম থাকে।

সূত্র: ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ (২০১৫) চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত)। তদেব। পৃ. ৩২।

২০) পর্ণশবরী: অক্ষোভ্য সন্ততিদের মধ্যে পর্ণশবরী একজন উল্লেখযোগ্য দেবী। পূর্বে মহামারি দেখা দিলে লোকে মহাধূমধামে দেবদেবীর পূজা করিয়া শব্দের তরঙ্গে দূষিত হাওয়া শুদ্ধ করা হত। হোমের শুদ্ধ ঘি পুড়ে যে ধূম উদগত হত, তাতে দূষিত হাওয়া শুদ্ধ হত। পর্ণশবরীর পূজা মন্ত্র হোম ইত্যাদির দূষিত হাওয়া শুদ্ধ করবার শক্তি ছিল বলে মারিকালে তার পূজার প্রচলন হয়েছিল। এই দেবী অক্ষোভ্যের ক্ষুদ্রমূর্তি মাথায় ধারণ করেন কুলচিহ্ন বজায় রাখতে। এই দেবীর রং হলুদ, মারিরূপ বিঘ্নরাজির ওপর দাঁড়িয়ে থাকেন। পর্ণভূষণা ও পর্ণবসন পরিধান করে।

সূত্র: ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ (২০১৫) চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত)। তদেব। পৃ. ৭৭।

২১) বাসুলী: মধ্যযুগে বাংলার রাঢ়ের সমাজে বাসুলী দেবীর বিশেষ প্রতিপত্তি ধরা পরেছে। বাসুলী লৌকিক গ্রাম্যদেবী, পরবর্তীতে পৌরাণিক প্রভাবে এই দেবী হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই ধর্মের মানুষের কাছেই পূজা পেয়েছেন। এই দেবী পৌরাণিক দেবী পার্বতীর সঙ্গে পরবর্তীতে সাদৃশ্য তৈরি করেছেন। বাসুলীর প্রাপ্ত ধ্যানমন্ত্র থেকে চন্ডীর সঙ্গে বাসুলীর সাদৃশ্যের কথা জানা যায়। তান্ত্রিকদেবী বিশালক্ষীর সঙ্গে এই দেবীর মিল আছে বলে অনুমান করা হয়। প্রাক-চৈতন্যযুগের কবি বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলীর সেবক ছিলে, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে লেখক নিজে একথা উল্লেখ করেছেন।

সূত্র: ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০০)।*বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।* কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৪৪১-৪৪৩।

২২) শ্যামাচরণ, পণ্ডিত (অনূদিত) (২০০৭)। *চণ্ডী-রত্নামৃত শ্রী শ্রী মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সরল পদ্যানুবাদ*। কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর। পৃ. ২।

২৩) রত্নসম্ভব: দেবনাস্কন্ধ থেকে ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের উৎপত্তি। 'রত্নধৃক' মন্ত্রপদ থেকে মন্ত্রপুরুষরূপে এই দেবতার আবির্ভাব হয়। এই দেবতার বর্ণ পীত এবং বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন। এই দেবতা সিংহকে বাহন করেছেন এবং রত্নকে প্রতীক চিহ্নরূপে ধারণ করেছেন।

সূত্র: ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ (২০১৫) চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত)। তদেব। পৃ. ৩০।

২৪) মামকী: বুদ্ধশক্তি মামকী অক্ষোভ্যের শক্তিরূপে পরিগণিত হন। 'দ্বেষরতি' মন্ত্রপদ থেকে উৎপন্ন হয়ে মন্ত্রপুরুষরূপে আবির্ভূত হয়। মাথার ওপরে অক্ষোভ্য মূর্তি ধারণ করেন, পাশে পদ্ম থাকে যেখানে অক্ষোভ্যের প্রতীকচিহ্ন বজ্র থাকে।

সূত্র: ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ (২০১৫) চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত)। তদেব। পৃ. ৩১।

২৫) তারা: বুদ্ধশক্তি তারা, যিনি অমোঘসিদ্ধির শক্তিররূপে গণ্য হয়েছেন। গুহ্যসমাজের মতে 'বজ্ররতি' মন্ত্রপদ থেকে উৎপন্ন হয়ে মন্ত্রপুরুষরূপে আবির্ভূত হয়। দেবীর মাথার ওপরে ক্ষুদ্র অমোঘসিদ্ধির মূর্তি ধারণ করে স্বকুলের পরিচয় দেয়। এই দেবতার বর্ণ হরিত বা সবুজ এবং দুই পার্শ্বে দুটি পদ্মের উপর কুলচিহ্নরূপে দুটি বিশ্ববজ্র প্রদর্শন করেন।

সূত্র: ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ (২০১৫) চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত)। তদেব। পৃ. ৩২।

২৬) লোচনা: বুদ্ধশক্তির লোচনা বা রোচনা বৈরোচন ধ্যানীবুদ্ধের ধ্যানীবুদ্ধের শক্তিরূপে গণ্য হন। 'মোহরতি' মন্ত্রপদ থেকে ঘনীভূত হয়ে মন্ত্রপুরুষরূপে আবির্ভূত হন। দেবী মাথার ওপরে ক্ষুদ্র বৈরোচন মূর্তি ধারণ করে নিজ কূলের পরিচয় বহন করে। এই দেবতার বর্ণ সাদা এবং পাশে থাকা পদ্মের ওপর চক্র থাকে কুলচিহ্নের প্রতীকরূপে।

সূত্র: ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ (২০১৫) চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত)। তদেব। পৃ. ৩২।

২৭) পান্ডরা: বুদ্ধশক্তি পাণ্ডরা বা পাণ্ডরবাসিনী অমিতাভের শক্তিরূপে পরিগণিত হয়। 'রাগরত্তি' মন্ত্রপদ থেকে ঘনীভূত হয়ে মন্ত্রপুরুষরূপে আবির্ভূত হন। এই দেবতা মাথার ওপরে একটি ক্ষুদ্র অমিতাভ-মূর্তি ধারণ করেন। এই দেবতার বর্ণ লাল, দুই পাশে থাকা কমলের ওপর কুলচিহ্নরূপে দুটি পদ্ম রাখা হয়।

সূত্র: ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ (২০১৫) চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত)। তদেব। পৃ. ৩২।

২৮) ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ (২০১৫) চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত)। তদেব। পৃ. ১০২।

২৯) বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ১৫।

৩০) দত্ত, বিজিতকুমার ও দত্ত, সুনন্দা (সম্পাদিত) (২০০৯)। *মানিকরাম গাঙ্গুলি-বিরচিত ধর্মমঙ্গল*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৩৬-৭৮।

৩১) মহাপাত্র, পীযূষ কান্তি (সম্পাদিত) (২০১২)। *ঘনরাম চক্রবর্তী-বিরচিত শ্রীধর্মমঙ্গল*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৩৯।

৩২) চৌধুরী, সত্যজিৎ, ভট্টাচার্য, সুমিত্রা ও দেবপ্রসাদ, সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর, বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন (সম্পাদিত) (২০০১)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ৪০৯।

৩৩) বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) (১৩১৪)। *শূন্যপুরাণ রামাই পণ্ডিত প্রণীত*। কলকাতা: বিশ্বকোষ প্রেস। পৃ. ৮৮।

৩৪) মহাপাত্র, পীযূষ কান্তি (সম্পাদিত) (২০১২)। তদেব। পৃ. ১০৩।

৩৫) ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ (২০১৫)। *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*। তৃতীয় পর্ব। কলকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৩১২।

৩৬) মুখোপাধ্যায়, নিশীথ (সম্পাদিত) (২০১৫)। *রায়গুনাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল*। কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ। পৃ. ৯।

৩৭) তদেব। পৃ. ৫।

৩৮) মুখোপাধ্যায়, অতনুশাষণ (সম্পাদক) (২০১৮)। *শীতলামঙ্গল সমগ্র*। কলকাতা: দশদিশি। পৃ. ৩২১।

৩৯) তদেব। পৃ. ৩৯৪-৩৯৭।

৪০) মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পাদিত) (১৯৬০)। *হরিদেবের রচনাবলী রায়মঙ্গল ও শীতলামঙ্গল*। সাহিত্য প্রকাশ-৪। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী। পৃ. ১৮৬-১৮৭।

৪১) দাশ, আশা (২০১৮) বড়ুয়া, সুমিত (সম্পাদিত)।*বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ছোঁয়া। পৃ. ১৮৯।

৪২) চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। পৃ. ৭৭।

৪৩) Gupte, R.S. (1972)। তদেব। পৃ. ১৮২।

৪৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। তদেব। পৃ. ১৬৯।

৪৫) ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০০)। তদেব। পৃ. ৯১২।

৪৬) তদেব। পৃ. ৯০৭।

৪৭) দাশ, আশা (২০১৮) বড়ুয়া, সুমিত (সম্পাদিত)। তদেব। পৃ. ১৯২।

৪৮) Bhattacharyya, Benoytosh (edited) (2013)। তদেব। পৃ. ৩৪৫।

৪৯) চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। পৃ. ৯১।

৫০) ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ (২০১৫)। তদেব। পৃ. ৩২-৩৩।

৫১) সিততারা: অমোঘসিদ্ধিকুলের একজন দেবী হল সিততারা। এই দেবী চতুর্ভুজা, শুক্লবর্ণা ও সৌম্যদর্শনা। মূল দুই হাতে উৎপল মুদ্রা দর্শন করে। দ্বিতীয় দুই হাতে থাকে অক্ষসূত্র ও বরদমুদ্রা। এই দেবীর সঙ্গে মহামায়ূরী দেবী এবং মারীচী থাকে। এই অমোঘসিদ্ধিকুলে দুইজন দেবী থাকে মহাশ্রীতারা এবং ষড়ভুজ – সিততারা। মহাশ্রীতারা এই দেবীর সৌম্যদর্শনা এবং করুণাপরায়ণা। দেবীর বর্ণ হরিদ, একমুখ ও দ্বিভুজা। দুইহাতে ধর্মচক্র মুদ্রা প্রদর্শন করে এবং দুই পাশে উৎপল শোভা পায়। সুবর্ণ সিংহাসনে নানা পুষ্পরাজিনির্মিত গদির ওপর মহারাজ ললিতাসনে বসে থাকে। ষড়ভুজ – সিততারা দেবী যার রং সাদা, তিনটি মুখ এবং ছয়টি হাত। এই দেবী পদ্মের ওপর অর্ধপর্যাঙ্কে বসে থাকে। দেবীর মূল মুখ শ্বেত, দক্ষিণ মুখ পীত এবং বাম মুখ নীল।

সূত্র: ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ (প্রণীত), ভিক্ষু, সুমনপাল ও মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র (সম্পাদিত) (২০১৫)। *বৌদ্ধদের দেবদেবী*। কলকাতা: মহাবোধি সোসাইটি। পৃ. ৬২-৬৩।

৫২) বজ্রতারা: বজ্রতারা তান্ত্রিকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় দেবী ছিলেন। এই দেবীর মূর্তি নানা রকমের পাওয়া যায়। নিষ্পন্নযোগীতে এই দেবীর পরিবার মণ্ডলীর খবর পাওয়া যায়। বজ্রতারার বর্ণ পীত এবং তিনি বজ্রপর্যাঙ্কাসনে ধ্যানমগ্ন থাকে। দেবী রূপলাবণ্যবতী, নবযৌবনোদ্ভিন্না এবং সর্বলঙ্কারভূষিতা। এই দেবীর চারটি মুখ ও অষ্টভুজা এবং দশদেবী-পরিবৃতা। এই দেবীর চারটি দক্ষিণ হাতে থাকে বজ্র, পাশ, শঙ্খ ও শর। এবং চারটি বাম হাতে থাকে বজ্রাঙ্কিত অঙ্কুশ, উৎপল, ধনু ও তর্জনী। এই দেবীর প্রধান চার মুখ্য দিশায় চারজন দেবী অবস্থান করত। যথা - পূর্ব দ্বারে বজ্রাঙ্কুশী, দক্ষিণ দ্বারে বজ্রপাশী, পশ্চিম দ্বারে বজ্রস্ফোটী ও উত্তর দ্বারে থাকে বজ্রঘণ্টা। উর্ধ্বে থাকে উষ্ণীষবিজয়া এবং নিম্নে সুম্ভা অবস্থান করে।

সূত্র: ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ (প্রণীত), ভিক্ষু, সুমনপাল ও মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। পৃ. ৫৮।

৫৩) বাগীশ্বরী: বোধিসত্ত্ব এই মঞ্জুশ্রীর আকৃতি কুমারাকৃতি, কুঙ্কুমারুণবর্ণ, সর্বালংকারভূষিত, একভুজ ও দ্বিভুজ। এই দেবী সিংহের ললিতাসনে এক পা লম্বিত করে বসে। এই দেবীর বামে উৎপল এবং তার দক্ষিণ হাত সাবলীল ভাবে রক্ষিত থাকে।

সূত্র: চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। পৃ. ৪৬-৪৭।

৫৪) Bhattacharyya, Benoytosh (edited) (2013)। তদেব। পৃ. ৪১৪-৪১৬।

৫৫) Rahman, Mukhlesur (1998). *Sculpture in The Varendra Research Museum: A Descriptive Catalogue*. Rajshahi: Varendra Research Museum University of Rajshahi. পৃ. ৩২৭.

৫৬) চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। পৃ. ৮৩-৮৪।

৫৭) Rahman, Mukhlesur (1998). তদেব। পৃ. ২৪৮.

৫৮) বসু, কাবেরী (অনূদিত) রত্নাগর, শিরিন (২০১৮)। *হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে*। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৯৫-৯৬।

৫৯) মুখোপাধ্যায়, রমেশ চন্দ্র ও ভিকশু, সুমনপাল (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। পৃ. ৩১।

৬০) মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পাদিত) (১৯৬০)। তদেব। পৃ. ২৭৩।

৬১) ভট্টাচার্য, বেলা (সম্পাদক মণ্ডলী) (২০০৪-২০০৫)। *বৌদ্ধকোষ Encyclopaedia of Buddhism*। তৃতীয় খণ্ড।। কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদয়ালয়। পৃ. ৪৩৯।

৬২) ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০০)। তদেব। পৃ. ৯৫২।

৬৩) চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। পৃ. ৮৭।

৬৪) ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০০)। তদেব। পৃ. ৯৬১।

৬৫) চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। পৃ. ৬৩।

৬৬) বসু, কাবেরী (অনূদিত) হাবিব, ইরফান (২০১৯)। *সিন্ধু সভ্যতা*। ভারতবর্ষের মানুষের ইতিহাস-২। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৮০।

৬৭) রামেশ্বর, ভট্টাচার্য (১৩১০)। *শিবায়ন*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ১১।

৬৮) ঘোষ, সুধাংশুরঞ্জন (অনূদিত ও সম্পাদিত) (২০১৭)। *জাতক সমগ্র*। কলকাতা: কামিনী প্রকাশালয়। পৃ. ৫২৩-৫২৫।

৬৯) তদেব। পৃ. ৩৩-৩৪।

৭০) হালদার, যোগিলাল (সম্পাদিত) (১৯৫৭)। *শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৩৪।

৭১) ভট্টাচার্য, বেলা (সম্পাদক মণ্ডলী) (২০০৪-২০০৫)। *বৌদ্ধকোষ Encyclopaedia of Buddhism*। পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদয়ালয়। পৃ. ৬৫৫।

৭২) রামেশ্বর, ভট্টাচার্য (১৩১০)। তদেব। পৃ. ১১।

৭৩) মণ্ডল, ইন্দুভূষণ (১৯৯৯)। *বাংলা মঙ্গলকাব্যে লৌকিক উপাদান*। কলকাতা: সাহিত্যলোক। পৃ. ৫১।

৭৪) টোটেম: যেসব প্রাণী বা বস্তুর সঙ্গে সামাজিক পুঞ্জের প্রতীকমূলক সম্বন্ধ বর্তমান তাদের টোটেম বলে। এই সামাজিক গোষ্ঠীর মানুষেরা মনে করেন, টোটেম তাঁদের পৌরাণিক পূর্বপুরুষের নিদর্শন।

সূত্র: চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত) (২০১২)। *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*। কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। পৃ. ২০৮।

৭৫) ঘোষ, সুধাংশুরঞ্জন (অনূদিত ও সম্পাদিত) (২০১৭)। তদেব। পৃ. ৫৬০-৫৬৩।

৭৬) নিগুঢ়ানন্দ (২০১১)। *মানুষ বলির তন্ত্র ও অপতন্ত্র*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ৩৫।

৭৭) মণ্ডল, ইন্দুভূষণ (১৯৯৯)। তদেব। পৃ. ৫২।

৭৮) ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০০)। তদেব। পৃ.২৬০।

৭৯) নস্কর, সনৎকুমার (সম্পাদিত) ২০১৫। *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল*। কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ। পৃ. ২৩।

৮০) সেন, অঞ্জন ও ইসলাম, শেখ মকবুল (সম্পাদিত) (২০১২)। *সর্প-সংস্কৃতি ও মনসা*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। পৃ. ২৯।

৮১) বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পাদিত) (২০০২)। *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল*। কলকাতা: রত্নাবলী। পৃ. ১১৮-১১৯।

৮২) ঘোষ, ঈশানচন্দ্র (অনূদিত) (১৩১৯)। *জাতক*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ১৪৮।

৮৩) নস্কর, সনৎকুমার (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। পৃ. ৭৮।

৮৪) ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী (সম্পাদিত) (২০০০)। *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল*। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি। পৃ. ২৮।

৮৫) দাশগুপ্ত, জয়ন্তকুমার (সম্পাদিত) (১৯৬২)। *কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৪৪৩।
৮৬) নস্কর, সনৎকুমার (সম্পাদিত) ২০১৫। তদেব। পৃ. ৩৮।
৮৭) বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। *কবিকঙ্কণ – চণ্ডী*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ২৭।
৮৮) দাস, আশুতোষ (সম্পাদিত) (১৯৫৭)। *অভয়ামঙ্গল*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ১৭।
৮৯) সেন, সুকুমার (সম্পাদিত)। কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি। পৃ. ২৩।
৯০) ভট্টাচার্য, বেলা (সম্পাদক মণ্ডলী) (২০০০-২০০১)। *বৌদ্ধকোষ Encyclopaedia of Buddhism*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পালি বিভাগ। পৃ. ৪৭৩-৪৭৫।
৯১) বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। তদেব। পৃ. ২০-২১।
৯২) ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ, ভট্টাচার্য, সুমিত্রা, সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর, চৌধুরী, সত্যজিৎ (সম্পাদিত) (১৯৯১)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: রাজ্যপুস্তক পর্ষদ। পৃ. ২০৫।
৯৩) ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ, ভট্টাচার্য, সুমিত্রা, সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর, চৌধুরী, সত্যজিৎ (সম্পাদিত) (১৯৯১)। তদেব। পৃ. ২৪৫।
৯৪) ভট্টাচার্য, সুধীভূষণ (সম্পাদিত)। *দ্বিজমাধব রচিত চণ্ডীমঙ্গল গীত*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৫২।
৯৫) বসু, তারাপদ (২০০৬)। *নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল সমাজ ভাবনা*। বর্ধমান: রাঢ় সংস্কৃতি পরিষদ। পৃ. ১৫।
৯৬) মহাপাত্র, পীযূষ কান্তি (সম্পাদিত) (২০১২)। তদেব। পৃ. ১৪। ৪এ
৯৭) চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত) (২০১৪)। *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ-গ্রন্থমালা ২। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ২২৪।
৯৮) দত্ত, বিজিতকুমার ও দত্ত, সুনন্দা (সম্পাদিত) (২০০৯)। তদেব। পৃ. ১-৬০৬।
৯৯) তদেব। পৃ. ১-২।
১০০) তদেব। পৃ. ১০।
১০১) মুখোপাধ্যায়, নিশীথ (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। পৃ. ৬০।
১০২) তদেব। পৃ. ১৩৩।
১০৩) ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ (২০১৫)। তদেব। পৃ. ১৫০।
১০৪) বসু, ত্রিপুরা (১৯৮৭)। *বিস্মৃত কবি ও কাব্য*। কলকাতা: পুস্তক বিপণী। পৃ. ৩০।
১০৫) ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। পৃ. ৭৭।
১০৬) Sastri, Haraprasad (1897). *Discovery of Living Buddhism in Bengal.* Calcutta: R. Dutta Hare Press. পৃ. ২০.
১০৭) বসু, ত্রিপুরা (১৯৮৭)। *বিস্মৃত কবি ও কাব্য*। কলকাতা: পুস্তক বিপণী। পৃ. ২।
১০৮) মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পাদিত) (১৯৬০)। তদেব। পৃ. ২০৫।
১০৯) ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০০)। তদেব। পৃ. ৯১২-৯১৪।
১১০) দাশ, আশা (২০১৮) বড়ুয়া, সুমিত (সম্পাদিত)। তদেব। পৃ. ১৯৪।
১১১) Rahman, Mukhlesur (1998)। তদেব। পৃ. ৭২৬।
১১২) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার (১৯৯৩)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী পৃ. ১৮১।
১১৩) সেন, সুকুমার (১৪২৩)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ৪২০-৪২২।
১১৪) ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০০)। তদেব। পৃ. ৯১৬-৯১৮।
১১৫) ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ (২০১৫)। তদেব। পৃ. ৩২-৩৩।

১১৬) ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০০)। পৃ.৯৪৮।

১১৭) ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ (প্রনীত) মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র ও ভিক্ষু, সুমনপাল (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। পৃ. ৮৮।

১১৮) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার (১৯৯৩)। তদেব। পৃ.১৪৮।

১১৯) ঘোষ, ঈশানচন্দ্র (অনূদিত) (১৩১৯)। তদেব। পৃ. ২২৩-২২৫।

১২০) ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ (২০১৫)। তদেব। পৃ. ১১৮।

১২১) সাহা, বিপুল (২০১১)। *হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ*। কলকাতা: আশুতোষ লিথোগ্রাফিক কোম্পানি। পৃ. ৫৪।

১২২) ঘোষ, তপনকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮)। *বাংলা ভাষায় জৈনধর্ম-চর্চা*। কলকাতা: প্যাপিরাস।পৃ. ৪৬।

চতুর্থ অধ্যায়

মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈন ভাবনার ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

৪. ০ ভূমিকা

মঙ্গলকাব্যগুলিতে উঠে আসা সমাজবাস্তবতা ও কবিদের নবাগত কল্পিত দেবভাবনাগুলির বৈশিষ্ট্যগুণে এই কাব্যগুলি হয়ে উঠেছিল যুগ সন্ধিক্ষণের কাব্য। প্রাচীনভারতের বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ও জৈনযুগের অবসান ঘটিয়ে পুনরায় নব ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান ঘটতে শুরু করেছিল। অস্তিত্বের লড়াইয়ে টিকে থাকতে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মগুলি নিজেদের ধর্মীয় বেড়াজালকে কিছুটা খাটো করে হলেও সমাজের অন্যান্য ধর্মীয়ভাবনাগুলির মধ্যে প্রবেশ করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়েছিল। সমাজের সমগ্র ধর্মীয় ভাবনাগুলির মধ্যে একত্রীকরণ ঘটতে শুরু করে। এই সমন্বয়ের থেকে মধ্যযুগে পৌঁছে বাংলা কাব্যসাহিত্যের ধারায় এক যুগ্ম ভাবনা দ্বারা প্রণোদিত হয়ে মঙ্গলকাব্যের যাত্রাপথ বিস্তার লাভ করেছিল। মহাবীরের জৈনধর্মের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের লৌকিক ও পৌরাণিক দৈবীভাবনার প্রবেশের নমুনা। জৈনধর্মে মূর্তিপূজার প্রচলনের কথা জানা যায়। মহাবীরের পরে বঙ্গদেশে শাক্যপুত্র গৌতমবুদ্ধের প্রচলিত ধর্ম এসে পৌঁছায়। সময়ের কালস্রোতে বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখায় তন্ত্রভাবনার মধ্যে দিয়ে কিছু বৌদ্ধ দেবতাদের রূপকল্পনার দৃষ্টান্ত এসে ধরা পড়ে। বৌদ্ধতন্ত্রসাধনার সংস্পর্শে এসে একদল বৌদ্ধযোগী 'গুহ্যসাধন' নাম দিয়ে সমাজের অন্তরালে, এই সাধন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কিছু বৌদ্ধদেবতার আরাধনা করতে থাকে। বৌদ্ধধর্মের এই কল্পিত দেবতাভাবনার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে অন্য ধর্মীয়ভাবনাগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত। বৌদ্ধসাধনার এই ভাবনার মধ্যে গতানুগতিক সামাজিক ধর্মীয় ভাবনার বাইরে লোকচক্ষুর আড়ালে তন্ত্রভাবনায় প্রভাবিত নতুন ধর্মীয় আচার পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়। সমাজের নারী-পুরুষের দৈহিক সম্পর্ককে ধর্মের নাম দিয়ে ব্যবহার করার চেষ্টা চালানো হয়। এই সাধকেরা সমাজে ধর্মের নামে স্বাভাবিক দৈনন্দিন আচরণকে গভীর বিকৃত করে তুলতে থাকে। সমাজে ধর্মের নামে ঘুণ ধরানো পরিস্থিতিতে বাংলায় বিদেশী রাজার আক্রমণ নেমে আসে। যার ফলে ত্রয়োদশ শতকে ভারতবর্ষের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে বিপুল পরিবর্তন আসতে থাকে। তুর্কী আক্রমনোত্তর ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ মুছে যায় এবং সমাজে নতুন ধর্মের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এই নতুন আবির্ভূত ধর্মের দৈবী পরিকল্পনায়,

অবসিত বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের দৈবীকল্পনার ছাপ থেকে যায়। দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব নব উদ্ভূত সমাজের মধ্যে গ্রথিত হয়ে থেকে যায় নব উৎপত্তি হওয়া সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে। পূর্বের ধর্মীয় ধারণাগুলি রূপান্তরিত হয়ে মধ্যযুগের সমাজে লালিত ও পালিত হতে থাকে। ধারণাগুলিকে মধ্যযুগের সাহিত্যে যেইভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে ধর্মীয় আচরণ বা ধারণা গুলিকে ভিন্নার্থে চিহ্নিত করতে গেলে বেগ পেতে হয়। এই নবাগত সমন্বিত সমাজের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে প্রকাশিত যুগ্ম ভাবনাগুলি এখানে আলোচিত বিষয় হয়েছে।

৪. ১ মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈন ভাবনার ধর্মীয় তাৎপর্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেকটি পাতায় যে সাম্প্রদায়িকতার নমুনা পাওয়া যায় সেখানে মূলত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের কথা বোঝানো হয়ে থাকে। প্রাচীন ভারতের সাহিত্যাঙ্গনে দুই ভিন্ন জাতির রেখাচিত্রের বাইরেও হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধ এবং বিভেদের ছবি ধরা পরে। সেই বিরোধকে অতিক্রম করে সমন্বয়ী চেতনায় পৌঁছানোর প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেছে। হিন্দুদের উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের সম্পর্কের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা এবং দূরত্বের ছবি ধরা পরে যেখানে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পাওয়া যায়। যার উদাহরণ রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য চর্যাপদ নামক গ্রন্থে –

নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
ছই ছোই বাইসি বাহ্ম নাড়িআ।।ধ্রু।।
আলো ডোম্বি তোএ সম করিষে মঁ সাঙ্গ
লিখণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ ।।ধ্রু।।[১]

সমাজে শ্রেণিভিত্তিক এই সাম্প্রদায়িকতার জন্য ভিন্নধর্মী রাজাদের উত্থান পতন। তৎকালীন শাসক ও রাজানুগামী ব্যক্তিদের অন্য ধর্মের প্রতি বৈরীভাব এই সমস্ত কিছুর জন্য সমাজে বেদের উত্থানের সময় থেকে সাম্প্রদায়িকতার আভাস উপলব্ধি করা যায়। একদিকে বৈদিক ধর্মের কর্মযজ্ঞে ব্রাহ্মণরা সমাজে নিজেদের কতৃত্ব প্রয়োগে ব্যস্ত হয়ে পরে। অন্যদিকে অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষ কোণঠাসা হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে অবৈদিক জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হতে থাকে। এই অবৈদিক ধর্মীয়ভাবনাগুলির মধ্যে দিয়ে মূলত বৈদিক কর্মকাণ্ডের বাইরে জনসাধারণকে বের করে আনার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। প্রত্যেকটি ধর্মীয়নেতারা নিজেদের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাকে জনসাধারণের কাছে সহজভাবে কিছু নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এই প্রচেষ্টায় তারা সফলতা পেতে থাকে। জৈনধর্মে বলা হয়েছে -

> অহিংসা পরম ধর্ম, এটা জৈন ধর্মের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য। অন্যেরাও হিংসাকে পাপ বলেই পরিহার করতে বলেছেন। কিন্তু অহিংসাকে জৈনরা যে উচ্চতায় নিয়ে গেছেন, তা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। প্রত্যক্ষ হিংসা তো বটেই, পরোক্ষ হিংসাও সেখানে পাপজনক এবং সেই পাপ কেবল পাপকারীকেই স্পর্শ করে না, যার জন্য হিংসা করা হয়, তাকেও স্পর্শ করে। অনিচ্ছাকৃত জীব-হিংসাও যাতে না হয়, সেজন্য জৈনদর্শনে অনেক লোকাচার উদ্ভাবিত হয়েছে।[২]

মানুষের মধ্যে পাপপুণ্যের ধারণাগুলিকে ভেঙে ভেঙে জনসাধারণের কাছে ছড়িয়ে দিতে থাকে। এই ধারণাগুলিকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ হিংসা ভুলে গিয়ে অহিংসার দিকে আগ্রহী হতে থাকে। একইভাবে বৌদ্ধধর্মকে সকল মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য ধর্মের মূল কথা, নিয়ম, কানুন এগুলিকে সহজ করাটা জরুরি হয়ে পরে।

বৌদ্ধধর্মকে সহজ করতে গিয়ে নির্বাণ, অদ্বয়বাদ এই ভাবনাগুলিকে সহজ সরল রূপায়ন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এইভাবে জন্ম নেয় সহজযান[৩] নামে একটি বৌদ্ধ ধর্মীয়সম্প্রদায়ের। অবৈদিক এই ধর্মীয় ভাবনাগুলিকে সহজ করার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অভ্যন্তরে ব্যাভিচার প্রবেশ করে। ভগবান বুদ্ধ পঞ্চকামোপভোগ নিবারণের জন্য বহু প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। সেখানে সহজযানীদের হাত ধরে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এই পঞ্চকামোপভোগ ভাবনা পুনরায় জাল বিস্তার করে ফেলে। সমগ্র বৌদ্ধধর্মকে গ্রাস করে ফেলে, ফলস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এই বৌদ্ধ সহজিয়াদের দ্বারা রচিত চর্যাপদ নামক গ্রন্থ। যেখানে সন্ধ্যাভাষায় দেহতত্ত্বের গান লিখিত রয়েছে। তাদের রচিত এই গানগুলির মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষকে তারা বোঝানোর চেষ্টা করে - আকাশ, কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু, সুমেরু, অর্থাৎ সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড দেহের মধ্যে অবস্থিত রয়েছে। বৌদ্ধ মহাযানদের মতানুসারে যেসকল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মানুষ আপন উন্নতিলাভের কথা বা নির্বাণলাভের কথা যেভাবে কল্পনা করেছিল। হীনযানদের ক্ষেত্রে নির্বাণলাভের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছিল। এই হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধভিক্ষুদের মধ্যে ধীরে ধীরে বিলাসিতার পরিমাণ চরমে উঠতে থাকে। তাদের পোশাকের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে রেশমের কাপড়, তারা ইন্দ্রিয়াসক্তির দিকেও অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পড়েছিল।[৪] এই আরাম প্রিয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বারা প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্মমতের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বের বৌদ্ধ মহাযানীদের ধর্মমতগুলি জনসাধারণের কাছে অতি কঠিনবোধ হতে থাকে। সেসময় সহজযানী বৌদ্ধরা সাধারণ মানুষকে সহজ বৌদ্ধ পথের খোঁজ দেখাতে থাকে। তারা বলেন শুধুমাত্র ধারণী[৫] পাঠ করলে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হওয়া যাবে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হয়ে ওঠার এই সহজ

রাস্তা মানুষকে অতিসহজে আকৃষ্ট করেছিল। পরবর্তীকালে এই ধারণীর বিভিন্ন রূপপরিবর্তন হয়েছিল। যা বৌদ্ধধর্মকে সমাজের পিছনের দিকে ঠেলে দিতে থাকে। বৌদ্ধধর্মের এইবহুবিধ মতের সামনে এসে পরে তুর্কী আক্রমণ (১২০১ খ্রিস্টাব্দ), যার প্রভাবকে কাঁটিয়ে ওঠা বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মুসলমানেরা যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল তখন তারা জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ এই সকল ধর্মগুলিকে নিজেদের বিরোধী ধর্মমত ভেবে ভুল করেছিল। তারা সমাজে থাকা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সঙ্গে বিহারে থাকা অস্ত্রহীন বৌদ্ধভিক্ষু, ছাইভস্মমাখা চিমটাধারী জৈন সন্ন্যাসীদের প্রতি সহানুভূতি না দেখিয়ে সকলের প্রতি তরোয়ালের আঘাত নামিয়ে আনে। অসহায় মানুষগুলিকে নৃশংসভাবে হত্যা করে চলে। এই ঘটনার পরবর্তী প্রায় দু'শো বছর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন কোন উচ্চ মানের সাহিত্যের ফসল উৎপন্ন হতে পারেনি। দু'শো বছর পরে যখন সমাজকে খানিকটা স্থিতিশীল হওয়ার নমুনা পাওয়া যায়। সেসময়ে স্থিতসমাজের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায় সমাজ সম্পূর্ণ নতুন কতকগুলি বিশেষ ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে। সেই নতুন সমাজের ধর্মীয়, সংস্কৃতি ও সামাজিক সকল দিক থেকে এই পরিবর্তনের রূপ পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই নতুন সমাজে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের আর তেমন কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। পুরোনো ধর্মীয় বিশ্বাস নতুন সমাজের অভ্যন্তরে থেকে যায় ফল্গুধারার মতো। এই ধারা অবিকৃত অবস্থায় নতুন সমাজে খুব একটা গ্রহণযোগ্য হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও জৈন ধারণা, ভাবনা এবং বিশ্বাসগুলি যথাক্রমে বিকৃত হয়ে নতুন মিশ্রসমাজে স্থান পেয়েছিল। যার নমুনা পাওয়া যায় মিশ্রসমাজের সাহিত্য মঙ্গলকাব্যগুলির মাধ্যমে।

জৈনধর্মে গুরুর কথা বলা হয়েছে। এই ধর্মে মোট চব্বিশজন তীর্থঙ্করের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই তীর্থঙ্করগণ মূলত জৈনধর্মাবলম্বীদের কাছে গুরুর ন্যায় পূজিত হয়ে থাকে। জৈন তীর্থঙ্করগণ কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে সকল তত্ত্ব, রাগ, দ্বেষ, কামনা, বাসনা এই ইন্দ্রিয়জাত বিষয়গুলিকে জয় করে কেবল জ্ঞান লাভ করে সিদ্ধপুরুষ হয়েছিলেন। জৈনরা ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে এই সিদ্ধপুরুষদের উপাসনা করতেন। এই সকল সিদ্ধপুরুষরা বদ্ধজীব হয়ে নিজ নিজ সাধনায় কর্মের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে পূর্ণজ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের অধিকারী হয়ে মোক্ষলাভ করেছেন। তারা বিশ্বাস করে প্রতিটি জীব নিজ প্রচেষ্টায় জিনদের প্রদর্শিত পথে পূর্ণ, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, মুক্ত ও অসীম আনন্দের অধিকারী হতে পারে। গুরুর বাণীকে এই ধর্ম মতাবলম্বীরা দৈববাণী মনে করে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে

চলে। তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ তার মূলনীতি চতুর্যাম-এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেখানে তাঁর অনুসারীদের দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে পালন করতে বলা হয়েছে - অচৌর্যবৃত্তি, অপ্রতিহত, অহিংসা এবং সত্য এই চারটি মতকে।[৬] জৈন ধর্মাবলম্বীরা এই মতাদর্শগুলিকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করত। এখনও জৈন সমাজে এই রীতি অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মে গুরুর উপাসনার উল্লেখ পাওয়া যায়। হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মে গুরুর উপাসনা না করে দেবতার উপাসনা করা হয়ে থাকে। এখানে বৌদ্ধ ও জৈন এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে সব থেকে বড় ব্যবধান। ব্রাহ্মণ্যহিন্দুর ধর্মসাধনায় অধ্যাত্মসাধনা ছিল একান্ত ব্যক্তিক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এখানে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পূজিত ভগবান বা দেবতার সঙ্গে আহ্বানকারী ব্যক্তির একক আদান-প্রদান চলে। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মধ্যে আরাধনা ও উপাসনার স্থান রয়েছে। এখানে দেখা যায় সাধনার চূড়ান্তে অর্থাৎ মোক্ষলাভের সাধনায় সাধক একান্ত ব্যক্তি মানুষ হিসেবে ধরা দেয়।[৭]

বৌদ্ধ ও জৈন এই দুটি অবৈদিক ধর্মের মধ্যে কোথাও নিজের ধর্মীয় মতাদর্শকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার কথা ভগবান বুদ্ধ বা তীর্থঙ্করররা বলেননি। এই সকল গুরুরা তার শিষ্যদের যুক্তি ও বিচারের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর সকল বিষয়কে গ্রহণ করতে শিখিয়েছে। যেমন *মহাপরিনির্বাণ সূত্র* নামক গ্রন্থে বুদ্ধ তার শিষ্য আনন্দকে বলেছে – তোমরা আমার কথা বিশ্বাস কোরো না। যুক্তি দিয়ে বিচার করে তবেই সেগুলি মানবে।[৮] বাংলাদেশে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধীরে ধীরে প্রাচীনকালের বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগুলি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়ে বিচিত্র রূপ লাভ করেছিল। কালক্রমে জৈনধর্ম প্রধান দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায় - শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামে। দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিচারে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তেমন কোন মতভেদ নেই। শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার-আচরণের দিক থেকে উভয় সম্প্রদায়ের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। শ্বেতাম্বররা ছিল কিছুটা উদারপন্থী আর দিগম্বররা ছিল কট্টরপন্থী। দিগম্বররা মনে করে সন্ন্যাসীদের সকল প্রকারের সম্পত্তি পরিত্যাগ করা উচিত। তারা বস্ত্রকে একধরণে সম্পত্তি মনে করে, বস্ত্র পরিধান থেকে বিরত থাকে। শ্বেতাম্বরেরা বস্ত্র পরিধানের সপক্ষে যুক্তি দেয়। দিগম্বরপন্থীরা আরও মনে করে পূর্ণজ্ঞানী সিদ্ধগণ খাদ্য ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করতে পারে। শ্বেতাম্বরপন্থীরা এই মতের সঙ্গে একমত হতে পারেনি।[৯] খ্রিস্টপরবর্তী সপ্তম শতাব্দী নাগাদ বাংলাদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের যেসকল শাখাগুলি গড়ে উঠেছিল। যেমন –

সম্মিতীয়বাদ, সর্বাস্তিবাদ, মহাসাংঘিক ও প্রভৃতি বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির সমাজে বিষেশ প্রতিপত্তি দেখা গিয়েছিল। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মহাযানী ঐতিহ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল। যেখানে মন্ত্র, তন্ত্র, মুদ্রা, ন্যাস, মণ্ডল প্রভৃতি তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ বা যোগবিধিগুলি মহাযান বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করে। বৌদ্ধদের ধর্মীয় জগতে এক অভিনব তান্ত্রিক বৌদ্ধভাবনার জন্ম হয়। এই সময়কালের মধ্যে বাংলা ও মগধের মানুষের আচার ব্যবস্থার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, তাদের পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছিল এই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিত ধর্মীয়ভাবনাটি।[১০] তন্ত্রভাবনা সম্পর্কে জানা যায় প্রাচীনকালে এই ভাবনা গুহ্য অবস্থায় ছিল প্রায় তিনশো বছর। ভারতবর্ষে পাল রাজাদের উত্থানে সিদ্ধাচার্যদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। যাদের প্রভাবে এই তন্ত্রভাবনা আরও সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে। এই তান্ত্রিক সমাজের শ্রীবৃদ্ধির সুর্বণযুগের ইতিহাস পাওয়া যায় সেন আমলে। রাজা বল্লাল সেনের (১১১৯-১১৬৯ খ্রিস্টাব্দ) নামে প্রচলিত একটি কাহিনিতে দেখা যায় – লক্ষ্মণ সেন একসময় জানতে পারে যে তার পিতা বল্লাল সেন কোন এক চণ্ডালরমণীর সঙ্গে গোপনে গুহ্যসাধনায় ব্যস্ত নদীর তীরে কুটীর বেঁধে। এই কথার সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে যুবরাজ জানতে পারেন তার পিতা ওই চণ্ডালরমণীকে নিয়ে নির্জনে তান্ত্রিক শক্তিসাধনা করে চলেছেন।[১১] তন্ত্রসাধনার নামে রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমিতে গোপনে সংগঠিত হওয়া ক্রিয়াকলাপ সমাজে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। বঙ্গদেশে বহুকাল শান্তি বজায় থাকায় রাজাসহ সমগ্র প্রজার মনেও অলসতা বাসা বাঁধতে শুরু করেছিল। অতর্কিত বৈদেশিক আক্রমণ দেশীয় রাজব্যবস্থাকে খুব সহজে আঘাত করতে পেরেছিল। তখন দেশীয় ধর্মীয়বোধে পরিবর্তন আসে।

নতুন রাজার আগমনের মধ্যে দিয়ে নতুনধর্মের বাণী ছড়িয়ে পড়তে থাকে সমাজের মধ্যে। সমাজে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অস্তিত্ব বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রাচীনযুগের শেষ হয়। সূচনা হয় মধ্যযুগ নামে নতুন যুগের। এই মধ্যযুগের সমগ্র অংশ জুড়ে ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল ধর্মীয় সাহিত্য। এই সাহিত্যকর্ম মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিতি পেয়েছিল। এই মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে ধরা পড়ে হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন সত্তাকে নিয়ে গড়ে ওঠা মিশ্রসত্ত্ব দেবতাদের গুণকীর্ত্তন। সেইসঙ্গে ধরা পড়ে সমাজের বহুবিধ ঘটনার প্রতিচ্ছবি। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য হল মনসামঙ্গলকাব্য। এই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে দেবী চরিত্রের বর্ণনা ও দেবীর

কর্মকাণ্ডের মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈনঐতিহ্য ফুটে উঠেছে। জৈনদের দেবী পদ্মাবতী যিনি সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই দেবীর সাহচর্যে সাপেদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। জৈনপন্থীরা বিশ্বাস করে এই দেবীর নাম মনে করলেও সাপের ভয় দূরে থাকে। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে তাদের জাঙ্গুলী দেবীর নামে সাপেরা পালিয়ে যায়। *সাধনমালা* গ্রন্থে উচ্চারিত একটি মন্ত্রের কথা জানা যায়, যেখানে বলা হয়েছে এই মন্ত্রটি উচ্চারণের ফলে সাপের মাথা সপ্তধা স্ফুটিত হতে থাকে। বাংলাদেশের মঙ্গলকাব্যের মনসাদেবী পূর্বোক্ত পদ্মাবতী দেবী, জাঙ্গুলীদেবী অথর্ববেদোক্ত সর্পবিষ বিনাশের বিদ্যায় পারদর্শী কিরাতকন্যা বা ঘৃতাচী। সরস্বতীদেবী এই সকল দেবীদের সমন্বিত রূপমাত্র। বিজয়গুপ্তের রচিত মনসামঙ্গলকাব্যের নাম পাওয়া যায় *পদ্মপুরাণ*। বরিশাল থেকে এই কবির বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ উদ্ধার করা হয়েছিল। কবি নারায়ণদেব ও তার মঙ্গলকাব্যের নামকরণ করেছিলেন *পদ্মপুরাণ*। মনসামঙ্গলকাব্যের এই নামকরণের মধ্যে জৈনদেবী পদ্মাবতীর প্রভাব রয়েছে এমনটা অনুমান করা যায়। মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হয়েছিল মধ্যযুগে, এই সৃষ্টির দুই-তিন শতাব্দী পূর্বে তন্ত্রশাস্ত্রের ধ্যানে সাধকের অন্তর্লোকে বসবাসকারিণী সাপের বিষকে প্রতিহত করতে জানা এক দেবী রূপের চিত্রাঙ্কন হয়ে গিয়েছিল সেই শুভক্ষণ থেকে। বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ বিনয়বস্তুর অন্তর্গত *মহামায়ূরীবিদ্যা সূত্র*-তে মনসাদেবী যেরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তান্ত্রিকদের যে দেবীরূপ সাধকের মানসলোকে উৎপন্ন হয়ে আধ্যাত্ম মহিমায় ভূষিত হয়েছিলেন। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে আসলে সেই দেবীরূপগুলি মঙ্গলকাব্যের কবিদের মনসাদেবীর রূপ চিন্তনে সাহায্য করেছে। মনসামঙ্গলকাব্যের লেখার বিষয়বস্তু গ্রহণে এবং দেবী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্মাণে প্রেরণা জুগিয়েছে। বাঙালির নারীদের চরিত্রে স্বামীপ্রাণা ও ভক্তিপূর্ণ মনোভাব তৈরি করতে মনসামঙ্গলকাব্যের বেহুলা চরিত্রটি অনেকার্থে সাহায্য করেছে। বাসর ঘরে তার স্বামীর সাপের কামড়ে জীবননাশ হলে এই অবলা নারী মনের বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে মান্দারের ভেলায় চেপে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। তার পিতা-মাতা তাকে ফিরে যেতে চিঠি লিখলে সে যেতে অস্বীকার করেছে। সে কোন কিছুর বিনিময়ে মৃত পতি লখাইকে ছেড়ে যেতে চায়নি।[১২] চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে খুল্লনা যে সতিনের অত্যাচার সহ্য করে স্বামীর মঙ্গলকামনা করেছে। তার সতীত্বের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে তখনও সে পিছিয়ে না এসে স্বামীকে কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করতে বিনা বাক্যব্যয়ে পরীক্ষার ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে -

যদি সে হাম সতী খুলনা যুবতী

সাজিতে জল হউক স্থিত।।
নিবেদন করি সাজিতে জল ভরি
চলিল জ্ঞাতি বরাবরে।
সত্যার্থ তন্ত্রে স্থির হইল রন্ধ্রে
এক তিল মাত্র নাহি ঝরে।।
বণিক সভায়ে মনেতে ভয় পায়ে
রৈল যেন চিত্রের পোতলি।
রাঘবদত্তে কৈল হেলা এহা কি ছাওয়ালের খেলা
পরীক্ষা ইহারে নীহি বোলি।।
পরীক্ষাতে এড়াইল খুলনা কামিনী।
স্ত্রীয়ে-পুরুষে লোকে দিল জয়-ধ্বনি।।[১৩]

পঞ্চদশ শতকের মনসামঙ্গলকাব্যে দেবতা শিব চরিত্রে কালিলেপন করা হয়েছে। হিন্দুদের প্রাচীন দেবতা শিব নীচু জাতির স্ত্রী-লোকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে -

ডুমনির রূপ দেখি অতি বিলক্ষণ।
কামে ব্যেকুল সিব সাত পাচ মন।।
ডুমনি বোলে মোর ডোম গিছেত গাওয়ালে।
একাস্বরে খেওা মুঞি দেম ঘাটের কুলে।।
ডুমনির বোলে সিব পরম কৌতুকে।
চোরে ভাণ্ডার পাইলে জেন সাত হাতে লোটে ।।
কাড়ার ধরে ডুমনি বৈসে লাসে বেসে।।
খেনে ২ ডুমনির গায়ের কাপড় খৈসে।।
ইসদ কটার্ক্ষে তবে হাসেত ডুমনি।
কামবানে মহাদেবের না ধরে পরানি।।[১৪]

বৌদ্ধদের রচিত চর্যাপদ নামক গ্রন্থটির দশ নং পদে এইরূপ সহজ প্রেমের দৃশ্য ধরা পড়েছে। সমাজের উঁচুশ্রেণির লোকেরা দিনের বেলায় ছোট জাতের রমণী বলে যাদের ঘৃণা করত। রাতের অন্ধকারে তাদের ঘরে প্রবেশ করত নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থে। কাব্যে উল্লিখিত পদটি হল -

নগর বাহিরেঁ, ডোম্বি, তোঁহোড়ি কুড়িআ
ছুই ছোঁই বাইসি বাহ্ম নাড়িলা।
আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে মো সাঙ্গ।
নিখিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ।[১৫]

মনসামঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের ধর্মীয় ভেদাভেদের ভাবনা এসে মিলিত হয়েছে। এখানে শুধু আখেটিকখণ্ডে প্রভাব ফেলেনি। দেবখণ্ডে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এতোটা তীব্র হয়ে পড়েছিল যে, কবিরা আদিদেবতা শিবকে কলুষিত করতে দ্বিধা করেনি।

প্রধান মঙ্গলকাব্যের একজন দেবী হলেন চণ্ডী। যার সঙ্গে বৌদ্ধদেবী একজটার সদৃশ ধরা পড়েছে। মঙ্গলকাব্যের দেবীচণ্ডী পশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজা পেয়েছে। কালকেতুর অত্যাচারে বনের পশুরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে, তারা দেবী চণ্ডীর কাছে গিয়ে এই দূরাবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে বলেন। তখন দেবী তার ভক্তদের বাঁচাতে গোধিকারূপ ধারণ করেছেন –

পশুগণে বর দিয়া উপায় চিন্তিলা।
সেইখানে সুবর্ণ-গোধিকা-রূপ- হইলা।।
কাঞ্চন জিনিয়া তনু দেখিতে সুন্দর।
হইলা গোধিকা-রূপ অতি মনোহর।।
পথে রহে চণ্ডী হইয়া সুবর্ণ-গোধিকা।
কালকেতু কাননে যাইতে পাব দেখা।।[১৬]

এখানে দেবী জৈনতীর্থঙ্কর ও বুদ্ধের মতো মানবদরদী হয়ে ধরা দিয়েছেন। জৈনধর্মে যে পঞ্চমহাব্রত-র উল্লেখ পাওয়া গেছে সেখানে অহিংসা নামক একটি ব্রতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেখানে বলা হয়েছে - গতিশীল এবং গতিহীন সমস্ত প্রকার জীবের প্রতিহিংসা থেকে বিরত থাকাকে অহিংসা বলা হয়। জৈনদের আদর্শ স্থাবর সকলের প্রাণ রক্ষা করা। জৈন সাধকেরা নিষ্ঠার সঙ্গে অহিংসাব্রত পালনের জন্য একখণ্ড বস্ত্র নাকে বেঁধে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ বর্জ্জন করে। শ্বাস-প্রশ্বাস চলার সময় বাতাসে ভাসমান কোন সূক্ষ্ম জীবের কোনভাবে যেন ক্ষতি না হয় সেইদিকে খেয়াল রেখে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তারা মনে করে যে কোনো নিকৃষ্টমানের জীবের মধ্যে লুকিয়ে থাকে মহৎ এবং বৃহৎ হওয়ার সম্ভাবনা। তারা মনে করে প্রত্যেক জীবের অন্যপ্রাণীর জীবনের প্রতি সদয়শীল হওয়া উচিত, সেইরূপ উপদেশ দেওয়া হয়েছে।[১৭] জৈন তীর্থঙ্করদের মতো গৌতমবুদ্ধ মানুষের উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বুদ্ধের দশোপদেশের মধ্যে প্রথম উপদেশ ছিল জীবহত্যা না করা। মঙ্গলকাব্যের দেবীচণ্ডীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জৈনতীর্থঙ্কর এবং বুদ্ধের সেই সুর বেজে উঠেছিল। বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে জানা যায় একদিন ভগবান বুদ্ধকে তার শিষ্যরা পশু হত্যার ফল জানতে চাইলে। তিনি তখন তার শিষ্যদের উদ্দেশ্য বলেছেন - একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পশুবধ করে চারশো নিরানব্বইবার জন্ম নিয়েছে এই পৃথিবীতে। প্রত্যেকবার তাঁর মস্তকছেদনের ফলেই মৃত্যু হয়েছে। পশুবধ করে কখনও কোন মানবের সদ্গতি হয় না। যদি কোন মানবের দ্বারা জীব অনিচ্ছাবশত প্রাণী বধ হয় তাহলে সেই কর্মের জন্য তাকে ক্লেশ পেতে হয়।[১৮] মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীদেবী তার আশ্রিত ভক্ত কালকেতুকে এই পাপ কাজ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছেন। চণ্ডীদেবীকে স্মরণকারী পশুদের প্রাণবিনাশের পথ থেকে রক্ষা করেছেন।

জৈনধর্মে ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বলা হয়েছে। এই ব্রহ্মচর্য শব্দের অর্থ বোঝাতে বলা হয়েছে সর্বপ্রকার কামনা নিরোধ করার কথা। জৈনরা বিশ্বাস করে সংযমী হলে মানুষের মন, বাক্য ও স্বর্গাদি কামনায়, অসংযমের প্রশ্রয় দানে অসংযম থেকে যায়। বাহ্যাভান্তরে স্থূল-সূক্ষ, ঐহ্যিক-পারত্রিক, সাক্ষাৎ ও অসাক্ষাৎ অসংযম দূর করা উচিত। জৈনদের এই কঠোর সংযমের উদাহরণ পাওয়া যায় বৌদ্ধদের আচরণের মধ্যে। *বুদ্ধচরিত*-এ উল্লিখিত রয়েছে মার বোধিসত্ত্বকে ব্রহ্মচর্য পালনের মধ্যে দিয়ে পুণ্য সঞ্চয়ের পথ দেখিয়েছে। গৌতমবুদ্ধ ভিক্ষুদের সাধাসিদে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের সংযমী হতে পথ দেখিয়েছেন। ভিক্ষুদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিস মনে করে আটটি জিনিস রাখতে বলেছেন। যথা - তিনটি বস্ত্রখণ্ড, একটি পাত্র, একটি সূচ, কোমরের একটি তাগা ও জল ছাঁকার একটি নেকড়া। এই বিষয়গুলির বাইরে অন্য কোন অতিরিক্ত বিষয় সঙ্গে বহন করতে বারণ করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। *ধম্মপদ* নামক গ্রন্থে ভগবান বুদ্ধ তার সংঘের ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বলেছেন - যে ব্যক্তি সংসারে থেকে হিংসা থেকে মুক্ত থাকেন। সবাইকে নিজের প্রিয় সন্তানের মতো স্নেহ করেন, নিজের দেহের এবং ইন্দ্রিয়ের ওপর সংযম রাখেন সেই ব্যক্তি অচ্যুত লাভ করেন। ভিক্ষুদের আহার, চলাফেরা এবং কথাবার্তায়ও সংযোমী হতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এই ব্রহ্মচর্য ধারণার ছায়াপাত লক্ষ করা গেছে। ধর্মমঙ্গলকাব্যের ধর্মদেবতার রূপাঙ্কনের ক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্য ধারণাকে জুরে দেওয়া হয়েছে -

ভক্ত আশা পূর্ণ হবে পাপ যাবে নাশ।
পুণ্যের প্রভাবে হবে পৃথিবী প্রকাশ।।
এত শুনি সানন্দে সবাই অনুগামী।
হাকন্দ নিকটে এল অখিলের স্বামী।।
সেইখানে রয় রথে যত দেবগণ।
ব্রহ্মচারী হলো হরি ব্রহ্ম সনাতন।।[১৯]

জৈনধর্মে মোক্ষের কথা বলা হয়েছে। তাদের মতে মানবজীবনের পরম লক্ষ হল মোক্ষলাভ করা। আক্ষরিক অর্থে ভাবতে গেলে দুঃখনিবৃত্তি হল মোক্ষ। জীব স্বভাবদুঃখী নয়, তারা সুখ অর্জন করতে গিয়ে দুঃখ অর্জন করে ফেলে। মানবজাতি পথভ্রষ্ট হয়ে দুঃখের সাগরে পতিত হয়। তারা স্বাভাবিক ঈশ্বরত্ব হারিয়ে ভবসাগরের চতুর্দিকে বিরামহীন দুঃখতরঙ্গের মধ্যে হা হুতাশ করতে থাকে। তাঁদের এই খারাপ অবস্থার জন্য দায়ী হয় আসলে নিজেরা। তাঁদের এই দীনতা আত্মকৃত ও পরকৃত নয়। মানবজাতিকে যদি সঠিক পথে পরিচালনা করা যায় তাহলে তারা এই দুঃখভূমি থেকে মুক্তি পেতে

পারে। এই সঠিক পথের নির্দেশ মেনে যারা এগিয়ে গেছে তারা মোক্ষ লাভ করেছে এবং তীর্থঙ্কর উপাধিতে ভূষিত হয়েছে।

একইভাবে বৌদ্ধধর্মেও মোক্ষ বা নির্বাণলাভের পথকে মনে রেখে এগিয়ে চলা হয়। গৌতমবুদ্ধ জানিয়েছেন এই পৃথিবীর মায়াজাল থেকে রেহাই পেতে হলে মুক্তির প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হউত। এই জন্য নির্বাণলাভের রাস্তাও মানুষকে দেখিয়েছেন। ধম্মপদের দু'শো ছাব্বিশ নম্বর পদে বর্ণনা করেছেন – যদি কোন ব্যক্তি সবসময় সজাগ থাকে, যারা রাতদিন নির্বাণলাভের প্রচেষ্টায় শিক্ষারত থাকে। যারা নির্বাণপ্রাপ্তির দিকে প্রযত্নশীল থাকে। এই সকল ব্যক্তিদের পৃথিবীর বাহ্যিক ক্লেশ কম হয়।[২০] মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের শরনার্থীরা তাদের উদ্দিষ্ট দেবতাদের কাছে এসেছে বিপদ থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায়। কালকেতু যখন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কারাগারে বন্দী হয়ে থাকে তখন সেই দেবীচণ্ডীর স্তব জপ করে। এই বন্ধন দশা থেকে মুক্তি পেতে চায়। তখন দেবীর গুণগান করে কালকেতু এইভাবে -

হস্ত যোড়ে করোঁ স্তুতি　　হরিষ হইয়া মতি
হিত কর হরের কামিনী।
হুহুঙ্কার দিয়া হানা　　হত কর নৃপসেনা
হিমগিরি রাজার নন্দিনী।।
ক্ষেমঙ্করী মুর্ত্তি ধরি　　ক্ষয় কর যথ অরি
ক্ষম দোষ অভয়া পার্ব্বতী।
ক্ষণে ক্ষণে প্রণমিয়া　　ক্ষিতি তলে লোটাইয়া
ক্ষয় কর দাসের দুর্গতি।।[২১]

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধ মুক্তিলাভের রাস্তা এইভাবে ধীরে ধীরে এসে মিলিত হয়েছে।

জৈনধর্মে পঞ্চমহাব্রত[২২]-র কথা জানা যায়, যেখানে একটি ব্রতের নাম হল অস্তেয় বা চৌর্য্য। এই অস্তেয়-এর অর্থ বোঝাতে বলা হয় যদি কোন ব্যক্তির ফেলে যাওয়া, ভুলে যাওয়া অথবা অপহৃত দ্রব্য জেনে ভোগ করা হয়। অন্যের দ্রব্য বিনা অনুমতিতে গ্রহণ না করা। অন্যকে চুরি করতে প্ররোচিত করে, আবার দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কম ওজন ব্যবহার করে ব্যক্তিকে ঠকানোর প্রচেষ্টা এই সমস্ত কিছু চৌর্য্যবৃত্তির নানারূপ। জৈনগৃহীকে এই সকল পরিত্যাগ করতে হবে। বুদ্ধ তার ধর্ম মধ্যে দশবিধ অশুভকে পরিহার করতে বলেছিলেন। যেগুলির মধ্যে দ্বিতীয় মতটি ছিল – অপহরণ না করা, অথবা বলপূবর্ক কাউকে কিছু থেকে বিরত না করে। সকলকে নিজের পরিশ্রমের ফল ভোগ করার সুযোগ করে দেওয়া।[২৩] মঙ্গলকাব্যের একজন শ্রেষ্ঠ অপ্রধান দেবী হলেন শীতলা। এই দেবীকে

ঘিরে লিখিত মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রভাব লক্ষ করা গেছে। শীতলাদেবীর সঙ্গে বৌদ্ধদেবী হারিতির সদৃশ রয়েছে। শীতলাদেবীর পূজার প্রথা বহুদিন থেকে চলে আসছে লৌকিক সমাজে। প্রামাণ্য হিসেবে কাশীর ঘাটের ওপরে শীতলামন্দিরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মন্দিরে প্রথমে পূজা দিয়ে পূন্যার্থীরা বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকে পা বাড়ায়।[২৪] তিব্বতে বৌদ্ধমন্দিরের পাশে এই হারিতি দেবীর মূর্তি রাখা থাকে। একদিকে যেমন হিন্দু-বৌদ্ধ এই দুইধর্মের দেবীর অবস্থান মনে করিয়ে দেয় - প্রথমে এই দুই দেবীকে পরিদর্শন করে, পূজার্চনা করে সন্তুষ্ট করতে পারলে। মূল মন্দিরের অভীষ্ট দেবতাদের দিকে যাত্রা করা যাবে এবং সেই যাত্রা সফল হবে। বৌদ্ধযক্ষিণী, যে পূর্বজন্মের তার তিনসন্তানের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে, পরবর্তী কয়েকজন্ম ধরে প্রতিহিংসা পরায়ণা যক্ষিণী হয়ে তার স্বপত্নীর সন্তানদের হত্যা করেছিল। শেষপর্যন্ত ভগবান বুদ্ধের সহায়তায় যক্ষিণী পুনরায় স্বাভাবিক রমণীর ন্যায় মাতৃত্বের স্বাদ গ্রহণ করেছে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজের ভুল সংশোধন করেছে। মঙ্গলকাব্যের ষষ্ঠীদেবীর কথা জানা যায়। এই দেবীর পূজার নৈবেদ্য খাওয়ার অপরাধে গৃহস্তের বাড়ির নববধূটির, সন্তানদের অপহরণ করেছে ষষ্ঠীদেবী। তার নিজের বাহন কালো বিড়ালকে দিয়ে।[২৫] এই দেবী তার ভুল বুঝতে পেরে, নববধূটির দোষ মাপ করে, তার সন্তানদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বুদ্ধ প্রণীত ধর্মের বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে। হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এই তিনধর্মের ধর্মীয় আচরণগুলি একই ভাবে শেষোক্ত মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এসে সম্মিলিত হয়েছে। শীতলা এবং ষষ্ঠী দেবীর চরিত্র গঠনে সাহায্য করেছে।

জৈনধর্মীয় মতে বিশ্বাস করে কর্মের গতি বা আস্রব মানব বন্ধন বাড়ায়। সংবর এনে দেয় মুক্তির রাস্তা। তাদের মতে আত্মা স্বরূপত মুক্ত এবং সেইসঙ্গে অনন্ত জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের অধিকারী হয়। কর্মের জন্য আত্মার বদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হয়। পূর্বজন্মে কৃতকর্মের ফলে ভোগ, লালসা, কামনা-বাসনার সৃষ্টি হয়। এই কামনা-বাসনার জন্য আত্মাকে দেহ ধারণ করতে হয়। এই দেহ ধারণ করে পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করে। বৌদ্ধধর্মের মধ্যেও কর্মফল লাভের পন্থাকে বিশ্বাস করা হয়েছে। বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে ভগবান বুদ্ধের বিগত বহু জন্মের কথা ও কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে কেবলমাত্র একজন্মের কৃতকর্ম দ্বারা কেউ সম্যকবুদ্ধ লাভ করতে পারে না। গৌতমবুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধাঙ্কুররূপে কোটিকল্পকাল ধরে পৃথিবীর নানাবিধ জীবন্ত প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করে।

পশু-পাখি-কীট-মানুষ-দেবতা প্রভৃতি নানাজাতীয় অসংখ্য যোনিতে জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করে। এই সকল জন্মেগুলিতে দান-মৈত্রী-আহিংসা প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা ক্রমান্বয়ে অমিত প্রজ্ঞা ও বিভূতি লাভ করে সম্যক বুদ্ধত্ব লাভ করে। বৌদ্ধরা এই অবস্থাকে অভিসম্বুদ্ধ অবস্থা বলে থাকে। এই অবস্থা থেকে বুদ্ধ জাতিস্মরতা লাভ করে নিজের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করে। এই সব পূর্বজন্মের কথা শিষ্যদের ধর্মোপদেশের মতো শোনাতেন। এভাবে তাদের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা নির্বাণের পথে নিয়ে যেতেন। জাতকের মধ্যে দেখা যায় বুদ্ধের জন্মান্তরের কাহিনি রয়েছে সম্পূর্ণরূপে। যেখানে দেবলোক থেকে শুরু করে মর্ত্যে এবং পাতালপুরী এই সকল স্থানেই বুদ্ধের আনাগোনার কথা উল্লিখিত রয়েছে। মঙ্গলকাব্যে এই জন্মান্তরের রীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন - চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর যে শিবপূজার ফুল কুড়িয়ে আনে, একদিন সে ফুল কুড়িয়ে আনার পর সে ফুলে মহেশ্বরের পূজা দেওয়া হয়। সেই ফুলের মধ্যে দেবী চণ্ডী পিপীলিকার ছদ্মবেশে লুক্কায়িত থাকে এবং যথাসময়ে শিবকে দংশন করে। এই পিপীলিকাযুক্ত ফুল তোলার অপরাধে শিব নীলাম্বরকে মর্ত্যে ব্যাধপুত্র কালকেতুরূপে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দেয় -

দেখিয়া হরের কোপ বলে পুরন্দর।
মোর দোষ নাহি পুষ্প তোলে নীলাম্বর।।
নীলাম্বরে জিজ্ঞাসা করেন শূলপাণি।
ভয় তেজি নীলাম্বর কহ সত্যবাণী।।
কহিল কুমার সত্য যে দেখিল বনে।
চন্দিকার সত্য কথা হর কৈল মনে।।
মোর সেবা ছাড়ি তুমি অন্য কর সাধ।
বসুমতী চল ঝাট হও গিয়া ব্যাধ।।[২৬]

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে স্বর্গের অপ্সরাদের মর্ত্যে জন্মগ্রহণের ছবি ধরা পড়ে। যেখানে - মনসামঙ্গলকাব্যে ঊষা ও অনিরুদ্ধের মর্ত্যে আগমন হয়েছিল দেবতাদের অভিশাপে নিজেদের কৃতকর্মের ফল খণ্ডন করতে। নীলাম্বরের সঙ্গে তার পত্নী ছায়াকে দেখা যায় তার স্বামীর একজন্মের কৃতকর্মের ফলভোগ করতে দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করেছে। পূর্বজন্মজাত কর্মফল ভোগের বিষয়টি এইভাবে প্রথমে জৈন পরে বৌদ্ধ অবশেষে মঙ্গলকাব্যের ভাবনার মধ্যে এসে অবস্থান করেছে।

মানবজাতি পৃথিবী সূচনার কাল থেকে তাঁদের থেকে বেশী শক্তিশালী জন্তু এবং অদৃশ্যশক্তিকে ভয় পেয়ে এসেছে। এই চেতন-অচেতন শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করে মানুষ এই ধারণাগুলিকে আরও মনের মধ্যে গ্রথিত করে রাখতে চেয়েছে। যেভাবনা থেকে মানুষের মধ্যে ইহকাল ও পরকালের

ভাবনার উৎপত্তি হয়েছে। মানুষ জন্মানোর পরে সহজ বোধবুদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মফল সম্পর্কে ভাবতে শিখেছে। এই ভাবনাগুলি স্থান-কাল-পরিবেশের কথা মাথায় রেখে পরবর্তীকালে জন্ম দিয়েছে ধর্মীয়বোধের। বলা যায় ধর্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্ট হতে পারে না। ধর্ম হল এমন একটি বিষয় যা বহুদিন চর্চার ফলে সর্বাঙ্গীণ হয়ে ধরা দেয়। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের আগমনের ফলে ধর্মেররূপ গঠনে খানিকটা বদল আসতে পারে মাত্র। ধর্মের মূল কথা একই থেকে যায়। ভারতবর্ষে প্রথমদিকে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রাধান্য থাকলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ওই দুই ধর্মীয়ভাবনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ *গীতা,* যাকে সর্বশাস্ত্রময়ী বলা হয়। এই গ্রন্থের মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মূল আদর্শগুলিকে কিছুটা পরিবর্তন করে নিজেদের মতো করে ভাষান্তরের মাধ্যমে দিয়ে টিকিয়ে রেখেছে। এই ধর্মীয়ভাবনার আদর্শগুলি ব্রাহ্মণ্যধর্মকে পুনরায় সজীব করে তুলেছিল। বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব এবং আদর্শগুলি ব্রাহ্মণ্যদের প্রচলিত ধর্মের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে যেতে দেখা যায়।[২৭] বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের লৌকিক ভাবনাগুলির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য লৌকিক ভাবনাগুলি যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছিল মঙ্গলকাব্যের ধারা। এই ধর্মগুলি পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক গঠন করে ফল্গুধারার ন্যায় জীবিত রয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন এই সমগ্র ধর্মীয়ভাবনাগুলির মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকের সাদৃশ্য অব্যাহত থাকতে দেখা গিয়েছিল।

৪. ২ মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈনভাবনার সামাজিক তাৎপর্য

জৈনধর্মের প্রসঙ্গে প্রথমে উঠে আসে প্রথম সারির চব্বিশজন তীর্থঙ্করের নাম। এই চব্বিশজন শ্রেষ্ঠ মানবের জীবনের ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল ধরে জৈনধর্মের অস্তিত্ব চলে আসছিল। প্রথমদিকে এই ধর্মের প্রভাব মগধ, কোসল, বিদেহ এবং অঙ্গ এই সকল রাজ্যগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষ করে মৌর্যযুগে ভারতবর্ষে জৈনদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্ম দ্বারা দীক্ষিত হয়েছিলেন। কলিঙ্গরাজ খারবেল ও জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন এমন প্রচলিত মত রয়েছে। প্রাচীন ভারতে যেকয়টি প্রতিবাদী ধর্ম গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে এই ধর্মটি সবথেকে বেশি হিন্দুধর্মের সঙ্গে আপস করে নিয়েছিল সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে। প্রথম স্তরে এই ধর্মমতটি কতকগুলি নৈতিকতার বিষয়কে সামনে রেখে এগোতে চেয়েছিল। হিন্দুধর্মের কিছু কিছু

মতাদর্শের বিরোধীতা করা থেকে বিরত থেকেছে। হিন্দুদের বিষয়গুলিকে নিজ ধর্ম মধ্যে গ্রহণ করেছে। জৈনধর্ম ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মের সামাজিক পরিবেশের মধ্যে মিশে যেতে থাকে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব পর্ব থেকে শুরু করে তাঁর ধর্ম প্রচারকালের মধ্যে স্বয়ং বুদ্ধের বাংলাদেশে প্রবেশের কথা সঠিকভাবে জানা যায় না। বাংলাদেশে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত মিথ এবং কিংবদন্তীর মধ্যে দিয়ে বঙ্গদেশে গৌতমবুদ্ধের ধর্মবাণী প্রচারেরর কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। শাক্যপুত্রের কপিলাবস্তুতে জন্ম হলেও ভারতবর্ষসহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। একসময়ে বৈদিক বিরোধী ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে খ্যাতি অর্জন করলেও। গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতি ও বর্ণাশ্রম পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। এই নতুন সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্যধর্ম নামে সমাজে পরিচিতি পেয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সমাজে স্তিমিত হতে থাকে। বিশেষ করে লৌকিক বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে এসে নিজেদের পূর্ব অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যসমাজে পেশা অনুযায়ী মোট চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। যথা - শাসকশ্রেণি, যাজক বা পুরোহিত শ্রেণি, সাধারণ শ্রেণি এবং আর্যগণের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন অনার্য অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণের মনুষ্যজাতি। এখানে এই প্রত্যেকটি শ্রেণি একে-অপরকে শোষণ করার অধিকার রাখত। এই অনার্য শ্রেণির ওপর প্রথম তিন শ্রেণির মানুষ একত্রে অধিকারবোধ চালাতে থাকে।[২৮] ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার শ্রেণির মানুষের বিভাজনে সমাজে জাতপাতের বিভাজন ভীষণ কঠোর নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ হতে থাকে। জৈন সন্ন্যাসীরা এই প্রাচীন সমাজের জাতিভেদ প্রথাকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করেছিল। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের প্রধান আকর্ষণ ছিল সর্ব ধর্মের লোকেদের কোন রকম বিভাজন না করে বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মের মধ্যে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে যে – অনুশীলন, আচার, ধর্মচর্চা ও সাধনার উপরে সকল আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্ভর করে। জন্মগত বা বর্ণগত কারণ এখানে কোনোরকম গুরুত্ব পায় না। সেই সময়ে ব্রাহ্মণগণ সমাজের উচ্চস্থানে থেকে প্রবল আধিপত্যের দ্বারা সমাজে উচ্চশ্রেণির স্থান দখল করে নিজেদের আর্থিক উন্নতিতে সদা ব্যস্ত থাকত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা রাজা ও প্রশাসনের আনুকূল্যে বা ভিক্ষাবৃত্তিতে যা কিছু উপার্জন করত তাঁর বৃহৎ অংশ বিহারের প্রয়োজনে দান করে থাকত। বৌদ্ধধর্মের উন্নতি অব্যাহত থাকলেও ভারতের কিছু

অংশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তখনও বেশ ছিল। গুহাচিত্রগুলি থেকে ধরা পড়ে মঠ বা চৈত্যগুলি ছিল লোকশিক্ষার আখর বা কেন্দ্র। বৌদ্ধধর্মের প্রধানশক্তি ছিল ভিক্ষুদের ব্যক্তিগত বিত্তহীনতা, ভিক্ষাবৃত্তি ও অকৃতদার জীবন। বড় বড় যেসকল প্রাচীর চিত্রাদি পাওয়া গেছে বিহার বা গুহাতে সেগুলি থেকে উঠে আসে যে - আধুনিকের চিত্র প্রদর্শনের মতো তখনও দেওয়ালে অঙ্কিত ছবি দেখিয়ে শ্রমণেরা পুরাণ, জাতক ও ধর্মের বাণী ব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মকে সহজ করে পৌঁছে দিত। কোন মহৎ প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠিত হতে যেমন দীর্ঘকাল সময় নেয়। সেই ধারণা বিনষ্ট হতে সময় নেয়। রাজশক্তির আশ্রয় হারালেও ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব স্তিমিত হতে সময় নিয়েছিল বিগত চার-পাঁচ শতক জুড়ে এই দীর্ঘ সময়কে। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল যার ফলে মানুষের মনে সামাজিক এবং রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক বোধ সঞ্চারিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের জনসাধারণের সমতার সঙ্গে গণতান্ত্রিক ভাবাবেগের বলিষ্ঠ জাগতিক প্রকাশ দেখা গেছে অষ্টম শতকের শেষের দিকে ভারতের পূর্বদেশে। পূর্বভারতে পালবংশের প্রতিষ্ঠা হয় গোপাল (৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) নামক রাজার হাতে, যিনি বৌদ্ধধর্মের রক্ষক ছিলেন। এই বংশের প্রতিপত্তিতে বৌদ্ধদের ক্ষমতা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল পূর্বদেশে। পূর্বদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বাড়তে থাকলে বৌদ্ধপ্রাপ্ত পুঁথির বেশিরভাগ অংশ পাওয়া যায় এই অঞ্চল গুলিতে। এখানে কিছু বিহার প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নালন্দা, যেখানে বিদ্যাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে চারুশিল্পের ও বেশ প্রতিপত্তির কথা জানিয়েছিলেন র্তাগ-দাম-ব্র্তান-গ্লিং-ছোস বৌদ্ধ বিহারে প্রতিষ্ঠাতা তারানাথ। তার *দ্পাল-কি্য-দুস-'খোরলো-'ই-ব্যুং-গ্যি-বেস্কার-ছোস-স্খো-ন্যের-খুংস* গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে।[২৯] এই গ্রন্থে তৎকালীন সমাজে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তির কথা বৃহৎ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেখান থেকে জানা যায় - বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জনসংহতি গড়ে উঠেছিল। রাজা হর্ষবর্ধনের সময় পর্যন্ত এই ধর্মের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখা গেছে এই ধর্মের সুফল সর্বধর্মসহিষ্ণুতা।

ক. সন্ন্যাসীদের সামাজিক কর্তব্য: জৈনধর্মের মূলে ছিল কিছু নৈতিক নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের ধর্মকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা। জৈনধর্মের অনুগামীরা নিজেদের ধর্মের কথা প্রচারের জন্য ভারতবর্ষের বাইরে তেমন প্রচেষ্টা করেনি বলে জৈনদের ইতিহাস থেকে জানা যায়। দেশের মধ্যে এই ধর্ম স্থায়ীভাবে নিজেদের ধর্মের ভিত মজবুত করে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে

জৈনধর্ম নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। জৈন সন্ন্যাসীরা নিজেদের নিয়মের মধ্যে প্রাচীন ভারতের সমাজে চলে আসা অন্যান্য ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করতে থাকে। বৈদিক সমাজের দেবতায়নকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (৩৪০-২৯৮ খ্রিস্টপূর্ব) রাজত্বকালে ভারতবর্ষে যে দুর্ভিক্ষের কথা জানা যায়। জৈনসন্ন্যাসী গঙ্গাতীর ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। জৈনধর্ম প্রধান দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। সেসময়ে মহাবীরের নিয়মকে ভদ্রবাহু কঠোরভাবে মেনে চলতে থাকে। তারা জৈনদের নগ্নতাকে সমর্থন করে। উত্তর ভারতে যেসকল জৈনরা অবস্থান করেছিল তাদের গুরু হিসেবে মেনে নিয়েছিল স্থূলভদ্রকে। যিনি মহাবীরের পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের অনুসরণ করেছিলেন।[৩০] জৈনধর্মে গৃহীদের মঙ্গলের কথা অন্যান্য ধর্মের তুলনায় বেশি পরিমাণে ভাবনার মধ্যে রাখা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রথমদিকের বেশিরভাগ বৌদ্ধ ধর্মানুসারীরা ছিল গৃহী মানুষ। ধীরে ধীরে বৌদ্ধভিক্ষুরা মানুষকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে উৎসাহী করে তুলেছিল। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ত্যাগের কথা এই ধর্মকে আরও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে পৌঁছে দিয়েছিল। গৌতমবুদ্ধ চেয়েছিলেন শ্রমণদের নিয়ে সংঘ গড়ে তুলতে, পরবর্তীকালে নারীদের জন্য একটি সংঘ নির্মাণ করেছিলেন। বুদ্ধের সংঘে উচ্চনীচ, ধনীদরিদ্র সকল স্তরের মানুষকে একত্রে সংঘে স্থান দিয়ে তৎকালীন সমাজে অন্যরকম দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিলেন। সমাজের মঙ্গলকামনা করে বুদ্ধ তার ধর্মের মধ্যে বিবাহের কোন স্থান ছিল না।[৩১] গৌতমবুদ্ধ নিকায়ে গৃহীদের জন্য কিছু বাণী উল্লেখ করে গেছেন। যেখানে করনীয় দৈনিক কার্যাবলীর উল্লেখ করা হয়েছিল। *সিঙ্গালোকত্তবাদ সূত্র* নামক গ্রন্থে যেগুলি বৌদ্ধদের গৃহীবিনয় নামে পরিচিত। এখানে গৃহী জীবনে পালনীয় নির্দেশাবলী পাওয়া যায়। বৌদ্ধ গৃহীরা এই ধর্মে দীক্ষিত হলে তারা উপাসক-উপাসিকা নামে পরিচিতি পেত। এই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ত্রিশরণ[৩২]-এর শরণাপন্ন হয়, পঞ্চশীল[৩৩] পালন করে, উপোসথ দিনে ধর্মকথা শ্রবণ করে, ভিক্ষুদের চীবর প্রদান করে। বিহার নির্মানে ও বিহারের যে কোনো কাজে সাহায্য করে, চারটি পুণ্যস্থান[৩৪] ও বুদ্ধের অস্থিসম্বলিত স্তূপ পরিদর্শন করা, এই সমস্ত কর্মগুলি তারা পালন করে থাকে। বৌদ্ধ বিহারগুলি সমাজের উন্নতি সাধনে ব্যবহৃত হতে থাকে। বৌদ্ধধর্মে গৃহীদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়েছে। তাদের আগমনের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মে

দেবতায়নের প্রবেশ ঘটে। তাদের আগমনে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পূজাপদ্ধতি, ক্রিয়াকর্ম, আচার ও অনুষ্ঠানাদি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। মূল বৌদ্ধধর্ম লৌকিকধর্মের সঙ্গে মিশতে থাকে –

> বৌদ্ধ ও হিন্দুদের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে সেদেশে বৌদ্ধধর্মের গণ্ডীর ভিতরে তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ লাভ করিয়াছে। হিন্দুদিগের যে ধর্ম প্রণালী সর্বাপেক্ষা আধুনিক, নেপালী বৌদ্ধেরা সেই তান্ত্রিক পদ্ধতি নিজ ধর্ম মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইঁহারা শিব শক্তি গণেশ, কুমার ভৈরব হনুমান, রুদ্র মহারুদ্র, মহাকাল মহাকালী, অজিতা অপরাজিতা, উমা জয়া চণ্ডী,ত্রিদশেশ্বরী, ইন্দ্রী কপালিনী কম্বোজিনী, ঘোরী ঘোররূপ মহারূপা, মালিনী কপালমালা, খট্টাঙ্গা পরশুহস্তা বজ্রহস্তা, মাতৃকা যোগিনী পঞ্চডাকিনী, ডাকিনী যজ্ঞ গন্ধর্ব গৃহদেবতা, ভূত পিচাশ দৈত্য প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত দেবদেবীগণকে স্ব-সম্প্রদায়ের স্থান দান করিয়াছেন। কেবল দেবাদি গ্রহণ করিয়া নিরস্ত হন নাই, তন্ত্র শাস্ত্রের মন্ত্রাদি এবং সাঙ্কেতিক আঁকজোঁকও গ্রহণ করিয়াছেন।[৩৫]

নেপালে এই তান্ত্রিকমতের আদিগুরু ছিলেন পেশোয়ার-নিবাসী অসঙ্গ নামধারী একজন সাধক। এই তন্ত্রগুলিতে যেসকল দেবদেবীর ভাবনার উদয় হয়েছিল সেগুলি বহুকাল ধরে বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে সহাবস্থানের ফলে অন্যধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিল। তুর্কী আক্রোমণোত্তর বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তিকে স্বীকার করে নিয়ে। বৌদ্ধ ও লৌকিক জনজীবনের সমন্বয়ে সংঘটিত সংস্কার, বিশ্বাস, পূজার্চনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দন জানিয়েছিল। বৌদ্ধ মহাযান শাখার মধ্যে দেবতাদের প্রবেশ ঘটতে থাকে। বৌদ্ধদেবী প্রজ্ঞাপারমিতা যাকে বোধিসত্ত্বের সকল গুণাবলীর মূর্তরূপ হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। হিন্দুধর্মের সংস্পর্শে এসে বুদ্ধের পত্নী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে এই প্রজ্ঞাপারমিতা দেবীকে।[৩৬] বৌদ্ধ ও লৌকিকধর্মের যৌথ মূর্তিধারী দেবদেবী যারা ছিলেন। তারা আর্য আভিজাত্যে মণ্ডিত হয়ে ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। তুর্কীদের অত্যাচারের দু'শো বছর পরে দেখা যায় বৌদ্ধধর্ম আলাদা করে তেমন আর বাংলাদেশে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনি। এই দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে পুরনো বৌদ্ধধর্মের অবসানে যে নতুন ব্রাহ্মণ্যধর্ম এসেছিল। সেখানে দেখা যায় নতুন ধর্মের হাত ধরে নতুন সমাজ ব্যবস্থা এসে ধরা দিয়েছে। নতুন সমাজে অর্থাৎ প্রাচীন যুগের পর আগত নব্যমধ্যযুগ যেখানে নব আবির্ভুতা দেবদেবী বিষয়ক মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে এই দৃষ্টান্তকে তুলে ধরেছে। এই দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে ভক্তরা নিজেদের অঙ্গ কেটে দিয়ে দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে। বিনিময়ে আরাধ্য দেবতা ভক্তকেও যে কোনো বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য নেমে এসেছে বাস্তবের মাটিতে। ধর্মমঙ্গলকাব্যে পশ্চিম উদয় পালা যেখানে ভক্ত সন্ন্যাসীদের দেখা যায় নিজের কর্ম দেবতার হাতে সম্পন্ন করতে অপেক্ষা করেছে। ভক্তরূপী সন্ন্যাসীরা ধুলায় লুটিয়ে পড়ে নিজেদের জীবন ত্যাগ করেছে। দেবতা এসে ভক্তদের উদ্দেশ্য সাধন করেছে -

পশ্চিম উদয় দিল ভকতবৎসল।
যে জন দেখিল তার চতুর্বর্গ ফল।।
একই মনেতে যেবা করয়ে বিশ্বাস।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয় শত্রু যায় নাশ।।
ব্রাহ্মণে শুনিলে হয় বেদে বিশারদ।
ভূপতি শুনিলে রাজ্য করে নিরাপদ।।[৩৭]

এখানে জাতপাতের বিভাজন করে বলা হয়েছে শূদ্র, বৈশ্য এবং মহিলারা একই দেবতার গুণগান ভক্তিসহকারে শুনলেও তাদের পুণ্যলাভের ফলাফল বিভিন্ন হয়ে থাকে।

খ. জাতকর্ম: জৈনধর্মের মধ্যে মানব শিশু জন্মকালে কিছু মেয়েলি আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। জৈনরা বিশ্বাস করে পিতা-মাতার কাছ থেকে আমরা যে দেহ ধারণ করি সেটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। আমাদের প্রাক্তন কর্মফল হিসেবে মানব কেমন শরীর ধারণ করবে সেগুলি নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে পূর্ব থেকে। আয়ুষ্কাল কতখানি হবে এবং বর্ণ কেমন হবে সেটাও মানবের দ্বারা ঘটে যাওয়া পূর্বের কর্মফল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।[৩৮] তারা শিশু জন্মগ্রহণ করলে লোকায়ত কিছু কর্মের মাধ্যমে নবজাত শিশুর সম্বর্ধনা করে থাকে। বৌদ্ধগৃহীরা নবজাত সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সেই সন্তানকে অভ্যর্থনা জানাতে বাড়ির মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানায়। এই উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে গৃহী তাঁর প্রতিবেশীদের কাছে সুখবর পৌঁছে দিয়ে থাকে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে নবজাত শিশু এবং তার মা উভয়কে পরিষ্কার জলে ধুয়ে স্নান করানো হয়। প্রসূতির গৃহে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। সাতদিন সন্তানসহ মাতা ঔশচ পালন করে এবং সপ্তম দিনে শিশুটির মাথা কামানো হয় এরপরে তাদের শুদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়। বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থে দেখা যায় স্বয়ং বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব লাভের পূর্বে পূর্বজন্মের কর্মফলের জন্য বারবার ভিন্ন প্রাণীর রূপধারণ করে জন্মগ্রহণ করেছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের ন্যায় কিছু লোকাচার পালন করে থাকে। যেমন - চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে কালকেতুর জন্মগ্রহণের সময়ে সূতিকাগৃহে আগুন জ্বেলে রাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। *পদ্মপুরাণ*-এ লখিন্দরের জন্মগ্রহণের অংশটি এইরূপ -

স্নান করাইয়া জলে মাঠুর মাথায়ে তৈল ডালে
জয়ে ধ্বনি দিল সর্ব্বজন।
দেখিয়া পুত্রের মুখ সোনকার বড় সুখ
বাজে সব বিবিধ বাজন।।
তেউর মৃদগা বাজে আনন্দিত সর্ব্ব রাজ্যে
হইল পুত্র চান্দো ভাগ্যবান।

ঢাক ঢোল বাজে কাড়া   সর্ব্ব রাজ্য পাইল সাড়া
শুনিয়া আনন্দ সর্ব্বজন।।
শিঙ্গা ডম্ভুর বাজে   সুমধুর দেব রাজে
ঝাজর বাজয়ে ঘন ঘন।
গাইনেতে গীত গায়ে   সুললিত শুনি তায়ে
নর্ত্তকীয়ে নাচে আর গায়ে।।[৩৯]

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মগুলিতে গৃহীরা জাতকর্ম হিসেবে যেসকল লোকাচার পালন করে থাকে। সেগুলির মধ্যে কিছু পরবর্তীকালের মঙ্গলকাব্যের সমাজব্যবস্থার মধ্যে লুকায়িত রয়ে গেছে।

গ. বিবাহ: জৈনদের বিবাহের সময়ে বেশ কিছু আচার পালন করা হয়ে থাকে। জৈন বিবাহ সংস্কার-বিধি নামক গ্রন্থে জৈনদের বিবাহের পূর্বে, বিবাহকালে এবং বিবাহের পরবর্তীকালের সংস্কার সম্পর্কে বৃহৎ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে বিবাহের জন্য পাত্র ও পাত্রীর বয়স হবে যথাক্রমে কুড়ি এবং ষোলো। জৈনরা বিবাহের পূর্বে পাত্র এবং পাত্রী দুই পরিবারের সদস্যরা একত্রে বসে বিবাহ সংক্রান্ত সমস্ত রকমের আলোচনা করে থাকে। জৈনদের বিবাহে কন্যাকে পণ দেওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে। বিবাহের জন্য একটি বেদি সাজানো হয়, এবং পাত্র পাত্রীর বাড়ির দরজা পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে আসে। পাত্রীর পিতা কন্যা সম্প্রদান করে, বিবাহ স্থলে উভয়ের গোত্র ভীষণ গুরুত্ব রাখে। বিবাহ আসরে পরস্পর একে-অপরের মুখদর্শন করে। আগুনকে সাক্ষী রেখে একে-অপরের হাত ধরে আগুনকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে সপ্তপদী নামক বিবাহচার পালন করে। বিবাহ সম্পন্ন হলে গুরুজনেরা তাদের আশীর্বাদ করে থাকে। অবশেষে কন্যাটি তাঁর স্বামীর গৃহ উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়। বিবাহের সময়ে দেখা গেছে বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে কিছু আচার প্রায় একরকমভাবে পালন করা হয়ে থাকে। বৌদ্ধদের বিবাহ ও কয়েকটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। বৌদ্ধদের সমাজে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকে। তাদের মতামত পর্ব চুকে গেলে দুই পক্ষের সম্মতিতে একটা ছোট ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাত্র-পাত্রীকে আশীর্বাদ করে। তারপর বিবাহ নামক শুভকর্মের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে থাকে। এই বৌদ্ধদের মধ্যে গোত্র বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। হিন্দুদের মধ্যে এই রীতির কিছুটা সংরক্ষিত হতে দেখা গেছে। যেখানে বিবাহ মণ্ডপে পাত্র-পাত্রীকে স্বগোত্রের হতে দেখা গেছে। মঙ্গলকাব্যে প্রাপ্ত কিছু রীতির উদাহরণ হল -

সর্ববথা আমার পুত্রে কন্যা দেহ দান। তুমি আমি দুঁহে এক ইথে নাহিয়ান।।
সায় সদাগর বলে শুনহ বেহাই। তোমা আমি কুটুম্বিতা কত ভাগ্যে পাই।।
সায়বান্যা সহিত ঘটক জনার্দনে। বিভার নির্ণয় লগ্ন করে সেইখানে।।

পুত্রের সম্বন্ধ করা চাঁদ সদাগর। পরম হরিষে তবে গেল নিজ ঘর।
আসিয়া যতেক কথা সনকারে কয়। লখাই সম্বন্ধ আমি করিলুঁ নির্ণয়।[৪০]

হিন্দুরা এখনও বৌদ্ধদের মতো জ্যৈষ্ঠ মাসে বাড়ির সবথেকে বড় সন্তান বা জৈষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিতে কিছুটা দ্বিধা বোধ করে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলিতে আরও নানাবিধ বিবাহের জন্য প্রযোজ্য নিয়মাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। যেগুলির মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈনদের নিয়মের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে এগিয়ে চলেছে।

ঘ. গুরুর ভূমিকা: হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে যেসকল স্থানে ধর্মীয় গুরুদের উপস্থিতির কথা জানা যায়। সেই স্থানগুলিতে দেখা যায় এই সকল গুরুরা ধর্মীয় কার্যাবলী ছাড়া সামাজিক বিশেষ কিছু কাজে নিজেদের যুক্ত রেখে সমাজের উন্নতির চিন্তাসাধন করেছে। জৈনদের ধর্মগুরুরা *পঞ্চমহাব্রত*-এর মধ্যে যে পাঁচটি নীতির সমাহার ঘটিয়েছে। সেখানে দেখা যায় তারা মানুষকে সমাজে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য কিছু সুশিক্ষামূলক নীতিকে একত্রে সংঘবদ্ধ করেছে। যেমন - এখানে বলা হয়েছে হিংসা থেকে দূরে থাকার কথা, সর্বদা সত্য কথা বলা। জৈনগুরুরা অর্হৎদের জন্য এইসকল কঠিন নিয়ম কানুন চালু করলেও গৃহী জৈনদের জন্য রীতিগুলিকে কিছুটা লাঘব করেছে। গৃহীদের মুক্তিলাভের জন্য ত্রিরত্নের কথা উল্লেখ করেছ। জৈনগৃহীরা গৃহে থেকে যাতে নিজের মুক্তিলাভের কথা চিন্তা করতে পারে সেইদিকে নজর রেখেছে। বৌদ্ধধর্মে গুরুকে দেখা যায় সর্বদা বৌদ্ধগৃহীদের মঙ্গলার্থে চিন্তিত থেকেছে। বৌদ্ধধর্মে গুরুর প্রাধান্য ছিল। গুরুর সাহায্য তারা জীবনে চলার পথ অনুসন্ধান করত। চর্যাপদ গ্রন্থের পদ মধ্যে এরূপ উল্লিখিত রয়েছে -

দিঢ় করিও পরিমাণ। লুই ভণই গুরু পুচ্ছিআ জাণ।
সঅল সমাহিঅ কাহি করঅই। সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিআই।।[৪১]

বৌদ্ধ সংঘগুলিতে গুরুরা শিষ্যদের সমুখে সকল জীবের কল্যানার্থে দীর্ঘ ধর্মকথা আলোচনা করত। বুদ্ধ তার ধর্মকথা ভারতবর্ষসহ দেশের বাইরে প্রচারের জন্য উৎসাহী করে তুলতে থাকে। বুদ্ধ তার সংঘের ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে এইরূপ নির্দেশ দেন – মানুষের মঙ্গল এবং সুখের জন্য পৃথিবীর চারিদিকে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে হবে। একই রাস্তায় দুজন ভিক্ষুর যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় যাত্রা শুরু করলে অল্প সময়ে বৌদ্ধ ধর্মকথা বেশি বিস্তৃতি লাভ করতে পারবে এইরূপ সম্ভাবনার কথা অনুমান করা হয়েছিল। ভিক্ষা গ্রহণকালে ভিক্ষুরা গৃহীদের দার্শনিক শিক্ষা দান করত। বৌদ্ধগুরুরা মানুষের মন থেকে বিবাদ, কলহ, হিংসাবুদ্ধি এই সমস্ত কিছুকে দূরে সরিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়ে থাকত। বৌদ্ধগুরুদের এইসকল সামাজিক উন্নতিমূলক কার্যকলাপ তাঁদেরকে সমাজে আরও

সম্মানীয় করে তুলেছিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই গুরুর প্রভাব দেখা গেলে, এখানে ব্যক্তি নিজ কল্পনা ও বিশ্বাস দ্বারা দেবতার মূর্তি নির্মাণ করে। এই কল্পিত দেবতাকে সামনে রেখে নিজেদের ইষ্টসাধনে নিমজ্জিত হয়। বৌদ্ধগুরুদের বাসস্থান ছিল মর্ত্যে কিন্তু হিন্দুদের দেবতাদের বিচরণের স্থান ছিল স্বর্গে। তারা ভক্তের ডাকে মাটিতে নেমে আসে। মানুষ জাগতিক বিষয় এবং সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে এই দেবতাদের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। প্রাচীনকালে মানুষের আয়ত্তের বাইরে সকল ঘটনাকে অশরীরী বলে মনে করে থাকে। এই সমস্ত কিছুর সংরক্ষণ ক্ষমতায় কোনো কল্পিত মূর্তি স্থাপন করে চলে। মঙ্গলকাব্য রচয়িতারা নিজেদের সমাজে এইরূপ ভয়ঙ্কর জন্তু এবং মরণদায়ী রোগগুলিকে বিবিধ দেবীরূপের পূজা করতে শুরু করে। যার কিছু উদাহরণ মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ধরে রাখা হয়েছিল। যেমন - বসন্তরোগের হাত থেকে রেহাই পেতে কল্পনা করা হয়েছিল দেবী শীতলার –

প্রণমহো শীতলাই তোমার মহিমা গাই।
ব্রনমাই ব্রহ্মার তনয়া
কে জানে তোমার স্তুতি তুমি স্বর্গ তুমি খিতি
শরণাগতের কর দয়া।[৪২]

এই দেবী চৌষট্টি বসন্তের অধিষ্ঠাত্রীদেবী। যিনি নিজের পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে, প্রথমে এই রোগ মানুষের মধ্যে বিস্তার করেন। নিজ পূজালাভ করার পর আবার মানুষের মধ্যে থেকে এই রোগ তুলে নিয়েছেন। এমনটা মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখানো হয়েছে। শেষে মানুষকে সমাজের মধ্যে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার আর্শীবাণী করেছেন। দেবতার দেওয়া নিয়মাবলী মানুষ গুরুর বচনের ন্যায় নিজেদের মঙ্গলার্থে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। সকল ধর্মের মানুষেরা তাদের কল্পিত ধর্মগুরুকে নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবনের পথ প্রদর্শক বলে মনে করেছে।

ঙ. বাণিজ্যযাত্রা: ভারতের অর্থনীতি ব্যবস্থায় জৈনদের অবদান ছিল যথেষ্ট প্রশংসনীয়। জৈনধর্মে সর্বদা বাণিজ্যিক গুণাবলীকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রাচীনকালে সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। জৈনধর্মের প্রবক্তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছেন তাদের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে জৈনধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল। জৈনধর্মে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রাখা হলে, শিল্পজাত দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে এই সকল নিয়মগুলি প্রযোজ্য ছিল না। পশ্চিম উপকূলের সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং তৎসংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশেষ আকর্ষণ দেখানো হয়েছিল।[৪৩] বৈদিক ধর্মগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ধর্ম হিসেবে গড়ে ওঠা এই

বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে যথেষ্ট জোড়ালো যুক্তি দেওয়ার নিদর্শন পাওয়া গেছে। বৌদ্ধ চর্যাপদ গ্রন্থে কামলিকার পদে বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায় -

সোনে ভরিতী করুণা নাবী। রূপ থোই নাহিক ঠাবী
বাহতু কামলি গঅণউবেসেঁ। গেলী জাম বহুড়ই কইসেঁ
খুণ্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছী। বাহতু কামলি সদগুরু পুচ্ছী
মাঙ্গত চড়িলে চউদিস চাহঅ। কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ
বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাগা। বাটত মিলিল মহাসুহসঙ্গা।[৪৪]

চর্যাপদকে কেন্দ্র করে যেই সকল উপন্যাস লিখিত হয়েছিল সেখানে দেখা যায় ভুসুকুপাদ বাণিজ্যে যাওয়ার কথা দীর্ঘভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে উল্লিখিত রয়েছে - ভুসুকু পত্নী সুলেখা শহরে যাওয়ার পথে দেশাখকে সে বলে যেন তার দাদা ভুসুকুর খবর এনে দেয়। দীর্ঘদিন হল ভুসুকু বাণিজ্যের জন্য গৃহ ছাড়লেও সে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। যাদের নৌকায় ভুসুকু বাণিজ্যে করতে গেছে কিন্তু কেউ জানেনা তারা কবে ফিরবে। তাদের মানুষেরাও জানে না বাণিজ্যের নৌকা কবে ফিরে আসবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মানুষের নৈতিকতার বিষয়ে সচেতন হতে উৎসাহ দিয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনা যথেষ্ট স্পষ্ট ভাবে দেওয়া হয়েছে। কেননা সেইসময়ে সমাজের যারা বাণিজ্যে যেত তাদের সমাজে উঁচুস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে দেখা হত। মনসামঙ্গলকাব্যে রয়েছে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যবর্ণনা –

সনকার বোলে রোষ চাঁদ সদাগর। অবশ্য সফর যাব চড্যা মধুকর।।
নানা দ্রব্য নানা ভক্ষ্য লয় মিঠা জল। যুঝার গাড়র লয়, তেলেঙ্গা ছাগল।।
পর্ব্বতিয়া তাজী নিল শিকারী সয়চান। তবক বেলক নিল কামান কৃপাণ।।
নায় বস্যা গীত গায় গাঠ্যার গাবর। শুভক্ষণে যাত্রা করে চাঁদ সদাগর।।
...　　...　　...
চাঁদ সদাগর সপ্ত ডিঙ্গার ঠাকুর। নবখণ্ড এড়াইয়া গেল বহুদূর।।
বুদ্ধের কাণ্ডার বাহে বাঁকা দামোদর। বর্দ্ধমান এড়াইয়া চলিল সত্বর।।[৪৫]

বেদবিরোধী ধর্মগুলির ন্যায় মঙ্গলকাব্যে সমাজের উন্নতির কথা ভেবে বাণিজ্যের বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

চ. কৃষিকাজ: জৈনধর্মে অহিংসার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। কৃষকশ্রেণী এই ধর্মের মধ্যে খুব একটা প্রবেশের অধিকার পায়নি। কৃষিকার্যের সময় অনেক কীটপতঙ্গের প্রাণনাশ হয়ে থাকে অনিচ্ছাকৃত ভাবে হলেও, এই কাজে পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, বনস্পতি ও এস এই ছয় প্রকার জীবের সংহার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। লাঙল চাষের সময় মাটিজাত সুক্ষ প্রাণীর মৃত্যু প্রাণনাশ হয়ে

থাকে। চাল, ডাল সেদ্ধ করার সময় কিছু বনস্পতিকায়, অপকায়, অগ্নিকায় ও বায়ুকায় এই জাতীয় প্রাণনাশ হয়ে থাকে। প্রথম দিকে কিছু জৈন অর্হতরা অগ্নি সংযোগে তৈরি খাবারকে গ্রহণ করত না অজান্তে প্রাণনাশের ভয়ে। পরবর্তীতে জৈন শ্রবণরা আগুন দ্বারা রান্না করা খাবার গ্রহণ করে থাকে।[৪৬] জৈনধর্মের ইতিহাসে দেখা যায় মহেঞ্জোদারো সভ্যতার খননকার্য থেকে পশুপতি নামক পুরুষমূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই মূর্তিটি জৈনধর্মের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ-এর মূর্তি বলে অনুমান করেছে জৈনরা। এই চিত্রের মধ্যে কৃষিজাত উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা গৌতমবুদ্ধ ছিলেন শাক্য পুত্র। শাক্যদের প্রধান পেশা ছিল কৃষিকাজ। জাতকের নিদানকথায় শুদ্ধোধনকে মহারাজা বলা হয়েছে। এখানে সেকালের চাষবাসের বর্ণনা পাওয়া গেছে, যথা - তাদের বীজবপনের উৎসব হত। সেদিন দেবতাদের উদ্দেশ্য শহরটি সাজিয়ে তোলা হত। বাড়ির সকল লোকেরা তখন নতুন পোশাক পরিধান করে নবসাজে সজ্জিত হত। রাজা শুদ্ধোধনের এক হাজার লাঙল চলত। ওই বীজোৎসবের দিন বলদের জোয়াল সোনালিপাত দিয়ে মোড়া হয়ে থাকে। রাজা শুদ্ধোধন নিজেও চাষবাস করতেন। গৌতমবুদ্ধ চাষবাসের ক্ষেত্রে সর্বদা উৎসাহ দিয়েছিলেন। গৌতমবুদ্ধ চাষের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক নৈতিকতাকে যুক্ত করে কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হতে বলেছেন।[৪৭] কৃষিকাজের ক্ষেত্রে নৈতিকতাকে জুড়ে দিয়ে বলেছেন যদি কোনো ব্যক্তি চাষের ক্ষেতে বীজ বপন করে। অন্য কোনো ব্যক্তি শস্য কেটে নিয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে চাষকারী ব্যক্তির ক্ষতি হতে পারে। সমাজে বিশৃঙ্খলা শুরু হতে পারে। বুদ্ধ কৃষিকাজের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতাকে জুড়ে দিয়েছে, শ্রদ্ধার বীজ বপন করে আধ্যাত্মিক চাষ করতে বলেছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে এরূপ চাষের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে বারংবার। যেমন কালকেতু গুজরাট নগর পত্তন করে বুলান মণ্ডলকে নগরে বসার অনুমতি দেয়। বলে ইচ্ছে মত চাষচষার জন্য। ইচ্ছে মত চাষ করতে পারলে মানুষের জীবিকা নির্বাহে সুবিধা হতে পারে এমনটা অনুমান করা হয়েছিল। চর্যাপদে চাষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দুধর্মের আদিদেবতা শিবের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের কবিরা চাষের সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছেন। যে শিব হিন্দুদের ঘরে ঘরে পূজিত হয় দেবতার আসনে বসে। সেই দেবতার হাতে মধ্যযুগের কবিরা লাঙলের ফলা তুলে দিয়েছিলেন -

দিন সাত বরষিয়া দিলেক ঈশানে।
হৈল হাল-প্রবাহ শিবের শুভক্ষণে।।
আরম্ভে উগাল্যা গেল একশত কুড়া।
পড়্যা গেল পাড় যেন পর্ব্বতের চূড়া।।

দুদণ্ডে ছাড়িয়া হাল হাল্যা গেল ঘরে।
বান্ধ আলি বৈকালে বান্ধিল একপরে।।
চোট মার্য্যা হুহুঙ্কারে হালিয়া তুলে চাপ।
শঙ্কর সাবাসি দেন ভেলা মোর বাপ।।[৪৮]

এই মঙ্গলকাব্যে আরও দেখা যায় এরপর চৈত্রমাসে শিব চাষ সম্পূর্ণ করে। চাষের জমি তৈরি করার রীতি, বীজ বোনার পদ্ধতি যথাযোগ্যভাবে বর্ণনা করে সেসমাজে চাষব্যবস্থার ছবি তুলে ধরেছেন।

ছ. সমাজের আইন-কানুন: পৃথিবী সৃষ্টির মূহুর্তকাল থেকে প্রথম যখন মানুষের উদ্ভব হয়েছিল তখন মানুষ একলা বাস করত। যখন মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে একসঙ্গে বসবাস করতে শুরু করে। সেসময় থেকে তারা কিছু অলিখিত নিয়ম-কানুন তৈরি করে। এই নিয়মাবলী লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। জৈনধর্মে তেমনি কিছু নৈতিক নিয়মাবলীর কথা বলা হয়েছে। কোনো ব্যক্তির ফেলে যাওয়া, ভুলে যাওয়া বা অপহৃত দ্রব্য জেনে ভোগ করা। অন্যকে চুরি করতে প্ররোচিত করা এমনকি দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের সময় কম ওজন ব্যবহার করা এই সমস্ত কিছু চৌর্যবৃত্তির মধ্যে ধরা হয়। এগুলিকে জৈননীতিতে সমগ্রভাবে দূরে সরিয়ে রাখার কথা বলা হয়েছে।[৪৯] বৌদ্ধ সমাজব্যবস্থায় ও এইরূপ কিছু নিয়মাবলীর উল্লেখ পাওয়া গেছে। যেখানে সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। চর্যাপদে দেখা যায় ভুসুকুপাদের বাণিজ্যযাত্রার সঙ্গে জলদস্যুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে দেশাখ মনে করিয়ে দিয়েছে সেকালের নৌকাপথে জলদস্যুর ভয় ছিল। এই জলদস্যুরা মানুষকে হত্যা করে তাদের সকল সম্পত্তি হরণ করে নিত। বাড়িতে চুরি হলে নগর প্রতিনিধির কাছে নালিশ জানানোর ছবিও চর্যাপদে ধরা পড়েছে। সম্রাট অশোক তার রাজ্যকে সুস্থ ভাবে পরিচালনা করার জন্য বেশ কিছু নীতি গ্রহণ করেছিলেন। রাজকার্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন স্তরে বেশ কিছু লোক নিয়োগ করেছিলেন। অশোকের তৃতীয় মুখ্য গিরিশাষণে জানা যায় সমাজের সর্বস্তরে খোঁজখবর রাখার জন্য তিনি পরিষদ নামক একদল সংস্থা গঠন করেছিলেন। যারা রাজার নির্দেশ মন্ত্রী মহোদয়গণের কাছে পৌঁছে দেওয়া, দূরের বা কাছের রাজ কর্মচারীদের কাছে রাজার নির্দেশ পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে থাকত। এই পরিষদবর্গ রাজা এবং অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রেখে চলত। প্রতিবেদক নামক একশ্রেণির রাজ কর্মচারী যারা প্রজাদের মঙ্গল-অমঙ্গলের খবর দ্রুত এসে রাজার কাছে পেশ করত।[৫০] সমাজে অনৈতিক কর্মরত ব্যক্তির কঠোর শাস্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সমাজের অনৈতিক ব্যক্তিদের জন্য কিছু কঠোর

ব্যবস্থা নেওয়ার ছবি ধরা পড়েছে। যেখানে কনকরচিত বারি চুরির অপবাদে ধীবর পুত্রকে, রাজার কাছে ধরে নিয়ে যায় কোটাল। দৃশ্যটি এরূপ –

দেখিয়া কোটাল বড় কুপিত হইল   তর্জন গর্জন করি কহিতে লাগিল।
কনকমুণ্ডিত বারি দেখি জে কাহার   কেমনে পাইলে বারি কহ ত সর্ত্তর।
এতেক কোটাল শুনি হইল কোপীত   রাজারে কহিয়া দিব ফল সমচিত।[৫১]

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে দেখা গেছে ভারুদত্তের অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে বাজারিরা কালকেতুর কাছে সুবিচার চেয়েছে।

জ. নারী স্বাধীনতা: প্রাচীন ভারতের সমাজে নারী স্বাধীনতার দিকটি ছিল বিশেষ লক্ষ করার মত বিষয়। সেসময়ে নারীরা সমাজের কিছু বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকত। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতীয় নারীদের সামরিক বাহিনীতে যোগদানের কথা জানা গেছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ে নারী রক্ষীবাহিনীর কথাও জানা গেছে। এই রক্ষী বাহিনী বনে শিকারে বেরোতে পারত বলে জানা যায়। গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস (৩৫০-২৯০ খ্রিস্টপূর্ব) তার ভারত ভ্রমণ গ্রন্থে জানিয়েছেন আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকালে পাঞ্জাবের রমণীরা পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। রাজ্যশাষণে এই নারীরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকত। নারীরা তখন পাণ্ড্যজাতিকে নিজেদের শাষণের অধীনে রাখত। জৈনদের মধ্যে ধর্মীয় ভেদাভেদের জন্য যে দুটি ভিন্ন সম্প্রদায় তৈরি হয়েছিল। সেখানে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নারীদের বিভিন্ন ভূমিকা দেখা গেছে। জৈনধর্মে নারীদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জগতে ভারতীয় অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নারীদের তুলনায় কেন্দ্রিয় স্থানে রেখে ভাবা হত। তারা ধর্মীয় উপাসনার ক্ষেত্রে সর্বদা অত্যাধিক বেশি করে যুক্ত থেকে ধর্মীয় কাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যেমন - পূজা করা, উপবাস করা ইত্যাদি। জৈনধর্মে ষোলসতী[৫২] নামক কাহিনি পাওয়া গেছে সেখানে জৈন নারীদের গুরুত্বের বিষয়টি আরও স্পষ্ট করেছে। এই ষোলসতীকে জৈনরা পুণ্যবতী বলে মনে করে। তাদেরকে জৈন গৃহী রমণীরা নিজেদের আদর্শ বলে মনে করে।

বৌদ্ধধর্মে প্রথম দিকে নারীদের তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখা হত না। গৌতমবুদ্ধ সংঘে নারীদের প্রবেশের অধিকার দিতে চায়নি। ধীরে ধীরে বুদ্ধের ভাবনায় পরিবর্তন আসে এবং নারীদের জন্য আলাদা সংঘ তৈরি করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মে নারীদের ভূমিকা গুরুত্ব পেতে থাকে। শাক্যবংশের বহুরমণী গৃহকর্ত্রী, বধূ ও কন্যাদের শ্রবণ পদ লাভ করেছিল। বৌদ্ধদের সময়ে দেখা গেছে নারীরা সমাজের পুরুষদের সঙ্গে সমাজ এবং পরিবারের রক্ষার কিছু দায়িত্ব নিয়ে থাকত। যেমন - মহাবংসে

বিরণী দাসীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোক ব্রাহ্মণ এই রমণীকে আটজন ভিক্ষুর দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছিল। বিরণী দাসী প্রত্যহ এই আটজন ভিক্ষুর যথাযোগ্য দেখভাল করে সন্তুষ্ট করে পুণ্যের অধিকারী হয়েছিল। জানা যায় কোন এক বৌদ্ধ গৃহী শিষ্য বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দেখভালের দায়িত্ব বাড়ির মহিলা দাসীদের নিয়োগ করেছিলেন।[৫৩] বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যুক্ত আরও কিছু মহীয়সী নারীর নাম পাওয়া গেছে। এই সকল বৌদ্ধ রমণীরা সকল ধরনের সমাজের কল্যাণ মূলক কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রেখেছিল।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সমাজে নারীদের যথেষ্ট প্রাধান্য দেখা গেছে। মঙ্গলকাব্যগুলির দৈবীভাবনায় দেখা যায়, সেখানে নারী দেবতার যথেষ্ট প্রাধান্য ধরা পড়েছে। মঙ্গলকাব্য গঠনে দেবতার তুলনায় দেবীদের ঘিরে বেশি কাব্য রচিত হয়েছে। যা থেকে অনুমান করা যায় সেসময়ে মানুষ পুরুষদেবতার তুলনায় সমাজের মানুষ নারী দেবীদের প্রতি ভরসা রেখে স্বস্তি পেতে চেয়েছেন। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বর্ণিত সমাজচিত্রের মধ্যে দেখা যায় নারীরা সেই সময়ে শুধুমাত্র ঘরে বসে থাকত না। তারাও পুরুষদের সঙ্গে জীবিকা নির্বাহের জন্য ঘরের বাইরে বেড়িয়ে আসত। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে কালকেতু জঙ্গল থেকে পশুশিকার করে নিয়ে আসে আর ফুল্লরা সেই পশুর মাংস মাথায় করে হাঁটে বিক্রি করতে নিয়ে যায়। মাংস বিক্রির টাকা দিয়ে সংসার চালানোর প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করে আনে। কালকেতু পুনরায় পরেরদিন শিকারে গিয়ে যাতে আরও শিকার করতে পারে সেজন্য তার খাদ্যাখাদ্যের দিকেও যথেষ্ট দৃষ্টি রাখে ফুল্লরা। ধর্মমঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায় লখ্যার মত বীর নারীকে। যে পুত্রের মৃতদেহ সামনে রেখে স্বামীকে যুদ্ধের ক্ষেত্রে উৎসাহ দিয়েছে -

লখ্যা বলে নাথ কিছু নাই আর মনে।
বিফল সকল হল্যা বাছার বিহনে।।
এখন সেনের ধার ধারি অভাগিনী।
তবে শুধি সমরে সাজন কর তুমি।।
স্বধর্মে থাকিলে জয় জানি সবিশেষে।
প্রাণ গেলে প্রাণ পাবে প্রভু এলে দেশে।।
পুত্রশোকে মহাবীর পরান বিকল।
সমরে সাজন করে শত্রুসম বল।।
অতি তীক্ষ্ণ হেত্যার নিলেক অসি ঢাল।
টোপর পরিল শিরে কনক মিশাল।।[৫৪]

এই কাব্যে কলিঙ্গা সকলকে সমর সাজে উদবুদ্ধ করেছে। মনসামঙ্গলকাব্যে স্বামীর প্রাণ ফিরে পেতে বেহুলা স্বর্গের দেবতার কাছে ছুটে যায়। মনসা বিদ্বেষী শিবের উপাসক শ্বশুর চাঁদ সওদাগরকে মনসা পূজা দিতে স্বীকার করায়। এইসকল ঘটনা সেসময়ে সমাজের নারীদের চরিত্রকে স্পষ্ট করে।

ঝ. বারবণিতায় স্বাভাবিকতা: প্রাচীন ভারতের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (৩২০-২৯৮ খ্রিস্টপূর্ব) রাজত্বকালে চাণক্য *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র*[৫৫] নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেখানে মোট পনেরোটি বিভাগ রয়েছে গ্রন্থে তার মধ্যে একটি বিভাগে নারীদের নিয়ে বৃহৎ আলোচনা করেছেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রমণীদের ব্যবহার করা হত। যেমন - রাজার অভিসন্ধি জানতে, রাজার পররাষ্ট্র নীতি অগ্রে বুঝতে এবং উপজাতীয় নেতাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির জন্য সদ্বংশীয় মহিলা এবং সমাজের বারবণিতাদের ব্যবহারের প্রাধান্য বেশি করে লক্ষ করা গেছে। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এরূপ কিছু নর্তকী বা বারবণিতাদের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। নৃত্য-গীত বিদ্যায় পটীয়সী নর্তকীদের কথা জাতক গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। যারা মূলত রাজার আমোদ-প্রমোদের বিষয়ে বিশেষ ধ্যান দিতেন। শাক্যপুত্র গৌতমকে এইরূপ নারীদের দ্বারা ছলনায় ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। গৌতমবুদ্ধ এই মিথ্যা লালসার গ্রাসে তলিয়ে যায়নি। বৈশালীতে অদ্ভুদ একটি নিয়মের কথা জানা যায় - যেখানে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী কখন বিবাহ করতে পারবে না। তাকে জনসাধারণের আনন্দের জন্য উৎসর্গ করা হবে। এই বৈশালীতে অম্বপালী নামক একজন গণিকার কথা জানা যায়। যে রূপে-গুণে বেশ খ্যাতির অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। এই অম্বপালীর গর্ভে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজা বিম্বিসার অভয় নামে একজন পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। এই অম্বপালীর নিকট ভগবান বুদ্ধ ধর্মালোচনা করেছিলেন বলেও জানা যায়। সেসময়ে পিতা ও পুত্র একই গণিকাগৃহে যাওয়ার অধিকার ছিল। বারবণিতা গর্ভবতী হয়ে পড়লে সেটা ছিল লজ্জার কাহিনি। বিম্বিসার ও তার পুত্র অভয় উভয়ে সালবতীর প্রতি মুগ্ধ ছিল। সালবতীর গর্ভের সন্তান সে পরিত্যাগ করলে ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং তাকে গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়।[৫৬] বৌদ্ধ যুগে আরও বহু বারবণিতা রমণীর নাম পাওয়া যায়। যেমন - পদুমাবতী, সিরিমা, সামা, সুলসা ও প্রভৃতি যারা বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সংঘে পরবর্তীকালে প্রবেশ করেছিল। চর্যাপদে দেখা গেছে তখন নগরের বাইরে বসবাসকারী ডোম্বিরা

পুরুষদের যৌন লালসা নিবারণ করত। সমাজের উচু শ্রেণির মানুষদের রাতের অন্ধকারে সমাজের বাইরে বসবাসকারী এই বারবণিতাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা লক্ষ করা গেছে।

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এই গণিকাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে কালকেতুর গুজরাট রাজ্য পত্তনকালে দেখা গেছে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের আগমন ঘটেছে। হাঁটের একপাশে বারবধূদের উপস্থিতি। যেখানে কবি বলেছেন এই বারবধূদের কাছে লম্পট পুরুষরা তাদের বাসনা পূরণের আশায় এসে থাকে। ধর্মমঙ্গলকাব্যে দেখা যায় লাউসেনের পত্নীকে অন্যান্য রমণীরা গণিকা সমান গঠন ঠাট বলে তিরস্কৃত করেছে। এই উক্তি থেকে অনুমান করা যায় সেই সময়ের নারীরা এই বারবণিতা সম্পর্কে অবগত ছিল। সেই সমাজে বারাঙ্গনা পল্লিতে গমন, সমাজের অন্য আর পাঁচটি ঘটনার ন্যায় হয়ত স্বাভাবিক ছিল। মঙ্গলকাব্যের কবিরাও ভগবান শিব চরিত্রের মধ্যে এই পরনারীর প্রতি কামভাবনার প্রবৃত্তি পোষণ করতে পিছপা হয়নি। শিবের সম্মুখে ভীম এই নীচুজাতের পরনারীর চেহারার বর্ণনা দিয়েছে -

নিন্দিয়া কুন্দের কলি   সকল দশনগুলি
চামর নিন্দিয়া কেশ চারু।
নবঘন জিনি বর্ণ   গৃধিয়া জিনিয়া কর্ণ
কামের কামান জিনি ভুরু।।
কণ্ঠে কম্বু পাল্য তিরস্কার
মালুর নিন্দিয়া স্তন   মূর্চ্ছা যার ত্রিভুবন
মাঝায় মৃগেন্দ্র পরিহার।
করিবর জিনি কর   নখ নিন্দি শশধর
রামরম্ভা জিনি উরুদে।[৫৭]

শিব এই বাগদিনীর উদ্দেশ্য প্রণয় আকাঙ্ক্ষায় যাত্রা করেছে।

হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এই তিনটি ধর্ম পারস্পরিক সহাবস্থানের ফলে সকল ধর্মীয় ভাবনার মানুষদের মধ্যে সামাজকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য বেশ কিছু বৈশিষ্টের আদান-প্রদান হয়েছে। জৈনধর্ম নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থেই খানিকটা হিন্দুধর্মের সঙ্গে আপোস করে নেয়। তাদের গ্রন্থাবলী, নিয়মাবলী সবেতে হিন্দু ঐতিহ্যের নমুনা চোখে পরে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে অবৈদিক বৌদ্ধধর্ম ছাড়া, জৈনধর্মের খানিকটা প্রকাশ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। এই নমুনাগুলি মধ্যযুগের সমাজের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় নীতি-ব্যবস্থাগুলি অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। প্রাচীন ভারতের পরিত্যাজ্য ধর্মীয়ভাবনাগুলি মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে অনুপ্রবেশের অধিকার পেয়েছে। লোকায়ত ধারণাগুলি এই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে

নিজেদের জাল বিস্তার করেছে। যেমন - আনুমানিক নবম শতকে প্রাপ্ত *শূন্যপুরাণ*[৫৮] নামক একটি গ্রন্থের কথা জানা যায়। যেখানে বৌদ্ধ লোকায়ত ভাবনার যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই গ্রন্থের মধ্যে ধর্মঠাকুরের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই ধর্মঠাকুরের পূজা বর্তমানে হিন্দুদের মধ্যে দেখা যায়। পূর্বে এই দেবতার পূজা সমাজের উঁচু স্তরের লোকেরা মেনে নেয়নি। ধীরে ধীরে এই দেবতাদের অনুপ্রবেশের কাজ চলেছে সমাজের অভ্যন্তরে। *শূন্যপুরাণ* হল প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত ধর্ম দেবতার পূজাবিধি। পরবর্তীকালে এই দেবতার পূজার নিয়মাবলীর নাম দেওয়া হয় *ধর্মপূজাবিধান* । এই নতুন তৈরি হওয়া গ্রন্থটি পুরোপুরি হিন্দু সংস্করণ এমনটা নয়। এই হিন্দুগ্রন্থটি রূপায়ণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন রঘুনন্দন নামে একজন পুঁথিকার। যিনি গ্রন্থটিকে বৌদ্ধপ্রভাব থাকা হিন্দু বাঙালিয়ানার রূপ দান করেছেন। এই রঘুনন্দন সংস্কৃত ভাষায় কিছু বৌদ্ধ মহাযান শাখার কিছু শাস্ত্ররচনা করেছেন। একইভাবে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে বৌদ্ধ দেবতাদের আনাগোনা উঠে আসে। যেমন - হিন্দু দেবতা ব্রহ্মা, যিনি ভগবান বুদ্ধের বন্ধুর মতো বিপদে আপদে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। গৌতমবুদ্ধের দেহত্যাগ কালে যে আকাশবাণী শোনা গিয়েছিল। অনুমান করা হয় সেগুলি আসলে ছিল ব্রহ্মার বিলাপধ্বনি। সকল বৈদিক এবং অবৈদিক ধর্মগুলির সমাজ বৈশিষ্ট্য একেবারে লুপ্ত না হয়ে, মধ্যযুগে নব রূপলাভকারী মঙ্গলকাব্যের সমাজ ভাবনার মধ্যে জীবিত রয়েছে গোত্রান্তরিত হয়ে।

৪. ৩ মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈন ভাবনার সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

পৃথিবী সৃষ্টির আদিমাবস্থায় মানুষ যখন ধীরে ধীরে সভ্য হয়ে উঠতে শুরু করেছিল তখন তারা প্রথমে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবহার শিখতে শুরু করেছিল। যেমন - আগুন, পাথরের অস্ত্র, পশুপালন ও চাষবাস যেগুলি মানুষের জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। মানুষ যৌথভাবে বাস করতে শুরু করে এবং মানুষ গ্রামের গুরুত্ব অনুভব করতে থাকে। সেখানে মানুষ পশুপালন শুরু করে, মেয়েরা সুতো কেটে কাপড় বোনার চেষ্টা করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে সমাজকে সাহায্য করতে থাকে। স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে সকল মানবজাতির হাতে সৃষ্ট সমাজে নানাবিধ নতুন ভাবনার উদ্ভব হতে থাকে। মানুষের মধ্যে সংস্কৃতির ভাবনা এসে সমাজের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। এই সংস্কৃতির মধ্যে অবস্থান করে ধর্ম, ভাষা, শিল্প ইত্যাদি বিষয়গুলি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতের আর্যভাষাভাষী সমাজভাবনার মধ্যে সাহিত্য, সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল মূলত ধর্মকে আশ্রয়

করে। যখন যে রাজার আগমন হয়েছে, ক্ষমতাশালী সেই রাজার ধর্মকে কেন্দ্র করে বারংবার সমাজভাবনার রংবদল ঘটেছে। এই নতুন সামজের অভ্যন্তরে মানুষের সাংস্কৃতিক ভাবনাতেও পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের ধারা বজায় রয়েছে মানুষের শিল্পভাবনার মধ্যে। মানুষের সাহিত্য ভাবনাতে এসেছে পরিবর্তন। প্রাচীন ভারত থেকে প্রাপ্ত এখনও পর্যন্ত সর্বশেষ নমুনা মহেঞ্জোদারো সভ্যতা। যেখানে একদিকে হিন্দুদের আদিদেবতা শিব অন্যদিকে জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথ বা ঋষভনাথের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় চলে আসছে। এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষেরা অস্তিত্বের লড়াইয়ে নিজেদের জয়ী ঘোষণা করতে গিয়ে নিজেদের সমাজ, সংস্কৃতির সঙ্গে পূর্বের সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে যে সকল নানাবিধ সাদৃশ্য রয়েছে সেগুলিকে খুঁজে বার করতে চেয়েছে। সেখানে একেবারে দুটি ভিন্নধারার ধর্মীয়বোধ বৈদিক এবং অবৈদিক ভাবনার মধ্যে সংস্কৃতিগত কিছু মিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক বা মহাবীরের সময় পর্যন্ত জৈনধর্ম গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল ভারতীয় সমাজে। এরপর গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব এবং তার প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম। এই দুইয়ের মধ্যে কিছু সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য ধরা পড়ে। পূর্বকাল থেকে চলে আসা হিন্দুসমাজ, জৈনসমাজ ও বৌদ্ধসমাজ এই তিনটি সমাজের মধ্যেও সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্যের ধারায় মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সংস্কৃতির নমুনাগুলি মঙ্গলকাব্যের সমাজ সংস্কৃতির মধ্যে জায়গা দখল রয়েছে।

ক. পূজা পদ্ধতি: জৈনধর্মের প্রথম স্তরে জৈনগৃহীদের নানাবিধ দেবদেবীর পূজা থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। মানুষ জীবনে তার কর্মফল ভোগ করে। দেবতা পূজা দ্বারা কর্মফল লাঘব করা যায় না। কেবলমাত্র অনাসক্তি দিয়ে মানুষ কাম, ক্রোধ, মোহ ও ঐশ্বর্য থেকে দূরে থাকা যায়। পরবর্তীকালে জৈনধর্মের মধ্যে বিভিন্ন দেবতার পূজা প্রচলন শুরু হয়েছিল। মহিলা দেবতার পূজা হতে দেখা গেছে, যেমন - দেবী পদ্মাবতী, জৈনদেবী অম্বিকা ও ইত্যাদি। জৈনরা তাদের তীর্থঙ্করদের শাসনদেবীর আলাদা করে পূজা করত, সংসারের মঙ্গল কামনায়। জৈনরা তীর্থের আদর্শ ও তীর্থের বাণী বিশুদ্ধ মনে শ্রবণ করত। জৈনরা কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষকে পূজনীয় বলে মনে করে। তারা দীপাবলি, শারদ পূজা, জ্ঞান, শীতলা পূজা, মকর সংক্রান্তি এইসকল অনুষ্ঠানগুলি হিন্দুদের ন্যায় পালন করে থাকে। জৈনদের 'শম্বস্বরী ব্রত', এই ব্রতের মূল কথা হল ক্ষমা যাঞ্চনা করা। যার অর্থ হল ক্ষমাদান করা। কখনও

কারও অমঙ্গলের কথা ভাবা যাবে না। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে গ্রীকদের আগমনের কথা জানা যায়। ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাবনার আদান প্রদান হয়। ভারতবর্ষে গ্রীকদের আগমনের বহু পূর্ব থেকে গুহাচিত্র এবং অন্যান্য শিল্পের মাধ্যমগুলি থেকে এই নিজস্বতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই শিল্পকলাগুলির মধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতির কথা নিহিত রয়েছে। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে বৌদ্ধ হীনযান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন দেবতার রূপ কল্পনা বা দেবতা পূজাপদ্ধতির কথা জানা যায়নি। ভগবান বুদ্ধের মৃত্যুর চার-পাঁচ শতক পর থেকে বিহারগুলিতে বুদ্ধ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে, সেই মূর্তির পূজা করার রীতি প্রচলিত হতে দেখা যায়। ক্রমে এক এক করে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন - অমিতাভ, অক্ষোভ্য, বৈরোচন, রত্নসম্ভব ও অমোঘসিদ্ধি শুধুমাত্র বুদ্ধের এই পাঁচপ্রকার ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তিতে এসে থামে। এই পঞ্চ তথাগতের সঙ্গে জৈনদের শাসনদেবীর ন্যায় ধীরে ধীরে বুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে পাঁচজন শক্তি দেবী, যথা – লোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডুরা ও আর্য্যাতারিকা এই পাঁচজন শক্তিদেবী। এই পাঁচজন শক্তিদেবীর সঙ্গে পাঁচজন বোধিসত্ত্ব রূপও পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৫৯] গৌতমবুদ্ধ নিজে দেবতা বিশ্বাস না করলেও তার শিষ্যরা– ডাকিনী, যোগিনী, প্রেত, প্রেতিনী, পিশাচ, পিশাচিনী ও প্রভৃতিদের পূজা করতে শুরু করে। তাদের পূজা ভাবনার মধ্যে শুভ এবং অশুভ সকল কল্পনার সঙ্গে দেবতার মূর্তি কল্পনা করে, সকল অশুভ শক্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চেয়েছে। অশুভ শক্তিকে পূজো দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছে। এইভাবে বৌদ্ধ মহাযান শাখায় ধীরে ধীরে বৌদ্ধদেবতা মূর্তি বৃদ্ধি পেয়ছে। সেই সময়ের বৌদ্ধ দেবতাদের কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *বেনের মেয়ে* উপন্যাস থেকে -

> কোনো কোনো প্রজ্ঞা-মূর্তি দাঁড়ামূর্তি – সর্বাঙ্গসুন্দর, দুই হাত দুই পা, সর্ব-অলংকার-ভূষিত। সেই-গুলি দক্ষিণদিক হইতে আসিতে সকলের আগে পাওয়া যাইত। তাহার পর বসামূর্তি : তাহার পর তারামূর্তি: তাহার পর পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পঞ্চশক্তি – লোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডুরা, আর্য্যাতারিকা। তাহার পর, বজ্র তারা, বজ্রবারাহী, শূয়রের মতো মুখ: তাহার পর বজ্রযোগিনী, তাহার পর বজ্রধাতেশ্বরী। সব মূর্তি তামায় তৈয়ারি, আর সোনার মুখ পাতলা পাতে মোড়া। ইহাতে কখনও মরিচা পড়ে না, সর্বদাই চকচক করে। পশ্চিমের শাড়িতে প্রজ্ঞাদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন – উপায়-মূর্তি অথবা বুদ্ধমূর্তি। কোনো জায়গায় বুদ্ধদেব দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেছেন; কোনো জায়গায় বসিয়া ধ্যান করিতেছেন; কোনো জায়গায় একহাত মাটিতে দিয়া রাখিতেছেন।[৬০]

বৌদ্ধধর্ম বহুদিন ধরে ধীরে ধীরে ভাঙনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। গৌতমবুদ্ধ প্রথমে মহিলাদের বৌদ্ধসংঘের মধ্যে স্থান দিতে চায়নি। গৌতমীর অনুরোধে স্ত্রীলোকেদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করে

ভিক্ষুণী করেছিলেন এবং তখন থেকে বৌদ্ধ সংঘের নিয়মকে আরও কঠোর করেছিল। প্রথমে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা এক বিহারে রাত্রিবাস করতে পারতেন না। গৌতম বুদ্ধের দেহাবসানের কয়েক বছরের মধ্যে, গৌতমবুদ্ধ প্রণীত সকল নিয়মাবলী, রক্ষণা-বেক্ষণপদ্ধতিতে বদল ঘটতে থাকে। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা বৌদ্ধধর্মের নিয়মাবলীকে শিথিল করে এই ধর্মের সারবস্তুকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে থাকে। বৌদ্ধধর্মের উদার মনোভাব, যেখানে কোনরকম ভেদাভেদ ছাড়া সমগ্র মানবের প্রবেশের অধিকারের ফলশ্রুতি বৌদ্ধধর্মকে খানিকটা পতনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এই উদারতার ফলে বিহারগুলিতে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের ভির বাড়তে থাকে। ভিক্ষুরা ধর্মের নামে অলসতায় জর্জরিত হয়ে গিয়ে, নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজের প্রতি বিমুখ হতে থাকে। তারা নিত্য ভিক্ষার কাজ থেকে বিরত থাকতে শুরু করে। বিহারের নামে থাকা জমি জায়গা থেকে যে পরিমাণ আয় হত, সেগুলিতে বিহারের ভিক্ষুরা কোনোরকমে দিন অতিবাহিত করে চালাতে চাইত। এই অভাবের মাঝে বিহারের শ্রী পাল্টাতে থাকে। ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতায় বৌদ্ধধর্ম বিধর্মী রাজাদের প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ-পণ্ডিতদের রাজ সম্মানপ্রাপ্তি বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। আসল বৌদ্ধভিক্ষুদের অবস্থা করুণ হতে থাকে। গৌতমবুদ্ধ প্রাকৃত ভাষায় ধর্মপ্রচার করেছিল। সেই সময়ে দীর্ঘকাল পরে ভারতবর্ষে আনুমানিক দ্বাদশ শতকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধনতত্ত্ব-জ্ঞাপক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ক চর্যাগীতি রচিত হয়েছিল সান্ধ্যভাষায়। বৌদ্ধ সাধনতত্ত্ব ও বৌদ্ধ সাধনঘটিত কিছু গান পাওয়া যায়, যেখান থেকে সহজিয়া ভারতীয় বৌদ্ধদের সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গদেশে মুসলমান অধিকারের পরে নূতন সমাজ তৈরি হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা শেষদিকে হিন্দুধর্মের ভাবনার সঙ্গে মিশে যায়। বৌদ্ধ মতাদর্শ প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্ব, বিজ্ঞানবাদ, করুণাবাদ, দর্শন, শীল ভুলে গিয়ে, নিজেদের প্রয়োজন মতো বৌদ্ধধর্মকে গড়ে তোলে। এই বৌদ্ধরা বঙ্গদেশের কিছু লৌকিক বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারা হিন্দু সংস্কারের সঙ্গে বিশ্বস্ত হতে থাকে। যথা – দূর্গাপূজা, কালীপূজা, মনসাপূজা, শীতলাপূজা, ডাকিনিপূজা, গ্রাম্যদেবতার পূজা, পঞ্চভূতের পূজা ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি বলী প্রথা শুরু করে।[৬১] বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধ প্রবর্তিত বিশ্বপ্রেমের বাণীর মূলস্রোত থেকে সরে এসে নতুন দিশায় যাত্রা শুরু করে। গৌতমবুদ্ধ নিজে বিশ্বাস করতেন এবং তার শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন - বিশেষ স্থানে গিয়ে কিংবা বিশেষ মন্ত্র পড়ে, অথবা বিশেষ অনুষ্ঠানের দ্বারা মুক্তিলাভ করা যায় না। এই লোকায়ত বিশ্বাসের অরণ্যে মানুষ

যখন পথ হারিয়েছিল তখন ভগবান বুদ্ধ এই সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার করার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন স্বার্থত্যাগ করে, সর্বভূতে দয়া বিস্তার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করলে মানবের মুক্তি সম্ভব। কোন বিশেষ তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে, বিশেষ কোন স্থানের জলে স্নান করলে, অগ্নিতে আহুতি দিলে অথবা দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করলে মোক্ষ লাভ হয় না।[৬২] এই সহজ কথাটি প্রমাণ করতে একজন রাজকুমারকে রাজ্যের লোভ ছেড়ে, পরিবারকে পরিত্যাগ করে, সারাজীবন কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাতে হয়েছে। সেখানে তার ধর্মাবলম্বীরা দেবতার উদ্দেশ পশুবলি দিয়ে, অবশিষ্টাংশ পশুর দেহের মাংস প্রসাদী হিসেবে নিজেরা ভোজন করত। পার্বত্য বাংলাদেশের চট্টগ্রামে একশ্রেণির চাকমা বৌদ্ধসম্প্রদায় দেখা যায়। যারা তাদের আরাধ্যা বৌদ্ধ মা-লক্ষী-মা দেবীর সামনে শূকর ও মোরগ বলি দিয়ে দেবীকে সন্তুষ্ট রাখতে চায়। বৌদ্ধধর্মে বিষয়াসক্তির কথা বলা হয় না। বৌদ্ধদের সময়ে ভারতবর্ষে শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যশক্তি সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির ইতিহাস থেকে জানা যায় - আফগানিস্তানের উপত্যকায় পাঠানেরা মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যখন মুসলমানধর্মকে পৃথিবীর মধ্যে প্রচারে আত্মনিয়োগ করে। ত্রয়োদশ শতকে তারা বঙ্গদেশে এসে উপস্থিত হয়। বঙ্গদেশে এসে বৌদ্ধ বিহারগুলিকে ধ্বংস করে, সঙ্গে পাথরের মূর্তিগুলিকে ধূলিসাৎ করে। কিছু বৌদ্ধভিক্ষু এই ঘটনায় মারা যায়, বাকিরা তিব্বত, নেপাল, বর্মা প্রভৃতি স্থানে পালিয়ে যায়। এরপরে বাংলায় বৌদ্ধপুঁথি, বৌদ্ধদের ভাবনা বা বিদ্যার প্রকাশ একরূপ বন্ধ হয়ে যায়। কিছু বৌদ্ধ ঐতিহাসিকবিদ মনে করেন - অন্তিম বুদ্ধদের ইন্দ্রিয়াসক্তি, কুকর্মেলিপ্ত, ভূতপ্রেতের পূজা এগুলির প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে নেমে আসে মুসলমান আক্রমণ।[৬৩] এই আক্রমণের পরবর্তী দু'শো বছর বাংলার ইতিহাসে নেমে আসে অন্ধকার যুগ। এই অন্ধকার কেটে সমাজ আবার স্বাভাবিক হতে থাকে। এই সময়কে সমাজ মধ্যযুগ নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই যুগে বৌদ্ধদের তেমন সরাসরি কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধদের সম্প্রদায় গঠনের দিকে আদৌ তেমন কোন লক্ষ ছিল না। তারা নির্দিষ্ট কোনো সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকর্ম, আচার অনুষ্ঠানের আবেষ্টন তৈরি করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করেনি। ভারতের আর্যসমাজ তার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এই দুই ঘটনার সমন্বয়ে বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করে দেয়। বৌদ্ধদের আচার, অনুষ্ঠান

হিন্দুদের আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল এবং বৌদ্ধমন্দির হিন্দুমন্দিরে পরিণত হয়েছিল।[৬৪] এই আগত নতুন যুগে সমাজ সংস্কৃতিতে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। যার নমুনা বর্ণনা করা হয়েছিল মঙ্গলকাব্যসমূহের মধ্যে। হিন্দু-বৌদ্ধ মিশ্রসংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে যে সকল দেবদেবীর আবির্ভাব হয়েছিল তাদের গুণগান এই মঙ্গলকাব্যের মূল বিষয় হয়ে উঠেছিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বর্ণিত সংস্কৃতির মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে বলিদানের মহিমা কীর্ত্তন করা হয়েছে। ধর্মমঙ্গলকাব্যে হরিশচন্দ্রের কাহিনিতে দেখা যায় - গৃহে অতিথি হিসেবে আগত একজন সন্ন্যাসীর সামনে হরিশচন্দ্র তার পুত্র লুইচন্দ্রকে বলি না দিতে চাইলে, শিশু লুইচন্দ্র তার পিতা-মাতাকে বলি দিতে উদবুদ্ধ করেছে। তার পিতা হরিশচন্দ্রকে জানিয়েছে তাকে বলি দিয়ে যেন তার কোটি পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করে। বলি এবং পূজা দ্বারা দেবতাকে সন্তুষ্ট করলে মানবের সকল উদ্দেশ্য সাধন হয়। লুইচন্দ্রের কথা বিশ্বাস করে রাজা হরিশচন্দ্র তার পুত্রকে বলি দিয়ে সন্ন্যাসীর পূজা করতে চেয়েছে -

বাছার বচন শুনি বাঁধাইল বুক।
পুত্রে বলি দিয়া বাছা পূজেন বুভুক।।
কৌতুক দেখেন প্রভু দেব করতার।
পরিপাটি মহাপূজা ষোল উপচার।।
সকল পূজার সার মহাবলি দান।[৬৫]

নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্য মানুষ দেবতার পূজা করত মঙ্গলকাব্যের সময়ে।

খ. মহিলাচার: যেকোন সমাজ গড়ে ওঠার পিছনে যেমন পুরুষের কিছু ভূমিকা থাকে। সেই সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সংস্কার গড়ে তোলা এবং সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার পিছনে নারীদের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। প্রাচীন ভারতের সমাজে দেখা যায় বিভিন্ন ধর্মের সমাহার সেখানে থাকলেও নারীদের আচরণীয় রীতি-নীতি প্রায় একইভাবে পালিত হত। প্রাচীন ভারতে নারীদের ধর্মীয় জীবন পালনে তেমন অধিকার ছিল না। তখন মনে করা হত সমাজে নারীদের জন্ম হয়েছে বিবাহ করে, সুস্থভাবে স্বামী ও সন্তান পালন করে গৃহে শান্তি বজায় রাখা। সমাজের উঁচুস্থানে বসবাসকারী সামান্য কিছু নারীদের শিক্ষা গ্রহণের কথা জানা যায়। বেদের কয়েকটি স্তোত্র নারীদের দ্বারা রচিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। জৈনগ্রন্থে কৌশাম্বী নামক একজন নারীর কথা জানা যায়, যিনি ধর্ম-দর্শন শিক্ষা ও চর্চার জন্য সারাজীবন অবিবাহিত অবস্থায় জীবন-যাপন করেছিলেন।[৬৬] জৈনশাস্ত্রগুলি থেকে নারীদের

সম্পর্কে জানা যায় তারা বিবাহের সময় স্ত্রী-ধনের অধিকারী হতে পারত। শ্রাবস্তীর একজন রমণী যিনি একশোটি চাকার মালকিন ছিলেন। জৈননারীরা সমাজে মহিলাচার হিসেবে জৈন অষ্টমঙ্গল পালন করে থাকত যা এখনও জৈনসমাজে প্রচলিত রয়েছে। এই অষ্টমঙ্গলের মধ্যে থাকে – স্বস্তিক, শ্রীবৎস, নদ্যার্ভ, কল্পবৃক্ষ, ভদ্রাসন, কলস, মৎস্য, দর্পন বা মৃগরাজ, বৃক্ষ, নাগ, কলস, ব্যজন, জৈয়ন্তী, ভেরী, দীপ বা ব্রাহ্মণ, গৌ হুতাশন, হিরণ্য, ঘৃত, আদিত্য, অপ ও রাজা। জৈন বিবাহের সময়ে নারীরা বিশেষ কিছু সংস্কার পালন করে থাকে। যথা - জৈনরা বিবাহের পূর্বে 'খোল বরণ' উৎসব পালন করে থাকে। যেখানে একটি রূপোর প্লেটে নারকোল আর কিছু শগুন নিয়ে বরের বাড়িতে যাওয়া শুভ বলে মনে করে। মূল বিয়ের অনুষ্ঠান মেয়ের বাড়িতে হয়ে থাকে। জৈনরা বিবাহের পূর্বে 'হলদি সিরোমণি' নামক একটি আচার পালন করে থাকে। বিবাহ বাসরে বর এবং বধূর গ্রন্থি বন্ধন করা হয়। যার মূল উদ্দেশ্য হল দুই পরিবারের মধ্যে বন্ধন। বিশেষ করে ভিন্ন পরিবারের দুটি মানুষের মধ্যে বন্ধন তৈরি করা। কন্যা বিদায় অংশে আসে সব থেকে করুণ অংশ যেখানে কন্যার পিতা-মাতা তার কন্যাকে বরের হাতে তুলে দেয়। কন্যার মাতা তখন কন্যার হাতে তুলে দেয় একটি কাঁচা টাকা এবং সামান্য কিছু চাল। যা তার স্বামীর গৃহে পৌঁছানোর পাথেয়।

বৌদ্ধসমাজের মধ্যে কিছু মহিলা সংস্কারের কথা জানা যায়। বৌদ্ধধর্মে ধর্মরক্ষার ক্ষেত্রে এবং বৌদ্ধ থেরীগাথা রচনার বিষয়ে নারীদের বিশেষ ভূমিকার কথা জানা যায়। বৌদ্ধদের বিবাহের বেশিরভাগ অংশ সম্পন্ন হত মেয়ের বাড়িতে। গৌতমবুদ্ধের বিবাহ হয়েছিল যশোধরার পিতৃগৃহে। বৌদ্ধদের বিবাহ কয়েকটি পর্বের মধ্যে দিয়ে সংঘটিত হত। যেমন - বর কন্যার গৃহে প্রবেশ করলে তাদের গৃহের রমণীরা একটি বরণকুলা [৬৭]-র মধ্যে কাঁচা হলুদ, ধান, দূর্বা, আম্রপল্লব, একটি জলপূর্ণ ঘট ও তৈল-প্রদীপ রেখে কুলোটিকে সাজায়। তারা বরণকুলায় রাখা প্রত্যেকটি দ্রব্যকে শুভলক্ষণের প্রতীক মনে করে। প্রত্যেকটি দ্রব্যের আলাদা আলাদা গুণ রয়েছে, যথা - সজীবতা, দৃঢ়তা, সৌন্দর্য, দীর্ঘজীবী ও মিলনের কামনার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বরবেশে গৃহে আসা যুবককে এই বরণকুলো দিয়ে কন্যার গৃহে অভিষেক করা হয়। বিবাহের পূর্বে হলুদ বেঁটে বর-কনেকে মাখানো হয়, যা হলদি অনুষ্ঠান নামে পালন করা হয়ে থাকে। বিবাহের দিন বরপক্ষ মাঙ্গলিক দ্রব্য ও বাজনা ইত্যাদি

সহযোগে কনেকে স্বামীর গৃহে আনতে মেয়ের বাড়ি যায়।[৬৮] সেই সময়ে বিয়ের আসরে ভোজন ও দান দুটোই চলত।

মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে বিবাহবাসরে মহিলারা কিছু আচার পালন করে থাকে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে কালকেতুর বিবাহ-উদ্যোগ অংশে, দেখা যায় হরিণ, মহিষ কেটে ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে ভোজনের উদ্দেশ্যে ডাকা হয়েছে। বিয়ের পূর্বে ফুল্লরার অধিবাস করা হয়েছে। বিবাহ বাসরে মহিলারা শুভাশুভ মেনে ছাদনা তলা গোবর মাটি দিয়ে লেপে, আলপনা দেওয়া হয়। ফুল্লরার গাত্রহরিদ্রা বাসে শুদ্ধ করা হয়েছে। কালকেতুর বরযাত্রীরা ঢেমচা কাড়া বাজিয়ে বিয়ে করতে গেছে। কালকেতুর বিবাহ অংশে বরণের সময় মাথায় ধান, দূর্বা ব্যবহার করা হয়েছে। কালকেতুর গলায় পড়ানো হয়েছে বনফুলের মালা।[৬৯] অন্নদামঙ্গলকাব্যে শিবের বিবাহ বাসরে গৌরীর পিতা হিমালয়কে দানসজ্জা নিয়ে বসেছে। সেখানে বরবেশে শিব এলে তাকে বরণের সময়ে মেনকার কিছু মহিলাচারের রীতি দেখা যায় -

ত্রয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া।
লইয়া নিছনিডালা হুলাহুলি দিয়া।।
বরের সমুখে মাত্র মেনকা আইল্যা।
পালাবার পথে গিয়া হরি দাঁড়াইলা।।[৭০]

অন্যান্য সকল মঙ্গলকাব্যেও মহিলাচারের নমুনা পাওয়া যায়। বিবাহ বাসরে মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়ে বিবাহসভায় খুশির আমেজ আনার চেষ্টা করে। বাদ্যযন্ত্র দ্বারা বিবাহের সভাকে মুখরিত করে রাখত।

গ. মানত দেওয়া: জৈনসম্প্রদায়ের মধ্যে পৌরাণিক দেববিশ্বাসের মধ্যে লৌকিক ধারণা পোষণ করা হয়েছে। জৈন ক্যালেণ্ডারে বছরে দুবার (মার্চ-এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) নয়দিন করে উপবাস অনুষ্ঠান পালন করার রীতি দেখা যায়। বর্ষাকালে জৈনসন্ন্যাসীরা চারমাস ধরে একস্থানে অবস্থান করে ধর্মকথা পালন করে। এই অনুষ্ঠানকে জৈনরা চাতুর্মাস্য নাম দিয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানের শেষ দিন তারা একত্রে সমভাসারি উৎসব পালন করে থাকে। কার্তিক মাসের পূর্নিমায় হিন্দুরা যখন দিওয়ালী উৎসব পালন করে জৈনরা তখন নির্বাণ উৎসব পালন করে। যেখানে তারা চূরান্ত মুক্তি কামনা করে। জৈনরা প্রতি বারোবছর অন্তর কর্ণাটকে অবস্থিত ঋষভণাথ বা বাহুবলীর মূর্তিতে মস্তক অভিষেক অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। সতেরো মিটার বাহুবলির মূর্তিকে জল, দুগ্ধ, ফুল ও কিছু দ্রব্যের দ্বারা

স্নান করানো হয়। এই অনুষ্ঠানে কয়েক লক্ষ জৈনদের সমাবেশ ঘটে। যারা নির্বাণলাভের আশায় এই স্থানে এসে উপস্থিত হয়।

বৌদ্ধধর্মের মধ্যে গৌতমবুদ্ধ ধর্মপ্রচারকালে নির্বাণের বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও। বৌদ্ধরা নিজেদের উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে আসতে থাকে। বৌদ্ধরা নিজেদের ছোটো ছোটো উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য দেবতা আরাধনা করে থাকে। যেমন - বৌদ্ধরা পুত্র কামনায়, প্রিয়জনের রোগমুক্তির জন্য, প্রবাসে সন্তান-স্বামী যারা বাস করে তাদের মঙ্গলকামনায় ও বিভিন্ন বিপদ থেকে মুক্তির জন্য মানত করে থাকে। বৌদ্ধ চর্যাপদ-এ 'সুখরাত্রি ব্রত'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ব্রতের উদ্দেশ্যে হল বুদ্ধের কাছে সকলের মঙ্গলকামনা করা।[৭১] এই ব্রতকে তারা পবিত্র অনুষ্ঠান মনে করে থাকে। বৌদ্ধরা নিজেদের ধর্মস্থানে উপস্থিত হয়ে ইপ্সিত ফল লাভের আশায় দেবতার পূজা দিয়ে প্রদীপ ও ধূপ জ্বেলে থাকে। তারা মানব মুক্তি কামনার আশায় বদ্ধ পশুপাখি মুক্ত করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় দেবতাকে। আর্তদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে ধর্মস্থানে টাকাপয়সা দান-ধ্যনের মানত ও করে তারা। এরূপ কিছু দৃশ্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় *বেনের মেয়ে* উপন্যাসে। যেখানে মায়া তার বৈধব্যদশা থেকে দূরে থাকতে স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করে দেবতার কাছে। সে দেবতার কাছে মানত করে –

> ঠাকুর, আমায় বিধবা করিও না, আমার স্বামীর জীবন দাও। পূর্ণিমা-অমাবস্যায় ব্রাহ্মণবাড়ি সিধাভোজ্য পাঠাইয়া এই কামনাই করিত। বুদ্ধ মন্দিরে দীপ দিয়াও এই কামনাই করিত। ভিক্ষু-সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিয়াও এই কামনাই করিত।[৭২]

বাংলাদেশের গৃহী বৌদ্ধরা গৃহে থেকে মাসে চারটি উপোসথ পালন করে। প্রত্যেক মাসের অমাবস্যা ও পূর্নিমা এই দুইপক্ষে। এইসময়ে তারা বিহারে গিয়ে কিছু ধর্মীয় আচরণ পালন করে পরিবারের মঙ্গলকামনায়। মাসের চতুর্দিবসে গৃহী বৌদ্ধরা সারাদিন বিহারে অবস্থান করে গৃহী জীবনের নানাবিধ ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে থাকতে প্রার্থনা করে। হিন্দুধর্মে দেবতা পূজা করে নিজেদের কামনা পূরণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই মানত বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মঙ্গলকাব্যের যুগ ভরে উঠেছিল মানুষের কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস এই সকল ধারণাগুলির দ্বারা। সেসময়ে মানুষ একে-অপরের প্রতি বিশ্বাস হীনতায় ভুগতে থাকে। একে-অন্যকে ঠকিয়ে নিজের জয়োল্লাসে মেতে ওঠা এই সমস্ত কিছু সমাজকে নীতি হীনতার দিকে ঠেলে দেয়। সমাজের এই অসহায় পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে মানুষ দৈবনির্ভর হয়ে পড়েছিল। এইসকল দেবতারা নিজেদের

ভক্তের মঙ্গলার্থে অন্যের ক্ষতি করতে পিছপা হতেন না। নিজের পূজা পেতে মানবের ওপর জোরজুলুম করতে পিছিয়ে থাকেনি। নবআবির্ভূত দেবতারা ভক্তের মনোবাঞ্ছাপূরণ করতে স্বর্গ ছেড়ে বাস্তবের মাটিতে এসে ধরা দিয়েছিল। ভক্তরা এইসকল মঙ্গলময় দেবতাদের উদ্দেশে নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণে অথবা ইপ্সিত ফললাভের আশায় বিভিন্ন বস্তু বা কায়িক কষ্ট স্বীকার মানত করে থাকে। ধর্মমঙ্গলকাব্যে সামুলার মুখে ধর্মদেবতার মাহাত্ম্যের কথা শুনে রাজা হরিশচন্দ্র এবং রাণী রঞ্জাবতী পুত্রলাভের ইচ্ছায় ধর্মদেবতার কাছে মানত করে। দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে কিছু কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয় -

উপদেশ পেয়ে সুখী হয়ে রানী রাজা।
আরম্ভিলা বল্লুকায় অনাদ্যের পূজা।।
অনাহারে স্ত্রী পুরুষে দোঁহে দিবারাত্রি।
কায়জ কামনা করে ক্লেশ করে কতি।।
চতুর্দিকে অনল করিয়া প্রজ্বলিত।
উর্ধ্বপদ অধশিরে রহে অবিরত।।
অঙ্গ হইল অবসন্ন অশন বিহনে।।
তথাপিহ তবু চিত্ত মগ্ন তাঁর চরণে।।
প্রত্যহ পূজার পরে অর্ঘ্য দান সুরে।
নৃত্য করে রাজা রানী উর্ধ্ববাহু করে।।
ভাবে হয় বিমহিত ভূমে গড়ি যায়।
দাতা কৃষ্ণ কোথা বলে কাঁদে উভরায়।।
ক্ষণে বলে জয় জয় জয় নিরঞ্জন।
অপুত্রকে পুত্র দেহ পতিতপাবন।।[৭৩]

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে দেবতার সামনে কালকেতুর পিতামাতা মানত করেছে যদি তাদের সন্তানলাভ হয় তবে তারা সেই সন্তানকে দেবীর দাস করে রাখবে।

ঘ. তন্ত্র সংস্কৃতি: জৈনধর্মের মধ্যে অহিংস পদ্ধতিতে মানুষের মুক্তির পথ সন্ধানের কথা বলা হয়েছে। এই ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা কিছু পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা নির্বাণলাভের চেষ্টা করেছে। এই জৈনধর্মের মধ্যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিকগুণেরও প্রবেশ ঘটেছিল। জৈনমন্দিরগুলির মধ্যে কিছু অলৌকিক ঘটনার প্রকাশের কথা জানা যায়। জৈনধর্মে বিভিন্ন রঙের গুঁড়ো দিয়ে ডায়াগ্রামের চিত্র অঙ্কন করে, সেখানে নারকোলকে শুভ মেনে পূজো করা হয়। এই বিভিন্ন রঙের গুঁড়ো দিয়ে আঁকা ডায়াগ্রামে সমাজে সম্পদ সমৃদ্ধির বিষয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রসাদ দিয়ে পূজো করে থাকে। ত্রয়োদশ শতক থেকে জৈনভাবনার মধ্যে এই তন্ত্রের স্পর্শ লাগতে শুরু করে। জৈনধর্মের মধ্যে নানাবিধ তন্ত্রসংস্কার

বৃদ্ধি পেতে থাকে। জৈনদের মধ্যে মন্ত্রের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে। এই মন্ত্রগুলি প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। এই মন্ত্রগুলির প্রশংসা করেছেন জৈনঋষি ও তপস্বীরা। যারা মূলত ধ্যানের মধ্যে দিয়ে জৈনসমাজে শ্রদ্ধার অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। জৈনদের এই মন্ত্রগুলির অর্থ ব্যাখ্যা করলে সেখানে তন্ত্রের কথা জানা গেছে। জৈন মন্দিরগুলির পাশে এই তান্ত্রিক ডায়াগ্রামগুলি বিক্রি হতে দেখা গেছে। কিছু অপ্রকাশিত জৈনগ্রন্থের উদাহরণ পাওয়া যায়। যেসকল পাণ্ডুলিপিগুলি থেকে জৈন রীতি-নীতি, আচার-আচরণের কথা জানা গেছে।

গৌতমবুদ্ধ যখন ধর্মপ্রচার করেছিলেন তখন তিনি মূলত নির্বাণ লাভের জন্য মানবকে শিক্ষা দিয়েছেন। মানব নানাবিধ কর্মবন্ধনের দ্বারা পৃথিবীতে পুর্নজন্মলাভ করে। গৌতমবুদ্ধ তার শিষ্যদের মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধের তিরোধানের পরে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বুদ্ধের নির্বাণ মার্গকে সরিয়ে রেখে নিজেদের মতো করে এগিয়ে যেতে থাকে। বৌদ্ধ মাহাযানীরা গৌতম বুদ্ধ প্রচলিত প্রথাগুলিকে নিজেদের প্রয়োজনে সহজলভ্য করে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করতে থাকে। নিজেরা এই নবপদ্ধতিতে বুদ্ধ উপাসনা করতে শুরু করে। তৎকালে বাংলাদেশসহ, সিকিম, ভুটান, লাদাখ, নেপাল ও প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব এতোটাই বিস্তারলাভ করেছিল যে বৌদ্ধ মন্দিরে বৌদ্ধমূর্তিকে সঙ্গে রেখে তান্ত্রিক দেবতাদের পূজার উদাহরণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ কালচক্রযান-এ বলা হয়েছে তন্ত্রসাধনার কথা। বর্ণনা করা হয়েছে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই নিয়ে সময়ের চাকা অবিরাম ঘুরে চলেছে। এই আবর্তে কাল বা সময় সবকিছু সৃষ্টি করে চলেছে। এই তন্ত্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্যে হল সাধনের দ্বারা কালের চক্রকে স্তব্ধ করে দেওয়া। যার মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যু রোধ হবে এবং মানুষ পুনর্জন্মের চক্র থেকে রেহাই পাবে।[৭৪] কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সুভাষগ্রাম নামক স্থানে হাড়ি ঝি চণ্ডী নামে একজন বৌদ্ধ তান্ত্রিকদেবীর কথা জানা যায়। দক্ষিণ চব্বিশপরগণার বিভিন্ন স্থানে নারায়ণী, বিশালাক্ষী, দীপলক্ষ্মী নামে বিভিন্ন তান্ত্রিক চণ্ডীমূর্তিগুলির পূজা হয়ে থাকে। কালীদেবীর কিছু তান্ত্রিকমূর্তির পূজা হয়ে থাকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। শিবের যে বুড়োশিব মূর্তিটি পাওয়া যায় সেখানে বৌদ্ধ তান্ত্রিকশিবের রূপান্তর মাত্র। বিক্রমপুরের বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করতেন কুমার আচার্য যিনি তান্ত্রিক গ্রন্থের টীকা রচনা করেছিলেন। প্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্য তৈলাপাদ চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহারের আচার্য ছিলেন। বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়ার কৃষ্ণনগরে অবস্থিত বিহারটি ছিল বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনার

সবচেয়ে বৃহৎ কেন্দ্র। সেসময়ের তান্ত্রিক গ্রন্থে চুরাশিজন তন্ত্র সিদ্ধাচার্যের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলার তন্ত্রসাধনা গুহ্যসাধনায় পরিণত হওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত বৌদ্ধ *চর্যাগীতিকোষ* নামক গ্রন্থে। যেখানে বজ্রযানী দেব-দেবীর পূজা বন্ধ হয়ে গেছে। নাগার্জুনের শূন্যবাদকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনার কিছুটা শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। মানুষ শূন্যবাদের তত্ত্বকথা সহজে উপলব্ধি করতে সক্ষম না হলেও যাদুমন্ত্র, মণ্ডল, ধারণী, বীজ এগুলিকে খুব সহজে গ্রহণ করেছিল। যাদু, টোনা বশীকরণ প্রভৃতি মন্ত্রশক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ তাবিজ ধারণ প্রক্রিয়াকে সহজভাবে গ্রহণ করেছিল। এই তন্ত্রসাধনার মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োগ করতেও দেখা গেছে। এই তন্ত্রের গুরুরা প্রচার করেছেন মন্ত্রবলে তারা দেবতাদের নিজেদের অধীনে আনতে সক্ষম। মানুষ অতি শীঘ্র ফললাভের আশায় তান্ত্রিকগুরুদের সংস্পর্শে আসতে শুরু করে এবং তান্ত্রিক ধর্মীয়ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে থাকে।

প্রাচীনভারতে হিন্দু তন্ত্রসাধনার কথা জানা যায়। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের ভাবনার মধ্যে এই তন্ত্রসাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলকাব্যে চাঁদ সওদাগরের রাজ্যে দেবী মনসা পূজা পাওয়ার আশায়, চাঁদ সওদাগরকে পূজা দিতে বাধ্য করতে চায়। সেই আশায় সওদাগরের বাগানসহ সংসারের আরও কিছু ক্ষয়ক্ষতি করে। ধন্বন্তরি ওঝা মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে দিয়ে সেগুলি পুনরায় ফিরিয়ে দিয়েছে। এই মঙ্গলকাব্যের শেষাংশে দেখা যায় মনসাকে পূজা দিতে রাজি হলে, মনসা সওদাগরের মৃত সকল পুত্রকে পুনরায় জীবিত করে দিয়েছেন মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে দিয়ে। মনসার মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে দিয়ে চাঁদবেনে তার হারানো সম্পত্তি ও ফিরিয়ে পেয়েছিল। বেহুলার মধ্যে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ রয়েছে। বেহুলা লক্ষ্মীন্দরকে জীবিত করতে স্বর্গের পথে যাত্রা করে উত্তীর্ণ হয়েছে। শীতলামঙ্গলকাব্যে সাধুরা তান্ত্রিক পদ্ধতিতে শীতলার স্তব করেছেন শ্মশানে -

শিয়রে শীতল মাতা সিদ্ধ মোক্ষ্য সিদ্ধিদাতা
শিশুদাসে শীঘ্র কর ত্রাণ।
ধিরঙ্গমা ধৃতিরঙ্গি ধীর কর ধিমা চণ্ডি
ধিয়াইয়া কর‍্যাছি ধিয়ান।।
রয়ে রিপু রাজ ভৃত্যে রোগেশ্বরী রাসরথে
রক্ষ মোরে ছাড় রোগপুর।।
স্তয়েতে কি জানি স্তুতি তুমি স্তুতি তুমি গতি
তুমি মোর তাপ কর দূর।।[৭৫]

এই কাব্যে দেবী স্তবের পরে, দেবী শীতলা শ্মশানের সমগ্র মরাকে জীবিত করে দেন তার ক্ষমতা দিয়ে। ধর্মমঙ্গলকাব্যে লাউসেন পশ্চিমে সূর্যোদয় করে অসাধ্য সাধন করেছিল। পুত্রলাভের আশায় হরিশচন্দ্র ও রঞ্জাবতী বালুকাভূমিতে তান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধর্মদেবতার আরাধনা করেছে।

ঙ. দেবতার চিত্রাঙ্কন ও দান-ধ্যান পদ্ধতি: প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে ভারতবর্ষে জৈনধর্মের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা গেলেও, জৈনধর্মের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন বেশ কিছু সময় পরে প্রবেশ করেছিল। জৈনবিহারে সূর্যদেবতার পূজার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। যেমন - জগদীশপুরের তাম্রশাসনে ভগবান সহস্ররশ্মির অর্থাৎ সূর্যের দেবকুল প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া যায়। পৌণ্ড্রবর্ধনে গুল্মগন্ধিকা গ্রামে যে প্রাচীন জৈনবিহারের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে, পরবর্তীকালে সূর্যের দেউল প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা গেছে।[৭৬] জৈন দেবপূজার কথা উল্লেখ করতে হলে বলতে হয় ব্রাহ্মণ্য মতের সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন মত এদেশে আলোচ্য সময়ে যথাভাবে প্রচলিত হয়েছিল। সেসময়ে জৈনরা দেবতার পূজা এবং জৈন বিহারগুলিতে দান ধ্যান করতে দেখা গেছে। জগদীশপুরের তাম্রশাসনে পাওয়া যায় ভোয়িল নামক একজন জৈন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির নাম। যিনি জৈনবিহার এবং সূর্য-দেবকুলে ভূমিদান করেছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশের পাহাড়পুর তাম্রশাসনে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ নাথশর্মা ও তার পত্নী রামী বটগোহালীর জৈনবিহারে প্রতিমার সেবাপূজার জন্য ভূমি দান করেছিলেন।

বৌদ্ধ দেবতায়ণের প্রথমে দেবতা পূজার কথা বলা না হলেও ধীরে ধীরে এই ধর্মের মধ্যে অসংখ্য দেবতার চিত্রাঙ্কনের ছবি ধরা পড়েছে। বৌদ্ধদের মধ্যে দেখা গেছে সূর্য পূজার প্রচলন। যেমন - বৌদ্ধদের দেবী মারীচী যিনি বৈরোচনকুলের প্রধান দেবী। মারীচী বৌদ্ধদের সূর্যদেবীরূপে পূজিত হতে দেখা যায়। হিন্দুদের সূর্যদেবতা যেমন সপ্তাশ্বরথে আসীন হন হিন্দুদের কল্প জগতে তেমনি মারীচী দেবী সপ্তশূকরের তৈরি রথে আরূঢ়া হয়ে থাকেন।[৭৭] মারীচী দেবীর বিবরণ বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থগুলিতে প্রভূত পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাপ্ত 'গুণইঘর তাম্রশাসনে' দেখা যায় - মহারাজা রুদ্রদত্ত মহাযানিক শাক্যভিক্ষু শান্তিদেবের উদ্দেশ্যে তার প্রতিষ্ঠিত অবলোকিতেশ্বর আশ্রম-বিহারে ভিক্ষুসংঘের সেবার জন্য এবং বিহারের ভগ্নাবশেষ মেরামতের জন্য ভূমি দান করেছেন। পরমসৌগত রাজা ধর্মপাল তার এক মহাসামন্তের বিষ্ণুমূর্তির সেবাপূজার জন্য গ্রাম দান করেছিলেন। পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা মদনপালের প্রধানা রানী পট্টমহাদেবী চিত্রমতিকা মাহাভারত পাঠের জন্য

পণ্ডিত ভট্টপুত্র বটেশ্বরস্বামি শর্মাকে বুদ্ধ ভট্টারকম উদ্দিশ্য হিসেবে একটি গ্রাম দান করেছিলেন। পরমবৈষ্ণব সামলবর্মা ভীমদেব প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধদেবী প্রজ্ঞাপারমিতা মূর্তির সেবাপূজার জন্য ভগবন্তং বাসুদেব ভট্টারকম্ উদ্দিশ্য ভূমি দান করেছিলেন। 'শোভারামপুর তাম্রশাসনে'প্রাপ্ত গৌতমদত্ত যিনি নামে ও ধর্মীয়ভাবে বৌদ্ধ হলেও দুজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন।[৭৮] জৈন ও বৌদ্ধধর্মের দেবতায়নের যে ছবি ধরা পড়েছিল তার কিছুটা নমুনা মঙ্গলকাব্যের দেবভাবনার মধ্যেও ধরা পড়ে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে ধর্মমঙ্গলকাব্যের দেবতা ভাবনায় সূর্যদেবতার আরাধনা করা হয়ে থাকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্মমঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধপ্রভাব আবিষ্কার করেছিলেন। ধর্মমঙ্গলকাব্যের অন্যতম সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন ও ধর্মমঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধপ্রভাব উপলব্ধি করেছেন। ধর্মপূজার পুরোহিত হিসেবে গণিত হয় ডোম সম্প্রদায়ের ব্যক্তি। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাই এই দেবতার থেকে খানিকটা দূরত্ব রেখে চলত। প্রাচীনভারতে মানুষ জরা এবং ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে সূর্যদেবতার আরাধনা করত ধর্মমঙ্গলকাব্যের ধর্মদেবতাকে মানুষ জরা-ব্যধি থেকে মুক্তি পেতে আরাধনা করেছে। বৌদ্ধ দেবভাবনায় যেই সকল দেবীমূর্তির অঙ্কন করা হয়েছিল তাদের রূপের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত দেবীরূপের যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায়। সংস্কৃতিতে দেবীরা ভক্তদের মানসলোকে প্রায় কাছাকাছি রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে। যেমন – বৌদ্ধদেবী পর্ণশবরী, যার পূজা করতে হলে হোম করতে হত, কেননা এই হোমে ঘি, পুড়িয়ে দূষিত বাতাসকে শুদ্ধ করা হত। দেবীর মূর্তিতে ধরা পরে মুখ রক্তবর্ণ ও ললিত হাস্য।[৭৯] মঙ্গলকাব্যের দেবী শীতলা যার কপালে লাগানো হয়েছে চওড়া করে সিঁদুরের টিপ, চুল এলো করে দেবীকে ভৈরবীর বেশে অঙ্কন করা হয়েছে –

ভৈরবীর বেশে চলে শুন ভগবতি, সহরের মধ্যে আছে অনেক বসতি।
... ...
নানামতো নৈবিদ্ধ করএ সাবধান গণ্ডার মেষ য়জা বলিদান।
কৃতাঞ্জলি হয়া রাজা তব স্তুতি করি জনম সফল মাতা কর গ ইশ্বরি।
শঙখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল বাজায় সহরে আশি মণ ধূনা পোড়ায় মস্তক-উপরে।
পূজায় সন্তুষ্ট মাতা হইল তখন রাজার তরেতে বলে মধুর বচন।[৮০]

ধর্মমঙ্গলকাব্যে লাউসেনের মাতা পুত্রলাভ করে খুশি হয়ে বিপ্রদের মধ্যে গোধন ও ধরণীধন দান করেছে। ধর্মের নামে দান-ধ্যান ভারতবর্ষের মানবের মধ্যে চিরকাল বজায় ছিল।

চ. বৃক্ষপূজা: আদিম সমাজের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় মানব সমাজ প্রথমে জঙ্গলে বসবাস করত। জঙ্গলে অবস্থিত সকল উদ্ভিদ এবং প্রাণী থেকে রক্ষা পেতে মানুষ জঙ্গলের পূজা করতে শুরু

করে। আদিম সমাজের এই ভাবনা থেকে মানুষ সমাজে বসবাস করতে শুরু করলেও পুরোনো বিশ্বাসকে সমাজের মধ্যে রেখে ভরণ-পোষণ করতে থাকে। জৈনদের সংস্কারে বৃক্ষকে পূজনীয় বলে গ্রহণ করেছে। জৈনদের যে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের নাম পাওয়া যায় জৈন ইতিহাসে। সেই তীর্থঙ্করদের মূর্তিকল্পনার সঙ্গে তারা গাছের চিত্র জুড়ে দিয়েছে। যেমন - জৈনতীর্থঙ্কর ঋষভনাথ, অজিতনাথ, অভিনন্দনাথ ও অন্যান্য তীর্থঙ্করের সঙ্গে বৃক্ষের সম্পর্ক জুড়ে থাকতে দেখা গেছে। বাংলাদেশের বরেন্দ্র মিউজিয়াম-এ জৈনতীর্থঙ্করদের যে কয়েকটি মূর্তি সংরক্ষিত হয়েছিল সেখানেও তীর্থঙ্করদের মূর্তির সঙ্গে গাছের সম্পর্ক জুড়ে রয়েছে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত ঋষভনাথের মূর্তিতে দণ্ডায়মান তীর্থঙ্করের মাথার উপরে গাছের ডালে কিছু লতা-পাতা জড়িয়ে রয়েছে।[৮১] জৈন মহিলাচারের মধ্যে বৃক্ষ পূজার সরাসরি প্রচলন দেখা গেছে।

বৌদ্ধদের মধ্যে এই বৃক্ষদেবতার পূজা করতে দেখা গেছে। বৌদ্ধদের মধ্যে বোধিবৃক্ষ নামক একটি বৃক্ষের কথা জানা যায়, যা বুদ্ধদের কাছে পরম পবিত্র এবং পূজনীয় ছিল। অমরাবতীতে এরূপ বোধিবৃক্ষের অস্তিত্বের কথ জানা যায় বৌদ্ধগ্রন্থগুলি থেকে। এই বোধিবৃক্ষের চিত্রে দেখা যায় একটি গাছ বেদীতে ঘেরা রয়েছে। সেই বেদীর সামনে কয়েকজন মানব-মানবী হাঁটুমুড়ে, হাতজোড় করে আরাধনার ভঙ্গিতে বসে রয়েছে।[৮২] দ্বীপবংশ থেকে জানা যায় শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারকালে চতুরঙ্গ মহাসেনা আর ভিক্ষুণীদের সঙ্গে উত্তম বোধিবৃক্ষের একটি শাখা নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। এই বোধিবৃক্ষের শাখা সীমান্তদেশের নিকটবর্তী হলেই দেবগণ মনোরম ক্রীড়া করতে থাকে। দেবতারা পরিচ্ছদ ও পুষ্প, দিব্য মন্দার পুষ্প এবং দিব্য চন্দন চূর্ণ আকাশ থেকে বর্ষিত হতে থাকে। দেবতারা শাস্তার বোধিশাখার কাছে পূজা নিবেদন করে। নাগরাজ, নাগকন্যা, নাগপুত্ররা সকলে এই বোধিশাখার পূজা করে থাকে। জৈন এবং বৌদ্ধদের এই বৃক্ষপূজার আচার রীতিগুলি পরবর্তীকালে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ধরা পড়ে। বৃক্ষপূজার সঙ্গে বৃক্ষদেবতার রূপকল্পনা করা হয়েছে। মনসামঙ্গলকাব্যে মনসার প্রতিরূপ হিসেবে স্নুহী বৃক্ষের প্রচলন দেখা গেছে। লোকায়ত স্তরে বৃক্ষ পূজার কথা জানা যায় নাগপঞ্চমীর দিন মনসা ব্রতকথা পালন করা হয়। সেখানে স্নুহীবৃক্ষের ডাল পুতে সেই ডালের পূজো করা হয়ে থাকে। যেমন - মেদিনীপুর অঞ্চলে নাগপঞ্চমীর দিন ত্রিশিরা ফণীমনসার ডাল ভেঙে এনে প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ আঙিনায় পুঁতে মা-মনসার পূজা করে থাকে। সেখানে মানুষ মনসার

বাহনদের ভয় পায় এবং বিভিন্ন সাপদের (জলখরিস, কাল কেউটে, বোড়া, চিতি, অশ্বনাগ ও ইত্যাদি) হাত থেকে রক্ষা পেতে ত্রিশিরা মনসাগাছের পূজা করে থাকে।[৮৩] মনসামঙ্গলকাব্যের মধ্যে এই বৃক্ষ পূজার ছবি ধরা পড়ে -

কার্ত্তিক মাসের পূজা কহনে না যায়। কুহু তিথি সুহু বৃক্ষে পূজিব তোমায়।।
আখণ্ড সিজের ডাল করিয়া রোপণ। আতব তণ্ডুল রম্ভা নানা আয়োজন।।
করিব তোমার পূজা দেবাসুরগণে। নৌতন সকল দ্রব্য হইব আঘনে।।[৮৪]

দেবী মনসার সঙ্গে আদিম মানবের বৃক্ষপূজার রীতিকে মানুষ সংযুক্ত রেখেছে।

হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন সম্প্রদায়ের মানুষ সমাজের একে-অপরের পাশাপাশি অবস্থান করার ফলে তাদের মধ্যে ভাবগত ও আচরণগত সকল বৈশিষ্ট্যের আদান-প্রদান হয়েছে। এই তিন সমাজের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সবদিক থেকে সমাজের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটেছিল যার প্রমাণ এখনও সমাজ বহন করে আসছে। প্রাচীনভারত থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয়শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে ধর্ম, সমাজজীবন এবং সংস্কৃতির দিক থেকে নানবিধ সংকটের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্যকে। জৈনদের দুটি সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধধর্মের প্রধান দুটি বিভাজনের পরবর্তীকালে, ভারতীয় সমাজের বৌদ্ধদের উত্তর মহাযানকাল যেখানে নবাগত বৌদ্ধদের নানাবিধ অদ্ভুদ আদর্শ, বিভিন্ন মতবাদ ও নানাবিধ আচরণ যেগুলির সঙ্গে মিশে যাওয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজের উত্তর-স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম, সমাজ, দেবায়তন, আচার-বিচার প্রভৃতি ধারণাগুলি সৃষ্টি হয়েছিল। এখানে গড়ে উঠেছিল নূতন বৌদ্ধধর্ম ও সমাজ বনাম নূতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজ।[৮৫] জৈনভাবনা, বৌদ্ধভাবনা এবং তাদের ধ্যানধারণাগুলি তৎকালীন রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনগত প্রভাবের ফলে বিভিন্ন বিরোধ ও সংঘাতের মাধ্যমে মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তরালে অন্যান্য ধর্মগুলি রূপবদল করে রয়েছে। যেগুলির আসল রূপের কাছে ফিরে যেতে হলে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের দীর্ঘ ইতিহাসকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। মধ্যযুগের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। সকল ধর্মের মধ্যে ঐক্যের ধারাকে চিহ্নিত করা সম্ভব হতে পারে। এই ঐক্যের ধারাকে চিহ্নিত করা সম্ভব হলে ভারতবর্ষের মহান ঋষিদের উদ্ভব এবং বহির্বিশ্বের হাতছানিতে তাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সমগ্র বিশ্বের কাছে তারা গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিলেন। তাদের ধর্মীয় বার্তাগুলি পুনরায় বিশ্বের কাছে পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন। এইসকল মহান ধর্মীয়ভাবনা এবং তাদের কর্মকাণ্ডের কথা পৌঁছে যাবে সমাজের অতল গহ্বরে। ইতিহাসকে বাদ দিয়ে নতুন সভ্যতা যেমন গড়তে পারে না, তেমনি

পুরনো সমাজের ধর্ম, সংস্কৃতিকে বাদ দিয়েও নতুন সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবকে সরিয়ে রেখে মঙ্গলকাব্যের যুগ সূচীত হতে পারেনি, উভয়ের মধ্যে নাড়ীর টান রয়েছে।

৪. ৪ ভারতীয় হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবী এবং বৈদেশিক বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর মূর্তি, চিত্র প্রকরণের তুলনামূলক আলোচনা

প্রাচীন ভারতের সমাজের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় সেখানে ধর্মের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেসময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতের সমাবেশ দেখা যায়। যেগুলির মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন এই তিন ধর্মবিশ্বাস ভারতবর্ষে উৎপত্তি লাভ করলেও ভারতবর্ষের বাইরে এই ধর্মমতগুলি সামান্য কিছু দেশ বা দেশের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে এই ধর্মমতগুলি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। যেমন - হিন্দুধর্ম হল প্রাচীন ভারতের উপমহাদেশের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত একটি প্রাকৃতিক ধর্ম। এই ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের ধর্মমতকে সনাতন ধর্ম নামে অভিহিত করে থাকে। হিন্দুধর্ম সারা পৃথিবীব্যাপী প্রকাশিত একটি ধর্ম নয়। এই ধর্মের কোনো একক প্রতিষ্ঠাতা নেই। অনাদিকাল থেকে এই পরম্পরা চলে আসছে লৌহযুগীয় ভারতের ঐতিহাসিক বৈদিকধর্মে এই ধর্মের শিকড় নিবদ্ধ ছিল। হিন্দুধর্মকে বিশ্বের প্রাচীনতম জীবিত ধর্মবিশ্বাস বা প্রাচীনতম জীবিত প্রধান মতবাদ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এই ধর্মের মধ্যে চিরন্তন কর্তব্যের কথা বলা হয়ে থাকে, যেমন - সততা, অহিংসা, ধৈর্যশীলতা, সমবেদনা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি আরো অনেক ভাবনা যেগুলি মানুষকে জীবনের পথে উন্নতিলাভের উপায়। এই ধর্ম মানুষকে সর্বদা বাহ্যিক আচার বিচারের থেকে পরম সত্য জ্ঞানের পথে মুখ্য স্থান দেয়। জনসংখ্যার বিচারে হিন্দুধর্ম খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের পর বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ধর্মমত হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছে। হিন্দুমতে বিশ্বাসী মানুষ বসবাস করে বিশেষ করে ভারতবর্ষে। নেপাল, মরিশাস ও ইন্দোনেশীয়ার বালি দ্বীপে যেখানে কিছু সংখ্যায় হিন্দুরা বসবাস করে থাকে।

বৌদ্ধধর্ম হল মূলত গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত একটি ধর্মবিশ্বাস এবং জীবনদর্শন। বৌদ্ধধর্ম আপাত অর্থে জীবন দর্শনের কথা বলে। গৌতমবুদ্ধ তার ধর্মমত প্রচারের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন এবং সকল প্রাণীজগতের মধ্যে এবং বিশ্বের সর্বত্র এই ধর্ম প্রচারের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন মানুষের মধ্যে অগণিত নৈতিকতার বিচ্যুতি থাকে, সেগুলি নিজেদের মধ্য থেকে নির্মূল করে ধর্মপ্রচারে মনোযোগী হতে হবে। সর্বদা সততার উপলব্ধি রাখার

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। বুদ্ধের মতবাদকে অনুভব করার পথ সঠিকভাবে খুঁজে বার করতে হবে।[৮৬] আজকের সময়ে এসে বৌদ্ধ অনুসারীদের সংখ্যা হিসেব করলে দেখা যায় বৌদ্ধধর্ম হল বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তর অংশে প্রচলিত একটি ধর্ম। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে ভারতীয় উপমহাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হতে থাকে। ভারতবর্ষের বাইরেও যেমন- শ্রীলংকা, ভারত, ভুটান, নেপাল, লাওস, কম্বোডিয়া, মায়ানমার, চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও কোরিয়া-সহ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে এই বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হতে দেখা যায়। সবচেয়ে বেশি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বাস করে চীনে। বাংলাদেশের উপজাতীদের বৃহত্তর অংশ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হতে দেখা গেছে।

জৈনধর্ম হল প্রাচীন ভারতে উৎপন্ন হওয়া একটি ধর্ম। এই ধর্ম সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি অহিংসার শিক্ষা দেয়। প্রাচীনকালে জৈনপন্থীরা মনে করত অহিংসা ও আত্ম-সংযম হল মোক্ষ এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিলাভের একটি রাস্তা। জৈনমতে জিন নামক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের দ্বারা আচরিত ও প্রচারিত পথের অনুগামীদের বলে জৈনপন্থী। জৈনধর্মকে অনেক সময় শ্রমণ প্রথা থেকে উদ্গত ধর্মমত বলা হয়ে থাকে। বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মমতগুলির মধ্যে অন্যতম একটি স্থান দখল করে রয়েছে এই ধর্মমত। প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ এবং সর্বশেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর-এর সময় পর্যন্ত জৈনধর্মের বিস্তার ঘটেছিল। মহাবীরের পরে খ্রিস্টরবর্তীকালে আরও কয়েকজন অর্হৎ-দের মাধ্যমে জৈনধর্ম প্রচারিত হতে থাকে ভারতবর্ষ ও বহির্ভারতের দেশগুলিতে। আধুনিক বিশ্বে জৈনধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা পূর্বের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেকাংশে কমে গেলেও এই ধর্মীয়ভাবনা একসময় বেশ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। বর্তমান ভারতে জৈন ধর্মবলম্বীদের আনুমানিক সংখ্যা প্রায় ১০,২০০,০০০। উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ, দূরপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া ও বিশ্বের অন্যত্রও কিছু জৈন ধর্মাবলম্বীদের দেখা যায়।

ক. হিন্দুধর্ম: প্রাচীনভারতীয় সমাজে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি হলেও এই ধর্মমত বিস্তৃতিলাভ করেছে দীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে। ভারতবর্ষের বাইরে কয়েকটি দেশে এই ধর্ম বর্তমানে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। চীনে এই ধর্মের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায় -

> About 1316 A.D. he sent some learned *bhikkhus* and scholars to Ceylon and induced the great monk called Mahasami Sangharaja to come to Siam. Under his

inspiration and the active efforts of the King, Buddhism and Pali literature not only obtained a firm footing but also spread to a number of small Hinduized states in the territory now called Laos, such as Alavirastra, Khmerrastra, Suvarnagrama, Unmarga-sila, Yonakarastra, and Haripunjaya. Many of these still possess their local chronicles written in Pali. From this time onwards, Buddhism flourished in Siam and the neighbouring regions, and Brahmanism declined until it almost disappeared, leaving only a few traces in public ceremonies and customs.[৮৭]

এই ধর্মের মধ্যে দেখা যায় কিছু সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে দেবতাদের আবির্ভাব ঘটেছে। যেখানে মানুষ এই দেবতাদের ওপর বিশ্বাস রেখে জীবনের পথে এগিয়ে চলে। এই ধর্মের বিশেষ দেবতারা হলেন - সূর্য, শিব, বিষ্ণু, প্রজাপতি ব্রহ্মা, গণেশ, শক্তি দেবীকালী এবং মাতৃকা দেবীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রাচীন ভারতের অন্যান্য যেসকল দেশে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য বিস্তারলাভ করতে দেখা গেছে সেখানে হিন্দু দেবতাদের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। যেমন - হিন্দুদের দেবতা সূর্য যাকে সৌর জগতের প্রধান সৌর দেবতা মনে করা হয়। এই দেবতাকে আদিত্যগণের অন্যতম দেবতা মনে করা হয়। হিন্দু পুরাণগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে এই দেবতা কশ্যপ ও তার অন্যতমা পত্নী অদিতির গর্ভজাত পুত্র। কোনো কোনো পুরাণ মতে তিনি ইন্দ্রের পুত্র। সূর্য প্রণাম শ্লোক থেকে সূর্যের বর্ণনা পাওয়া যায় এইরূপ - জবাপুষ্পের মত লোহিত বর্ণ, অন্ধকারনাশক মহাদ্যুতিবিশিষ্ট সর্ব্বপাপবিনাশক কশ্যপপুত্র সূর্য। সূর্যের কেশ ও বাহু উভয়ের বর্ণ সোনালী। তিনি সাতটি ঘোড়া দ্বারা বাহিত রথে চড়ে আকাশপথে পরিভ্রমণ করেন। সূর্যের রথের ঘোড়াগুলি সাতটি পৃথক পৃথক রঙের, যা রঙধনুর সাত রঙের প্রতীক মনে করা হয়। তিনি সপ্তাহে সাতদিনের মধ্যে রবিবারের অধিপতি বলে মনে করা হয়। এই রথারূঢ় সূর্যদেব তাঞ্জোর ঘরানার চিত্রকলা থেকে পাওয়া যায় যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রাপ্ত। হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যে সূর্য দেবতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তিনি একমাত্র দেবতা যাকে মানুষ প্রত্যহ পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ করতে পারে। পরবর্তীকালে শৈব ও বৈষ্ণব মতে সূর্যকে যথাক্রমে শিব ও বিষ্ণুর বিভিন্ন রূপভেদ মনে করে নিজেদের ধর্মীয় মতবাদকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বৈষ্ণবেরা সূর্যকে সূর্যনারায়ণ নাম দিয়ে তার পূজা করে থাকে। শৈব ধর্মতত্ত্বে শিবের অষ্টমূর্তি রূপের অন্যতম মূর্তি পাওয়া যায় সূর্যমূর্তি। হিন্দুপুরাণে সূর্যের আরও কয়েকটি নাম পাওয়া যায়। যথা - বিবস্বান, রবি বা আগুনপাখি, আদিত্য বা অদিতির পুত্র, পূষা বা শ্রেষ্ঠ পাপনাশক, দিবাকর বা দিনের স্রষ্টা, সবিতৃ বা উজ্জ্বলকারী, অর্ক বা রশ্মি, মিত্র বা বন্ধু, ভানু বা আলোক, ভাস্কর, গ্রহপতি ও ইত্যাদি।

বাংলাদেশের বরেন্দ্র মিউসিয়ামে কয়েকটি সূর্যমূর্তি পাওয়া যায়। যেখানে সূর্যের রূপবর্ণনা পাওয়া যায় সেই সূর্যের রূপ ও কার্যের সঙ্গে ইরান ও পার্শিয়ানের সূর্যদেবতার কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। পার্শিয়ান দেবতাদের মধ্যে মিথরা (উদিত সূর্যের দেবতা) যাকে উদিত সূর্যের দেবতা মনে করা হয়। এই মিথরা সম্প্রদায়ের দেবতাদের অস্তিত্বের কথা প্রাচীন রোম নগরীর মধ্যে পাওয়া যায়। পার্শিয়াতে এই মিথরাইসম্ কাল্ট-এর আগমন ঘটেছে জোরাস্ট্রিয়ানিসম্ নামক সম্প্রদায়ের দেবতার থেকে। পার্শিয়ান লোককথা এবং মিথ থেকে জানা যায় দেবতা মিথরা প্রথমে ছিলেন কল্যাণের দেবতা। পরে তার রূপ পরবর্তিত হয়েছে। হভার কস্তা (পূর্ণ সূর্যের দেবতা) যাকে পূর্ণ সূর্যের দেবতা মনে করা হয়।[৮৮] এখানে হেলিওড্রোমাস নামক একজন দেবতার কথা জানা যায়, যিনি সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাকে সূর্যের বার্তাবহক দেবতা মনে করা হয়। যার মূর্তিতে থাকে একটি উজ্জ্বল মুকুট, হাতে থাকে মশাল ও একটি গ্লোব। এই বৈদিক সূর্যদেবতার সঙ্গে ইজিপ্তের রা অথবা রাআ নামক দেবতার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। মেক্সিকোর রায়মী নামক দেবতার সঙ্গে বাংলার রায় দেবতার সাদৃশ্যের সম্ভাবনার কথাও অস্বীকার করা যায় না।

হিন্দুদের দেবতা বিষ্ণু যিনি ত্রিমূর্তির (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) অন্যতম সদস্য। হিন্দুধর্মের ত্রিমূর্তি ধারণায় ব্রহ্মাকে বিশ্বচরাচরের সৃষ্টির প্রতীক, বিষ্ণুকে স্থিতির প্রতীক ও শিবকে ধ্বংসের প্রতীক রূপে কল্পনা করা হয়েছে। দেবতা বিষ্ণু হিন্দুদের কাছে বিশ্বের প্রতিপালক দেবতা রূপে পরিচিত হয়েছে। বিষ্ণুকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দেবতা কৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। স্মার্তপণ্ডিত আদিশংকর তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, স্মার্ত মতে ঈশ্বরের যে পাঁচটি প্রধান রূপের উল্লেখ করা হয়েছে ভগবান বিষ্ণু তাদের মধ্যে অন্যতম একজন। হিন্দুপুরাণে দেবতা বিষ্ণুর রূপের বর্ণনা পাওয়া যায় এইরূপ। যথা - গাত্রবর্ণ ঘন মেঘের ন্যায় নীল বা ঘনশ্যাম, চতুর্ভূজ এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করে থাকে। হিন্দু ধর্মীয়গ্রন্থ ভগবদ্গীতা-য় বর্ণনা করা হয়েছে বিষ্ণুর বিশ্বরূপের। ভগবদ্গীতা অনুসারে, ধর্মের পালন এবং দুষ্টের দমন ও পাপীর ত্রাণের জন্য বিষ্ণু অবতার গ্রহণ করেছে বারবার। পুরাণে বিষ্ণুর দশাবতারের উল্লেখ করা হয়েছে। বিষ্ণুর এই দশ প্রধান অবতারের মধ্যে নয় জনের জন্ম অতীতে হয়েছে এবং এক জনের জন্ম ভবিষ্যতে কলিযুগের শেষলগ্নে হবে বলে হিন্দুরা বিশ্বাস করে থাকে। বিষ্ণু সহস্রনামে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উক্তিতে বিষ্ণুকে সহস্রকোটি যুগ ধারিনে নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

যার অর্থ হল বিষ্ণুর অবতারগণ সকল যুগে জন্মগ্রহণ করে থাকে। সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিষ্ণুমূর্তির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন মন্দির ও জাদুঘরে বিষ্ণুর অনেক মূর্তি পাওয়া যায়। কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম'-এ বেশ কয়েকটি বিষ্ণুমূর্তি সংরক্ষিত রয়েছে। সেখানে কিছু মূর্তিতে বিষ্ণুর অন্তিম শয্যার রূপ, কোথাও পাওয়া যায় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী বিষ্ণুর চতুর্ভুজ মূর্তি।

বাংলাদেশের রংপুর জেলা থেকে কয়েকটি ব্রোঞ্জের বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার হয়েছে। সেখানে ভারতীয় বিষ্ণুমূর্তির ন্যায় দেবতা বিষ্ণু পদ্মাসনে, শয্যার ভঙ্গিমায় আসীন হয়েছে। সেখানে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ দণ্ডায়মান মূর্তির নমুনাও পাওয়া গেছে। হিন্দুদের ত্রিমূর্তির অন্য একজন দেবতা হলেন শিব। যাকে হিন্দুধর্মের অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ দেবতা মনে করা হয়েছে। এই দেবতাকে সনাতন ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে পরমসত্ত্বা রূপে কল্পনা করা হয়। শিবকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় এই তিনের অধিষ্ঠাতা দেবতা মনে করা হয়। এই দেবতাকে জন্মরহিত, শাশ্বত, সর্বকারণের কারণ; আবার স্ব-স্বরূপে বর্তমান, সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি ও তুরীয়, অন্ধকারের অতীত, আদি ও অন্তবিহীন বলে প্রণাম মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দুপুরাণে মনে করা হয় পৃথিবীতে যখন আলো ছিল না, অন্ধকার ছিল না, দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না, সৎ-অসতের ভেদাভেদ ছিল না তখন থেকে ভগবান শিবের অস্তিত্ব ছিল। বৈদিক গ্রন্থগুলিতে দেবতা শিব সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। হিন্দুপুরাণে ভগবান বিষ্ণু এবং তার অবতার স্বরূপগুলি শিবউপাসনা করে থাকে। হিন্দুধর্মের তিনটি সর্বাধিক প্রাচীন সম্প্রদায়ের অন্যতম শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতা হলেন শিব। স্মার্ত সম্প্রদায়ের পূজিত পাঁচজন ঈশ্বরের প্রধান রূপের মধ্যে (গণেশ, শিব, সূর্য, বিষ্ণু ও দুর্গা) শিবের কথা জানা যায়। হিন্দুরা সর্বোচ্চ স্তরে শিবকে সর্বোৎকর্ষ অপরিবর্তনশীল পরম ব্রহ্ম মনে করা হয়। শিবের আবার অনেকগুলি সদাশয় ও ভয়ঙ্কর মূর্তি রয়েছে। সদাশয় রূপে তিনি একজন সর্বজ্ঞ যোগীরূপে ধরা দেয়। কৈলাস পর্বতে সন্ন্যাসীর জীবন-যাপন করে, গৃহস্থ রূপে তিনি হিমালয় কন্যা গৌরীর পতিদেবতা। তাদের গৃহে গণেশ ও কার্তিক নামে দুটি পুত্রের কথা জানা যায়। শিবকে যোগ-ধ্যান ও শিল্পকলার দেবতা মনে করা হয়। দেবতা শিব চিকিৎসা বিদ্যা ও কৃষিবিদ্যার অধিষ্ঠিত দেবতা এমনটা মনে করা হয়। দেবতা শিবের ভারতে যে সকল মূর্তি পাওয়া যায় সেখানে দেখা যায় - শিবমূর্তির কপালে থাকে তৃতীয় নয়ন, গলায়

থাকে নাগের মালা। মাথার জটার ওপর অবস্থান করে অর্ধচন্দ্র, জটার মধ্যে থেকে নির্গত হয় গঙ্গা, হাতে থাকে ত্রিশূল ও ডমরু বাদ্য। হিন্দুদের মতে শিবকে শিবলিঙ্গ নামক বিমূর্ত প্রতীকরূপে পূজা করা হয়ে থাকে।

শিবমূর্তি গঠন নিয়ে একাধিক ধর্মীয়সম্প্রদায়ের ধারণা একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যার নিদর্শন পাওয়া যায় মহারাষ্ট্রের শৈবদেবতার মধ্যে। মহারাষ্ট্রে কৃষি ও পশুপালনের দেবতা ছিলেন খাণ্ডোবা, যিনি মূলত একজন স্থানীয় দেবতা। মহারাষ্ট্রে এই খাণ্ডোবা দেবতার প্রধান উপাসনাকেন্দ্র ছিল জেজুরি। এই খাণ্ডোবা দেবতার রূপকল্পটি খানিকটা হিন্দুদেবতা শিবের ন্যায়, এই দেবতার পূজা পদ্ধতি শিবপূজার মতো হয়। ভারতবর্ষের বাইরে নেপাল, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের কিছু অংশে শিবপূজার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ করা যায়। ভারতবর্ষের এই পার্শ্ববতী দেশ নেপাল, যেখানে দেশের মানুষের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয়গোষ্ঠী এবং ধর্মীয়বিশ্বাসের বৈচিত্র্যতা। এই দেশের গণতন্ত্রের ভাবনার মধ্যে একটি বহু-সাংস্কৃতিক, বহু-জাতিগত, বহু-ভাষাগত এবং বহু-ধর্মীয় ভাবনার পূর্ণদেশ। এই দেশের প্রধান ধর্ম হিসেবে হিন্দুধর্মকে ধরা হয়। এখানে হিন্দুদের বিশেষ কয়েকটি তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠতে দেখা গেছে। হিন্দুধর্মের দেবতা শিবকে নেপালের হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্যাপকভাবে পূজিত হতে দেখা যায়। নেপালে একটি বৃহৎ পশুপতিনাথ মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। কাঠমন্ডুতে অবস্থিত এই শিবমন্দিরটি বিশ্বের সর্ববৃহত্তম শিবমন্দির হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছে। যা বিশ্বের সকল তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের আকর্ষিত করে। নেপালের পালপা জেলার মহামরিয়ুনযায়া শিবাসন নামক স্থানে ভগবান শিবের একটি সর্ব বৃহৎ ধাতব মূর্তি পাওয়া যায়। এই শিবের মূর্তিতে রয়েছে গলায় সাপ, মাথার ওপর জটা বাধা, হাতে ত্রিশূল ও ডমরু। বাংলাদেশের ঢাকা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি শিবের মূর্তি পাওয়া যায়। যেখানে শিবের মূর্তিগুলির মধ্যে একই ধরণের বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন অটুট রয়েছে। বরেন্দ্র মিউজিয়ামে সংরক্ষিত দেবতা শিবের কয়েকটি মূর্তি পাওয়া যায় যা রাজশাহী জেলার তানোর অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত। শিবের সঙ্গে তার বাহন নন্দী রয়েছে সর্বদা। এই শিব মূর্তির তিনটি মুখ, বারোটি হাত, হাতে থাকছে কপোল, ত্রিশূল এবং ডমরু।[৮৯]

দেবতা ব্রহ্মাকে হিন্দুধর্মাবলম্বীরা সৃষ্টির দেবতা জ্ঞানে পূজা করে থাকে। বিষ্ণু ও শিবের সঙ্গে দেবতা ব্রহ্মা হিন্দুদের ত্রিমূর্তি দেবতার ধারণার মধ্যে বিরাজ করে থাকে। বৈদিক দেবতা প্রজাপতিকে হিন্দুদের দেবতা ব্রহ্মার স্বরূপ মনে করা হয়ে থাকে। দেবতা ব্রহ্মার পত্নীরূপে পাওয়া যায় হিন্দুদের বিদ্যার দেবী সরস্বতীর নাম। ব্রহ্মাকে মালয় ভাষায় দেবতা বেরাহমা নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। থাইল্যান্ডের দেবতাভাবনার মধ্যে ব্রহ্মার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তাদের এই ব্রহ্মারূপী দেবতার নাম ফ্রা ফ্রোম। বাংলাদেশে ব্রহ্মাকে বহরম বা বিরিঞ্চি নামে পূজা করা হয়ে থাকে। ব্রহ্মা মূর্তিতে দেখা যায়, চতুর্মুখ বিশিষ্ট দেবতা পদ্মের আসনে অবস্থান করে। এই দেবতা কখনও লাল পদ্মে, কখনও শ্বেতহংসের উপর আসীন হয়ে থাকেন। এই দেবতার গায়ের রং লাল গৌরবর্ণ এবং দেবতা দীর্ঘ এবং উন্নত অঙ্গধারী। এই দেবতার চারটি হাত যার উপরের বামহাতে থাকে কমণ্ডলু, ডানহাতে থাকে স্রুব। নীচের বামহাতে থাকে স্রুব এবং ডানহাতে জপমালা। হিন্দুপুরাণ থেকে জানা যায় এই দেবতার বামপাশে থাকে আজ্যস্থালী, সম্মুখে থাকে বেদ এবং ঋষিগণ। দেবতা ব্রহ্মার বামপাশে অবস্থান করে এবং ডানপাশে সরস্বতী দেবী বিরাজিত থাকেন। প্রাচীনকালে ঋষিগণ ব্রহ্মাররূপ এইভাবে ধ্যানের মধ্যে কল্পনা করে থাকে। হিন্দুপুরাণ থেকে জানা যায় সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা প্রজাপতিদের সৃষ্টি করেছিলেন। যারা মানবজাতির আদিপিতা রূপে পরিগণিত হন। মনুস্মৃতি গ্রন্থে এই প্রজাপতিদের নাম পাওয়া যায়। যাদের নামগুলি ছিল এরূপ, যথা - মারীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতুজ, বশিষ্ঠ, প্রচেতস বা দক্ষ, ভৃগু ও নারদ। সপ্তর্ষি নামে পরিচিত সাত মহান ঋষির স্রষ্টা ছিলেন এই দেবতা ব্রহ্মা। যারা পরবর্তীকালে ব্রহ্মাকে বিশ্বসৃষ্টির কাজে সহায়তা করেন।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মতে শাক্তসম্প্রদায়ের প্রধান দেবী হলেন কালী। এই দেবীর অন্য নাম শ্যামা বা আদ্যাশক্তি। হিন্দুধর্মের মধ্যে যে তন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছিল, সেখানে দেবীকালী হলেন দশমহাবিদ্যা-র প্রধান তান্ত্রিক দেবী। শাক্তরা মনে করে দেবীকালী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি কারণ। বাঙালি হিন্দুদের কাছে কালীদেবীর মাতৃরূপের পূজা বিশেষভাবে জনপ্রিয়। হিন্দুপুরাণ ও তন্ত্র সাহিত্যে দেবীকালীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন - দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী, শ্মশানকালী, মহাকালী, রক্ষাকালী, কৃষ্ণকালী ও প্রভৃতি। কালীমূর্তির কিছুরূপের পূজা হয়ে থাকে, যথা - ব্রহ্মময়ী, ভবতারিণী, আনন্দময়ী, করুণাময়ী ও ইত্যাদি। এই দেবীর চার হাতে থাকে যথাক্রমে -

খড়্গ, অসুরের ছিন্ন মস্তক, বর ও অভয়মুদ্রা। এই দেবীর গলায় থাকে নরমুণ্ডের মালা। এই দেবীর গায়ের রং হয় কালো, মাথায় আলুলায়িত চুল। এই দেবী শিবের বুকের ওপরে দক্ষিণপদ অগ্রে রেখে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকে। ব্রহ্মযামল নামক তন্ত্রগ্রন্থ থেকে জানা যায় দেবীকালী হলেন বাংলাদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বাংলাদেশে প্রাপ্ত দেবীকালীর মূর্তির সঙ্গে ভারতবর্ষের কালীদের রূপের হুবহু মিল পাওয়া যায়। কলকাতার কালীঘাট মন্দিরটি ভারতবর্ষের সবচেয়ে বিখ্যাত একটি কালীমন্দির হিসেবে গণনা করা হয়। এই স্থানকে আবার সতীপীঠ হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। অন্যান্য বিখ্যাত কালী মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়, যথা - দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি, আদ্যাপীঠ, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি ইত্যাদি। ভারতবর্ষের অন্যত্র কয়েকটি বিখ্যাত কালীমন্দিরের কথা জানা যায়। যেমন - আসামে কামাখ্যা, ত্রিপুরাতে ত্রিপুরেশ্বরী কালীমন্দির। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে অবস্থিত রমনা কালীমন্দির একটি প্রাচীন কালীমন্দির। যেখানে ভারতবর্ষের হিন্দুদেরন্যায় কালীদেবীর পূজা হয়ে থাকে।

হিন্দুদের বিদ্যার দেবী হিসেবে পরিচিত হলেন দেবী সরস্বতী। এই দেবীকে জ্ঞান, সংগীত, শিল্পকলা, বুদ্ধি ও বিদ্যার হিন্দু দেবীরূপে কল্পনা করা হয়ে থাকে। বৈদিক শাস্ত্র ঋগ্বেদে প্রথম সরস্বতী দেবীর নামোল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এই দেবী হিন্দুধর্মের একজন গুরুত্বপূর্ণ দেবী হিসেবে গণিত হয়েছেন। হিন্দুপুরাণ মতে বসন্তপঞ্চমী অর্থাৎ মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা করে থাকে। জ্ঞান, সংগীত ও শিল্পকলার দেবী হিসেবে ভারতের বাইরে জাপান, ভিয়েতনাম, বালি (ইন্দোনেশিয়া) ও মায়ানমারে সরস্বতী পূজার প্রচলনের কথা জানা যায়। এই দেবীর মূর্তি সাধারণত থাকে এইরূপ, যথা - এই দেবী থাকেন আদ্যন্তবিহীনা, শ্বেতপদ্মে আসীনা, শ্বেতপুষ্পে শোভিতা, শ্বেতবস্ত্র-পরিহিতা, শ্বেতচন্দনে চর্চিতা, শুভ্রবর্ণা এবং অলঙ্কারে ভূষিতা এবং শ্বেতগন্ধে অনুলিপ্তা। এই দেবীর একহাতে থাকে শ্বেত রুদ্রাক্ষের মালা, অন্য হাতে থাকে শ্বেতবীণা। এই দেবীর রূপকল্পনায় দ্বিভুজ আবার কখনও চতুর্ভূজ মূর্তি ধারণ করে। এই দেবীর বাহন হিসেবে থাকে হাঁস। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সাধারণত ময়ূরবাহনা চতুর্ভূজা সরস্বতী দেবী পূজিত হন। এই চতুর্ভুজা দেবী চার হাতে অক্ষমালা, কমণ্ডলু, বীণা ও বেদপুস্তক ধারণ করে। বাংলাদেশে এক হাতে পুস্তক ও অন্যহাতে বীণাধারী সরস্বতী দেবীর পূজা হতে দেখা যায় শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে।

জাপানের বেন্যাইতেন নামে একজন জাপানি বৌদ্ধদেবীর নাম জানা যায়। এই দেবীর রূপকল্পনায় খানিকটা হিন্দুদেবী সরস্বতীর অনুসরণ লক্ষ করা যায়। এই দেবীর মন্ত্রের সঙ্গে হিন্দুসরস্বতী দেবীর পূজার মন্ত্রের যোগাযোগ রয়েছে এমনটা অনুমান করা হয়। জাপানিরা এই দেবীকে পঞ্চভূতে যা কিছু প্রবহমান বা প্রবাহের আকারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। সেই সমস্ত উপাদানের দেবী বলে চিহ্নিত করে থাকে। বেন্যাইতেন দেবীর সঙ্গে জল, সময়, শব্দ ও বাক্য, সঙ্গীত এবং জ্ঞান এই সমস্ত কিছুর সম্পর্ক রয়েছে।

হিন্দুধর্মের অন্য একজন পরিচিত লৌকিক দেবী হলেন মনসা। এই দেবীকে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনে করা হয়। প্রধানত বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব অঞ্চলগুলিতে এই দেবীর পূজা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে এই দেবীর অল্পমাত্রায় পূজার প্রচলনের নিদর্শন পাওয়া যায়। পূর্বকাল থেকে এই দেবীর সঙ্গে সাপের বিশেষ যোগাযোগ ছিল বলে মনে করা হত। সর্পদংশনের হাত থেকে রক্ষা পেতে, সাপের বিষ থেকে প্রতিকার পেতে, প্রজনন ও ঐশ্বর্যলাভের উদ্দেশ পূজা করা হত। এই দেবীর পূজা করতে ঘট প্রতিস্থাপন করা হয়ে থাকে। মানব সমজের গতি অর্থাৎ প্রবাহমানতার মাধ্যম হলো সৃষ্টি। এই মনসা ঘট হলো গর্ভবতী নারীর প্রতীক। এই মনসা ঘট ফসলের উর্বরতার প্রতীক হিসেবে পরিগণিত হয়। এই ঘটকে প্রজনন শক্তির প্রতীক হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। মনসার আরও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন - সে নাগ-রাজ বাসুকীর ভগিনী এবং ঋষি জরৎকারুর পত্নী। পুরাণ ও কিংবদন্তি অনুসারে মনসাকে শিবের কন্যা মনে করা হয়ে থাকে। হিন্দু ধর্মীয়গ্রন্থগুলিতে মনসাকে বিষহরি বা বিষ ধ্বংসকারিণী, নিত্যা বা চিরন্তনী ও পদ্মাবতী নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। দেবী মনসার মূর্তিতে দেখা যায় - দেবী সর্প-পরিবেষ্টিত, একটি পদ্মের উপর বসে থাকে আবার কখনও একটি সাপের উপর দাঁড়িয়ে থাকেন। এই দেবীর মাথার ওপর সাতটি সাপের ফনা দেবীকে ছাউনির মতো ঢেকে রাখে। হিন্দুপুরাণ থেকে শিব পত্নী চণ্ডীর দ্বারা মনসার একটি চোখ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। মনসাকে একচক্ষু-বিশিষ্ট দেবী ও বলা হয়ে থাকে। উত্তরপূর্ব ভারতের হাজং উপজাতির মানুষেরা তাই এই দেবীকে কাণি দেউ নামে পূজা করে থাকে। বাংলাদেশে মনসাদেবীর মূর্তিতে দেখা যায় সাপের উপস্থিতি। কোনো কোনো মূর্তিতে আবার পাঁচ মাথাযুক্ত সাপের

ফণাও দেবী মনসার মাথার ওপরে ছত্রের ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ ও ভারতে এখনও আষাঢ় মাসে মনসাপূজা করে থাকে।

হিন্দুদের ধনের দেবীরূপে পূজিত হন লক্ষ্মী বা মহালক্ষ্মী দেবী। আধ্যাত্মিক সম্পত্তি, সৌন্দর্য ও সৌভাগ্যের দেবী হিসেবে লক্ষ্মী দেবীকে মনে করা হয়ে থাকে। এই দেবীকে হিন্দুরা দেবতা বিষ্ণুর পত্নীজ্ঞানে পূজা করে থাকে। এই দেবীর বাহন হল পেঁচা। দেবীর কিছু মূর্তিতে দেখা যায়, লক্ষ্মীদেবী পেঁচার ওপর বসে থাকে, দেবীর কাঁখে থাকে ধনপূর্ণ কলসি। লক্ষ্মীদেবীর স্তবে দেবীর রূপটি বর্ণনা করা হয়েছে, যথা - এই দেবী চতুর্ভুজা, দেবীর ডান হাতে থাকে পাশ আর অক্ষমালা, বাম হাতে থাকে পদ্ম এবং অঙ্কুশ। দেবীর অন্য দুই হাতের মধ্যে ব্যগ্র হাতে ধারণ করেন স্বর্ণপদ্ম ও দক্ষিণ হাতটি প্রসারিত থাকে বরদাত্রীর ন্যায়। এই দেবী পদ্মাসনে উপবিষ্টা, শ্রীরূপা, ত্রিলোকমাতা, গৌরবর্ণা, সুন্দরী, সর্বালঙ্কার ভূষিতা এই ভাবেই দেবীকে ধ্যানে কল্পনা করা হয়। হিন্দুদের গৃহে কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজার রীতি প্রচলিত রয়েছে। ভারতবর্ষে দেবীলক্ষ্মীর তিনবার পূজা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে ফসলের উৎপন্নকে কেন্দ্র করে প্রধান তিনটি লক্ষ্মী দেবীর পূজা হয়ে থাকে। যেমন - ফাল্গুন মাসে বীজ বপনের পূর্বে হরিতা-দেবী বা সবুজবর্ণের দেবী। চাষিরা এই ব্রতপালন করে রবিবারে ও বৃহস্পতিবারে, দেবীপূজা করে ঘর থেকে বীজ বার করা হয়। দ্বিতীয় লক্ষ্মীপূজা হয়ে থাকে আশ্বিন মাসে। এই সময় ফসলের রং সোনার মতো হয় বলে এই লক্ষ্মীদেবীকে স্বর্ণলক্ষ্মী বা হলুদবর্ণের লক্ষ্মী বলা হয়ে থাকে। তৃতীয় লক্ষ্মীদেবীর পূজা হয়ে থাকে অঘ্রাণ মাসে। এইসময় পাকা ধান ঘরে আনার পালা, এই দেবীর নাম হল অরুণা লক্ষ্মী। এই লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে মেক্সিকোয় একজন শস্যের দেবী পাওয়া যায় –

> A special group of deities called Centeotl presided over the agriculture of Mexico, each of whom personified one or other of the various aspects of the maiza-plant. The chief goddess of maize, however, was Chicomecohault (seven-servent). her name being an allusion to the fertilising power of water, which element the Mexicans symbolised by the serpent. As Xiolen she typified or xiolet, or green ear of the maize.[১০]

এই স্থানের নারীদের মধ্যে কিছু লক্ষ্মীব্রত পালন করার রীতিও লক্ষ করা যায়। হিন্দুদের লক্ষ্মী মূর্তি কল্পনার সাদৃশ্য আরও নিকট হয়।

খ. বৌদ্ধদেবতা: প্রাচীন ভারতবর্ষে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গৌতমবুদ্ধের জন্ম হয়। এরপর তিনি গৃহত্যাগ করে বোধিপ্রাপ্ত হয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচলন করেন। ভারতসহ ভারতবর্ষের বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে মননিবেশ করেন। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পরে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বৌদ্ধধর্মকে ভারতবর্ষের বাইরে প্রচার করতে উৎসাহ দেখিয়েছেন। সম্রাট আশোক যিনি বৌদ্ধধর্মেক ভারতবর্ষের বাইরে প্রচার করতে নিজের পুত্র কন্যাকে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রথম মহাসভার দ্বারা ভারতবর্ষের সকল ভিক্ষুদের সম্মুখে সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মকে প্রচার করে বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারক প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। সকল স্থানে একটি করে স্তম্ভ নির্মাণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যেমন – কাশ্মীর এবং গান্ধারে পাঠানো হয় মজ্ ঝন্তিককে, মহর্ষি-মণ্ডলে পাঠানো হয় মহাদেবকে। সুবর্ণ ভূমিতে পাঠানো হয় সোন ও উত্তরকে এবং লঙ্কায় পাঠানো হয় মহেন্দ্র ও সঙ্গে কিছু ভিক্ষুকে।[৯১] গৌতমবুদ্ধ নিজে কখনও তার শিষ্যদের দেবতাপূজার কথা বলেননি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন বৌদ্ধধর্ম দুটিভাগে বিভাজিত হয়ে যায়। তখন মহাযান বৌদ্ধ শাখায় কিছু দেবতা পূজার প্রথা শুরু হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের বাইরে যখন মহাযানী বৌদ্ধধর্ম প্রচার পেতে থাকে তখন মহাযানীদের এই দেবতায়ন ভারতবর্ষের বাইরে প্রচারিত হতে থাকে। মহাযান বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যায়, এই ধর্মীয়মতটি ভারতবর্ষ থেকে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, চীন, তাইওয়ান, মোঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মতো দক্ষিণ, পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশীয় দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। আফগানিস্তান, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওস, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, ইরানের মতো অন্যান্য দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশীয় দেশগুলিতে। মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে এই মতবাদ প্রসারিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম চীন, জাপানের জেন, বুদ্ধক্ষেত্র বৌদ্ধধর্ম, নিচিরেন বৌদ্ধধর্ম ও ভিয়েতনামি বৌদ্ধধর্ম বর্তমানে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান উপশাখা। বজ্রযান শাখাকে মহাযান শাখার অন্তর্গত বলে ধরা হয়, তিয়ানতাই, তেনদাই, শিংগন বৌদ্ধধর্ম ও তিব্বতেও এই মহাযান শাখার বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। ভারতীয় বৌদ্ধদের মধ্যে যেমন দেবতার রূপকল্পনা করে বিভিন্ন পূজাপদ্ধতি শুরু করে। ভারতবর্ষের বাইরে প্রচারিত বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কিছু দেবতার রূপ কল্পনা করে পূজাপদ্ধতির প্রচলন হয়। ভারতবর্ষে যেমন কিছু বৌদ্ধদেবতার মূর্তি পাওয়া যায় তেমনি ভারতবর্ষের বাইরে প্রচলিত বৌদ্ধ দেশগুলিতে বৌদ্ধ দেবতাদের মূর্তি পাওয়া যায়।

ভারতের বাইরের বৌদ্ধদেবতাদের রূপ এবং কার্যাবলীতে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয় ধরা পড়ে। যেমন - বৌদ্ধদেবতার বেশি পরিমাণ দেবতার রূপ কল্পনা করা হয়েছিল বৌদ্ধ তান্ত্রিকভাবনার মধ্যে। তন্ত্রের মধ্যে বিশেষ করে দেবীশক্তির কল্পনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সম্পর্ক রয়েছে। তন্ত্রের দেবীসাধনার মধ্যে পরবর্তীকালের বৌদ্ধদের দেবীপূজার ধারণা লুকিয়ে ছিল। বৌদ্ধদের এই তন্ত্রভাবনায় পূজিত দেবীদের মধ্যে হিন্দুদের শাক্ত প্রভাব-লক্ষ করা যায়। হিন্দু-বৌদ্ধ দেবীদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। যেমন – হিন্দুদেবী তারা, যাকে হিন্দু উপপুরাণ ও তন্ত্রের মধ্যে এই তারাদেবীকে পাওয়া যায়। তারা দেবী-র কিছু নাম পাওয়া যায়, যথা- বৌদ্ধতারা, উগ্রতারা, একজটা দেবী এই নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। বৌদ্ধদের চিত্তমণি তারা যা তারার একটি রূপ যেটি তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের গেলাগ শাখায় সর্বোচ্চ যোগ তন্ত্রে বহুলভাবে প্রচলিত। এই দেবীর গাত্রবর্ণ সবুজ দেখানো হয়, এই দেবীর হরিততারার সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে। দক্ষিণ ভারতে খদিরববনী তারা নামক একজন তারার নাম জানা যায়। এই দেবীর আবির্ভাবকাল নিয়ে বলা হয় শূন্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুনের সময়ে (১৫০–২৫০ খ্রিস্টাব্দ) এই দেবী আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে কথিত আছে। বৌদ্ধধর্মের কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে একুশ তারা-র রূপকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের চারটি সম্প্রদায় প্রত্যহ সকালে একুশ তারা স্তোত্র আবৃত্তি করে দিনের যাত্রা শুরু করে। তিব্বতি ও বৌদ্ধরা তারাকে স্তব করে ওঁ তারে তু তারে তুরে সোহা। তিব্বতি বৌদ্ধধর্মে আর্যতারাকে জেতসুন দোলমা (rje btsun sgrol ma) বলা হয়। তারা দেবীকে তিব্বতের সাফল্যের প্রতীক দেবী মনে করা হয়। জাপানেও এই তারা দেবীর অস্তিত্বের কথা জানা যায়। চীনে দেবী তারাকে তারা বোসাতু আবার কোথাও তারাকে দৌলাও পূসা দেবী নামেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। লোককথা থেকে জানা যায় অতীশ দীপংকর যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশে তখন তার মুখের আদলটি ছিল বৌদ্ধদের তারাদেবীর ন্যায়। গৃহী কল্যাণশ্রীর উপাস্যদেবী ছিলেন আর্যতারা বা শক্তিরূপী তারাদেবী।[৯২] এই উপাস্যদেবী রাণীর গর্ভে ফিরে এসেছিলেন এমনটাও অনুমান করা হয়। লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে যে তার জন্মের সময় দেবতাদের দ্বারা পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল।

বৌদ্ধদের মধ্যে ধীরে ধীরে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পূজা আরম্ভ হয়েছিল। যাদের নাম ছিল এইরূপ - বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য। এই বুদ্ধ মূর্তিগুলি প্রত্যেকে আলাদা

আলাদা স্কন্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই বৌদ্ধরা সকলেই ধ্যানাসনে সমাধি অবস্থায় থাকে। প্রত্যেক বুদ্ধমূর্তিতে একটি করে মুখ এবং দুটি হাত থাকে। এই মূর্তিগুলির নেত্র ধ্যানস্তিমিত এবং অর্ধনিমীলিত অবস্থায় থাকে। পরিধানে থাকে ত্রিচীবর এবং অলংকারবিহীন শরীর। এই দেবতাদের রং ও বাহন ভিন্ন ভিন্ন হয়। বুদ্ধদের মধ্যে আদিবুদ্ধের মূর্তি পাওয়া যায়, যাকে বৌদ্ধ দেবমণ্ডলের প্রধান মনে করা হয়। এই ধ্যানীবুদ্ধের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা রূপ ও থাকে। নালন্দাতে বুদ্ধের আলাদা আলাদা মুদ্রার বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। জাভায় বুদ্ধের বিভিন্ন মুদ্রায় অঙ্কিত মূর্তির একটি প্লেট পাওয়া গেছে। সেই প্লেটে বুদ্ধের তেরোটি বুদ্ধ মূর্তি খোদিত রয়েছে।[৯৩] জাভায়প্রাপ্ত এই বৌদ্ধ মূর্তিগুলিতে কয়েকটি বুদ্ধমূর্তিকে ধ্যানাসনে আবিষ্ট থাকতে দেখা যায়। যাদের মধ্যে কিছু মূর্তি কমলাসনে অধিষ্ঠিত থাকে। পাল ও সেনদের সময়ে গড়ে ওঠা নেপালে এইরূপ কিছু ব্রোঞ্জের বৌদ্ধমূর্তির নমুনা আবিষ্কৃত হয়েছে।

বৌদ্ধদেবী পর্ণশবরী অক্ষোভ্যকুলের দেবী। যাকে বৌদ্ধরা প্লেগ, কলেরা ও বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ভারতীয় বৌদ্ধদের কল্পনায় এই দেবীর মূর্তিতে দেখা যায় গায়ের রং হলুদ, তিনটি মুখ এবং ছয়টি হাত থাকে। বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জ এলাকা থেকে পর্ণশবরী দেবীর একটি মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। পর্ণশবরীদেবীর এই মূর্তি অনিন্দ্যসুন্দর একটি বৌদ্ধদেবী প্রতিমা। যেখানে পর্ণশবরী দেবীরমূর্তি থেকে অনুমান করা যায়, তিনি উপজাতীয় নারী, যিনি পরিধেয় হিসেবে বৃক্ষপত্রাদি পরিধান করেন। স্ফীত উদর বিশিষ্ট এই দেবী প্রত্যয়ালীঢ় ভঙ্গিতে রুগ্নতার প্রতীক দুজন পুরুষকে পদদলিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকেন। এই মূর্তিতে দেখা যায় দেবী তিন মাথা ও আটবাহু বিশিষ্ট।[৯৪] মূতির্র ছয় হাতে ঘড়ির কাটা অনুযায়ী রয়েছে যথাক্রমে অঙ্কুশ, তীর, বজ্র, পর্ণগুচ্ছ, ধনুক ও তর্জনী মুদ্রা। তাদের সঙ্গে সর্বদা দুজন পার্শতদেবীকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। একজন দেবী গাধার উপরে উপবিষ্ট অবস্থায় থাকেন। পর্ণশবরীদেবীর বেদির নীচে গণেশ মূর্তি দেখা যায়, যার এক হাতে থাকে তরবারি ও অন্য হাতে থাকে ঢাল। এই ভাস্কর্যটি বিঘ্ন বা বাঁধাকে প্রকাশ করে। এই মূর্তির উপরে মাঝে অমোঘসিদ্ধিসহ পঞ্চবোধিসত্ত্ব দৃশ্যমান থাকে। এই মূর্তিটি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত রয়েছে। এই ভাস্কর্যটির গঠনের সময়কাল আনুমানিক এগারো শতক।

বৌদ্ধদের দেবতা জম্ভল, যিনি অক্ষোভ্য এবং রত্নসম্ভব এই দুই কুলেই উপস্থিত থাকে। কিন্তু সেখানে প্রত্যেককুলের জম্ভলমূর্তি তাদের মাথার ওপর নিজস্বকুলের বৌদ্ধমূর্তি ধারণ করে থাকে।

জম্ভল সাধারণত ধনসম্পদের দেবী। বৌদ্ধ গৃহীরা মনে করে এই দেবতার মন্ত্র জপ করলেও ধনসম্পদের বৃদ্ধি হয়। এই দেবতার তিনটি মুখ থাকে, ষড়ভুজ ও প্রজ্ঞালিঙ্গিত। এই দেবীর বর্ণের রং নীল। এই দেবীর আরও একটি মূর্তির কথা জানা যায়, যেখানে এই দেবতা সর্পভূষণে আবৃত। কুমারাকৃতি, উলঙ্গ, প্রত্যালীঢ় পদে সুপ্ত ধনদকে পদদলিত করে দাঁড়িয়ে থাকে এবং মুখ থেকে অনর্গল ধনরত্নাদি নির্গত হতে থাকে। এই জম্ভল দেবতার মূর্তি নেপাল ও বাংলাদেশ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। নেপাল থেকে প্রাপ্ত জম্ভল মূর্তিটির গায়ের রং নীল, গায়ে সামান্য অলংকার থাকে পরনে থাকে ধুতি, প্রত্যালীঢ় পদে বেদিতে আসীন। ডান হাতে থাকে দান পাত্র এবং বাম হাতে থাকে ধনাদি।[৯৫] বাংলাদেশের ঢাকার বিক্রমপুর থেকে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্তিতে দেখা যায়, দেবতার গায়ের রং নীল, কুমারাকৃতি, গায়ে অলংকার থাকলেও দেবতার শরীরে কোনো বসন নেই। প্রত্যালীঢ় পদে আসীন, মাথার ওপর রয়েছে নিজের কুলের প্রতীক মূর্তি।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষ ভ্রমণকালে দেখেছিলেন একটি রথের মধ্যে তিনটি মূর্তিকে একত্রে রেখে রথটিকে রাস্তায় ভক্তদের সম্মুখ দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যাদেরকে তিনি বৌদ্ধমূর্তি বলে অনুমান করেছিলেন। তিনি আরও দেখেছিলেন, ওই দেবতাদের মধ্যে কেন্দ্রে থাকা বৌদ্ধমূর্তিটির, দুইপাশে থাকে দুটি বোধিসত্ত্বের মূর্তি। অনুমান করা হয় জগন্নাথের রথযাত্রায় বৌদ্ধদের রথযাত্রার অনুকরণ করা হয়েছিল। বৌদ্ধরা সাধারণত ধর্মকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করে থাকে। পাথরের মধ্যেও দেবীমূর্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। নেপালে এই দেবীকে প্রজ্ঞাপারমিতা নামে উল্লেখ করা হয়। *সাধনমালা* গ্রন্থ থেকে এই দেবীরূপ সম্পর্কে জানা যায়, এই দেবী পুস্তকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবী কনককান্তি, শোভন দর্শনা এবং চতুর্ভুজা। হাতগিলিতে থাকে যথাক্রমে ধর্মচক্র মুদ্রা এবং পুস্তক ও রত্নাঙ্কিত ধ্বজা। এই প্রজ্ঞাপারমিতা দেবী আসলে জগন্নাথ মূর্তির সঙ্গে থাকা সুভদ্রা মূর্তির পূর্বরূপ।[৯৬] বৌদ্ধরা বহুদিন পর্যন্ত বুদ্ধপদের চক্রচিহ্নের মূর্তি প্রস্তুত করে তার পূজা করে থাকত। ভারতীয় যাদুঘরে একটি প্রজ্ঞাপারমিতা দেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। দেবীর একটি মুখ, দুটি হাত, বজ্রাসনে পদ্মের ওপর অবস্থান করেন। বজ্রযানে বিভিন্ন প্রকার তন্ত্রের উপস্থিতির কথা জানা যায়।

ভারতবর্ষের বাইরে চীনে কিছু তন্ত্রসাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রথম স্তরে চীনের বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রের উপস্থিতি না থাকলেও আনুমানিক ৭১৬ খ্রিস্টাব্দে শুভকর নামে এক বৌদ্ধতান্ত্রিক

সন্ন্যাসী প্রথম চীনে বৌদ্ধতন্ত্র প্রচার করেছিলেন। যিনি আর্তব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের সঙ্গে চীনা Shen-দের প্রভাব মেনে নিয়ে নতুন দেবতামণ্ডলীর সৃষ্টি করেন। যারা মন্ত্র দ্বারা আহ্বান করলে মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসে।[৯৭] সেখানে অসংখ্য ধারিণীর উদাহরণ পাওয় যায়। যে ধারণীগুলি চীনা ভাষায় অনুবাদিত হতেও দেখা গেছে। এই তন্ত্রের দেবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন চুন্দা দেবী। এই দেবী শুক্লবর্ণা, এই দেবী তার স্বচিহ্ন অক্ষসূত্র থকে কমণ্ডলু পর্যন্ত ঝোলানো থাকে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে চুন্দাদেবীর একটি মূর্তি সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই দেবীর দুটি হাত, একটি মুখ এবং দেবী শুক্লবর্ণা। বজ্রযানে বৌদ্ধদের মতে তাদের দেবমণ্ডলের আদি দেবতা আদিবুদ্ধকে সৃষ্টির আদি কারণ শূন্য বা বজ্র বলে মনে করে। তাদের মতানুযায়ী এই শূন্য হয় সর্বব্যাপী, সর্বকারণ, সর্বশক্তির আধার এবং সর্বজ্ঞ। তারা মনে করে সৃষ্টির প্রত্যেক অণুপরমাণুতে বজ্র বিদ্যমান হয়। সৃষ্টির সমস্ত বস্তু হয় স্বভাবশুদ্ধ, শূন্যরূপ, নিঃস্বভাব ও বুদবুদস্বরূপ, কেবলমাত্র শূন্যই নিত্য। আদিবুদ্ধ হলেন সেই শূন্যের রূপকল্পনা মাত্র। আদিবুদ্ধ যখন দেবতাকারে কল্পিত হন তখন তার নাম হয় বজ্রধর এবং তিনি কমলের উপর ধ্যানাসনে উপবিষ্ট থাকেন। এই দেবতার মূর্তিতে থাকে দুটি হাত, যা বক্ষের উপর বজ্রহূঁকার মুদ্রায় সজ্জিত থাকে। দক্ষিণ হাতে থাকে বজ্র ও বাম হাতে থাকে ঘণ্টা। পরিধানে থাকে বিচিত্র বস্ত্রাদি এবং তিনি সকল প্রকার অলংকারে ভূষিত অবস্থায় থাকেন। এই দেবতার শক্তি কোথাও কোথাও প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্গে যুগনদ্ধ মূর্তিতে দেখতে পাওয়া যায়। শক্তির দক্ষিণ হস্তে কর্ত্রি ও বামে কপাল থাকে। বজ্রধরের মূর্তি দুই প্রকারে কল্পিত হইয়া থাকে। এখানে থাকে একটি একক মূর্তি ও অপরটি হল যুগনদ্ধ মূর্তি। একটি হল শূন্যমূর্তি ও অপরটি হল বোধিচিত্ত মূর্তি।

নেপালে বজ্রধরের অন্য একটি মূর্তি পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মে তত্ত্বজ্ঞানের কথা আলোচিত হয়ে থাকে হীনযানের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের মতে বৌদ্ধধর্মের হৃদয়ের দিকটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মহাযানী ভাবনার মধ্যে। এই সম্প্রদায়ের ধর্মীয়ভাবনাগুলি ভারতবর্ষের বাইরে প্রচার পেয়েছিল। শ্যাম, চীন, জাপান, জাভা, নেপাল ও প্রভৃতি দেশে এই মহাযান শাখাগুলি বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। মহাযান সম্প্রদায় নানা জাতি ও তাদের নানাবিধ ক্রিয়াকর্ম, মন্ত্রতন্ত্র, পূজার্চনা একত্রে প্রবাহিত হতে থাকে। এক মন্থনদণ্ড দ্বারা মথিত হতে থাকে।[৯৮] নেপালে বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার মধ্যে বজ্রযানী

ভাবনার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। নেপালের বজ্রভাবনার মধ্যে উৎপন্ন হয়েছে বৌদ্ধ বজ্রযানের দেবতা। এই বজ্রযানের দেবতা বজ্রযান যাব-য়ুম, যার মূর্তিতে দেখা গেছে দেবতার একটি মুখ, দুটি হাত যা বুকের বজ্রহুংকার ভঙ্গিতে রাখা থাকে, পদ্মাসনে বজ্রাসনে উপবিষ্ট থাকেন। নেপালে প্রাপ্ত এই দেবতার মধ্যে দেখা যায় দেব শরীর অলংকারে ভূষিত।

বৌদ্ধসংঘের মধ্যে মঞ্জুশ্রীর স্থান হয় সবার উপরে। সকল বোধিসত্ত্বের মধ্যে মঞ্জুশ্রী এবং অবলোকিতেশ্বর সর্বপ্রধান দেবতা হিসেবে পরিগণিত হয়। বৌদ্ধধর্ম অনুসরণকারী সকল দেশে এই মঞ্জুশ্রীর পূজা প্রচলিত হতে দেখা যায়। এইকারণে ভারত, নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান ও মাঞ্চুরিয়াসহ এই সমস্ত দেশে মঞ্জুশ্রীর প্রস্তরমূর্তি এবং কিছু ধাতুমূর্তি পাওয়া গেছে। সুখাবতী বূহ নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ দেবতা মঞ্জুশ্রীর নাম পাওয়া যায়। সাধনমালা গ্রন্থে মঞ্জুশ্রীর অনেকগুলি রূপের কথা জানা যায়। যেগুলির বর্ণনা থেকে দেখা যায়, এই দেবতার অনেকগুলি রূপ ও বর্ণে কল্পিত হয়েছে। এই রূপকল্পনা ও ধ্যানগুলি পাঠের ফলে ভিন্ন ভিন্ন মঞ্জুশ্রীকে সহজে চিহ্নিত করা যায়। এইসকল মঞ্জুশ্রীরা হলেন - বাক্ বা বজ্ররাগমঞ্জুশ্রী, ধর্ম ধাতু বাগীশ্বর, মঞ্জুঘোষ, সিদ্ধৈকবীর, বজ্রানঙ্গ, নাম সঙ্গীতি মঞ্জুশ্রী, বাগীশ্বর, মঞ্জুবর ও প্রভৃতি দেবতার মূর্তি। মঞ্জুশ্রীর মধ্যে নামসঙ্গীতি নামক দেবতার রূপ কল্পনা বিশেষ গুরুত্ব রাখে। এই মূর্তিতে দেখা যায় মঞ্জুশ্রী ত্রিমুখ ও চতুর্ভুজ বিশিষ্ট। এই দেবতার বর্ণ রক্তমিশ্রিত গৌর, ধ্যানাসনে উপবিষ্ট থাকেন। এই দেবতার তিনটি মুখের মধ্যে প্রধান মুখটি লাল, দক্ষিণ মুখটি নীল এবং বাম মুখটি শুক্ল। এই দেবতার চার হাতে যথাক্রমে থাকে - প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক, খড়্গ, ধনু ও বাণ। এই দেবতার আভরণে ভূষিত থাকেন, মাথার ওপর মুকুটের উপর একটি ক্ষুদ্র অক্ষোভ্য মূর্তি দেখা যায়। নেপালে বৌদ্ধ নামসঙ্গীতি মঞ্জুশ্রীর একটি মূর্তি পাওয়া যায়। যেখানে দেখা যায় এই মঞ্জুশ্রীর তিনটি মুখ ও চারটি হাত রয়েছে। গায়ের বর্ণ রক্তাভ এবং বজ্রপর্যাঙ্ক পদ্মাসনে উপবিষ্ট থাকেন।[৯৯] আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামক গ্রন্থে মঞ্জুশ্রীর পূজাপদ্ধতি লিখিত রয়েছে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য থেকে এই গ্রন্থটি ছাপানো হয়েছিল। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ মহাযানী শাখার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি বৌদ্ধ গুহ্যসমাজ সৃষ্টির পূর্ববর্তী রচনা বলে অনুমান করা হয়। বৌদ্ধদের এই তন্ত্রযানের মধ্যে আরও অনেক ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, যক্ষিণী, ভৈরব, বুদ্ধগণের উপাস্য হয়ে ধরা দেয়। অভিধ্যানাত্তরতন্ত্র, সম্বরবজ্র, পীঠপর্ব, বজ্রসত্ত্ব, পীঠদেবতা, ভেরুক, যোগবীর,

পীঠমালা, বজ্রবীরষড়যোগসম্বর, অমৃতসঞ্জীবনী, যোগিনী, কুলডাক, যোগিনী যোগহৃদয় বুদ্ধকাপালিকযোগ, মঞ্জুবজ্র, নবাক্ষরালীডাক, বজ্রডাক, চোমক, প্রভৃতি অনেক ভৈরব ও যোগিনীর পূজাপদ্ধতি ও শুরু হয় বৌদ্ধসমাজে। বোধিসত্ত্ব ও যোগিনীদের ধ্যানকে সাধন বলা হয়ে থাকে, সাধনমালা পুস্তকে এই ধ্যানগুলিকে উল্লিখিত করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বৌদ্ধদেবতা বজ্রবারাহী, বজ্রযোগিনী, কুরুকুল্লা, মহাপ্রতিসরা, মহামায়ূরী, মহাসাহস্র প্রমর্দ্দিনী ও প্রভৃতি বিভিন্ন যোগিনীদের ধ্যান এখানে উল্লেখ রয়েছে। তন্ত্রসাধনার 'অদ্বয়তত্ত্ব' ভাবনায় 'অর্ধনারীশ্বর তত্ত্ব'-এ বামভাগে থাকেন দেবী ভগবতী, আর দক্ষিণভাগে থাকেন ভগবান। বৌদ্ধরা তন্ত্রসাধনার এই ভগবান্ এবং ভগবতীকে আদিবুদ্ধ ও আদিদেবীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকার কথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধতন্ত্রে সর্বেশ্বর ভগবান্ এবং সর্বেশ্বরী ভগবতীর কথা বলা হয়েছে, যথা - শ্রীহেবজ্র, শ্রীহেরুক, শ্রীবজ্রধর, শ্রীবজ্রেশ্বর, শ্রীবজ্রসত্ত্ব, মহাসত্ত্ব, শ্রীমন্মহাসুখ, শ্রীচণ্ডরোষণ প্রভৃতি রূপ ধারণ করেছেন। তিনি কোথাও বজ্রধাত্বীশ্বরী, বজ্রবারাহী, কখনও ভগবতীপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতা অথবা দেবী নৈরাত্মা। এই ভাবনার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে হিন্দুদের মহেশ্বর-মহেশ্বরী এবং বৌদ্ধ সর্বেশ্বর-সর্বেশ্বরী ধারণা ও হয়ত কিছু স্থানে একাকার হয়ে গেছে।

নাথপন্থার সঙ্গে বৌদ্ধ তন্ত্রভাবনার সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা হয়। বৌদ্ধদের মধ্যে থাকে শক্তি আরাধনার কথা। নাথপন্থীদের একমাত্র আদর্শ থাকে নিজের মধ্যে অদ্বয় শক্তি উপলব্ধি করা। অমরত্ব অর্জন ও দিব্য দেহের কায়সাধনের দ্বারা পুনরায় দিব্যদেহ লাভ করার আরাধনা করা হয়। চন্দ্র হয়ে যায় সোম বা অমৃতের উৎস যিনি মানবদেহে অবস্থিত সহস্রা অঞ্চলের নীচে থাকে। এই নির্যাস পরিদৃশ্যমান মানবদেহকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে অমরত্ব অর্জন সম্ভব হয়। এখানে কিছু বাধা আসে, যেমন - দেহের মধ্যে অবস্থিত সোম থেকে ক্ষরিত অমৃতবিন্দু সূর্য শুষে নিতে চায়। এই সূর্য বাস করে মানবদেহের নাভিমূলে। এই অমৃতকে সূর্যের হাত থেকে রক্ষা করা দরকার। তা সম্ভব একটি উপায়ে, দেহের মধ্যে অবস্থিত একটি আঁকাবাঁকা সর্পাকার নালী থাকে যার দুটি মুখ। এই নালীকে আবার শঙ্খিনী নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই নালীর মুখ দিয়ে সোমরস ক্ষরিত হয়, এই দ্বারকে দশমদ্বার নাম দেওয়া হয়। নাথপন্থীরা মনে করে এই মুখটি বন্ধ করতে পারলে কাল বা মৃত্যুরূপী সূর্যের গ্রাস থেকে

সোমরসকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। এইজন্য প্রয়োজন কায়সাধন। তান্ত্রিক গ্রন্থে কুলকুণ্ডলিনীকে জাগানোর পদ্ধতির দ্বারা অমৃতক্ষরণ রোধ করা যেতে পারে। বৌদ্ধতন্ত্রের চক্রভেদ যোগমার্গ-এ যে তিনটি প্রধান নাড়ীর উপর সিদ্ধাচার্যদের সাধনা নির্ভরশীল, যার প্রধানটির নাম দেওয়া হয়েছে অবধূতযোগ। এই যোগসাধনার মধ্যে বৌদ্ধদের ধর্মীয় আচার-আচরণ খানিকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। নেপালে প্রতিষ্ঠিত নাথযোগীদের মধ্যে এই কায়সাধনার কথা বলা হয়ে থাকে।

বৌদ্ধতন্ত্রের গুহ্যসাধনা, রহস্যময়তা, গূঢ়ার্থক মন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী, বীজ-মণ্ডল প্রভৃতি সমস্ত বিষয়গুলি আদিম কৌম সমাজের যাদুশক্তি থেকে উদ্ভুত হয়েছে বলে মনে করা হয়। বৌদ্ধদের রচিত দোহা ও গীতিগুলির মধ্যে আরও নতুন নতুন দেবদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন - দেবী নৈরাত্মা, নৈরামণি, ডোম্বী, চণ্ডালী, মাগঙ্গী, শবরী ও প্রভৃতি। বৌদ্ধতন্ত্রে আচার্য অসঙ্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে পর্বত কান্তারবাসী সুবৃহৎ কৌমসমাজকে বৌদ্ধধর্মের সীমার মধ্যে আকর্ষণ করার জন্য ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, যোগিনী, ডাকিনী, পিশাচ ও মাতৃকাতন্ত্রের নানা দেবদেবী অসঙ্গ মহাযানের দেবায়তনে স্থান নিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন গুহ্য, মন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী প্রভৃতি প্রবেশ করেছিল মহাযান ধ্যান-কল্পনার পূজাচারে, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে। শক্তির ধারণার মধ্যে আদিম তান্ত্রিক আচার-আচরণ মহাযান বৌদ্ধধর্মে আচরিত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে। বৌদ্ধরা নারীপুরুষের সম্মিলিত মিথুনমূর্তির দ্বারা বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও তাদের শক্তিসমূহগুলিকে উপস্থাপিত করতে থাকে। এই ধারণাগুলি ভারতের বাইরের দেশগুলিতে দেবতাসমূহের উত্থানে শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে।

গ. জৈন দেবতা: প্রাচীন ভারতের ধর্ম হিসেবে পাওয়া যায় জৈনধর্মকে। এই ধর্মের মধ্যে মানুষ আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, ক্রোধ, অহংকার, লোভ ইত্যাদি আন্তরিক আবেগগুলিকে জয় করার কথা বলা হয়ে থাকে। জৈনধর্ম সম্পর্কে বলা হয় শ্রমণ প্রথা থেকে উদ্গত ধর্মমত হল এই জৈনধর্ম। প্রাচীন ভারতের এই জৈনধর্মটি ভারতের মধ্যে বিস্তৃতিলাভ করেছিল বিশেষ ভাবে। ভারতবর্ষ বাইরের কিছু দেশে এই ধর্মটি ছড়িয়ে পড়েছিল। যেমন - পাকিস্তান, উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ, দূরপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়াসহ ও বিশ্বের অন্যান্য কয়েকটি দেশে জৈন ধর্মাবলম্বীদের দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মমতগুলির মতো প্রাচীন ভারতীয় সমাজে রাজনৈতিক ও অর্থনীতির বিষয়ে জৈনদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। জৈনরা তাদের ধর্মীয় ইতিহাসে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের নাম উল্লেখ করে

থাকে। যাদের প্রচলিত ধর্মীয়শিক্ষা রীতি-নীতিগুলিই জৈনধর্মের মূল ভিত্তি ছিল। জৈনধর্মের এই চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মূর্তি পরবর্তীকালে জৈনধর্মাবলম্বীরা অঙ্কন করে। তীর্থঙ্করদের মূর্তির সঙ্গে এই ধর্মাবলম্বীরা তাদের শাসনদেবীর মূর্তি কল্পনা করে থাকে। জৈনদের এই মূর্তিগুলি ভারতবর্ষের জৈনদের মধ্যে পূজিত হতে থাকে। ভারতবর্ষের বাইরে দেশগুলিতে এই জৈনধর্মের মূর্তিগুলি গড়ে উঠতে দেখা গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়অঞ্চলে জৈনধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল প্রাচীনকালে। আধুনিককালের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার নামকরণ করা হয়েছিল জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বা বর্ধমানের নামানুসারে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলাগুলি থেকে অসংখ্য পাথরের জৈন ভাস্কর্য ও অন্যান্য পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। যেসকল মূর্তিগুলির মধ্যে কিছু মূর্তি পূজিত হয়। কিছু জৈন মূর্তি জাদুঘরে সংরক্ষিত থাকতে দেখা যায়। এই অঞ্চলে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির মধ্যে আবার কয়েকটি বৃহদাকার ও অনিন্দ্যসুন্দর তীর্থঙ্কর মূর্তি পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুডা জেলার বহুলারা ও হরমিশ্র এবং বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থেকে পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের অংশগুলি জৈনধর্মের সমৃদ্ধ কেন্দ্র মনে করা হয়। দিনাজপুর জেলার ইটাহার অঞ্চলের অন্তর্গত সুরোহর গ্রাম থেকে ঋষভনাথের একটি মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই মূর্তিটি পদ্মাসনের ওপর অধিষ্ঠান করে, যার দুটি হাত ধ্যানীমুদ্রায় রাখা থাকে, এই মূর্তিটি সর্বাঙ্গে সম্পূর্ণ পোশাকহীন অবস্থায় বিরাজ করে। সে জাতকমুক্তা পরিধান করে, আর এই মূর্তির পিছনে থাকে প্রভাবলী। এই দেবতা মূর্তির পিছনে দুটি পুরুষমূর্তি উপস্থিত থাকে। ঋষভনাথের এই মূর্তির সঙ্গে তার বাহন ষাঁড়ের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।[১০০] জৈনদের দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর অজিতনাথ, যার প্রাপ্ত মূর্তিতে দেখা যায় তিনি কায়তসর্গ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকেন, যার বাহন হিসেবে পাওয়া যায় গজ বা হাতিকে। এই তীর্থঙ্করের সঙ্গে উপস্থিত থাকে কেবলরক্ষা সপ্তপর্ণা, এবং ইকাসা অজিতবালা মূর্তি। জৈনদের এই তীর্থঙ্করের এরূপ দুটি ব্রোঞ্জের মূর্তি পাওয়া গেছে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায়।[১০১] জৈনদের অষ্টমতম তীর্থঙ্কর চন্দ্রপ্রভ। এই তীর্থঙ্করের মূর্তি সংরক্ষিত হতে দেখা গেছে বিহারের পাটনা মিউসিয়ামে। এই মূর্তিটিতে লাঞ্ছনা হিসেবে থাকে চন্দ্র। কেবল্ গাছ হিসেবে উপস্থিত থাকে নাগকেশরের লতা। এই তীর্থঙ্করের শাসনদেবী ও শাসনদেবতা হিসেবে উপস্থিত থাকে বিজয়া এবং ভ্রুকুটি। এই তীর্থঙ্কর মূর্তিকে কোথাও কোথাও কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকে, পরয়াঙ্কাসনে বসে

থাকতেও দেখা যায়। যেখানে তিনি থাকেন ধ্যানীমুদ্রায়, চাঁদ এখানে মাঝখানে শীর্ষচক্রের ন্যায় অবস্থান করে। দুইপাশে দুটি মকরের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

শিল্পশৈলীর দিক থেকে একটি অনিন্দ্যসুন্দর একটি পার্শ্বনাথ মূর্তি বাংলাদেশের দিনাজপুরের জাদুঘরে সংরক্ষিত হতে দেখা যায়। এই মূর্তিটি কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে পদ্মের উপর দন্ডায়মান থাকে। এই তীর্থঙ্কর মূর্তির মাথার ওপর সর্বদা একটি পূর্ণফণা বিশিষ্ট সপ্তবাসুকিনাগের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই তীর্থঙ্করের পার্শদেবতা দিকপালদের প্রাণির উপরে চলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। শাসনদেবী চক্রেশ্বরীকে তার বেদির নীচে অবস্থান করতে দেখা যায়। এই ভাস্কর্যটিকে আনুমানিক এগারো শতকে তৈরি বলে অনুমান করা হয়। জৈনদের তেরোতম তীর্থঙ্কর বিমলনাথ। যার মূর্তি পাটনা মিউসিয়ামে সংরক্ষিত হতে দেখা যায়। এই মূর্তিটি আলূরা ভঙ্গিমায় অবস্থান করে। মূর্তিটির সঙ্গে প্রতীক হিসেবে থাকে জম্বু কেবলরক্ষ, এবং তীর্থঙ্করের শাসনদেবতা ও দেবীরূপে উপস্থিত থাকে সন্মুখ ও বিদিতা। জৈনদের ষোলতম তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ–এর একটি মূর্তি সংরক্ষিত হতে দেখা গেছে বাংলাদেশের বরেন্দ্র মিউসিয়ামে। এই মূর্তিটি বাংলাদেশের গোদাগাড়ির মানদৈল অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই জৈন মূর্তিটিকে কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় দেখা যায়। এখানে তীর্থঙ্করের হাতদুটি খোলা অবস্থায় থাকে। শরীরে কোন পোশাক দেখা যায় না, মাথার চুলগুলি কোঁকড়ানো আবস্থায় দেখা যায়। এবং এই মূর্তির সঙ্গে দুটি পুরুষ মূর্তি ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় উপস্থিত থাকে। এই তীর্থঙ্করের বেদির নীচে গণেশ মূর্তিসহ নবগ্রহ মূর্তি খোদিত থাকতে দেখা যায়। এই মূর্তিটির সৃষ্টিকালও আনুমানিক এগারো শতক ধরে নেওয়া যেতে পারে।[১০২]

জৈনদের বাইশতম তীর্থঙ্কর হলেন নেমিনাথ। এই তীর্থঙ্করের শাসনদেবতা ও দেবীরা হলেন যথাক্রমে গোমেধ এবং অম্বিকা। জৈনদের এই অম্বিকাদেবীর বিশেষ পূজার প্রচলন পাওয়া গেছে জৈনদের সমাজে। ধীরে ধীরে এই দেবীর বিস্তৃতি ঘটতে থাকে অন্যদের মধ্যে তাই বাংলার টেরাকোটা শিল্পে অম্বিকা দেবীর মূর্তির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশপরগণা জেলার নালগোরা অঞ্চল থেকে এই অম্বিকা দেবীর একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে দেখা যায় এই দেবী আমগাছের নীচে পদ্মের ওপর অবস্থান করে থাকেন। এই দেবীর বাম কাধের ওপর একটি শিশু এবং ডানহাতের মধ্যে দ্বিতীয় আর একটি উলঙ্গ শিশু মূর্তিকে খেলারত অবস্থায় দেখা যায়। এই দেবীর

সঙ্গে থাকা গাছটি ফলে পরিপূর্ণ থাকে। দেবীর বাহন হিসেবে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় সিংহকে।[১০৩] জৈনদের তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ। এই দেবতার বাহন হিসেবে পাওয়া যায় সাপের উপস্থিতি। দেবদারু ও ধাতকি হল এই তীর্থঙ্করের কেবল্ বৃক্ষ। এই তীর্থঙ্করের শাসনদেবতা হিসেবে পাওয়া যায় ধরনেন্দ্র ও পদ্মাবতীকে। এই তীর্থঙ্করের মূর্তিতে দেখা যায় একটি বৃহৎ সাপের ফণা, তাকে সর্বদা রোদ ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা থেকে পার্শ্বনাথের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। যেখানে এই তীর্থঙ্কর আলূর ভঙ্গিমায় অবস্থান করে থাকে, এবং পদ্মের আসনের উপরে অধিষ্ঠিত থাকেন। জৈনদের সর্বশেষ অর্থাৎ চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীর। এই তীর্থঙ্করকে সাধারণত উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান অবস্থায় চিত্রিত করতে দেখা যায়। তার বেদির নীচে থাকে তার প্রতীক হিসেবে সিংহ মূর্তির উপস্থিতি। প্রত্যেক তীর্থঙ্করদের নির্দিষ্ট একটি করে প্রতীক থাকে, এই প্রতীকগুলি দেখে আসলে প্রত্যেক তীর্থঙ্করদের আলাদাভাবে চিনতে পারা যায় সহজেই। মহাবীরের এই চিহ্নটি সাধারণত তীর্থঙ্কর মূর্তির পায়ের নীচে উৎকীর্ণ করা হয়ে থাকে। অন্যান্য তীর্থঙ্করের মতো মহাবীরেরও একটি শ্রীবৎস চিহ্ন থাকে। এই তীর্থঙ্কর মূর্তিটি বজ্রাসন ভঙ্গিমায় অবস্থান করে, এবং হাত দুটি একটি হাতের ওপর অন্য হাতটি খোলা অবস্থায় রাখা থাকে। পোশাকহীন এই তীর্থঙ্কর মূর্তিটির চোখ দুটি মুদিত অবস্থায় থাকে। রাজস্থানের শ্রীমহাবীরজি মন্দিরে এইরূপ একটি মহাবীরের মূর্তি পূজিত হতে দেখা গেছে।

জৈনদের আরও কয়েকজন জৈন তীর্থঙ্করদের পূজা পেতে দেখা গেছে। তাদের শাসনদেবতাদেরও আলাদা করে মূর্তি গড়ে পূজা করতে দেখা গেছে। জৈনধর্মের দেবতা ভৈরব-এর অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এই দৈবীরূপী ভৈরবদের মহিমা কিছুটা গুপ্ত অবস্থায় থাকে। সাধারণভাবে জনসমক্ষে পুরাণকাহিনি-র উল্লেখ করা হলেও চৌষট্টি ভৈরব ও তাদের সঙ্গিনী চৌষট্টি যোগিনীর কথা জানা যায়। যারা তন্ত্রমতে বিবিধ শক্তির আধাররূপে কল্পিত হয়ে থাকে। এই ভৈরবরা বিভিন্ন পূজা, উপচার ইত্যাদির মাধ্যমে ভৈরবীশক্তিকে তুষ্ট করে ভৈরবের প্রসাদ লাভ করতে চায়। এই সাধনধারা দীর্ঘ কাল ধরে চলে আসছে। নেপালের ভৈরবধর্মে বিশেষ করে হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রের এক অনবদ্য মিশেলের নমুনা লক্ষ করা যায়। নেপালে প্রাপ্ত ভৈরব মূর্তিগুলিতে সেই মিশেলের ছাপ কিছুটা স্পষ্ট করা যায়। জৈন তীর্থঙ্করদের সঙ্গে থাকা কিছু শাসনদেবতারা পরবর্তীতে জৈনদের মধ্যে স্বতন্ত্রধারার

দেবতারূপে পূজা পেতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ নামোল্লেখ করা যেতে পারে পদ্মাবতী দেবীর কথা। এই দেবীর সঙ্গে জৈনরা সাপের যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে। এই দেবীর প্রাপ্ত মূর্তিতে দেবীর সঙ্গে বাহন হিসেবে চোখে পড়ে সাপের উপস্থিতি। এই দেবী পদ্মাসনে অধিষ্ঠিত হয়, এবং হাতে থাকে সাপ। তিনি সর্পের অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে থাকেন। মুম্বাইয়ের ওয়ালাকেশ্বর জৈন মন্দিরে এই পদ্মাবতী দেবীর একটি মূর্তি পূজিত হতে দেখা যায়।

৪. ৫ উপসংহার:

ভারতবর্ষের মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যাতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, সেখানে মঙ্গলকাব্যের ধারার মধ্যে পূর্বতন সমাজে প্রচলিত বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভাবনাগুলি স্থান দখল করতে থাকে। শুধু দেশের মধ্যেই নয়, দেশের বাইরেও এই ধর্মীয়ভাবনাগুলি নিজেদের বিস্তৃতি ঘটাতে থাকে। কোথাও ওই দেশের পূর্ব প্রচলিত ধর্মীয়ভাবনাগুলিকে বিলোপের মধ্যে দিয়ে, আবার কোনো দেশে সেই অঞ্চলের স্থানীয় ধর্মীয়ভাবনাগুলির মধ্যে দিয়ে। যেমন - তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রচলনের পূর্বে সেখানে প্রচলিত ছিল যোন ধর্ম। যেখানে গাছ, পাথর, মাটিকে পূজা করা হত এবং সেখানে মানুষকে ইন্দ্রজালে বশীভূত করার প্রক্রিয়াও রয়েছে। তিব্বতের মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতি পূজা করা। এই সময়ে রাজশক্তির হাত ধরে খ্রিস্টপরবর্তী ষষ্ঠ শতকে নেপালে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ ঘটে। একদিকে তিব্বতের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের রাজা অংশুবর্মার কন্যা ভ্রুকুটি, অন্যদিকে চীনের রাজকন্যা ওয়েন চ্যাঙ-এর হাত ধরে।[১০৪] একইভাবে জৈনধর্ম নিজের জাল বিস্তার করতে করতে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর অন্যত্র।

পাহাড়পুরের তাম্রপটে জৈন আচার্যদের নাম খুঁজে পাওয়া যায়। সেই সমাজে জৈনগৃহীদের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বৌদ্ধদের পূর্বে জৈনদের আগমন ও প্রসার ঘটেছিল। বঙ্গদেশে বৌদ্ধদের তুলনায় জৈনধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বৌদ্ধ ও জৈনদের দেবতার মূর্তিতত্ত্বের সঙ্গে ভারতের বাইরে বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে গড়ে ওঠা দৈব রূপকল্পনায় সাদৃশ্য বজায় থাকতে দেখা গেছে। সকল ভিন্ন ধর্মীয় সমাজগুলি গড়ে উঠেছিল আসলে একই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। সমাজগুলিতে দেবতার রূপ কল্পনার ক্ষেত্রে ধরা পড়েছে একই প্রবৃত্তি। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে দেবী সরস্বতীর কথা। ভারতীয় মঙ্গলকাব্য, বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যেও এই দেবী

বিভিন্ন নামে ধরা পড়েছে। ভারতের বাইরে জাপান ও চীনেও পাওয়া গেছে বিদ্যার দেবীকে আলাদা আলাদা নামে। এই সকল দেবীচরিত্রের মূর্তিতত্ত্বের মধ্যে পাওয়া গেছে পুস্তকের যোগাযোগ। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈনদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ভারতের বাইরে প্রচলিত বৌদ্ধ ও জৈনদের সঙ্গেও ভারতীয় বৌদ্ধ ও জৈনদের অস্তিত্ব একইভাবে বজায় থাকে প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহযোগে। মানুষ বিভিন্ন দেশে অবস্থান করলেও তাদের সহজাত প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে একই তাড়নার উদ্রেক করে থাকে।

টীকা

১) সেন, সুকুমার (১৯৫৬) (সম্পাদিত)। *চর্যাগীতি পদাবলী*। বর্ধমান: সাহিত্যসভা। পৃ. ৫৮।

২) পাল, বিপদভঞ্জন (২০১৪)। *ভারতীয় দর্শন*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। পৃ. ৬৫-৬৬।

৩) সহজযান: তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে *সহজ* শব্দের অর্থ হল মহাসুখ। বজ্রযানের একটি শাখা হল সহজযান। পাল রাজাদের সময়ে এই ধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছিল। বৌদ্ধদের তত্ত্বের দিকগুলি জনসাধারণের কাছে জটিল ধরে নিয়ে, সমকালীন মানুষেরা এই শাখার ধ্যানধারণা, মন্ত্রতন্ত্র ও মুদ্রাধারণের রীতিগুলিতে বেশি করে আকৃষ্ট হয়ে, এগুলিকেই বুদ্ধত্বলাভের প্রকৃষ্টউপায় বলে মনে করেন। বৌদ্ধসহজিয়ারা প্রচার করেন যে ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং স্ত্রী গোপার সঙ্গে সহজ সাধনায় লিপ্ত হয়েছিলেন। চর্যাপদে (১৯০৭) উথিত যে – লুইপাদ, সরহপাদ, কাহ্নপাদ প্রমুখ ব্যক্তিরা এই সহজযান সাধনার সাধক ছিলেন।

সূত্র: হালদার (দে), মণিকুন্তলা (২০১০) চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ২২৮-২৩৪।

৪) ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ, ভট্টাচার্য, সুমিত্রা, সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর, চৌধুরী, সত্যজিৎ (সম্পাদিত) (১৯৯১)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ।* তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: রাজ্যপুস্তক পর্ষদ। পৃ. ৩৭৩।

৫) ধারণী: ধারণী বা রক্ষামন্ত্র যেগুলি মহাযান সাহিত্যে বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। বৈদিক আশীর্বাদক মন্ত্র ও জাদুমন্ত্রগুলি ভারতীয় জনমানসের মধ্যে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, বৌদ্ধধর্মেও এর প্রভাব পরে এবং তারাও বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পেতে জাদুমন্ত্র ও পরিত্তা বা পরিত্রাণমন্ত্রের প্রয়োগ শুরু করে। বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব-দেবীদের উদ্দেশে অসংখ্য স্তুতি, প্রার্থনা মন্ত্র ও ধারণী রচিত হয়েছিল। সংক্ষিপ্ত প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রগুলি যেমন, অল্পক্ষরা প্রজ্ঞাপারমিতা ইত্যাদি ধারণীরূপে ব্যবহৃত হত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় - যাদুর উদ্দেশ্যে লিখিত মেঘ সূত্র ধারণীর হল একটি উৎকৃষ্ট মানের ধারণী।

সূত্র: চৌধুরী, বিনয়েন্দ্রনাথ (২০১৪) চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ সাহিত্য*। কলকাতা: মহাবোধি। পৃ. ২৬৫।

৬) মুখোপাধ্যায়, দেবাশিষ (সম্পাদিত) (২০১৭)। *ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন। পৃ. ২০।

৭) রায়, নীহাররঞ্জন (২০০৩)। *ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা।* প্রথম খণ্ড। কলকাতা: দ্বেজ। পৃ. ৩৮।

৮) চৌধুরী, সাধনকমল (২০১৭)। *ইতিহাসের আলোয় গৌতম বুদ্ধ* । কলকাতা: করুণা। পৃ. ৩।

৯) ত্রিপাঠী, যদুপতি ও ত্রিপাঠী, অশ্রুলেখা (সম্পাদিত) (২০১৫)। *ভারতীয় দর্শন পরিচয়*। কলকাতা: বি. এন. পাবলিকেশন। পৃ. ৭১।

১০) দাশ, আশা, (২০১৮) বড়ুয়া, সুমিত (সম্পাদিত)।*বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: ছোঁয়া। পৃ. ১৯০।

১১) চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ (সম্পাদিত) (১৩৬৫)। *জয়দেবের গীতগোবিন্দম্*। কলকাতা: দেব–প্রেস। পৃ. ২।

১২) রায়, বসন্তরঞ্জন (সম্পাদিত) (১৩১৬)।*কবি ক্ষেমানন্দ দাস প্রণীত মনসামঙ্গল*। কলকাতা: বঙ্গবাসী- ইলেক্ট্রো। পৃ. ৫১।

১৩) ভট্টাচার্য্য, সুধীভূষণ (সম্পাদিত) (১৯৬৫)। *দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ২০৫-২০৬।

১৪) দাশ গুপ্ত, তমোনাশ (সম্পাদিত) (২০১১)। *সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ১০-১১।

১৫) সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (১৯৫৬)। তদেব। পৃ. ৫৮।

১৬) বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। *কবিকঙ্কণ – চণ্ডী।* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ২১৬।

১৭) ত্রিপাঠী, যদুপতি ও ত্রিপাঠী, অশ্রুলেখা (সম্পাদিত) (২০১৫)। *ভারতীয় দর্শন পরিচয়*। কলকাতা: বি. এন. পাবলিকেশন। পৃ. ৮৫।

১৮) মিত্র, কৃষ্ণকুমার (১৯৯৮)। *বুদ্ধচরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষেপে বিবরণ*। কলকাতা: করুণা। পৃ. ৯৩।

১৯) মহাপাত্র, পীযূষ কান্তি (সম্পাদিত) (২০১২)। *ঘনরাম চক্রবর্তী-বিরচিত শ্রী ধর্মমঙ্গল*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৬৭৭।

২০) জ্ঞানবজ্র, কর্মা (দাস, রামকৃষ্ণ) (অনূদিত) (২০১৭)। *ধম্মপদ*। কলকাতা: তথাগত। পৃ. ২৫১।

২১) ভট্টাচার্য্য, সুধীভূষণ (সম্পাদিত) (১৯৬৫)। *দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ১০৯-১১০।

২২) পঞ্চমহাব্রত: জৈনরা *সম্যক্ চরিত্র* লাভের প্রত্যাশায় পঞ্চমহাব্রত পালন করে থাকে। এই পঞ্চমহাব্রতের মধ্যে থাকে পাঁচটি নীতি যথা - অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। অহিংসা বলতে জৈনরা মানবজাতিকে হিংসা থেকে দূরে থাকতে বলেছে। হিংসা করা, হিংসার কথা চিন্তা করা, হিংসার কথা বলা অথবা ভাবনার মধ্যে রাখা, হিংসা করানো বা হিংসাকে সমর্থন করা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে দোষযুক্ত মনে করে সেগুলি থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। সত্য কথাকে সর্বদা অহিংসা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে বলা হয়েছে। তারা নিজের জীবনের ন্যায় অন্যের জীবনকেও মূল্য দেয়। অন্যের সম্পত্তিকে বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, এই অবস্থার নাম দিয়েছে অস্তেয়। ব্রহ্মচর্য যেখানে মানবকে সংযমী হতে শিক্ষা দিয়েছে। অপরিগ্রহ বলতে বুঝিয়েছে বিষয়বাসনা থেকে দেহকে দূরে রাখতে বলা হয়েছে।

সূত্র: ত্রিপাঠী, যদুপতি ও ত্রিপাঠী, অশ্রুলেখা (সম্পাদিত) (২০১৫)। *ভারতীয় দর্শন পরিচয়*। কলকাতা: বি. এন. পাবলিকেশন। পৃ. ৮৫-৮৬।

২৩) শীলভদ্র, ভিক্ষু (১৪২২)। *বুদ্ধবাণী* । কলকাতা: মহাবোধি। পৃ. ৭৬।

২৪) নিগূঢ়ানন্দ (১৩৭৯)। *দেব দেউল ভারত*। কলকাতা: করুণা। পৃ. ৯৪।

২৫) দাশ, আশা, (২০১৮) বড়ুয়া, সুমিত (সম্পাদিত)।*বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: ছোঁয়া। পৃ. ১৯২।

২৬) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ১৫৪।

২৭) চৌধুরী, সাধনকমল (১৪২০)। *গীতা ও বুদ্ধ* । কলকাতা: করুণা। পৃ. ৩৭।

২৮) হালদার (দে), মণিকুন্তলা (রচিত) চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত) (১৪২৩)। *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস*। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ – ৪। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। পৃ. ৪।

২৯) মিত্র, অশোক (২০১৪)। *ভারতের চিত্রকলা*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ৯৪।

৩০) চট্টোপাধ্যায়, সুনীল (২০০৩)। *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ৯৪।

৩১) বড়ুয়া, প্রণবকুমার (২০০৭)। *বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। পৃ. ৮৫।

৩২) ত্রিশরণ: বৌদ্ধ সাহিত্যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে ত্রিরত্ন বলা হয়। এই ত্রিরত্নের আশ্রয় গ্রহণই হল প্রকৃত পক্ষে ত্রিশরণ। বুদ্ধের চরণে শরণ গ্রহণ করার অর্থ হল জ্ঞানীর শরণ, ধর্মের শরণ যেখানে থাকে সদ্ধর্মের শরণ ও সংঘের শরণের অর্থ হল সৎ ব্যক্তিগণের শরণ। প্রকৃত বুদ্ধানুরাগীরা এই ত্রিশরণ গ্রহণ করে। শরণাগতের ভয়, সন্ত্রাস, দুঃখ, দুর্গতি এগুলিকে হনন করে বিনাশ করে বলে এর নাম হয়েছে শরণ। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা শাক্যমুনি বুদ্ধের সামনে এই রত্নত্রয় গ্রহণ করেন। ত্রিশরণের মন্ত্রগুলি হল যথা -

ক) বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

খ) ধম্মং শরণং গচ্ছামি।

গ) সংঘং শরণং গচ্ছামি।

সূত্র: মুখার্জী, বন্দনা (২০০৪-২০০৫) ভট্টাচার্য, বেলা (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধকোষ* । পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৬৪১-৬৪২।

৩৩) পঞ্চশীল: *শীল* শব্দের অর্থ হল চরিত্র। বৌদ্ধ দর্শনে এই শব্দটির অর্থ বোঝায় সৎ চরিত্র অর্থে, যাকে আবার নৈতিক চরিত্রও বলা যেতে পারে। ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের নৈতিক শুদ্ধতা বজায় রাখতে পাঁচটি নীতিকে অনুসরণ করতে বলেন, যথা –

ক) প্রাণী হত্যা না করা।

খ) মিথ্যা কথা না বলা।

গ) অপরের বিষয় অপহরণ না করা বা চুরি না করা।

ঘ) সুরা ও মাদকদ্রব্য সেবন না করা।

ঙ) অবৈধ কামাচার সম্পর্কে লিপ্ত না হওয়া।

এই নীতিগুলি থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করানো হয়। এই নীতিগুলিকে যারা অবলম্বন করেন তারা বুদ্ধের আরও কাছে পৌঁছে যায়।

সূত্র: মধুমিতা, চট্টোপাধ্যায় (২০১৩) চ্যাটার্জী, অমিতা (সম্পাদিত)। *ভারতীয় ধর্মনীতি*। কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা। পৃ. ২৭৫।

৩৪) চারটি পুণ্যস্থান: সুত্তপিটকের প্রথম বিভাগ ও সংকলনগ্রন্থের হল দীঘনিকায়। এই নিকায়ে মোট ৩৪ টি দীর্ঘ মাপের সূত্র রয়েছে। ওই সূত্রগুলির মধ্যে বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব বা মতের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সূত্র একেকটি ছোট গ্রন্থ বিশেষ বলা যেতে পারে। এই নিকায়ের মধ্যে প্রাক্ বুদ্ধ ও বুদ্ধকালীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, দর্শন, অর্থনীতি ও ধর্মস্থানের বর্ণনা করা হয়েছে দীর্ঘাকারে। ভগবান বুদ্ধ এই স্থানে বলেছেন বৌদ্ধদের ভ্রমণের চারটি স্থানের নাম যথা – লুম্বিনী, বুদ্ধ গয়া, সারনাথ ও কুশীনারা। এই চার পুণ্যস্থানে ভ্রমণ না করলে বৌদ্ধদের জীবন সম্পূর্ণ হয় না।

সূত্র: চৌধুরী, বিনয়েন্দ্রনাথ (২০১৪) চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত)। তদেব। পৃ. ৪৩-৪৭।

৩৫) ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ (১৪১৮)। *বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: করুণা। পৃ. ১৩৮-১৩৯।

৩৬) চট্টোপাধ্যায়, সুনীল (২০০৩)। *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ১৭৬।

৩৭) মহাপাত্র, পীযূষ কান্তি (সম্পাদিত) (২০১২)। তদেব। পৃ. ৬৪৮।

৩৮) ত্রিপাঠী, যদুপতি ও ত্রিপাঠী, অশ্রুলেখা (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। পৃ. ৮৩।

৩৯) দাসগুপ্ত, জয়ন্তকুমার (সম্পাদিত) (২০০৯)। *কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৩০২।

৪০) নস্কর, সনৎকুমার (সম্পাদিত) ২০১৫। *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল*। কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ। পৃ. ২০৪।

৪১) চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার (সম্পাদিত) (২০০৫)। *চর্যাগীতির ভূমিকা*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী। পৃ. ২০৫।

৪২) মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পাদিত) (১৯৬০)। *হরিদেবের রচনাবলী রায় মঙ্গল ও শীতলা মঙ্গল*। সাহিত্য প্রকাশ – ৪। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী। পৃ. ১৭৫।

৪৩) চট্টোপাধ্যায়, সুনীল (২০০৩)। তদেব। পৃ. ৯৫।

৪৪) চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার (সম্পাদিত) (২০০৫)। তদেব। পৃ. ২০৭-২০৮।

৪৫) নস্কর, সনৎকুমার (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। পৃ. ১৮৫-১৮৬।

৪৬) চট্টোপাধ্যায়, সুনীল (২০০৩)। তদেব। পৃ. ৯৫।

৪৭) ভট্টাচার্য, চন্দ্রোদয় (অনূদিত) কোসাম্বী, ধর্মানন্দ (২০১৫)। *ভগবান বুদ্ধ*। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি। পৃ. ১০৫।

৪৮) হালদার, যোগিলাল (সম্পাদিত) (২০১২)। *রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ২৩৪।

৪৯) ত্রিপাঠী, যদুপতি ও ত্রিপাঠী, অশ্রুলেখা (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। পৃ. ৮৬।

৫০) রায় আচার্য্য, সুচিত্রা (২০১৪)। *অশোক অভিলেখ*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৫২।

৫১) মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পাদিত) (১৯৬০)। তদেব। পৃ. ১৮৩।

৫২) ষোলসতী: জৈন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মূলত 'সতী' শব্দটি নারীদের গুণগান ব্যাখ্যা করতে ব্যবহার করা হয়েছে। যাদের মহৎ কর্মগুলিকে নারীদের পথচলার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। জৈনধর্মে এইরূপ ষোলো জন প্রতিনিধি শ্রেণির নারীর নামোল্লেখ পাওয়া যায়। যারা হলেন যথাক্রমে – ব্রাহ্মী, সুন্দরী, চন্দনবালা, রাজিমতি, দ্রৌপদী, কৌশল্যা, মৃগবতী, সুলশা, সীতা, সুভদ্রা, শিবা, কুন্তী, দময়ন্তী, পুষ্পচূলা, প্রভাবতী ও পদ্মাবতী।

সূত্র: Joshi, Ratanlal (edited) (2000). *Uttaradhyayana-sutra.* Solana: Shri Shri Sadhu Marg Jaina Sanskriti Rakshak Sanggha. পৃ. ৩৬০।

৫৩) লাহা, বিমলাচরণ (২০১৩)। *বৌদ্ধরমণী*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। পৃ. ১৬।

৫৪) দত্ত, বিজিতকুমার ও দত্ত, সুনন্দা (সম্পাদিত) (২০০৯)। *মানিকরাম গাঙ্গুলি-বিরচিত ধর্মমঙ্গল*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৫৩৩।

৫৫) অর্থশাস্ত্র: এই গ্রন্থটি হল চাণক্য রচিত একটি সুপ্রাচীন রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক গ্রন্থ। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে রচিত এই গ্রন্থটি প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও শাসনসংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ইতিহাস।

সূত্র: shamashastry, R (translated and edited) (1951). *Kautilya's Arthashastra.* New Delhi: Mysore Press. পৃ. ১-৫৮৯।

৫৬) সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত) (১৪২৫)। *নারী ঔপন্যাসিক সংখ্যা*। কলকাতা: এবং মুশায়েরা। পৃ. ৩৮৮।

৫৭) হালদার, যোগিলাল (সম্পাদিত) (২০১২)। তদেব। পৃ. ২৫৯।

৫৮) মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার (১৩৮৮)। *বাংলায় ধর্মসাহিত্যে লৌকিক উপাদান* । কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী। পৃ. ৫৯।

৫৯) রায়, শরৎকুমার (১৪০৭)। *বৌদ্ধ ভারত*। কলকাতা: করুণা। পৃ. ১২৬।

৬০) চৌধুরী, সত্যজিৎ, ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ, ভট্টাচার্য, সুমিত্রা, সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর, চৌধুরী, সত্যজিৎ (সম্পাদিত) (১৯৯১)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ।* প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ। পৃ. ২১২-২১৩।

৬১) বড়ুয়া, ব্রহ্মানন্দ প্রতাপ (২০১৩)। *বাংলায় বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন। পৃ. ১৭০।

৬২) বসু, সুজিতকুমার, মণ্ডল, সুধেন্দু, ভট্টাচার্য, সুতপা, দাস, নরেন্দ্রনাথ, ভট্টাচার্য, গৌতম (১৪১৫)। *রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ। পৃ. ৪৩।

৬৩) চৌধুরী, সত্যজিৎ, ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ, ভট্টাচার্য, সুমিত্রা, সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর, চৌধুরী, সত্যজিৎ (সম্পাদিত) (১৯৯১)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ।* তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ। পৃ. ৩৮১।

৬৪) রায়, শরৎকুমার (১৪০৭)। *বৌদ্ধ ভারত*। কলকাতা: করুণা। পৃ. ১২৭।

৬৫) মহাপাত্র, পীযূষ কান্তি (২০১২)। তদেব। পৃ. ৪২।

৬৬) চট্টোপাধ্যায়, সুনীল (২০০৮)। তদেব। পৃ. ৭৭।

৬৭) বরণকুলা: বরণ শব্দের অর্থ সসম্মানে অভ্যর্থনা করা। দেবতা, বর (বিবাহের পাত্র) -কে নানা উপকরণে অর্চনা করা। আর এই অর্চনার জন্য বিবিধ উপকরণ সাজানো হয়, শস্যাদি ঝাড়ার জন্য ব্যবহৃত অর্ধবৃত্তাকার ডালাকে। একে বরণডালা ও বলা হয়, যার অর্থ দাঁড়ায় বরণের উপকণে সজ্জিত ডালা।

সূত্র: হক, মুহম্মদ এনামুল, লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন, সরকার, স্বরোচিষ (সম্পাদিত) (২০১৪)। *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি। পৃ. ২৭৭ ও ৮৩৩।

৬৮) বড়ুয়া, প্রণবকুমার (২০০৭)। *বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। পৃ. ৮৮।

৬৯) বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ১৭৯।

৭০) মুখোপাধ্যায়, নিশীথ (সম্পাদিত) (২০১৫)। *রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল*। কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ। পৃ. ৪২।

৭১) হোসেন, সেলিনা (২০১৮)। *পছন্দের পাঁচ উপন্যাস*। কলকাতা: দিয়া। পৃ. ৩৬৫।

৭২) চৌধুরী, সত্যজিৎ, ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ, ভট্টাচার্য, সুমিত্রা, সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর, চৌধুরী, সত্যজিৎ (সম্পাদিত) (১৯৯১)। তদেব। পৃ. ২৪০।

৭৩) দত্ত, বিজিতকুমার ও দত্ত সুনন্দা (সম্পাদিত) (২০০৯)। *মানিকরাম গাঙ্গুলি-বিরচিত ধর্মমঙ্গল*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৫৩।

৭৪) বড়ুয়া, ব্রহ্মানন্দ প্রতাপ (২০১৩)। *বাংলায় বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন। পৃ. ১৭৬।

৭৫) মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন (সম্পাদিত) (২০০৪)। *শীতলামঙ্গল সমগ্র*। কলকাতা: দশদিশি। পৃ. ৪৪৭।

৭৬) সেন, সুকুমার (১৯৯৯)। *বঙ্গ ভূমিকা*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পৃ. ১০৭।

৭৭) ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ, মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র ও ভিক্ষু, সুমনপাল (সম্পাদিত) (২০১৫)। *বৌদ্ধদের দেব-দেবী*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। পৃ. ৫৪।

৭৮) সেন, সুকুমার (১৯৯৯)। তদেব। পৃ. ১০৮।

৭৯) ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ, চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। পৃ. ৭৭।

৮০) মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পাদিত) (১৯৬০)। তদেব। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী। পৃ. ২৪৫-২৪৬।

৮১) Rahaman, Mukhlesur (1998). *Sculpture in the Varendra Research Museum a Descriptive Catalogue.* Rajshahi: Varendra Research Museum. পৃ. ৩২৯।

৮২) Bhattacharyya, Benoytosh (edited) (2013). *The Indian Buddhist Iconography.* New Delhi: Cosmo Publication. পৃ. ৩৭।

৮৩) বেরা, নলিনী (২০১৯)। *সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ১৫০।

৮৪) নস্কর, সনৎকুমার (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। পৃ. ২৩।

৮৫) রায়, নীহাররঞ্জন (২০০৩)। *ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা*। কলকাতা: দে'জ। পৃ. ৬৭।

৮৬) আম্বেদকর, ভীমরাও (সম্পাদিত) সরকার, ধীরেন্দ্রনাথ (বঙ্গানুবাদ) (২০০৪)। *বুদ্ধ এবং তার ধম্ম অজ্ঞতাই দুঃখের মূল কারণ*। অষ্টম খণ্ড। নাগপুর: ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল। পৃ. ৪৫০।

৮৭) Banerjee, Biswaanath and Chaudhuri, Sukomal (edited) (2017). *Buddha and Buddhism.* Kolkata: The Asiatic Society. পৃ. ১৬৪।

৮৮) Mitra, Sisir Kumar (1979) (edited). *East Indian Bronzes.* Kolkata: Centre of Advanced Study in Ancient Indian History and Culture Calcutta University. পৃ. ১১৪।

৮৯) Rahman, Mukhlesur (1998) (edited)। তদেব। পৃ. ১৪৫।

৯০) Spence, Lewis (1987). *The Myths of Mexico and Peru.* Mexico: Pu.পৃ. ১৪৮।

৯১) সেন, কৃষ্ণবিহারী (প্রণীত) ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পাদিত) (২০০৪)। *অশোক চরিত*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ৪৫।

৯২) বড়ুয়া, জিতেন্দ্র লাল (২০১৪)। *দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ*। ঢাকা: অন্যধারা। পৃ. ১৪।

৯৩) Bhattacharyya, Benoytosh (edited) (2013)। তদেব। পৃ. ৬৯।

৯৪) Rahaman, Mukhlesur (1998)। তদেব। পৃ. ৫৭৩।

৯৫) ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ, মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র ও ভিক্ষু, সুমনপাল (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। পৃ. ১৬৪।

৯৬) ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ (১৪১৮)। *বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: করুণা। পৃ. ১৭৯।

৯৭) মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার (১৯৭৮)। *চীনে বৌদ্ধ সাহিত্য*। কলকাতা: বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ। পৃ. ১০৮।

৯৮) বসু, সুজিতকুমার, মণ্ডল, সুধেন্দু, ভট্টাচার্য, সুতপা, দাস, নরেন্দ্রনাথ ও ভট্টাচার্য, গৌতম (সম্পাদক মণ্ডলী) (১৪১৫)। তদেব। পৃ. ৪৫।

৯৯) চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত) (২০১৫)। তদেব। পৃ. ৮।

১০০) Rahaman, Mukhlesur (1998)। তদেব। পৃ. ৩২৯।

১০১) Mitra, Sisir Kumar (edited) (1979)। তদেব। পৃ. ১০৩।

১০২) Rahaman, Mukhlesur (1998)। তদেব। পৃ. ৩২৯।

১০৩) Mitra, Sisir Kumar (edited) (1979)। তদেব। পৃ. ১০৫।

১০৪) আচার্য, অনিল (সম্পাদিত) মুখোপাধ্যায়, বন্দনা (রচিত) (১৪২২)। *বিশেষ বাংলা পুঁথি সংখ্যা*। প্রাক্ শারদীয়, ৪৯ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা। কলকাতা: অনুষ্টুপ। পৃ. ১১২।

উপসংহার

সময়-পরিসরের পারম্পর্য এবং গ্রন্থনা হিসেবে এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে 'মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈন দেবভাবনা: পৌরাণিক ও লোকায়ত উপাদান সন্ধান ও বিশ্লেষণ' গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা একাধিক ধর্মীয় মতাদর্শের প্রাধান্যতা ভারতীয় সমাজভাবনার বিষয়ে শুধুমাত্র সমকালকেই প্রভাবিত করেনি, এই প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতীয় সমাজের উত্তরকালের মধ্যেও। ফলে ভারতীয় সমাজ গঠনের মূলে পরিলক্ষিত হয়েছে মিশ্রধর্মীয়-সংস্কৃতির মেলবন্ধন। এই সমাজে গড়ে ওঠা সাহিত্যের মধ্যে এই মিশ্রসংস্কৃতির ধারণাগুলি নিমজ্জিত রয়েছে - সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, ধর্মীয় আচরণবিধি, নারীদের পূজাপদ্ধতি, দেবতাদের মূর্তিকল্পনা ও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যা এই সুদীর্ঘ গবেষণা পরিকল্পনার পরিধিতে স্পষ্ট করা হয়েছে।

জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর ও বৌদ্ধধর্মের শাস্তা গৌতমবুদ্ধ দুজনেই পূর্ব ভারতের মনীষী ছিলেন। তাঁদের ধর্মের প্রচারভূমি প্রাচ্যদেশের (মগধ, মিথিলা ও অঙ্গ) মধ্যেই সীমিত ছিল না। তাঁদের ধর্মীয় মতাদর্শের প্রভাব বাংলার মাটিতেও নেমে এসেছিল কিছুটা সময়ের ব্যবধানে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে এই দুই ধর্মের পূর্বকালে প্রচলিত ছিল পুরাতন আর্যধর্ম। যা বেদবাহ্য বলেই চিহ্নিত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে এই তিনটি ধর্মীয় মতাদর্শকে সমাজের মধ্যে অস্তিত্ব বজায় রাখতে নানাবিধ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। অস্তিত্বের লড়াইয়ে ধর্মগুলি হারিয়ে ফেলেছে তাদের নিজস্ব আকৃতি ও প্রকৃতি। সকল ধর্মীয় মতগুলির মধ্যে ঘটে গেছে এক আশ্চর্য সংযোগসাধন। জৈন ধর্মাবলম্বীরা মনে করে জীবনে ত্যাগ ও পবিত্রতার মধ্য দিয়ে কর্মের সাধনা করা প্রয়োজন। একইভাবে মহাবীরের উত্তরকালে গৌতম বুদ্ধ এই ধারণাকে তাঁর নিজের প্রচারিত ধর্মের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ-এর প্রচলিত ধর্মমত দুটি দীর্ঘকাল ধরে ভারতভূমিতে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছিল। কালের নিয়মে এই দুই ধর্মীয় মতাদর্শের অবসান ঘটেছে ঠিকই কিন্তু নবআগত ধর্মমতের মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বীজ বপন করে রেখে গেছে। মুসলমান শাসনের গোড়ার দিকে ভারতীয় সমাজে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য লক্ষ করা গিয়েছিল। এই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের আগমনের পরেই সামজে উঁচুনীচু ধর্মীয় ভেদাভেদ মুছে গিয়ে সমাজকে এক স্থির ধর্মীয় ভাবনার মধ্যে এসে মিলিত হতে দেখা গেছে। জৈন ও বৌদ্ধমহান সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবদেবী

ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক উপাসনার মধ্যে রূপবদল করে নিজেদের রক্ষা করেছে। এই সময়কালের মধ্যে লিখিত হওয়া সাহিত্যের মধ্যেও এই স্মৃতি কাহিনি উল্লেখ হতে দেখা যায়।

প্রকৃতপক্ষে সমাজের অসম নীতি-ব্যবস্থা এবং শাসকের কর্মবিধির ওপর নজরদারি এই দুই বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে গড়ে ওঠে সাহিত্যভাবনার একটি অংশ। বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের ধারায় মধ্যযুগের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটাতে মঙ্গলকাব্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তেমনি প্রাচীন যুগের সঙ্গে পাঠকের পরিচিতি বৃদ্ধি করতে বৌদ্ধ ও জৈনযুগের ধর্মীয়সাহিত্যগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে। মানুষের নিজের পাওয়া না পাওয়ার কাহিনি যেমন এখানে জোরালো হয়েছে। সমাজের পৌরাণিক দেবতাকে সরিয়ে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল নবাগত দেবতাদের সেকথাও জানানো হয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে দেশ-জাতি-সত্তার পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয়। খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীতে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম দুটির প্রচলন হলেও, জৈনধর্ম ভারতবর্ষের বাইরে খুব একটা বিস্তার লাভ করতে পারেনি। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের বাইরে সমগ্র এশিয়া মহাদেশকে আলোড়িত করেছিল। প্রাচীন যুগের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের তুলনায় জৈনধর্মের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা খুব বেশি দেখা যায় না। বর্তমান ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের তুলনায় জৈনধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য বেশি দেখা যায়। গৌতম বুদ্ধ দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রচারিত ধর্মমত আরও বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিল। প্রাচীন ভারতে প্রথমে বৈদিক যুগের সূচনা হয়, যেখানে কিছু মানুষ শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থে সমাজের নিয়ম-কানুনের বহর বাড়িয়ে তোলে। বৈদিক নিয়মের দ্বারা শোষিত সমাজ পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে। সমাজে এই পরিবর্তন আসে বৈদিক ধর্মের বিরোধী দুই ধর্মের হাত ধরে। এরপর বিদেশী আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। যেখানে একটি নবাগত মিশ্রধর্মীয় সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটে। মানুষ দীর্ঘদিন বৈদিক ধর্মের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হতে গিয়ে একসময় যেমন বেছে নিয়েছিল বেদবিরোধী ধর্মীয় মতাদর্শগুলিকে। বৌদ্ধ ও জৈন এই দুই ধর্মের দীর্ঘকাল অবস্থানের পর তাদের কলুষিত হয়ে ওঠা সমাজ থেকে মানুষ পরিত্রান পেতে আবার ভিন্নধর্মের সাহায্য পেতে আগ্রহী হয়। ভারতীয় সমাজে গড়ে ওঠে বৌদ্ধ ও জৈন যুগ এবং হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ। যা সমকালীন লেখকদেরও সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে রসদ জুগিয়েছিল।

সমাজের প্রতিনিধিশ্রেণির একদল মানুষ সেইসঙ্গে কিছু শিক্ষিত মানুষ তাদের এই অবস্থার কথাকে সাহিত্যে রূপদান করেছে নিজেদের অস্তিত্বের কথা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। তারা মঙ্গলকাব্যগুলি গড়ে তুলতে গিয়ে পৌরাণিক ও লোকায়ত দেবতাদের আশ্রয় নিয়েছে। মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের চরিত্রে এবং গল্পের কাহিনিতে মিশ্রসমাজের ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। এই শ্রেণির কবিরা নিজেদের বিশ্বাসের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পৌরাণিক ও লোকায়ত বিশ্বাসকে কাব্য মধ্যে এনে জুড়ে দিয়েছে। সেগুলির সঙ্গে নিজ ধ্যান-ধারণাগুলির মিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা গ্রহণ করেছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন ধর্মের পৌরাণিক ও লৌকিক সকল বৈশিষ্ট্যেগুলিকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত সম্ভব হয় নিখুঁত বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

ভারতবর্ষের মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, সেখানে মঙ্গলকাব্যের ধারার মধ্যে পূর্বতন সমাজে প্রচলিত বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভাবনাগুলি স্থান দখল করে রয়েছে। যা সহবস্থানের ফলে প্রকৃতির নিয়মেই সংঘটিত হয়েছে। দেশের বাইরেও এই ধর্মীয়ভাবনাগুলি নিজেদের বিস্তৃতি ঘটাতে থাকে। ওই দেশের পূর্ব প্রচলিত ধর্মীয়ভাবনাগুলিকে বিলোপের মধ্যে দিয়ে, কোনো দেশে সেই অঞ্চলের স্থানীয় ধর্মীয়ভাবনাগুলির মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। একইভাবে জৈনধর্ম নিজের অধিকার বিস্তার করতে করতে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। বর্তমান বাংলাদেশের পাহাড়পুরের তাম্রপটে জৈন আচার্যদের নাম খুঁজে পাওয়া যায়। সেই সমাজে জৈনগৃহীদের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বৌদ্ধদের পূর্বে জৈনদের আগমন ও প্রসার ঘটেছিল। বঙ্গদেশে বৌদ্ধদের তুলনায় জৈনধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বৌদ্ধ ও জৈনদের দেবতার মূর্তিতত্ত্বের সঙ্গে ভারতের বাইরে বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে গড়ে ওঠা দৈব রূপকল্পনায় সাদৃশ্য বজায় থাকতে দেখা গেছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে দেবী সরস্বতীর কথা। ভারতীয় মঙ্গলকাব্য, বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে এই দেবী বিভিন্ন নামে ধরা দিয়েছেন।

সকল দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হওয়া যায় যে, হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এইসকল ধর্মগুলি বহুকাল পাশাপাশি সহাবস্থানের ফলে সকল ধর্মগুলির মধ্যে মতবাদের আদান-প্রদান হয়েছিল। হিন্দুমতে যাকে কৈবল্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, বৌদ্ধমতে

সেটা নির্বাণ নাম পেয়েছে। একইভাবে সমাজে জৈনধর্মের আচরিত রীতি ও প্রথাগুলির ছাপ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে দেখা যায়। তুর্কী আক্রোমণোত্তর দু'শো বছর পরে বাংলাসাহিত্যে মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল। এই সামাজে সরাসরি বৌদ্ধধর্ম বা জৈনধর্মের প্রভাব সেভাবে চোখে পড়ে না। সমাজের অন্তঃস্থলে তখনও জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল। তুর্কী আক্রমণের (১২০১ খ্রিস্টাব্দ) ফলে বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। আর্য-অনার্য গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ ও সমন্বয় ঘটেছিল যাকে সংক্রান্তিকাল বলা হয়েছে, তুর্কী আক্রমণ এই প্রক্রিয়াকে সংঘটিত করতে অনুঘটকের কাজ করেছিল। সবদিক থেকে বিপর্যস্ত উচ্চবর্ণের লোকেরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিম্নবর্ণের সঙ্গে মেলবন্ধনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ধর্মসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই পর্ব অত্যন্ত জরুরি। অনার্য লোকায়ত অন্ত্যজ দেবতারা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য আর্য ব্রাহ্মণ্যদেবতাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের পর প্রতিষ্ঠালাভে সক্ষম হয়েছে। নিম্নবর্ণের দেবতাদের মধ্যে উচ্চবর্ণের দেবতাদের বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়েছিল। সমাজে ক্রমে পুরাতন ধর্ম–বিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে পড়েছিল, এবং নবাগত আদর্শের প্রতি মানুষের আশা ও আশ্বাস স্থাপিত হতে থাকে। রক্ষণশীল এই সমাজ পুরাতনকে একেবারে পরিত্যাগ করতে পারে না; তাঁদের নূতনকে গ্রহণ করার প্রক্রিয়ার মধ্যে পুরাতনেরই রূপান্তর হয়ে রইল। এই নূতন পুরাতনের মিশ্রণের ভাবনায় উৎপন্ন দেবতারা নাম পেয়েছিল মিশ্রসত্য দেবতা। জৈন এবং বৌদ্ধরা ভক্তিসহকারে যে সকল দেবতাদের পূজা করে থাকে। হিন্দুরা সেই সকল দেবতাদের নাম পরিবর্তন করে নিজেদের পূজ্য দেবতা হিসেবে গ্রহণ করেছে। একইভাবে জৈন ও বৌদ্ধ আচার-বিধিগুলিকে মধ্যযুগের সমাজ নিজেদের প্রয়োজন মতো সামান্য অদল-বদল করে নিজেদের সংস্কৃতি বলে বহন করে চলেছে।

হাজার বছরের পুরোনো নির্বাচিত গ্রন্থগুলি পাঠের পরে এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হওয়া যায় যে চলমান সমাজে সাংস্কৃতিক আচার রীতিপদ্ধতিগুলির থাকে এক বিশেষ প্রবাহমানতা। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রাপ্ত দেবতাদের বর্ণনায় পাওয়া যায় যুগ যুগ থেকে চলে আসা জৈন এবং বৌদ্ধ দেবদেবীদের আচার-আচরণগত বিষয়ের সাদৃশ্য। সময়ানুক্রমে দেখা গেছে সমাজের অভ্যন্তরে এই গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়াগুলি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে। যেগুলিকে সাহিত্যের মধ্যে থেকে বিশ্লেষণ করে মিশ্রসংস্কৃতির ব্যাপারে আরও স্পষ্ট ধারণা পোষণ করা যেতে পারে। হিন্দু-বৌদ্ধ এবং

হিন্দু ও জৈনদের মিশ্রসংস্কৃতিতেও এমনটাই ধরা পড়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলির বাইরে রয়েছে পুনরায় উত্থিত নবব্রাহ্মণ্যবাদের বৈশিষ্ট্য ও অভ্যন্তরে রয়েছে হাজার বছরের পুরোনো ক্ষয়ে যাওয়া বৌদ্ধ ও জৈন ঐতিহ্য। যা পরিবর্তন, পরিবর্জন ও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের মূল অবস্থাকে নিরবচ্ছিন্ন রেখেছে একাধিক সময়েও। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতির যেমন পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি সামাজিক রীতি-নীতির ও পরিবর্তন ঘটেছে। যা অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়ম প্রকৃতির। সমাজের আচার পদ্ধতিগুলির মধ্যে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছে। যেগুলি হয়ত সামান্য রূপান্তরিত হয়েছে নতুন সমাজে এসে। মূল বিষয়বস্তু আসলে একই রয়ে গেছে। একটি সমাজ ভাবনা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিভিন্ন সমাজ ভাবনা ও সংস্কৃতি এসে মিলিত হয়ে যে সমাজভাবনা বেশি যুগোপযোগী ও ক্ষমতাশালী হতে পারে সেই টিকে থাকে। সেই সমাজভাবনাগুলি এগিয়ে যাওয়ার পথকে আরও প্রশস্ত করে। জন্ম দেয় এক মিশ্রসমাজ ও মিশ্রসংস্কৃতির। এই মিশ্র সমাজভাবনার মধ্যে আগত সকল 'দৈবী' ভাবনার মধ্যেও থাকবে একাধিক ধর্মীয় সমাজের দৈবীপরিকল্পনা। বাংলা সাহিত্যের ধারায় আলোচিত হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতি এবং হিন্দু ও জৈন সমাজ-সংস্কৃতির ধারাগুলিকে পরস্পর বোঝার জন্য এই মঙ্গলকাব্যগুলি খুব সহায়ক মাধ্যম হয়ে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একাধিক ধর্মীয়ভাবনার সংমিশ্রণের ধারণাকেও এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। সময় এবং সময়ের পাঠক্রমকে ধারণ করে রয়েছে মঙ্গলকাব্যগুলি। এই শিল্প সাহিত্যগুলিকে বিশ্লেষণ করেই অতিক্রান্ত সময়ে এসে দাঁড়িয়েও সেই সময়কাল ও সমাজভাবনাকে অনুধাবন করা যায়। মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈন দেবভাবনার পৌরাণিক ও লোকায়ত উপাদানগুলি সন্ধান ও বিশ্লেষণের মধ্যেই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের কাজটি যুক্ত থাকতে সচেষ্ট হয়েছে।

পরিশিষ্ট

চিত্র

ক. হিন্দু দেবতা শিব: কালিয়াচক ৩ নং ব্লক, পারলাল পুর, মালদা।

খ. বৌদ্ধ দেবতা নীলকণ্ঠ: সারনাথ মিউজিয়াম, বারাণসী।

গ. জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ: শ্রী দিগম্বর জৈন বড় মন্দির, নিউ দিল্লী।

ঘ. হিন্দুদেবী মনসা: কালিয়াচক ৩ নং ব্লক, পারলাল পুর, মালদা।

ঙ. বৌদ্ধদেবী জাঙ্গুলী: উইকিপিডিয়া তারিখ: ১২/১/২০২২।

চ. জৈন দেবী পদ্মাবতী: শ্রী আত্মা বল্লভ জৈন স্মার্ক, দিল্লী।

ছ. হিন্দুদেবী চণ্ডী: বৈষ্ণদেবী মন্দির, কুলু-মানালি, হিমাচল প্রদেশ।

জ. বৌদ্ধদেবী একজটা: উইকিপিডিয়া তারিখ: ১২/১/২০২২।

ঝ. বৌদ্ধদেবী চুন্দা: ন্যাশনাল মিউজিয়াম, নিউ দিল্লী।

ঞ. গাজনের ধর্মদেবতা: জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ।

ট. শিবলিঙ্গ: পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারের গায়ে, নওগাঁজেলা, বাংলাদেশ

ঠ. দেবী অন্নপূর্না: কাশী, বারাণসী।

ড. হিন্দুদেবী শীতলা: কালিয়াচক ৩ নং ব্লক, পারঅনুপ নগর, মালদা।

ঢ. বৌদ্ধদেবী পর্ণশবরী: উইকিপিডিয়া তারিখ: ১২/১/২০২২।

ণ. বৌদ্ধ পঞ্চরক্ষা দেবী: উইকিপিডিয়া তারিখ: ১২/১/২০২২।

ত. দেবী ষষ্ঠী: উইকিপিডিয়া তারিখ: ১২/১/২০২২।

থ. বৌদ্ধদেবী হারিতি এবং পঞ্চিকা: ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম কলকাতা।

দ. জৈনদেবী অম্বিকা: শ্রী জিঙ্কুশাল সূরী জৈন দাদাবাড়ি, দিল্লী।

ধ. হিন্দুদেবী কালি: কালিয়াচক ৩ নং ব্লক, পারলাল পুর, মালদা।

ন. বৌদ্ধ হায় গ্রীভ: হিমালয়ান নিয়ংম্যাপ বৌদ্ধ গোম্পা, মানালি।

প. বৌদ্ধদেবী অপরাজিতা: সারনাথ মিউজিয়াম, বারাণসী।

ফ. হিন্দু সরস্বতী: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

ব. বৌদ্ধ মহাসরস্বতী: বৈষ্ণদেবী মন্দির, কুলু-মানালি, হিমাচল প্রদেশ।

ভ. জৈন সরস্বতী: বৈষ্ণদেবী মন্দির, কুলু-মানালি, হিমাচল প্রদেশ।

ম. হিন্দুদেবতা সূর্য: ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম কলকাতা।

য. বৌদ্ধদেবতা মারীচী: সারনাথ মিউজিয়াম, বারাণসী।

র. কার্ত্তিকেয়: ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম কলকাতা।

ল. লৌকিকদেবতা বনবিবি ও দক্ষিণরায়: বকখালি, পশ্চিমবঙ্গ।

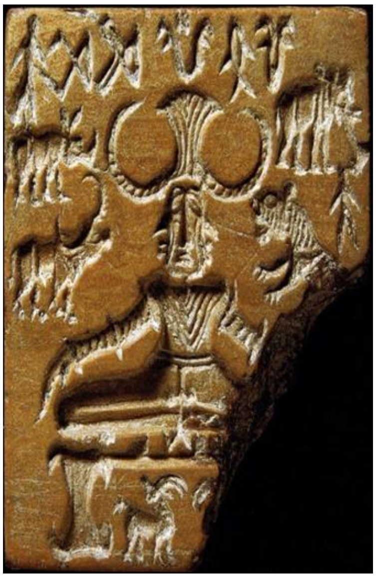

শ. পশুপতি: উইকিপিডিয়া তারিখ: ১২/১/২০২২।

ষ. বাবা পঞ্চানন: বারুইপুর, কলকাতা।

স. হিন্দুদেবী গঙ্গা: বেনারস ঘাট।
কাশী।

হ. বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রদান: সারনাথ, বারাণসী।

ড়. বৌদ্ধস্তুপ: পাহাড়পুর, নওগাঁ জেলা বাংলাদেশ।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

জ্ঞানবজ্র, কর্মা (দাস, রামকৃষ্ণ) (অনূদিত) (২০১৭)। *ধম্মপদ*। কলকাতা: তথাগত।

দত্ত, বিজিতকুমার ও দত্ত, সুনন্দা (সম্পাদিত) (২০০৯)। *মানিকরাম গাঙ্গুলি-বিরচিত ধর্মমঙ্গল*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দাশ গুপ্ত, তমোনাশ (সম্পাদিত) (২০১১)। *সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দাশগুপ্ত, জয়ন্তকুমার (সম্পাদিত) (১৯৬২)। *কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দাস, আশুতোষ (সম্পাদিত) (১৯৫৭)। *অভয়ামঙ্গল*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

নস্কর, সনৎকুমার (সম্পাদিত) (২০১৫)। *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল*। কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ।

বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। *কবিকঙ্কণ–চণ্ডী।* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পাদিত) (২০০২)। *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল*। কলকাতা: রত্নাবলী।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পাদিত) (২০১০)। *জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল*। কলকাতা: রত্নাবলী।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০০)। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।* কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী (সম্পাদিত) (২০০০)। *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল*। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি।

ভট্টাচার্য্য, সুধীভূষণ (সম্পাদিত) (১৯৬৫)। *দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পাদিত) (১৯৬০)। *হরিদেবের রচনাবলী রায় মঙ্গল ও শীতলা মঙ্গল*। সাহিত্য প্রকাশ–৪। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী।

মহাপাত্র, পীযূষ কান্তি (সম্পাদিত) (২০১২)। *ঘনরাম চক্রবর্তী-বিরচিত শ্রী ধর্মমঙ্গল*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মুখোপাধ্যায়, অতনুশাষণ (সম্পাদিত) (২০১৮)। *শীতলামঙ্গল সমগ্র*। কলকাতা: দশদিশি।

রায়, বসন্তরঞ্জন (সম্পাদিত) (১৩১৬)। *মনসামঙ্গল কবি ক্ষেমানন্দ দাস প্রণীত*। কলকাতা: বঙ্গবাসী- ইলেক্ট্রো।

সেন, সুকুমার (সম্পাদিত)। *কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি।

হালদার, যোগিলাল (সম্পাদিত) (২০১২)। *রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

অভিধান

চক্রবর্তী, জগন্নাথ (১৯৯৬)। *জাতীয় অভিধান*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ।

চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ ও আকাদেমি বানান উপসমিতি (সম্পাদিত) (২০০৫)। *আকাদেমি বানান অভিধান*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

বন্দোপাধ্যায়, হরিচরণ (১৯৭৮)। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। প্রথম খণ্ড অ-গ। নিউ দিল্লী – সাহিত্য অকাদেমি।

সরকার, সুধীরচন্দ্র (সম্পাদিত) (১৩৭০)। *পৌরাণিক অভিধান।* কলকাতা: এম. সি. সরকার. অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড।

হক, মুহম্মদ এনামুল, লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন, সরকার, স্বরোচিষ (সম্পাদিত)। *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থ

গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ (২০১০)। *সাময়িকপত্র প্রসঙ্গে*। কলকাতা: পারুল প্রকাশনী।

গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ (১৯৯৪)। *মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

গনী, ওসমান (২০০০)। *ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি*। কলকাতা: রত্নাবলী।

গম্ভীরানন্দ, স্বামী (সম্পাদিত) (১৯৯১)। *উপনিষদ গ্রন্থাবলী* । কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়।

গুপ্ত, মনীন্দ্রভূষণ (১৪০৭)। *সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

গোস্বামী, অচ্যুত (১৯৬১)। *বাংলা উপন্যাসের ধারা*। কলকাতা: পাঠভবন।

গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীল রাধাবিনোদ (অনূদিত) স্মৃতিতীর্থেন, কৃষ্ণচন্দ্র (সম্পাদিত) (২০০৬)। *শ্রীমদ্ভাগবত্*। কলকাতা: গিরিজা।

ঘোষ, ইশানচন্দ্র (২০০৮)। *জাতক-মঞ্জরী*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

ঘোষ, ইশানচন্দ্র (অনূদিত) (১৪০৮)। *জাতক*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

ঘোষ, ইশানচন্দ্র (অনূদিত) (১৪০৮)। *জাতক*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

ঘোষ, ইশানচন্দ্র (অনূদিত) (১৪০৮)। *জাতক*। ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

ঘোষ, ইশানচন্দ্র (অনূদিত) (১৪১১)। *জাতক*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী ।

ঘোষ, ইশানচন্দ্র (অনূদিত) (১৪১৪)। *জাতক*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী ।

ঘোষ, ইশানচন্দ্র (অনূদিত) (১৪১৪)। *জাতক*। পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী ।

ঘোষ, তপনকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮)। *বাংলা ভাষায় জৈনধর্ম চর্চা*। কলকাতা: প্যাপিরাস।

ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পাদিত) (২০১৫)। *বৃন্দাবন দাস-বিরচিত শ্রী শ্রী চৈতন্যভাগবত* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

ঘোষ, সুবীর (২০১১)। *ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়*। কলকাতা: পশ্চিম বাংলা অকাদেমি।

চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ (২০১০)। *নিবন্ধ সংগ্রহ-১ তন্ত্র*। কলকাতা: গাঙচিল।

চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার (সম্পাদিত) (২০০৫)। *চর্যাগীতির ভূমিকা*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত) (২০১১)। *লোককথার সাতকাহন*। কলকাতা: অপর্ণা বুক ড্রিষ্ট্রিবিউট।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত) (২০১২)। *বাংলার ব্রত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর*। কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ।

চক্রবর্তী, রজনীকান্ত (২০০৯)। *গৌড়ের ইতিহাস* । প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে। কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

চক্রবর্তী, রমাকান্ত (২০১৭)। *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম* । কলকাতা: আনন্দ।

চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (২০১৫)। *বৌদ্ধদের দেবদেবী বিনয়তোষ ভট্টাচার্য*। কলকাতা: চিরায়ত।

চট্টোপাধ্যায়, তুষার (১৯৮৫)। *লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান*। কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড।

চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ (সম্পাদিত) (১৩৬৫)। *জয়দেবের গীতগোবিন্দম্*। কলকাতা: দেব–প্রেস।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীল (২০০৩)। *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীল (২০০৮)। *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

চৌধুরী, দুলাল (সম্পাদিত) (২০০৪)। *বাংলার লোকসংস্কৃতি বিশ্বকোষ*। কলকাতা: আকাদেমি অব ফোকলোর।

চৌধুরী, বিনয়েন্দ্র নাথ ও চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত) (২০১৪)। *বৌদ্ধ সাহিত্য*। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ। কলকাতা: মহাবোধি।

চৌধুরী, সত্যজিৎ, ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ, ভট্টাচার্য, সুমিত্রা, সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর, চৌধুরী, সত্যজিৎ (সম্পাদিত) (১৯৯১)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

চৌধুরী, সত্যজিৎ, ভট্টাচার্য, সুমিত্রা ও দেবপ্রসাদ, সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর, বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন (সম্পাদিত) (২০০১)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

চৌধুরী, সাধনকমল (১৮১২)। *মহাবংশ* । কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

চৌধুরী, সাধনকমল (২০০৫)। *থুপবংশ* । কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

চৌধুরী, সাধনকমল (২০১৭)। *ইতিহাসের আলোয় গৌতম বুদ্ধ* । কলকাতা: করুণা প্রকাশনী ।

চৌধুরী, সাধনকমল (অনূদিত) (১৪০৯)। *বিশুদ্ধ সূত্তনিপাত*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত) (২০১৪)। *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত) হালদার (দে), মণিকুন্তলা (২০১০)। *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

জ্ঞানবজ্র, কর্মা (অনূদিত) (২০১৭)। *ধম্মপদ*। কলকাতা: তথাগত।

ঝাঁ, শক্তিনাথ (১৯৯৯)। *বস্তুবাদী বাউল উদ্ভব সমাজ সংস্কৃতি ও দর্শন*। কলকাতা: দে'জ প্রকাশনী।

ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ (অনূদিত) (১৪০৭)। *অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০১৭) চৌধুরী, সুকমল ও ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ (সম্পাদিত)। *বুদ্ধদেব*। *Introducing Mahayan Buddhism*। কলকাতা: The Asiatic society।

ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ (১৪১৮)। *বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী ।

তর্কবাগীশ, ফণীভূষণ (সম্পাদিত ও অনূদিত) (১৯৬১)। *ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র) বাৎস্যায়ন ভাষ্য*। প্রথম খণ্ড।

তেওয়ারী, হরিপ্রসাদ ও তেওয়ারী, নৃসিংহবাদ (২০১৯)। *ভগবান মহাবীরের সিদ্ধভূমি ও জৈন কালচক্র*। কলকাতা: সোমলতা।

ত্রিপাঠী, যদুপতি ও ত্রিপাঠী, অশ্রুলেখা (সম্পাদিত) (২০১৫)। *ভারতীয় দর্শন পরিচয়*। কলকাতা: বি. এন. পাবলিকেশন।

দত্ত, অক্ষয় কুমার (১৩১৮)। *ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

দত্ত, অক্ষয় কুমার (১৪১৩)। *ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

দত্ত, রমেশ (১৪০৩)। *প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস* । প্রথম খণ্ড: প্রথম ভাগ। কলকাতা: দীপায়ণ।

দত্ত, শ্রীরমেশ চন্দ্র (অনূদিত) (১৮৮৬)। *ঋগ্বেদ সংহিতা*। চতুর্থ অষ্টক। কলকাতা: কলকাতা: গবর্নমেন্ট যন্ত্রে মুদ্রিত।

দাশ, আশা (১৯৬৯)।*বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস।

দাশ, আশা (রচিত) বড়ুয়া, সুমিত (সম্পাদিত) (২০১৮)। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ছোঁয়া।

দাশগুপ্ত, অংশুপতি (অনূদিত) (২০০৫)। *অতীতের উজ্জ্বল ভারত*। A. L. Basham লিখিত 'The Wonder that was India' নামক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

দাশগুপ্ত, তমোনাশ (১৯৫১)। *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দাশগুপ্ত, নলিনিনাথ (১৩৫৫)। *বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: এ. মুখার্জী।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ (১৪০৯)। *ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ (২০০৪)। *ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা*। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন।

দাস, উপেন্দ্রকুমার (২০১০)। *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি সাধনা*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার।

দাস, উপেন্দ্রকুমার (২০১১)। *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।

দাস, হরিদাস (সম্পাদিত) (১৪২১)। *শ্রীশ্রী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো।

দুর্গাকিঙ্কর (১৩৭৭)। *সভ্যতা ও ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ*। প্রথম অধ্যায়। কলকাতা: পাবলিসিটি প্রিন্টার্স।

নস্কর, সনৎকুমার (সম্পাদিত) (১৯৯৪)। *কবি-কঙ্কণচণ্ডী*। কলকাতা: রত্নাবলী।

নিগূঢ়ানন্দ (১৩৭৯)। *দেব দেউল ভারত*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

পাল, বিপদভঞ্জন (২০১৪)। *ভারতীয় দর্শন*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

বড়ুয়া, জিতেন্দ্র লাল (২০১৪)। *দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ*। ঢাকা: অন্যধারা।

বড়ুয়া, দীপক কুমার (২০০৮)। *বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।

বড়ুয়া, প্রণবকুমার (২০০৭)। *বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি* । ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

বড়ুয়া, বেণীমাধব (অনূদিত) (বুদ্ধাব্দ ২৪৮৩)। *মধ্যম-নিকায়, দয়াধন-উমাবতী*। সিরিজ-৩। কলকাতা: যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড।

বড়ুয়া, বেণীমাধব (অনূদিত) (বুদ্ধাব্দ ২৫৫৫) চৌধুরী, হেমেন্দুবিকাশ (সম্পাদিত)। *নির্বাচিত রচনাবলী*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।

বড়ুয়া, ব্রহ্মানন্দ প্রতাপ (২০১৩)। *বাংলায় বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন।

বড়ুয়া, শিমূল (২০১২)। *বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, চট্টগ্রাম*। বাংলাদেশ: অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী।

বড়ুয়া, সুধাংশুবিমল (২০০৮)। *বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভা।

বড়ুয়া, সুমঙ্গল (অনূদিত) (১৩৪১)। *অঙ্গুত্তর-নিকায়*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী।

বন্দোপাধ্যায়, অমল কুমার (১৯২১)। *পৌরাণিকা*। প্রথম খণ্ড: অ-প। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম লিমিটেড।

বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার (১৯৯৫)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সি।

বন্দোপাধ্যায়, দেবাশিস (১৯৯৭)। *চৈতন্যচর্চার পাঁচশো বছর*। কলকাতা: আনন্দ।

বন্দোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি (২০২০)। *হিন্দু কে*। কলকাতা: সূত্রধর।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকূল চন্দ্র (১৯৬৬) / *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমোলকুমার (২০০১)। *পৌরাণিকা*। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম (প্রাইভেট) লিমিটেড।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর (১৪১৪)। *রাধা* । কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পাদিত) (১৯৯২)। *কাশীদাসী মহাভারত*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পাদিত) (১৯৯২)। *পদ্মাবতী জায়সী ও আলাওল* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ (১৪১৭)। *বাংলা সাময়িক-পত্র ১২৭৫ (ইং ১৮৬৮)—১৩০৭ (ইং ১৯০০)*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার (১৯৬৭)।*বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা* । কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।

বসু, অঞ্জলি (সম্পাদিত) (২০১৫)। *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

বসু, কাবেরী (অনূদিত) রত্নাগর, শিরিন (২০১৮)। *হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে*। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

বসু, তারাপদ (২০০৬)। *নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল সমাজ ভাবনা*। বর্ধমান: রাঢ় সংস্কৃতি পরিষদ।

বসু, ত্রিপুরা (১৯৮৭)। *বিস্মৃত কবি ও কাব্য*। কলকাতা: পুস্তক বিপণী।

বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) (১৩১৪)। *শূন্যপুরাণ রামাই পণ্ডিত প্রণীত*। কলকাতা: বিশ্বকোষ প্রেস।

বসু, মণীন্দ্রমোহন (২০০১)। *চর্যাপদ*। কলকাতা: সাহিত্য সেবক সমিতি।

বসু, যোগীরাজ (২০১৫)। *বেদের পরিচয়*। পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা: ফার্মা. কে. এল. এম.।

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (১৪১৮)। *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস।

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (১৪১৮)। *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস।

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (২০০৩)। *চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি*। কলকাতা: দে'জ প্রকাশনী।

বসু, সুজিতকুমার, মণ্ডল, সুধেন্দু, ভট্টাচার্য, সুতপা, দাস, নরেন্দ্রনাথ, ভট্টাচার্য, গৌতম (১৪১৫)। *রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ।

বসু, সুজিতকুমার, মণ্ডল, সুধেন্দু, ভট্টাচার্য, সুতপা, দাস, নরেন্দ্রনাথ, ভট্টাচার্য, গৌতম (১৪১৫)। *রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ।

বাগচী, প্রবোধচন্দ্র (২০০১)। *বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

বিদ্যাবিনোদ, কালীকিশোর ও চৌধুরী সুরেশ (সম্পাদিত) (২০১৭)। *বৃহৎ বারোমেসে মেয়েদের ব্রতকথা*। কলকাতা: অক্ষয় লাইব্রেরী।

বিদ্যাভূষণ, সতীশ চন্দ্র (১৪১৩)। *বুদ্ধদেব অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সম্পূর্ণ জীবন চরিত ও উপদেশ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

বিদ্যারত্ন, কালীপ্রসন্ন (২০১১)। *বুদ্ধদেব-চরিত* । কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

বিশ্বাস, দিলীপ কুমার (২০০৬)। *ইতিহাস ও সংস্কৃতি*। প্রবন্ধ সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী।

বেরা, নলিনী (২০১৯)। *সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

বোধি, ভদন্ত রাহুল (বিপশ্যনাচার্য) (২০০০, অক্টোবর)। *আদর্শ বৌদ্ধাগুণী আচারসংহিতা সম্যক দান*। মুম্বাই: ভিক্ষু সঙ্ঘাচে ইউনাইটেড বুদ্ধিস্ট মিশন।

ব্রহ্মচারী, শীলানন্দ (১৩৯৮)। *অভিধর্ম-দর্পণ* । অখণ্ড সংস্করণ। উত্তর চব্বিশ পরগণা: মহাযোগী জ্ঞানীশ্বর ট্রাষ্টি বোর্ড।

ব্রহ্মচারী, শীলানন্দ (বুদ্ধাব্দ ২৫২৭)। *বিশুদ্ধিমার্গ পরিক্রমা*। উত্তর চব্বিশ পরগণা: মহাযোগী জ্ঞানীশ্বর ট্রাষ্টি বোর্ড।

ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ (১৯৬৩)। *ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য*। কলকাতা: অক্ষয় লাইব্রেরী।

ভট্টাচার্য, অমিত (সম্পাদিত) (১৪১৫)। *সায়ণ মাধবীয় সর্বদর্শনসংগ্রহ চার্বাক-বৌদ্ধ-জৈনদর্শন*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (১৪১৯)। *বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পাদিত) (২০১৬)। *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০০)। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।* কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০৪)। *বাংলার লোকসাহিত্য।* প্রথম খণ্ড। কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

ভট্টাচার্য, চন্দ্রোদয় (অনূদিত) কোসাম্বী, ধর্মানন্দ (২০১৫)। *ভগবান বুদ্ধ*। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি।

ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ, ভট্টাচার্য, সুমিত্রা, সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর, চৌধুরী, সত্যজিৎ (সম্পাদিত) (১৯৯১)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ।* প্রথম খণ্ড। কলকাতা: রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ (২০০০)। *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস*। কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ (রচিত) মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র ও ভিক্ষু, সুমপাল (সম্পাদিত) (২০১৫)। *বৌদ্ধদের দেব-দেবী*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ (সম্পাদিত) ১৩৬২। *সাধনমালা।* প্রথম খণ্ড। জি. ও. এস. অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী।

ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ, চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত) (২০১৫)। *বৌদ্ধদের দেবদেবী।* কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন।

ভট্টাচার্য, বেলা (কার্যকারী সম্পাদিকা) ও সম্পাদক মণ্ডলী (২০০০-২০০১)। *বৌদ্ধকোষ*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভট্টাচার্য, বেলা (কার্যকারী সম্পাদিকা) ও সম্পাদক মণ্ডলী (২০০৪-২০০৫)। *বৌদ্ধকোষ*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভট্টাচার্য, বেলা (কার্যকারী সম্পাদিকা) ও সম্পাদক মণ্ডলী (২০০৪–২০০৫)। *বৌদ্ধকোষ*। পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভট্টাচার্য, বেলা (কার্যকারী সম্পাদিকা) ও সম্পাদক মণ্ডলী (২০০৭)। *বৌদ্ধকোষ*। ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভট্টাচার্য, রমণচন্দ্র (২০০৩)। *গৌতম বুদ্ধ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

ভট্টাচার্য, শিবজীবন (২০২১)। *হিন্দুধর্মের দার্শনিক পটভূমি*। কলকাতা: সূত্রধর।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী (২০১২)। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: গাঙচিল।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী (২০১৩)। *প্রবন্ধসংগ্রহ – ৩* । কলকাতা: গাঙচিল।

ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) ও হালদার, মানসী (১৪১২ বঙ্গাব্দ)। *বারোমাসের মেয়েদের ব্রতকথা*। কলকাতা: দি সজল পুস্তকালয়।

ভট্টাচার্য্য, হংসনারায়ণ (১৯৯৭)। *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* । প্রথম পর্ব। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম (প্রাইভেট) লিমিটেড।

ভট্টাচার্য্য, হংসনারায়ণ (১৯৯৭)। *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* । দ্বিতীয় পর্ব। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম (প্রাইভেট) লিমিটেড।

ভট্টাচার্য্য, হংসনারায়ণ (২০০৩)। *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* । তৃতীয় পর্ব। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম (প্রাইভেট) লিমিটেড।

ভেদানন্দ, স্বামী (১৩৫৩)। *আত্মজ্ঞান*। কলকাতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র (২০০২)। *বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: জেনারেল পাবলিশার্স।

মজুমদার, শ্রীবিজয়চন্দ্র (১৯২৫)। *থেরীগাথা* । ঢাকা: সাধনা লাইব্রেরী।

মণ্ডল, ইন্দুভূষণ (১৯৯৯)। *বাংলা মঙ্গলকাব্যে লৌকিক উপাদান*। কলকাতা: সাহিত্যলোক।

মহাস্থবির, ধর্মাধার (১৯৫৪)। *ধম্মপদ*। মূল ও বঙ্গানুবাদ। কলকাতা: ধর্মাঙ্কুর সভা।

মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার (বুদ্ধাব্দ ২৫৫৩)। *সদ্ধর্মের পুনরুত্থান*। কলকাতা: ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী।

মিত্র, অমলেন্দু (১৪০৭)। *রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর বীরভূমে প্রাপ্ত তথ্যালোকে*।

মিত্র, অশোক (২০১৪)। *ভারতের চিত্রকলা* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ।

মিত্র, কৃষ্ণকুমার (১৯৯৮)। *বুদ্ধচরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষেপ বিবরণ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

মুখার্জী, বন্দনা (২০০৪-২০০৫) ভট্টাচার্য, বেলা (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধকোষ*। পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত (১৯৭৮)। *চীনে বৌদ্ধ সাহিত্য*। কলকাতা: বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ।

মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার (১৩৮৮)। *বাংলায় ধর্মসাহিত্যে লৌকিক উপাদান*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী।

মুখোপাধ্যায়, মহুয়া (২০০৪)। *গৌড়ীয় নৃত্য প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা*। কলকাতা: দা এশিয়াটিক সোসাইটি।

মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দুশেখর (অনূদিত) মহাদেবন, টি. এম. পি. (২০১৮)। *শঙ্করাচার্য*। নিউ দিল্লী: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইণ্ডিয়া।

রত্নাগর, শিরিন (২০১৮)। *হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে বৃহত্তর সিন্ধু উপত্যকায়*। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

রায় আচার্য্য, সুচিত্রা (২০১৪)। *অশোক অভিলেখ*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

রায়, নীহার রঞ্জন (১০৮২)। *বাঙালির ইতিহাস।* আদি পর্ব। কলকাতা: লেখক সমবায় সমিতি।

রায়, বিদ্যানিধি যোগেশচন্দ্র (১৩৯৭)। বাঙ্গালা শব্দকোষ। কলকাতা: ভূর্জপত্র।

রায়, শরৎকুমার (১৪০৭)। *বৌদ্ধ ভারত*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

লাহা, বিমলাচরণ (২০১৩)। *বৌদ্ধরমণী*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।

লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন (সম্পাদিত) (২০১৪)। *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান।* ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

লাহিড়ী-শর্ম্মণা, শ্রীযুক্ত দূর্গাদাস (সম্পাদিত) (১৩২৭)। *ওঁ বেদ ঋগ্বেদ-সংহিতা*। চতুর্থ অধ্যায়। হাওড়া: পৃথিবীর মুদ্রাযন্ত্র।

শরীফ, আহমেদ (২০০৫)। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*। প্রথম খণ্ড। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিশার্স।

শাস্ত্রী, জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৯৯)। *ললিতবিস্তর।* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

শাস্ত্রী, শ্রীতীর্থপতি (সম্পাদিত) (২০১৮)। *খনার বচন*। কলকাতা: সাহিত্য তীর্থ।

শাস্ত্রী, শ্রীরামনারায়ণ দত্ত ও ভট্টাচার্য, শ্রীদুর্গা প্রসন্ন (অনূদিত) (২০১১)। *শ্রী শ্রী চণ্ডী*। গোরক্ষপুর: গীতা প্রেস।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (১৩৫৮)। *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* । কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (২০০১)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ।* তৃতীয় খণ্ড। কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

শীলভদ্র, ভিক্ষু (১৪২২)। *বুদ্ধবাণী*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

শীলভদ্র, ভিক্ষু (অনূদিত) (২০১১)। *দীঘ নিকায়*। (অখণ্ড) বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ—৬। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

শীলভদ্র, ভিক্ষু (অনূদিত) (২০১৫) পাল, সুমন (সম্পাদিত)। *সুত্ত নিপাত*। (অখণ্ড) বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ—৬। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

শ্যামসুখা, পূরণচাঁদ (১৩৫৫)। *জৈন দর্শনের রূপরেখা* । কলকাতা: আর, এন, চ্যাটার্জি এন্ড কোং।

শ্যামাচরণ, পণ্ডিত (অনূদিত) (২০০৭)। *চণ্ডী-রত্নামৃত শ্রী শ্রী মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সরল পদ্যানুবাদ*। কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর।

শ্রী শ্রী সত্যদেব, ব্রহ্মর্ষি (২০১০)। *সাধন সমর বা দেবী মাহাত্ম্য*। গোরক্ষপুর: গীতা প্রেস।

সরকার, ধীরেন্দ্রনাথ (অনূদিত) (২০০৪)। *বুদ্ধ এবং তার ধম্ম অজ্ঞতাই দুঃখের মূল কারণ*। অষ্টম খণ্ড। নাগপুর: ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল।

সরকার, পবিত্র (সম্পাদিত) (২০০৫)। *বঙ্গদর্পণ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সমাজ-রূপান্তর সন্ধানী তৃতীয় সহস্রাব্দ সমিতি থার্ড মিলেনিয়াম কমিটি ফর সোশ্যাল ট্র্যানজিশন।

সরকার, সাধনচন্দ্র (১৪০৪) চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

সাংকৃত্যায়ন, রাহুল (২০০৯) চট্টোপাধ্যায়, মলয় (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ দর্শন*। কলকাতা: চিরায়ত।

সাহা, বিপুল (২০১১)। *হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ*। কলকাতা: আশুতোষ লিথোগ্রাফিক কোম্পানি।

সিনহা, গোপাল চন্দ্র (২০০৮)। *ভারতবর্ষের ইতিহাস।* প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

সেন, অতুল চন্দ্র তত্ত্বভূষণ, সীতানাথ ঘোষ, মহেশচন্দ্র (সম্পাদিত) (২০০০)। *উপনিষদ*। অখণ্ড সংস্করণ। কলকাতা: হরফ।

সেন, অমূল্যচরণ (১৯৯৯)। অশোকচরিত। কলকাতা: জীনরতন মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট।

সেন, কৃষ্ণবিহারী (প্রণীত) ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পাদিত) (২০০৪)। *অশোক চরিত*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

সেন, ক্ষিতিমোহন (১৯৫৮)। *চিন্ময় বঙ্গ* । কলকাতা: আনন্দ।

সেন, ক্ষিতিমোহন (২০১০)। *হিন্দুধর্ম*। কলকাতা: আনন্দ।

সেন, দীনেশ চন্দ্র (২০০২) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (সম্পাদিত)। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

সেন, দীনেশ চন্দ্র (২০০২) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (সম্পাদিত)। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

সেন, দীনেশ চন্দ্র (২০০৬)। *বৃহৎ বঙ্গ*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

সেন, দীনেশ চন্দ্র (২০০৬)। *বৃহৎ বঙ্গ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

সেন, দেবব্রত (১৯৫৫)। *ভারতীয় দর্শন*। কলকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স।

সেন, নবীনচন্দ্র (বুদ্ধাব্দ ২৫০০)। *অমিতাভ*। কলকাতা: প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী।

সেন, প্রবোধচন্দ্র (২০০১) দত্ত, ভবতোষ (সম্পাদিত)। *বাংলার ইতিহাস সাধনা*। বিবিধ বিদ্যা সংগ্রহ—৯। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

সেন, রামদাস (১৯৯৭) ঘোষ বারিদবরণ (সম্পাদিত)। *বুদ্ধদেব তাঁহার জীবন ও ধর্মনীতি*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী ।

সেন, সুকুমার (১৪২৩)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ।

সেন, সুকুমার (১৯৪০)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* । আদি হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্য্যন্ত। কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী।

সেন, সুকুমার (১৯৭০)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস।* প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ। কলকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স।

সেন, সুকুমার (১৯৭৮)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স।

সেন, সুকুমার (২০১৪)। *ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

সেন, সুকুমার (২০১৬)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ।

সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (১৯৫৬)। *চর্যাগীতি-পদাবলী* । বর্ধমান: সাহিত্যসভা।

সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (১৯৮৩)। *কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত লঘু সংস্করণ*। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমী।

সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর (২০১৩)। *উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। কলকাতা: সাহিত্যশ্রী।

সেনগুপ্ত, পল্লব (২০১১)। *পূজাপার্বণের উৎসকথা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

সেনগুপ্ত, সুকুমার (সম্পাদিত) ও সম্পাদক মণ্ডলী (১৯৮৫-৮৬)। *বৌদ্ধকোষ* । ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

স্থবির, প্রজ্ঞানন্দ (অনূদিত) (২০১০)। *বুদ্ধবংশ*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

স্বামী, সমণ পুন্নানন্দ (২০১৭)। চৌধুরী, সুকমল ও ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ (সম্পাদিত)। *পালিভাষা ও পালি ত্রিপিটক*। Buddha And Buddhism. কলকাতা: The Asiatic society।

হাজরা, কানাইলাল (২০১৪) ভিক্ষু, সুমনপাল (সম্পাদিত)। *আদিবুদ্ধ*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

হালদার (দে), মণিকুন্তলা (২০১০)। *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস* । বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ – ৪। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

হালদার, অসিতকুমার (২০১০)। *অজন্তা*। কলকাতা: লালমাটি।

হোসেন, সেলিনা (২০১৮)। *পছন্দের পাঁচ উপন্যাস*। কলকাতা: দিয়া।

ইংরেজি গ্রন্থ

Akira, Hirakawa (2017) Paul, Groner (translated and edited). *A History of Indian Buddhism/ From Sakyamuni to early Mahayan.* New Delhi - Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Banerjee, Biswaanath and Chaudhuri, Sukomal (edited) (2017). *Buddha and Buddhism.* Kolkata: The Asiatic Society.

Barua, Sudhanshu Bimal (1991). *Studies in Tagore and Buddhist Culture.* Kolkata: Sahitya Samsad.

Basu, Ratna (edited) (2007). *Buddhist Literary Heritage in India: Text and Context.* New Delhi: National Mission for Manuscripts and Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Bhattacharyya, Benoytosh (edited) (2013). *The Indian Buddhist Iconography.* New Delhi: Cosmo Publication.

Bhattacharyya, Benoytosh (1958). *The Indian Buddhist Iconography.* Calcutta: Firma, k. L. Mukhopadhyay.

Bhattacharyya, Benoytosh (1964). *An Introduction to Buddhist Esoterism.* Varanasi: The Chowkhamba Sanskrit Studies Vol. XLVI, Chowkhamba Sanskrit Series Office.

Bompas, C.H. (2006). *Folklore of the Kolhan* Kolkata: Asiatic Society.

Chakrabarti, Uma (2015). *The Social Dimensions of Early Buddhism.* New Delhi: National Mission for Manuscripts and Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Chand, Bool (1987). *Lord Mahavira* [A study in Historical Perspective]. Varanasi: Vivek Printers.

Chand, Bool (1987). *Lord Mahavira* [A study in Historical Perspective]. Varanasi: Vivek Printers.

Chattopadhyaya, Debiprasad (2010) Chimpa, Lama & Chattopadhyaya, Alaka (Transleted and Edited). New Delhi: Motilal Banarsi Dass Publishers Pvt. Limited.

Chaudhuri, sukomal (1983). *Analytical Studi of The Abhidharmakosha.* Kolkata: Firma K. L. M Pvt. Limited.

Coomaraswamy, Ananda K. (2003). *Buddha and The Gospel of Buddhism.* Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers.

Dharmapala, Angarika Hewavitrna (1997). *Buddhism in Its Relationship with Hinduism.* Kolkata: Mahabodhi Book Agency.

Dharmapala, Angarika Hewavitrna (2010). *The World Debt to Buddha.* Kolkata: Mahabodhi Book Agency.

Duncan, Ronald (selected and introduced)। *Selected Writings of Mahatma Gandhi*। London: Faber and Faber Limited-24 Russell Squary।

Dutta, Ramesh Chandra (2004). *Civilisation in The Buddhist Age B. C. 320 to A.D 500.* Dellhi: Low Price Publication.

Gandhi, M. K. (1959). *The Moral Basis of Vegetarianism.* Ahmedabad: Jitendra T. Desai. Ahmedabad: Navajivan Mudranalaya 380 014 (India)।

Gupte, R. S. (1972). *The Iconography of The Hindus Buddhist and Jains.* Bombay: D. B Taraporavala Sons and Co Private Limited.

Haldar, Aruna (2001). *Some Psychological Aspects Early Buddhist Philosophy Based on Abhidharmakosha of Vasubandhu.* Kolkata: Asiatic Society.

Hazra, Kanailal (2002). *Buddhism and Buddhist Literature in Early India Epigraphy.* New Delhi: National mission for Manuscripts and Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Jain, Br. Dr. Sneh Rani and Sethi, Nirmal Kumar Jain (first edition) 2019. *Ethiopia in Jain Perspective.* New Delhi: All India Digambar Jain Heritage Preservation Organization International Centre for Nigantha Tradition.

Joshi, Ratanlal (edited) (2000). *Uttaradhyayana-sutra.* Solana: Shri Shri Sadhu Marg Jaina Sanskriti Rakshak Sanggha.

Lama, Dalai and C. Cutler, Howard (1999). *The Art of Happiness A Handbook for Living*. London: Coronet Books Hodder and Stoughton.

Law, Churan Bimala (2012). *On the Chronicles of Ceylon.* Kolkata: Asiatic Society.

Mitra, Sisir Kumar (1979) (edited). *East Indian Bronzes*. Kolkata: Centre of Advanced Study in Ancient Indian History and Culture Calcutta University.

Morris, Charles (1889). *Aryan Sun-Myths the Origin of Religions*. TROY, N.Y.: NIMS AND KNIGHT.

Mullar, F. Max (2013) (transleted and edited). *The Secred Books of The East. Vol. 11. Buddhist Suttas.* New Delhi: Motilal Banarsi Dass Publishers Pvt. Limited.

Munshi, K. M, Majumdar, R. C (edited) (1960). *The Age of Imperial Unity*. Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan.

Nagar, Shantilal (edited) (1927). *Iconography of Jaina Deities*. Vol. 1. Delhi: B.R Publishing Corporation.

R. Bates Thomas (2010). *Gramsci and the Theory of Hegemony.* University of Pennsylvania Press.

Rahaman, Mukhlesur (1998). *Sculpture in the Varendra Research Museum a Descriptive Catalogue*. Rajshahi: Varendra Research Museum.

Ray, Haraprasad (2012). *India-China Interface and the Road Ahead.* Kolkata: Asiatic Society.

Saha, Bipin R. and Barnes, Jenifar (2013). *Non-Vedic Tradition of India–Mahavira, Buddha and Gosala. Comparisons and contrasts of Buddhism and Jainism.* Dellhi: Cossmo Publication.

Sarkar, H. and Mishra, B.N. (2006). *Nagarjuna Konda*. New Delhi: Archaeological Survey of India.

Sarkar, H. and Nainar S.P. (2007). *Amaravati*. Fifth Edition. New Delhi: Archaeological Survey of India.

Sastri, Haraprasad (1897). *Discovery of Living Buddhism in Bengal*. Calcutta: R. Dutta Hare Press.

Shakya, Miroj (2015)। *Jainism and Buddisim: A Comparative Survey of Their Ethics*. California: Department of Buddhist Chaplaincy University of The West Los Angeles

shamashastry, R (translated and edited) (1951). *Kautilya's Arthashastra*. New Delhi: Mysore Press.

Sivaramamurti, C. (2004). *The Chola Temples*. Sixth Edition. New Delhi: Archaeological Survey of India.

Sosnoski, Daniel (edited) (1996). *Introduction to Japanese Culture*. Vermont and Tokyo, Japan: Charles E. Tuttle Company

Spence, Lewis (1987). *The Myths of Mexico and Peru*. Mexico: Pu.

Stevenson, Sinclair and Taylor, G. P (1915) The Religious Quest of India. *The Heart of Jainism.* London: Oxford University Press.

Swami, Vivekananda (2007). *Buddhism The Fulfillment of Hinduism Adderess at The Parliament of Religion. The Complete Works of Swami Vivekananda.* Kolkata: Advaita Ashrama.

Thomas, Edward j. (2004). *The History of Buddhist Thought.* New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

পত্র-পত্রিকাপঞ্জি

বাংলা পত্র-পত্রিকা

আচার্য, অনিল (সম্পাদিত) (১৯৯৯)। *অনুষ্টুপ*। সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক ত্রৈমাসিক ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ : গ্রীষ্ম, বর্ষা যুগ্মসংখ্যা। কলকাতা: সি. আই. টি. রোড।

আচার্য, অনিল (সম্পাদিত) মুখোপাধ্যায়, বন্দনা (রচিত) (১৪২২)। *বিশেষ বাংলা পুঁথি সংখ্যা*। প্রাক্ শারদীয়, ৪৯ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা। কলকাতা: অনুষ্টুপ।

কিস্ কু, উপেন (সম্পাদিত) ও সম্পাদকমণ্ডলী (১৪০৫)। *লোকশ্রুতি*। চতুর্দশ সংখ্যা। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।

চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত (২০০৫)। *পরিকথা*। অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং হাউস।

চতুর্বেদী, হরিহর প্রসাদ (সংস্থাপক এবং প্রধান সম্পাদক) (২০১৬, সেপ্টেম্বর)। *পারসমালা*। বারাণসী: বিশ্বগাঁও অন্তরধর্মীয় মাসিক সংবাদ।

দত্ত, বিজিতকুমার (সম্পাদিত) (২০০০)। *আকাদেমি পত্রিকা*। দ্বাদশ সংখ্যা। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

দাস, প্রভাতকুমার (সম্পাদিত) (১৪১১)। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*। ১১১ বর্ষ ১ সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ়। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

পাণ্ডে, শ্রীপ্রকাশ (সম্পাদিত) (২০২০)। *শ্রমণ*। জানুয়ারি থেকে জুন সংখ্যা। বারানসী: পার্শ্বনাথ বিদ্যাপীঠ।

বসু, সঞ্জীবকুমার (সম্পাদিত) (১৪০৯)। *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*। কার্তিক-পৌষ ও মাঘ-চৈত্র যুগ্ম সংখ্যা। কলকাতা: দে বুক স্টোর্স।

মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার (সম্পাদিত) (১৪০৩)। *বিশ্বভারতী পত্রিকা*। নবপর্যায়-৬, কার্তিক-পৌষ সংখ্যা। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ।

রায়চৌধুরী, সুব্রত (সম্পাদিত) (২০১৫)। *নবনির্মাণে চর্যাপদ*। কলকাতা: গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পত্রিকা তথ্যসূত্র দ্বিতীয় সংখ্যা।

সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত) (১৪২৫)। *নারী ঔপন্যাসিক সংখ্যা*। কলকাতা: এবং মুশায়েরা।

সেন, সুনীল কুমার ও চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (২০১২)। *প্রাচীন যুগের কথা*। কলকাতা: অনুষ্টুপ।

ইংরেজি পত্র-পত্রিকা

Akira. Saito (editor) (2015). *Acta Asiatica*. Bulletin of The Institute of Eastern Culture. Number – 108. Tokyo: The Institute of Eastern Culture.

Anchordoguy, Marie (editor) and associate editors (2007). *The Journal of Japanese Studies.* Volume – 33, Number – 2, Summer. Thomson Hall: University of Washington.

Anchordoguy, Marie (editor) and associate editors (2011). *The Journal of Japanese Studies.* Volume – 37, Number – 1, Winter. Thomson Hall: University of Washington.

Dorman, Benjamin and Korom, Frank J. (editors) and Associate editors (2015). *Asian Ethnology.* Volume – 74, Number – 1. Nagoya: Nanzan Institute for Religion and Culture.

Tsuyshi, Kojima (editor) (2017). *Acta Asiatica*. Bulletin of The Institute of Eastern Culture. Number – 112. Tokyo: The Institute of Eastern Culture.

Wasserstrom, Jeffrey N. (editor) and associate editors (2015). *The Journal of Asian Studies.* Volume – 74, Number – 3, August. U.K: Cambridge University Press.

আর্কাইভ্যাল ও বৈদ্যুতিন তথ্য

https://www.google.co.in/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=OKrkWsyuBYyMvQTXm7sg&q=goddess++janguli&oq=goddess++janguli&gs_l=psy-ab.12...97365.100875.0.102493.15.14.0.0.0.0.502.2351.0j1j4j2j0j1.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..9.2.703...0j0i67k1.0.bMYKDteOHog.

https://www.google.co.in/search?q=goddess+ekjata&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjOi-X7uN3aAhVDNI8KHc5lBwkQ_AUICygC&biw=1366&bih=662

https://www.google.co.in/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=xKnkWqHJBcvdvgTH-qqIAg&q=goddess++parnashabari&oq=goddess++parnashabari&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.1100.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.QPPFOhoG76Y

https://www.google.co.in/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=xqnkWprSBYb4vATZ-paoCg&q=goddess++shashthi&oq=goddess++shashthi&gs_l=pab.12..0.3930.10323.0.11871.20.17.0.2.2.0.402.2829. 3j1j5j3j1.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..10.9.1279...0i67k1j0i8i10i30k1j0i24k1.0.Fm06e56CfIs

https://en.wikipedia.org/wiki/Pashupati_seal

https://www.himalayanart.org/items/65664